জলে দস্যু ডাঙায় বাঘ

প্রফুল্লকুমার চক্রবর্তী

জ্ঞান-ভবন
১৮সি টেমার লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশনা—আগষ্ট ১৯৬৫

প্রকাশিকা :
শ্রীমতী প্রমীলা বাগচী
দুর্গানগর, মাদ্রাস
২৪ পরগণা

মুদ্রাকর :
শ্রীগঙ্গারাম পাল
মহাবিদ্যা প্রেস
১৬৬, তারক প্রামাণিক রোড,
কলিকাতা-৬

শ্রীরাধা ও সুগতকে

জলে দস্যু ডাঙায় বাঘ

হই-হই করে উঠে পূর্ণ চ্যাটার্জি বললেন, 'এসো কৌশিক, এসো। আজ তিনদিন ধরে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, কিন্তু কেউ কোনওরকম হদিস দিতে পারছে না। চোর-ডাকাতকে খুঁজতে হয় শুনেছি, কিন্তু গোয়েন্দাকে এত খুঁজতে হবে কেন?'

হেসে উঠে জবাব দিল কৌশিক, 'দিনকাল একেবারে পাল্টে গেছে পূর্ণদা। এখন খুনি-ডাকাত সবার চোখের সামনে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়, আর পালিয়ে বেড়ায় গোয়েন্দা-পুলিশ।'

'পালাক। তবে পালাবার সময়টা লম্বা না হলেই হল। আজ তোমাকে না পেলে আমার অবস্থা আরও কাহিল হয়ে উঠত। হাতে আর মাত্র তিনটে দিন। ভাল কথা, তোমার কি এখন কোনও তদন্তটদন্ত চলছে?'

হেসে উঠল কৌশিক। 'একটা বেয়াড়া কেস ছিল হাতে, সেটা মেটার পরেই গা ঢাকা দিয়েছিলাম।'

'গা-ঢাকা কেন? ওহ্। তোমার তো আবার মিডিয়ার ভয়। খেটেখুটে চোর-ডাকাত-খুনি ধরবে ; কিন্তু সাক্ষাৎকারের জন্য টিভি, খবরের কাগজ পিছু নিলেই উধাও হয়ে যাবে। শোনো, তোমার গা-ঢাকা দেওয়ার পালা এখন শেষ। এবার তো একটু নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নেবে—। তাই তো?'

লাজুক মুখে উত্তর দিল গোয়েন্দা, 'বিশ্রাম ঠিক নয়, এই ধারেকাছে কোথাও গিয়ে চিৎপাত হয়ে একটু আলসেমি করা।'

'তোমার চিৎপাত হওয়ার জায়গা মানে তো জঙ্গল?'

হেসে ফেলল কৌশিক। 'আপনার দেখছি আমার বাতিকটার কথা মনে আছে পূর্ণদা।'

'বাতিক কোথায়? আমার তো মনে হয়, বিশ্রাম নেওয়ার পক্ষে জঙ্গলই সব চাইতে ভাল জায়গা। চোখ খুলে সবুজ দেখো, তারপর চোখ বুজে পাখির ডাক শোনো। এবার তোমার বিশ্রামের ব্যবস্থা আমি করছি। আমিও সঙ্গে যাব। তবে এ জঙ্গল তোমার শান্ত জঙ্গল নয়। জঙ্গলের আশেপাশে বিস্তর নদী-নালা-খাঁড়ি আছে। জায়গাটা কিন্তু অপূর্ব। কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলে ঝিমুনি ধরে যাবে। যেখানে-সেখানে অবশ্য ঝিমোবার উপায় নেই। বিপদ ওত পেতে আছে চারদিকে। জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ—জায়গাটা নিশ্চয়ই তুমি আন্দাজ করতে পারছ?'

ছেলেমানুষের মতো খুশি হয়ে উঠেছিল কৌশিক। 'যে কেউ পারবে। সুন্দরবন তো?'

'ঠিক তাই।'

'আহ্! অপূর্ব! একবার গিয়েছিলাম, তবে সে বাইরে থেকে ছোট্ট একটা চক্কর মেরে আসা—। কিন্তু পূর্ণদা, আপনার বেড়াবার জায়গা মানে তো বইপত্তরের জঙ্গল। ওই জঙ্গল ছেড়ে সত্যিকারের জঙ্গলে যাচ্ছেন কেন?'

প্রশ্নের জবাবে রহস্যময় একটা হাসি ফুটে উঠেছিল পড়ুয়া মানুষটির চোখেমুখে। 'এটা একেবারে অন্য ধরনের সফর। আমি তো ভেতরে ভেতরে রীতিমত উত্তেজিত হয়ে আছি। আমার বেড়ানো আর বই পড়া একসঙ্গে চলবে।'

'কী রকম?'

'দাঁড়াও, একটু চা নিয়ে আসি।'

'কে বানাবে?'

'আমিই বানাব। কাজের লোক আজ ছুটি নিয়েছে একবেলা।'

জবাব শুনে বিব্রত হয়ে উঠেছিল কৌশিক। 'ব্যস্ত হওয়ার কী আছে! একটু পরে না হয়—। আমরা তো বেরিয়ে গিয়েও চা খেতে পারি পূর্ণদা।'

'তোমার অত সঙ্কোচের কোনও কারণ নেই। চা খাওয়ার ব্যাপারে আমি পুরোদস্তুর সাহেব। তুমি না এলেও আমি এখন চা বানাতে যেতাম। একটু বোসো, দু-মিনিটের বেশি লাগবে না।' কথাটা বলেই ভেতরের ঘরে ঢুকে গেলেন কৌশিকের পূর্ণদা।

শীতের বিকেল। মাত্র চারটে বাজে, কিন্তু এর মধ্যেই দিনের আলো বেশ ম্লান হয়ে এসেছে। একটু বাদে আলো জ্বালাতে হবে ঘরে। এই ঘরটা অবশ্য সামান্য আলো আঁধারিতেই বেশি ভাল লাগে কৌশিকের, মস্ত বড় ঘরের চারদিকে র‍্যাকভর্তি বই। টেবিলেও বইয়ের পাহাড়। পাহাড়ের একদম ধারের দিকে একটা বই ভাঁজ করে ওলটানো।

বছরখানেক হল চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন পূর্ণদা, কিন্তু একটা দিনের জন্যও দুপুরে ঘুমোননি। একেবারে নিয়ম-বাঁধা জীবন। ভোরে উঠে লেকের ধারে বেড়াতে যান। সপ্তাহে তিন দিন বাজার করেন। লোক-লৌকিকতা যতটুকু না করলে নয়, তার বেশি করেন না। দিনরাতের বেশির ভাগ সময় বইপত্তর পড়ে কেটে যায় ওঁর। ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সংখ্যা এখন দাঁড়িয়েছে দুইয়ে। এর বাইরে বিপত্নীক মানুষটি আড্ডা মারতে ভালবাসেন তরুণ গোয়েন্দা কৌশিকের সঙ্গে। একমাত্র কন্যাসন্তানের বিয়ে হয়ে গেছে বছর-সাতেক আগে। মেয়ে থাকে নাসিকে। এক-দেড় বছর অন্তর কলকাতায় এসে বাবার সঙ্গে কাটিয়ে যায় কয়েকটা দিন। মেয়ের তখন একটাই শর্ত থাকে। ও যতদিন বাড়িতে থাকবে ততদিন বইয়ে মুখ গুঁজে থাকা চলবে না। শর্তটা হাসিমুখে মেনে নিয়েছেন বাবা।

চা বানিয়ে নিয়ে এলেন পূর্ণদা। চায়ের সঙ্গে নোনতা বিস্কুট। চায়ে ছোট্ট একটা চুমুক মেরে কৌশিক বলল, 'দুর্দান্ত চা বানিয়েছেন তো!'

ছেলেমানুষের মতো হেসে উঠে পূর্ণদা বললেন, 'এই একটা ব্যাপারে কেউ আমাকে হারাতে পারবে না। চায়ের কোয়ালিটি ভাল হলেই যে চা ভাল হবে—তা নয় কিন্তু। চা বানাবার কায়দাটাই আসল। আর ভাল চা বানাতে হলে চা-পাতার সঙ্গে সঙ্গে জলের দিকেও নজর দিতে হবে। টিউবওয়েলের জলে আয়রন বেশি, ভাল চা হবে না। মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের জলে ক্লোরিন বেশি থাকলে চায়ের দফা গয়া। সবচেয়ে ভাল

চা কিসে হয় জানো? বৃষ্টির জলে।'

'এটা কি বৃষ্টির জলে বানানো চা?'

মুচকি হেসে জবাব দিলেন পূর্ণদা, 'কলকাতার বৃষ্টির জলে কিন্তু চা ভাল হয় না। হবে কোত্থেকে? ধোঁয়াকালির পলিউশনে তো আকাশ ভর্তি। আমি একবার দূরের একটা গ্রাম থেকে দুই জেরিক্যান বৃষ্টির জল এনেছিলাম। সেই জলে যা চা হয়েছিল না—ফ্যান্টাস্টিক!'

চোখ বড়-বড় করে মজার গলায় কৌশিক বলল, 'চা খাই, কিন্তু আড়ালের এ সব রহস্যটহস্য জানি না তো!'

খোলামেলা গলায় কৌশিকের পূর্ণদা হেসে উঠে বললেন, 'কী করে জানবে? তোমরা মানে গোয়েন্দাদের সবাই তো কমবেশি শার্লক হোমস্ মার্কা। খুন-চুরি-ডাকাতির সমাধানে যা-যা জানা দরকার তার বাইরে আর কিছুই তো মাথায় ঢোকাতে চাও না। আমরা তো কাজের কাজ কিছুই করি না, তাই একগাদা অদরকারি বিষয় নিয়ে বসে থাকি।'

জিভ কেটে কৌশিক বলল, 'বড় বড় গোয়েন্দাদের সঙ্গে আমাকে মেশাবেন না। আমি দরকারি, অদরকারি কোনওটাই ভাল করে জানি না। জানি না বলেই আপনাদের মতো মানুষের কাছে ছুটে আসি বারবার। আপনাদের কাছে আসা মানেই ভাল কিছু জেনে ফেরা। তা, পূর্ণদা আপনি তো এখন সাড়ে-তিনশো চারশো বছর আগেকার মুঘল যুগে ঘোরাফেরা করছেন। ওই সময়ের কিছু গল্পটল্প বলুন না—।'

অবাক হয়ে পূর্ণদা বললেন, 'কিন্তু তুমি কী করে জানলে! সত্যিই আমি এখন মুঘল যুগ নিয়ে একটু-আধটু পড়াশোনা করছি। তোমার সঙ্গে তো আমার বেশ কিছু দিন দেখা হয়নি, তা তুমি ওই ব্যাপারটা জানলে কী করে?'

বিব্রত মুখে জবাব দিল কৌশিক, 'আপনি ছোটখাটো বিষয়কে বড্ড বড় করে দেখেন। টেবিলে মুঘল যুগের একটা বই ভাঁজ করা আছে—তাই বললাম।'

বেশ তারিফ করার গলায় পূর্ণদা বললেন, 'রহস্য ফাঁস করে দিলে অনেক কিছুকেই ছোট দেখায়। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত সমস্তই বিরাট। দেখার চোখটাই গোয়েন্দাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ। তোমার ওপর তো রনির অগাধ আস্থা। সেই জন্যই সুন্দরবন ট্রিপে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার কথা রনি আমাকে বারবার বলছে।'

'রনি কে?'

'রনির কথা মনে নেই? আমার ভাইপো। তোমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল একবার। তোমার তো বিরাট ভক্ত।'

'ওহ্! রনি! আপনি যে ওর কথা বলছেন—ধরতে পারিনি প্রথমে। দারুণ বুদ্ধিমান ছেলে। ও তো এখন জুরিখে। না?'

'না, জুরিখের চাকরি ছেড়ে বার্নে গেছে। সেদিন টেলিফোনে বলছিল, বার্ন সুইজারল্যান্ডের রাজধানী হলে কী হবে—জুরিখ ঢের বেশি জমজমাট। ও এখন ইন্ডিয়ান এম্বাসিতে চাকরি করছে। ওই তো বারবার বলছিল—কাকু, তুমি অবশ্যই কৌশিককে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। আসলে আমাকে নিয়ে ওর খুব ভয়। সুন্দরবন মানে তো শুধু বাঘ-কুমির-সাপ নয়, মানুষও আছে—যাকে বলে জলদস্যু।'

কৌশিক হেসে উঠে বলল, 'তা, এত জায়গা থাকতে ও আপনাকে বিপদের মধ্যে ঠেলে পাঠাচ্ছে কেন? সুন্দরবনে না গেলেই তো হয়।'

'আরে, আমরা তো নেহাতই সঙ্গীসাথি ; আসল পর্যটক হল ওই সাহেব আর মেম।'

অবাক হল কৌশিক। 'তারা আবার কারা?'

চায়ের কাপে লম্বা একটা চুমুক দিয়ে পূর্ণদা বললেন, 'আসলে আমি এতই উত্তেজিত হয়ে আছি যে পুরো ব্যাপারটা তোমাকে এখনও গুছিয়ে বলতে পারিনি। রনির খুব জানাশোনা এক সাহেব আর মেম সুন্দরবনে বেড়াতে আসছে। আমাদের দুজনকে ওদের সঙ্গী হওয়ার জন্য বারবার টেলিফোন করছে আমাকে। বিশাল একটা চিঠিও লিখেছে। আসলে সাহেব-মেম চাইছে একটু-আধটু ইতিহাস-ভূগোল জানা কেউ ওদের ভ্রমণসঙ্গী হোক। তাই শুনে আমি বলেছিলাম—আমি তা হলে একজন ভাল গাইডের খোঁজ করি। রনির তাতে আপত্তি। বলল, পেশাদার গাইডের কোনও দরকার হবে না ওদের। গাইড হতে হবে তোমাকে। আরে বাবা, আমি তো আর সুন্দরবন-এক্সপার্ট নই। দু-তিনখানা বই পড়েছি—এই যা। ভাইপো বলছিল, ওই বিদ্যেতেই কাজ চলে যাবে ওদের। আমি অবশ্য কেটে পড়ার তাল করেছিলাম, কিন্তু যেই না শুনলাম—। বলা যায় একরকম লোভে পড়েই ফেঁসে গিয়েছি আমি।'

'লোভ!'

'হ্যাঁ, একে লোভ ছাড়া আর কী বলা যায়! যে দুই সাহেব-মেম সুন্দরবন দেখতে আসছে, তাদের একজন—মানে মেমসাহেবটি হল খোদ ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়েরের বংশধর।'

কৌশিকের চোখমুখের চেহারা একটু ম্লান হল। আমতা-আমতা করে বলল, 'ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের কে?'

কৌশিককে আশ্বস্ত করার গলায় পূর্ণদা বললেন, 'বার্নিয়েরের কথা তোমার না জানলেও ক্ষতি নেই। এটা তোমার লাইনের ব্যাপার নয়। তবে হাতে যখন একটু সময় আছে, বার্নিয়েরের কথা অল্পসল্প জেনে রাখো। ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের একজন বিখ্যাত ফরাসি পর্যটক। আজ থেকে প্রায় সাড়ে-তিনশো বছর আগে ভারতবর্ষে বেড়াতে এসেছিলেন। ভদ্রলোক ছিলেন পেশায় চিকিৎসক। দর্শনের চর্চাও করতেন। অন্য ধরনের মানুষ, অন্য ধরনের চোখ ; তার ফলে সেই যুগের ভারতবর্ষের অসাধারণ এক ভ্রমণবৃত্তান্ত বেরিয়ে এসেছে ওঁর কলম থেকে। ওই বইটি পড়লে যে কারও ভাল লাগবে। কয়েক বছর উনি সম্রাট ঔরঙ্গজিবের খাস-চিকিৎসকের চাকরিও করেছিলেন। ভারত থেকে দেশে ফিরে গিয়ে ভ্রমণকাহিনীটি ছেপে বার করেন। ফরাসি ভাষায় লেখা বইটির ইংরেজি ও ডাচ সংস্করণও বার হয়। তারপর ওই বই নিয়ে গোটা ইউরোপে রীতিমত হইচই পড়ে গিয়েছিল। আসলে সেই সময় যোগাযোগ ব্যবস্থা এত খারাপ ছিল যে, ভারতের খবরাখবর ইউরোপের মানুষজন খুব একটা জানার সুযোগ পেত না। সুরাট, দিল্লি, লাহোর, গোলকুণ্ডা, কাশ্মীর ইত্যাদি জায়গা ঘোরার পরে বাংলাদেশে বেড়াতে এসেছিলেন বার্নিয়ের। একবার নয়, দু-দুবার।'

'বাংলাদেশকে নিয়ে আলাদা ভাবে কিছু লেখেননি?'

'লিখেছেন। ওই বইটার মধ্যেই আলাদা একটা চ্যাপটারই আছে বাংলাদেশ নিয়ে। ওঁর লেখার মধ্যে যে জিনিসটা আমার সবচেয়ে ভাল লাগে—তা হল, কোথাও কোনও ভাসা-

ভাসা ব্যাপার নেই। লিখেছেন : বেশ কয়েকজন লেখক মিশরকে সোনার দেশ বলে রায় দিয়েছেন। মিশরের মতো অমন ফুল-ফল-ফসল ভরা দেশ নাকি পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। কিন্তু দুবার বাংলাদেশে বেড়াতে এসে আমার মনে হচ্ছে—মিশর সম্পর্কে এতকাল যা বলা হয়েছে, তা আসলে বাংলাদেশ সম্পর্কেই বেশি সত্যি।'

রীতিমত উত্তেজিত হয়ে কৌশিক বলে উঠল, "বাংলাকে 'সোনার বাংলা' বলা হয়তো সেই থেকেই শুরু। আচ্ছা, বার্নিয়েরের বংশধর ওই মেমসাহেব কি পূর্বপুরুষের লেখা পড়ে সোনার বাংলা দেখতে আসছেন?"

'সেটা একটা উদ্দেশ্য, তবে আরও কিছু আছে বোধহয়।'

'কী সেটা?'

'রনি পুরোটা ভাঙেনি, তবে ওর কথা শুনে মনে হয়—কোথায় যেন কী একটা রহস্য আছে। স্পষ্ট ভাবে জানতে চাইলে একটাই কথা—সুন্দরবন ট্রিপে অবশ্যই কৌশিককে সঙ্গে নেবে।'

কৌশিক এবার খোলামেলা গলায় হেসে উঠে বলল, 'একেই বলে সঙ্গদোষ। আমার মতো ছোটখাটো একটা গোয়েন্দার সঙ্গে মেলামেশা করে লোককে অকারণে সন্দেহ করতে শিখেছেন আপনি। সাহেব-মেম সুন্দরবনে বেড়াতে আসছে, তার বেশি আর কিছু নয়। রনি আপনাকে সঙ্গে যেতে বলেছে—তার কারণ এখানকার লোকজন, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার সম্পর্কে সাহেব-মেমের হাজার একটা প্রশ্ন থাকবে। সে সবের উত্তর আপনার মতো আর কেউ দিতে পারবে না। আর আমার ভূমিকা পাহারাদারের। আপনার মতো ভুলো মনের মানুষ সুন্দরবনের মতো ভয়ংকর জায়গায় যাতে বিপদে না পড়ে—সেদিকে নজর রাখতে হবে আমাকে। তার মানে আমার কাজ বলতে—নো কাজ। স্রেফ ভালমন্দ খাওদাও আর আরামসে বন-জঙ্গল-নদী দেখো। আচ্ছা পূর্ণদা, আপনার ওই সাহেব-মেম দুজনেই কি ফরাসি?'

'সাহেব ইংরেজ, মেম ফরাসি। তবে মেমসাহেব নাকি খুব ভাল বাংলা জানে।'

'তাই! এখানে ছিল বোধহয়?'

'না-না, কখনওই এ দেশে আসেনি। বাংলা শিখেছে ওর প্রথম স্বামীর কাছ থেকে। প্রথম স্বামী ছিল বাঙালি। তবে বাংলা শেখাটা নাকি মেমসাহেবের নিজের আগ্রহেই। বাঙালি স্বামী থাকায় শেখার কাজটা সহজ হয়েছিল। রনি বলছিল, ওঁর বাংলা ভাষা শেখার আগ্রহের পেছনে আছে পূর্বপুরুষের ওই ভ্রমণবৃত্তান্ত। মেমসাহেবের কাছে ওই বৃত্তান্তের সেরা অংশ—সোনার বাংলা ভ্রমণ। বাঙালি স্বামীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার পরে মহিলা ওই দেশে খুঁজে-খুঁজে বাঙালি বার করেন বাংলায় গল্প করার জন্যে। রনির সঙ্গে ওই ভাবেই আলাপ।'

অবাক হল কৌশিক। 'অদ্ভুত তো! একটা দেশের ওপর টান থেকে সেই দেশের ভাষা শেখা! তাও আবার ওই ভাবে! এমন দৃষ্টান্ত বোধহয় আর একটাও নেই।'

'একেবারে যে নেই, তা বলা যায় না। ম্যাক্সমুলারের কথাই ধরো না। জার্মান এই সাহেবটি ভারতে কখনও আসেননি, কিন্তু ভারতপ্রীতি থেকে সংস্কৃত শিখেছিলেন মন দিয়ে। অমন সংস্কৃত-জানা পণ্ডিত তখন ভারতেও খুব কম ছিলেন।'

দিনের আলো আর একটু মরে এসেছে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে কৌশিক জিজ্ঞেস করল, 'সাহেবের কি এই প্রথম ভারতে আসা?'

'না-না, সাহেব কয়েক বছর এই কলকাতাতেই কাটিয়ে গেছেন। ব্রিটিশ হাইকমিশনারের অফিসে কাজ করতেন। অল্পস্বল্প বাংলা জানেন।'

'সাহেব তা হলে বোধহয় সুন্দরবন ঘুরে গেছেন?'

'না-না, ঘোরেননি। আসলে ঘরের পাশে সুন্দরবন হলে কী হবে, ওখানে যাওয়াটাই তো বেশ কঠিন। এই দেখ না আমার সারা জীবন এই কলকাতায় কেটে গেল, কিন্তু সুন্দরবন যাইনি একবারও। তবে মনে মনে গিয়েছি বহুদিন। আসলে ছেলেবেলা থেকেই সুন্দরবন সব বাঙালির রক্তে মিশে যায়। সুন্দরবন মানেই রয়াল বেঙ্গল টাইগার। সুন্দরবন মানেই অসংখ্য খাল-বিল-নদী-নালা। জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ। ঘন বাদাবন। বন থেকে মোম, মধু আর কাঠ আনতে যায় মৌলি আর কাঠুরেরা। ওদের মধ্যে কতজন যে বাঘের পেটে যায় তার আর ঠিকঠিকানা নেই। নদী আবার জলদস্যুতে ভরা। এই সব নিয়েই গা-ছমছমে সুন্দরবন।'

একটু বোধহয় গল্প শোনার মেজাজ এসে গিয়েছিল কৌশিকের। 'সত্যি, সুন্দরবন শব্দটার মধ্যেই অদ্ভুত একটা জাদু আছে। ছোটবেলায় সুন্দরবন নিয়ে আমরাও অনেক গল্প শুনেছি। আচ্ছা, বার্নিয়ের তো গোটা বাংলাদেশের প্রশংসা করেছেন। তা, সাহেব-মেম সব ছেড়েছুড়ে সুন্দরবন দেখার জন্যে ছুটছে কেন?'

'সুন্দরবনের কথাও বার্নিয়ের লিখেছেন আলাদা ভাবে। এক জায়গায় লিখেছেন : এই সব দ্বীপের মধ্যে অনেক জায়গায় দাঁড়-টানা নৌকো থেকে নামা বিপজ্জনক। রাতের বেলায় গাছের সঙ্গে বাঁধা নৌকো তীরের থেকে বেশ কিছুটা দূরে রাখা দরকার। না হলে নৌকোর কেউ-না-কেউ ঠিক বাঘের শিকার হবে। রাত্তিরে মাঝিরা ঘুমোয় নৌকোয়। বাঘ তখন নিঃশব্দে নৌকোয় উঠে ঘুমন্ত একজনকে মুখে নিয়ে পালায়। স্থানীয় লোকেদের বিশ্বাস—, বার্নিয়ের লিখেছেন, দলের সবচেয়ে মোটাসোটা লোকটাই বাঘের পছন্দ।'

চোখেমুখে মৃদু উত্তেজনার ভাব ফুটে উঠেছিল কৌশিকের। 'শুনেছি, সুন্দরবনে এই ধরনের ঘটনা নাকি এখনও ঘটে থাকে। তার মানে এই সাড়ে-তিনশো বছরের মধ্যেও সুন্দরবনের চেহারা খুব একটা পালটায়নি।'

'না-না, অনেক পালটেছে। বন কেটে বসত হয়েছে বহু জায়গায়। বাঘের সংখ্যাও কমেছে।'

"সাহেব-মেম ক'দিন ঘুরবে এখানে?"

'ও নিয়ে রনি কিছু জানায়নি। তবে অদ্দুর থেকে আসছে যখন কয়েকটা দিন থাকবে মনে হয় সুন্দরবনে।'

'আমার তা হলে কাজটা কী এখন? সাহেব-মেমের জন্যে লঞ্চ ভাড়া করা।'

'না-না, সে সব ঠিক হয়ে গিয়েছে। পরশুর পর দিন, মানে শুক্রবার, হাসনাবাদ থেকে লঞ্চ ছাড়বে।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল কৌশিক, 'কে ঠিক করল ওদের জন্যে লঞ্চ?'

"তা জানি না, তবে লঞ্চ ভাড়া হয়ে গিয়েছে। দু'দিন আগেই ফোনে জানিয়েছে রনি।"

গোয়েন্দার কপালে হালকা কয়েকটা ভাঁজ ফুটে উঠেছিল। একটু চাপা গলায় বলল, 'ভাল, আমরা তা হলে কনডাকটেড ট্রিপের যাত্রী হয়ে সুন্দরবন সফরে যাচ্ছি।'

দিনের আলো আরও ম্লান হয়ে গিয়েছিল। ঘরের সুইচবোর্ডের দিকে এগোতে এগোতে পূর্ণদা জবাব দিলেন, 'সে সব জানি না, তবে তুমি তোমার পিস্তলটা সঙ্গে নিতে ভুলো না কিন্তু, রনি বারবার করে বলে দিয়েছে।'

ঘরের আলো জ্বালতেই চোখের ওপর হাত চাপা দিলে কৌশিক। আবছা আলোয় চোখ সয়ে গিয়েছিল বেশ। তারপর হাতটা সরিয়ে নিয়ে বলল, 'সুন্দরবন মানেই জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ। তাও আবার এক-আধটা নয়, গাদা-গাদা। ওখানে একটা পিস্তল নিয়ে গিয়ে কী করব?'

'হয়তো আরও কোনও বিপদের আশঙ্কা করছে!'

'কী বিপদ'?

'বাঘ-কুমির বাদে আর যেটা আছে সুন্দরবনে—জলদস্যু।'

হেসে উঠল কৌশিক। 'আপনার রনি দেখছি চমৎকার একটা প্রমোদভ্রমণকে রোমহর্ষক অ্যাডভেঞ্চার বানিয়ে দিচ্ছে!'

পূর্ণদাও হাসলেন। 'সঙ্গে পিস্তল নেওয়ার ইচ্ছে না হলে নেবে না। বেঘোরে আমার প্রাণ যদি যায়, যাক। আমার প্রাণের কোনও দাম নেই। আর তোমার ওপর আমার অগাধ আস্থা—যে কোনও বিপদেই পড়ো না কেন, খালি হাতেও তুমি তোমাকে বাঁচাতে পারবে। আমার এখন আবার অন্য একটা টেনশন শুরু হয়েছে—।'

কপালে ভাঁজ পড়ল কৌশিকের। 'কী নিয়ে টেনশন?'

একটু বিব্রত মুখে পূর্ণদা বললেন, 'বহুকাল কোথাও বেড়াতে যাইনি। সঙ্গে কী-কী নেব বলো তো? জামাকাপড়—আচ্ছা, শাল নেব, না সোয়েটার! আমি তো ঘরে লুঙ্গি পারি। লুঙ্গি কি নেওয়া যাবে?'

'কেন নেওয়া যাবে না?'

'না, বলছিলাম কি—সঙ্গে তো সাহেব-মেম থাকবে—।'

গলা ছেড়ে হেসে উঠল কৌশিক। 'সাহেব-মেম ওদের পোশাক পরবে, আমরা পরব আমাদের পোশাক। আমরা তো কোনও পার্টিতে যাচ্ছি না। যাদের সঙ্গে দেখা হতে পারে, তারা হল বাঘ আর কুমির। ওরা মানুষের পোশাকের ধার ধারে না। চলি এবার।'

'সে কী এক্ষুনি!'

'না গেলে দোকান বন্ধ হয়ে যাবে যে।'

'কিসের দোকান?'

'বন্দুকের। আমার পিস্তলটা সার্ভিসিংয়ে দিয়েছি। তাগাদা মেরে বের করতে হবে না? আপনি আর রনি দুজনেই যখন আমার লাগেজ বাড়াতে চান—বাড়ুক।'

॥ ২ ॥

কলকাতার শীত বিদায় নেওয়ার আগে দু-চারটে কামড় বসিয়ে যায়। তেমন একটা কামড় গতকাল সন্ধেতেই পাওয়া গিয়েছিল। কনকনে শীত হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছিল প্রায়। সন্ধের শীত রাতেও ছিল, এখন এই ভোরেও আছে। ভোর হয়েছে ঘড়ির নিয়মে, কিন্তু দিনের আলো এখনও ফোটেনি। চারপাশে যেন মাঝরাতের অন্ধকার। এ দিকের এই চারতলা

বাড়ির তিনতলায় একটা ফ্ল্যাটে আলো জ্বলছে। ফ্ল্যাটটা তরুণ প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর কৌশিক মিত্রের। ভোরবেলায় কিছুক্ষণের জন্যে ব্যায়াম করা কৌশিকের প্রতিদিনের অভ্যাস। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা কোনও ঋতুতেই কামাই নেই।

লম্বা, ছিপছিপে, শক্তসমর্থ চেহারাটাকে পুরোপুরি বশে রাখা ওর দিনের প্রথম কাজ। শরীরের ঘাম ঝরাবার পরে মন-মেজাজ বেশ খোলতাই হয়ে যায়। হাতে তেমন কাজ না থাকলে আবার বিছানায় খানিকটা গড়িয়েও নেয়। আজকের এই দিনটা শুধু বিছানায় গড়ানো নয়, লেপের মধ্যে ঢুকে পড়ার পক্ষেও আদর্শ। জানলা-দরজা বন্ধ, কিন্তু কোত্থেকে যেন কনকনে হাওয়া ঢুকে পড়ছিল।

ব্যায়াম সারার আধ ঘণ্টার মধ্যে কৌশিক চা খায় না, কিন্তু আজ খুব ইচ্ছে করছিল। চা খেয়ে আবার শুয়ে পড়বে বিছানায়। লেপমুড়ি দিয়ে স্রেফ আলসেমি করবে। আলসেমি করার মস্ত একটা সুফল আছে, মাথার ভেতরটা একেবারে পরিষ্কার হয়ে যায়। চিন্তাশূন্য হয়ে কিছুক্ষণ পড়ে থাকতে পারলে মগজের বিশ্রামও হয় চমৎকার।

শুভবিবাহের নামে ব্যবসা চালাবার চক্রটাকে ধরে ফেলার পরে শরীর-মন এখন একেবারে ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করছিল কৌশিকের। কোনও কাজ নয়, কয়েকটা দিন শুধু হাওয়ায় ভেসে থাকা। পূর্ণদার ওই সুন্দরবন ভ্রমণের প্রস্তাবটা লাগসই একটা টনিকের মতো। সবুজে ঠাসা সুন্দরবন, চারদিকে অসংখ্য নদী-নালা। গাছপালা, পাখির ডাক আর জলের ছলাত্-ছল্। ওই সুন্দরবনের কথা ভাবা যেতে পারে শুধু শুয়ে শুয়ে। কিন্তু চা?

চায়ের চিন্তায় চায়ের তেষ্টা কিছুটা বোধহয় বেড়ে গিয়েছিল। তবে চায়ের জন্য নিমোকে ডাকতে ইচ্ছে করছিল না ব্যাচেলার গোয়েন্দার। বেচারা শীতের ভোরে পাশের ঘরে কম্বলমুড়ি দিয়ে গোল হয়ে ঘুমোচ্ছে। এই ফ্ল্যাটের দ্বিতীয় বাসিন্দা আঠারো-উনিশ বছরের নিমো অত্যন্ত চটপটে ছেলে, কিন্তু ঘুমোলে একেবারে কাদা। ডেকেডুকে ওকে হয়তো তোলা যায়, কিন্তু সেটা নিষ্ঠুরতার সামিল।

সাজানো-গোছানো রান্নাঘরে গিয়ে এক কাপ চা অবশ্য বানিয়ে নেওয়া যায়। মিনিট-পাঁচেকের বেশি সময় লাগবে না। কিন্তু ওইটুকু কাজের মধ্যেও ঢুকতে ইচ্ছে করছিল না কৌশিকের। আসলে আলসেমি করার ইচ্ছেটা ওকে কেমন যেন পেয়ে বসেছিল। থাক, চা এখন থাক। বিছানায় শুয়ে শুধু লেপটা গলা পর্যন্ত টেনে দিয়েছিল। মাথার ভেতরটা ভারী অদ্ভুত জায়গা, কিছু ঢুকতে দেবে না ভাবলেও একটা-না-একটা বিষয় ঠিক ঢুকে পড়ে। তার চেয়ে বরং সুন্দরবনের ছবিটা মাথার মধ্যে বসিয়ে দেওয়া যাক। আশ্চর্য সুন্দর সবুজ ওই বাদাবন। একটা গাছের সঙ্গে আর একটা গাছ মিশে থাকে। শিকড়গুলোও থাকে জড়াজড়ি করে।

বেঁচে থাকার এটাই বোধহয় সেরা কৌশল। দল বেঁধে না থাকলে টিকে থাকা যায় না। সুন্দরবনকে সমুদ্র কতবার ভাসিয়ে দিয়েছে, কিন্তু নিশ্চিহ্ন করা দূরের কথা—জল সরে যাওয়ার পরে পলিমাটি ধরে রেখে আরও জমাট হয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে সুন্দরবন। আচ্ছা, বেঁচে থাকার এই সহজ রাস্তাটা প্রকৃতি কেন বাঘদের শিখিয়ে দেয়নি?

পাশ থেকে ফিরে শুল কৌশিক। বাঘের সংখ্যা কমে যাওয়ার এটাও বোধহয় একটা কারণ। একটা বাঘই সবার বুকে কাঁপুনি ধরিয়ে দেয়। এই বাঘেরা যদি দল বেঁধে থাকত

তাহলে চোরাশিকারিরা ওদের ত্রিসীমানার মধ্যে যাওয়ার সাহস পেত না। আসলে সাম্যবাদ কেউ ওদের শেখায়নি। বাঘদের মধ্যে যদি নেতাগোছের কেউ থাকত! সে যদি হুঙ্কার দিয়ে নিজেদের ভাষায় বলত : দুনিয়ার বাঘ এক হও। তা হলে?

অলস কল্পনা মাথায় খেলতেই আর একবার পাশ ফিরে লেপটা প্রায় নাক পর্যন্ত টেনে দিল কৌশিক। সিংহরা বরং বেঁচে থাকার ওই নিয়মটা অনেকখানি মেনে চলে। ঝাঁক বেঁধে থাকে সিংহরা। দলে অবশ্য একটাই সিংহ, বাকি সব সিংহিনী আর বাচ্চাকাচ্চা।

সিংহের মেজাজটা সত্যিই পশুরাজের। দলের সর্বময় কর্তা। শিকার ধরার দায়িত্ব সিংহীর। বিস্তর ছোটাছুটি করে শিকার ধরে, কিন্তু পেটে যতই খিদে থাক, সেই শিকারে আগে মুখ দেওয়ার কোনও অধিকার নেই তার। শিকার ঘাড়ে ফেলে পশুরাজের কাছে নিয়ে আসবে। পশুরাজ হাই-টাই তুলে সেই শিকারের যতটা সম্ভব ভোজন করবেন তারিয়ে-তারিয়ে। সিংহীর আর বাচ্চাকাচ্চার দল একটু দূরে দাঁড়িয়ে সেই ভোজনপর্ব দেখবে। সিংহের খাওয়া শেষ হওয়ার পরে দলটা শিকারের বাকি অংশ খাওয়ার সুযোগ পাবে।

আর একবার পাশ ফিরল কৌশিক। মানুষের মধ্যে কিছু-কিছু 'পুরুষসিংহ' আছে। আচ্ছা, তাদের স্বভাবও কি ওই সিংহের মতো? বউয়ের মেহনতে খাবে, কিন্তু আগে খাবে। তারপর প্রসাদ পাবে বাকি সবাই। নাকি পুরুষসিংহরা পশুরাজদের চাইতেও কড়া প্রকৃতির?

লেপটা এবার মাথা পর্যন্ত টেনে দিল কৌশিক। আচ্ছা, সিংহীরা কি সব সময় ওই কঠিন নিয়মটা মেনে চলতে পারে?

ধরা যাক, অসম্ভব ক্ষুধার্ত অবস্থায় বহু দূর পর্যন্ত ছুটে গিয়ে কোনও সিংহী একটা শিকার ধরল। তারপর কিছুটা না খেয়েই কি শিকারটা টেনে নিয়ে আসবে সিংহের কাছে? এমন যদি হয়, কিছুটা খাওয়ার পরে আধখাওয়া শিকার নিয়ে এল। তা হলে কি পশুরাজ ওই অপরাধের জন্যে শাস্তি দেবে সিংহীকে? দিলে, কেমন হবে সেই শাস্তি?

আবার পাশ ফিরল কৌশিক। কোথায় যেন পড়েছিল সুন্দরবনের বাঘের সঙ্গে অন্য কোনও এলাকার বাঘ নাকি এঁটে উঠতে পারে না। রয়াল বেঙ্গল টাইগারের স্পিড সাঙ্ঘাতিক, সেই সঙ্গে আছে দুর্দান্ত বডি ফিট্‌নেস। তার কারণ সুন্দরবনের প্রকৃতি। অসম্ভব ঠাসা বাদাবন। ঘন গাছপালার নীচের জায়গাটাও মনোরম নয়। অসংখ্য শিকড়বাকড়, কিছু শিকড়ের ফলা আবার তীরের মতো। অসাবধানে চলাফেরা করলে বাঘের থাবা এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যেতে পারে।

নদী-খালের থকথকে কাদাও উঠে আসে বনের মধ্যে অনেকখানি। ওই কাদাভাঙা সহজ কাজ নয়। নদী-খাল পেরুবার পথে কুমিরের মুখে পড়তে পারে যে-কোনও মুহূর্তে।

অসংখ্য খাল বনের মধ্যে। খাল পেরুতে হয় বাঘকে হরবখত। নদী সাঁতরে এপার থেকে ওপারেও যেতে হয় প্রায়ই। সুন্দরবনের বাঘ নাকি অসম্ভব দ্রুতগতিতে সাঁতার কাটতে পারে, জোরালো স্রোতেও কাবু হয় না। এই সব কারণই বুঝি ওখানাকার বাঘের কর্মক্ষমতা প্রচণ্ড বাড়িয়ে দিয়েছে। সুতরাং অন্য এলাকার বাঘ এঁটে উঠতে পারবে কেন?

ধরা যাক কুমায়ুনের দুর্দান্ত বাঘদের কথা। আকারে ওরা একটু বড়ই, কিন্তু থাকে তো পরিচ্ছন্ন পাহাড়ি-এলাকায়। সামান্য চড়াই-উৎরাই ভাঙতে হয়, কিন্তু তা আর কী এমন

পরিশ্রমের! পরিশ্রম যদি একটু হয়ও, বিশ্রামের জন্যে মাঝেমধ্যেই বড়সড় উপত্যকা পেয়ে যায়। প্রকৃতিও ওখানে চমৎকার। কিন্তু সুন্দরবনকে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস কম-বেশি প্রতি বছরই ভাসায়, সঙ্গে আছে ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়। কবি যতই বলুন না কেন 'বাঘের সঙ্গে লড়াই করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি'—বাঘও বেঁচে আছে ঝড়-জলের সঙ্গে লড়াই করে।

অলস-কল্পনায় কৌশিক সুন্দরবনের বাঘের প্রতি রীতিমত পক্ষপাতমূলক আচরণ চালিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু ছন্দ কেটে গেল হঠাৎই ডোরবেলের শব্দে। এক ঝটকায় লেপটা সরিয়ে উঠে বসল কৌশিক। কাচের জানলায় ভোরের প্রথম আলো।

সামান্য সময়ের ব্যবধানে আরও দু'বার বেল বাজতেই কৌশিক চেঁচিয়ে উঠল— 'আসছি অবনীদা।'

দরজা খুলতেই দেখা গেল প্রকাণ্ড চেহারায় পুলিশ ইন্সপেক্টর অবনী ঘোষরায়কে। একটু হাঁপাচ্ছিলেন। কৌশিক আপ্যায়নের গলায় বলল, 'আসুন অবনীদা।' তারপর ওর গলায় একই সঙ্গে অনুযোগ আর চাপা ধমক ফুটে উঠল, 'আপনার কিন্তু এ ভাবে লাফিয়ে-লাফিয়ে সিঁড়ি ভাঙা উচিত হয়নি। পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছেন, তার ওপর এই রকম ভারী শরীর। শ্যুগারের রোগও তো ধরেছে—।'

অপ্রস্তুত মুখে জবাব দিলেন ইন্সপেক্টর, 'একটা সময় আমি ফুটবল প্লেয়ার ছিলাম তো—সময়টা অবশ্য একটু বেশি আগের ; লাস্ট খেলেছি তেত্রিশ বছর আগে। তখন আমাদের কোচের নির্দেশ ছিল—কোথাও সিঁড়ি ভাঙার ব্যাপার থাকলে একসঙ্গে দুটো করে সিঁড়ি টপকাবে। তাতে স্ট্যামিনা বাড়বে। তা, আমরা পুরনো দিনের মানুষ তো, কোচের কথা বেদবাক্য বলে মানতাম। ওটা এমন ভাবে ভেতরে ঢুকে গেছে যে, এখনও অন্যমনস্ক থাকলে ওই কাণ্ডটা করে ফেলি। কিন্তু তুমি কী করে ধরলে যে আমি লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি ভেঙে তিনতলায় উঠেছি!'

কথাটার কোনও উত্তর না দিয়ে কৌশিক বলল, 'বসুন, চা খাওয়া যাক আগে। জানেন তো আজ ভোররাত থেকেই আমার খুব চায়ের তেষ্টা পেয়েছে—। এখন বুঝতে পারছি সকালের প্রথম চা আপনার সঙ্গে খাব বলেই তখন খাওয়া হয়নি।'

কৌশিকের মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠেছিল, কিন্তু অবনীদা গম্ভীর মুখে ওঁর আগের কথার জের টানলেন, 'আমার কথার জবাব দিলে না তো? আমি লাফিয়ে-লাফিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠেছি—কী করে বুঝলে তুমি?'

কৌশিকের গলায় চাপা ধমকের সুর খেলে গেল আবার। 'ওহ্ অবনীদা, আপনি ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে এত জেরা করেন না! এই শীতের ভোরে দোরগোড়ায় আপনাকে ওই ভাবে হাঁপাতে দেখলে যে কেউ ব্যাপারটা ধরে নিত! কী হল, আপনি বসুন।'

"না, আমার আরও একটা প্রশ্ন আছে। তোমার দরজায় আইহোল-টাইহোল নেই, কিন্তু দরজা না খুলেই কী করে বুঝলে যে আমি এসেছি! বেল বাজাতেই ভেতর থেকে 'আসছি অবনীদা' বলে কি করে চেঁচিয়ে উঠলে?"

কৌশিককে এবার বেশ বিব্রত দেখাচ্ছিল। একটু থেমে থেমে বলল, 'এই প্রশ্নের উত্তর এর আগে আপনাকে বার দুই-তিনেক দিয়েছি।'

'নো। কখনও না। শুনলে আমি ভুলতাম না। নিজের মুখে বলা ঠিক নয়, তবু বলছি—আমার স্মৃতিশক্তিটা অসম্ভব ভাল। একবার যা কানে ঢোকে, স্মৃতিতে তা গেঁথে যায়।'

মৃদু হেসে জবাব দিল কৌশিক, 'তা হলে এমনও হতে পারে—আমার দু-তিনবার বলা উত্তরটা একবারও আপনি কানে নেননি। কানে ঢুকলে তো স্মৃতিতে গাঁথার কথা!'

ইন্সপেক্টর ঘোষরায় লক্ষ্যপথ থেকে কখনই সরেন না। গোয়েন্দার কথার মারপ্যাঁচের মধ্যে না ঢুকে একই প্রশ্ন আবার করলেন, 'সত্যি বলো না, কী করে টের পেলে যে আমি এসেছি?'

আরও একবার বিব্রত হল কৌশিক। তারপর নিচু গলায় বলল, 'আপনি শ্যুগারের রুগি, ডাক্তারের পরামর্শে ভোরে হাঁটেন। হাঁটার ফাঁকে-ফাঁকে দু-একটা কাজও সারেন মাঝেমধ্যে। ওই নিয়মেই কয়েকবার ভোরে আমার ফ্ল্যাটে এসেছেন। আপনার মতো এই রকম আর্লি-মর্নিং ভিজিটর আমার বিশেষ কেউ নেই।'

পুলিশি জেরার ঢঙে ইন্সপেক্টর বললেন, "তুমি নিজেই বলছ 'বিশেষ কেউ নেই।' তার মানে কেউ-কেউ আছে। আমার প্রশ্ন হল, আজ সকালে তুমি কী করে এত শ্যিওর হলে ভিজিটরটি তোমার অবনীদা?"

একটু কেটে কেটে কৌশিক বলল, 'উত্তরটা আমি আগেও দিয়েছি, আবারও দিচ্ছি। আপনার ডোরবেল বাজাবাব দুটো আলাদা ভঙ্গি আছে। দুর্ভাবনা-টাবনা না থাকলে খুব লম্বা করে একবার মাত্র বেল বাজান। আর দুর্ভাবনা থাকলে একটু পর-পর তিনবার। আজকে আপনি তিনবার বাজিয়েছেন।"

তারিফ করার গলায় ইন্সপেক্টর বললেন, "সত্যি, প্রতিটি বিষয় কী খুঁটিয়ে দেখো তুমি। কিন্তু কৌশিক, এবারের কেসটা নিয়ে তো কোনও ঝামেলা নেই আমার। ইট'স এ সিম্পল কেস। দুটো দাগি ক্রিমিনালকে স্পট থেকে তুলেছি। অপরাধ কিছুটা স্বীকার করেছে। একটু থার্ড ডিগ্রি অ্যাপ্লাই করলে বাকিটাও স্বীকার করে নেবে। তোমার কী মনে হয়?"

চোখ কপালে তুলে কৌশিক জিজ্ঞেস করল, 'কোন্ কেসটার কথা বলছেন? আমি তো কিছুই জানি না।'

পাশের সোফাটার ওপর ধপ্ করে বসে পড়ে ইন্সপেক্টর বললেন, "কালকের সব ক'টা কাগজেই তো খবরটা ফলাও করে ছাপা হয়েছে। তোমার চোখে পড়েনি?"

গোয়েন্দা একটু লাজুক স্বভাবের, লাজুক হাসি হেসে বলল, 'আমি তো এখন ছুটিতে। ছুটিতে থাকলে খবরের কাগজ ছুঁই না। টিভি একটু-আধটু খুললেও খবর শুনি না। কলকাতা থেকে পালাবার চেষ্টা করি।'

পুলিশ ইন্সপেক্টরের চোখেমুখে এবার কড়া ধাঁচের এক অভিভাবকের ছাপ ফুটে উঠল। 'দিস ইজ ভেরি ব্যাড। এটা হল গিয়ে ইনফর্মেশনের যুগ, তার ওপর তোমার যা পেশা—। তোমার তো সবসময় আপ-টু-ডেট থাকা উচিত।'

আর একবার লজ্জিত হল গোয়েন্দা। "উচিত তো বটেই, কিন্তু কী করব বলুন—ওই যে কথায় বলে না, স্বভাব যায় না ম'লে!"

এবার রীতিমত ধমক দিলেন ইন্সপেক্টর। 'বয়েস তো ছাব্বিশ-সাতাশ। এই বয়সে কোনও অভ্যেসই শিকড় গেড়ে বসতে পারে না। এখন থেকে যা নিত্যদিন করবে, তাই পরে স্বভাবে দাঁড়াবে। আমার বয়স তোমার ডবল, দুটো উপদেশ দিই—মেনে চলবে। এক, কোনও কাজ ফেলে রাখবে না। দুই, সকালে উঠেই খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে খবরের কাগজ পড়ে নেবে।'

কৌশিকের মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠেছিল। সামনের সোফায় বসে পড়ে অন্য রকমের গলায় বলল, 'আচ্ছা অবনীদা, সুন্দরবনের বাঘের সঙ্গে অন্য এলাকার বাঘ নাকি মারামারিতে এঁটে উঠতে পারে না। এটা কি সত্যি?'

প্রশ্ন শুনে অবাক হয়ে গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে ইন্সপেক্টর বললেন, 'মানে!'

ভেতরের ঘরের পর্দা সরিয়ে নিমো উঁকি মারতেই কৌশিক চেঁচিয়ে উঠল, 'উঠে পড়েছিস! খুব ভাল। শিগ্‌গির দু-কাপ চা বানিয়ে নিয়ে আয়। অবনীদা কীরকম চা খান জানিস তো?'

ঘুমজড়ানো জবাব দিল নিমো, 'জানি—চা ছাড়া, চিনি দিয়ে।'

ওর কথায় কৌশিক হেসে উঠতেই নিমো চটপট নিজেকে সংশোধন করল—'ব্ল্যাক টি, চিনি ছাড়া তো?'

হাসতে হাসতেই কৌশিক সায় দিল, 'ঠিক। তবে, তোর ঘুম এখনও কাটেনি, খুব ভাল করে চোখমুখ ধোওয়ার পরে গ্যাস জ্বালাবি—বুঝলি?'

একটু আগে কৌশিকের বিদঘুটে প্রশ্ন শুনে অবাক হয়েছিলেন ইন্সপেক্টর, এখন সেই মুখেই গাম্ভীর্য এঁটে বসেছে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে বললেন, 'আমার এই কেসটা শোনার মতো এখন একটু সময় হবে কি তোমার?'

ভালমানুষের মতো মুখ করে উত্তর দিল কৌশিক, 'কেন হবে না? এখন তো আমার হাতে অঢেল সময়। তা ছাড়া আপনার ব্যাপার যখন সময় না থাকলেও সময় বার করে নিতাম। কেসটা কি একটু গোলমেলে অবনীদা?'

আবার চোখমুখের চেহারা পালটাল ইন্সপেক্টরের। আত্মবিশ্বাসী অফিসারের গলায় বললেন, 'খুবই ঝামেলার হতে পারত, কিন্তু হয়নি, হতে দিইনি। রহস্যের সমাধান করে ফেলেছি, অপরাধীও ধরা পড়েছে।'

'সে কি! এর মধ্যেই! ঘটনাটা কী?'

ধূর্ত মানুষের হাসি খেলে গিয়েছিল ইন্সপেক্টরের বাঁকানো ঠোঁটে। 'বলছি, সব বলছি। এত তাড়াতাড়ি রহস্যের কিনারা করার পেছনে ওই যে তোমাকে যে উপদেশ দুটো দিলাম, তার প্রথমটা আছে—অর্থাৎ কোনও কাজ ফেলে রাখতে নেই। পরশু রাত দশটায় খবর পাই। পোড়োবাড়ি, ভেতরে বাইরে জঙ্গল, সাপের ডেরা। কিন্তু আমি সঙ্গে সঙ্গে ওখানে পৌঁছে গিয়েছিলাম। সকালের অপেক্ষায় না থাকার জন্যেই অপরাধী-দুটোকে ধরতে পেরেছি।'

কৌশিকের দৃষ্টি ধারালো হয়ে উঠেছিল। 'ব্যাপারটা কি?'

'খুন। একটা নয়, দুটো নয়—তিন-তিনটে খুন। তিনটেই আবার সাদা চামড়ার মানুষ। দুটো সাহেব একটা মেম।'

চোখ বড়-বড়হয়ে উঠেছিল গোয়েন্দার। 'কোথায়?'

'আমার থানা থেকে উত্তর দিকে এক কিলোমিটারটাক গেলে একটা জলা আছে, ঠিক তার পাশেই একটা ভাঙা শিবমন্দির, তার লাগোয়া মস্ত একটা পোড়োবাড়ি—তুমি গেছ কখনও ওখানে?'

'বুঝতে পেরেছি, জমিদার রায়চৌধুরীদের বাড়ি তো?'

'ঠিক, তবে জমিদার তো সাত পুরুষ আগের। এখন পোড়োবাড়ির জমির দখল নিয়ে শরিকি মামলা চলছে। ও মামলা বোধহয় কখনওই মিটবে না। চুল্লু, জুয়ার ঠেক বসে

ওখানে মাঝেমধ্যে—খবর আছে আমাদের। তবে ওটা যে গুম-খুন করার জায়গা হয়ে উঠবে, বুঝতে পারিনি কখনও।'

'খবর পেলেন কী ভাবে?'

'পোড়োবাড়ির পাশে জলা জায়গা, তার পাশে একটা মাঠ। ওই মাঠে ছেলেরা ক্রিকেট খেলছিল। বল গিয়ে পড়ে পোড়োবাড়িতে। ছেলেরা ওখানে বল খুঁজতে গিয়ে লাশ দেখে পালায়। ওদেরই একজন অভিভাবক রাত দশটায় ফোন করে জানায়—এই ব্যাপার, তবে ছেলেরা ভুল দেখতেও পারে ; আপনারা একবার খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন। এ সব খবর আমি কখনও উড়িয়ে দিই না, পরে দেখব বলে ফেলেও রাখি না। দুজন আর্মড কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে ছুটলাম। কিন্তু ওই রাতে অন্ধকার পোড়োবাড়িতে ঢোকা অসম্ভব। ফিরে আসব ঠিক করেছি, এমন সময় ওই ক্রিমিনাল-দুটোকে দেখি। পোড়োবাড়ি থেকে বেরুচ্ছিল। আচমকা আমাদের দেখে থমকে গিয়েছিল। সেই সুযোগে আমরা ছুটে গিয়ে ধরে ফেলি। ধরেই মার, বেধড়ক মার। মারতে মারতে বললাম—'লাশ কোথায় বল? ওরাই তখন দেখাল।'

'খুনের কথা স্বীকার করেছে?'

'এখনও করেনি, তবে করবে। একটা গপ্পো অবশ্য চালাবার চেষ্টা করছে।'

'কী গল্প?'

'বলছে সাহেব-মেম কাশী থেকে এসেছিল। নেশাভাঙ করত। দিনের বেলায় শুকনো নেশা, রাতে চুল্লু। তিন দিন ছিল ওদের সঙ্গে। রাতের বেলায় পোড়োবাড়িতেই শুত। তবে ওরা শুত না। সকালে গিয়ে দেখে দুই সাহেব মরে পড়ে আছে, গলার নলি কাটা।'

'আপনি তো তিন জনের কথা বলছিলেন—।'

'হ্যাঁ, তিনজনই তো। জিজ্ঞেস করলাম, আর এক সাহেব কে?'

'কী বলল?'

'গপ্পোটা ভালভাবে সাজাতে পারেনি। বলল, তিন নম্বর সাহেবকে ওরা আগে কখনও দেখেইনি। সকালে এসে দেখে তিনটে লাশ পাশাপাশি পড়ে আছে।'

'সকালে লাশ দেখেছে, তা রাত্তিরবেলায় আবার ওই পোড়োবাড়িতে ঢুকেছিল কেন?'

'ঠিক, এই প্রশ্নটাই তখন আমি ওদের করেছিলাম।'

'কী বলেছে তার উত্তরে?'

'ন্যাকার মতো জবাব। বলল, তিন দিন তো একসঙ্গে ছিলাম—যদি আমাদের কোনও জিনিসপত্তর ওখানে ভুল করে ফেলে আসি! ওদের জিনিসপত্তর দেখে খোঁজখবর করে পুলিশ যদি ওদের খুনি হিসেবে ধরে—সেই জন্যেই গিয়েছিল।'

গোয়েন্দার চোখ রীতিমত ধারালো হয়ে উঠেছিল। 'ওই লোক দুটোর বডি সার্চ করে আপত্তিকর কিছু পেয়েছেন?'

'না, কিচ্ছু না। পাকা ক্রিমিনাল।'

'ভিকটিম-তিনজনের পরিচয় পেয়েছেন? পাশপোর্ট?

'না, কিচ্ছু না। পাশপোর্ট, টাকাপয়সা, সঙ্গের জিনিসপত্র—সব লোপাট। বাকিটাও লোপাট করার জন্যে রাত্তিরে ওই লোক দুটো ওখানে হানা দিয়েছিল।'

'বাকিটা লোপাট! মানে?'

তরুণ গোয়েন্দার দিকে একটু বুঝি অনুকম্পার চোখে তাকালেন জবরদস্ত পুলিশ ইন্সপেক্টর ঘোষরায়। 'লোপাট মানে লাশ লোপাট। তিন নম্বর সাহেবটার গায়ে একটা সুতো পর্যন্ত নেই। শার্ট-প্যান্ট সব খুলে নিয়েছে। তারপর ভারী পাথর দিয়ে মাথাটা থেঁতলে দিয়েছে—যাতে কেউ ওকে চিনতে না পারে। বাকি দুটো লাশের অবস্থাও তাই করত, তারপর পোড়োবাড়ির মাটি খুঁড়ে চাপা দিত। কিন্তু ওদের কপাল খারাপ, ক্রিকেট বল পড়ল ওখানে। আর রাত্তিরে খবর পেয়েই আমরা ছুটলাম—। প্ল্যানটা ওরা আর কাজে লাগাতে পারল না।'

নিচু গলায় কৌশিক বলল, 'কিন্তু লাশ পুঁতে ফেলাই যদি ওদের উদ্দেশ্য হয়, খুন করার পরে অকারণে মাথা থেঁতলাতে যাবে কেন?'

কৌশিকের অবনীদার মুখে এবার স্নেহের হাসি ফুটল। 'সারা জীবন তো পুলিশের চাকবিতেই কেটে গেল। অপরাধীদের মনস্তত্ব ভারী অদ্ভুত ধরনের হয়। ওদের নির্ঘাত মনে হয়েছিল, মাথার খুলি গুঁড়ো করে ন্যাংটো অবস্থায় মাটি চাপা দিলে একটু বেশি সাবধানতা নেওয়া হবে। হঠাৎ কবর খুঁড়ে কেউ যদি লাশ বারও করে ফেলে—শনাক্ত করতে পারবে না। আজ আমি যা অনুমান করছি, দু-চারদিন বাদে দেখো এটাই ওদের স্বীকারোক্তি হবে। লাঠির মতো ওষুধ নেই, লাঠি সত্যি কথা বলায়। আমি আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখেছি—লাঠির আর একটা নাম হওয়া উচিত লাই-ডিটেকটর। সব মিথ্যেই ধরার ক্ষমতা রাখে লাঠি।'

'বডি পোস্ট-মর্টেমের জন্য পাঠিয়েছেন?'

'পাঠিয়েছি। ফলেনসিক-এক্সপার্টরা এসেছিল। পুলিশের ফেটোগ্রাফার বিস্তর ছবিও তুলেছে। রুটিন জবের কোথাও কোনও ঘাটতি নেই।'

'তা হলে তো আপনার সব কাজ শেষ।'

'তা একরকম বলতে পারো। খুনি দুটোকে যখন লক-আপে ভরতে পেরেছি, প্রমাণট্রমানগুলোও ঠিক পেয়ে যাব পরে।'

'খুব ভাল কথা, ফিরে এসে বাকিটা শোনা যাবে।'

'ফিরে এসে মানে! তুমি এখন আবার কোথাও যাচ্ছ নাকি?'

নিমো ছোট্ট একটা ট্রেতে চাপিয়ে চা বিস্কুট এনে সেন্টার-টেবিলের ওপর রাখল। কৌশিক কালো চায়ের কাপ অবনীদার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'নিন, চা খান।'

'তা খাচ্ছি, কিন্তু তুমি যাচ্ছ কোথায়?'

'একটু বেড়াতে।'

'কোথায়?'

'সুন্দরবনে।'

'আবার জঙ্গলে! তুমি এক কাজ করো, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে একটা চাকরি নিয়ে নাও।'

নিজের চায়ের কাপটা হাতে তুলে নিয়ে হাসতে হাসতে কৌশিক বলল, 'পেলে তো বর্তে যাই।'

॥ ৩ ॥

মধ্যিখানে একটামাত্র দিন কেটেছে। এই একটা দিনে যা বেড়েছে তা হল কৌশিকের পূর্ণদার উত্তেজনা, আর যা কমেছে তা হল শীত। দু'দিন আগের কনকনে ঠাণ্ডাটা উধাও হয়ে গেছে। শীত এখন আরামপ্রদ, তবে ভরদুপুরের রোদে একটু চড়া ভাব।

সামনাসামনি তো বটেই, টেলিফোনেও পূর্ণদাকে বেশ কয়েকবার আশ্বস্ত করেছে কৌশিক। কথাগুলো মোটামুটি একই রকমের : পূর্ণদা, আপনি তো বেড়াতে যাচ্ছেন, যাকে বলে প্রমোদ-ভ্রমণ। লঞ্চে চেপে সুন্দরবনের নদীনালায় আরামসে ঘুরব। সঙ্গে কী-কী নেবেন, তা নিয়ে এত টেনশনে ভোগার কী আছে? লাজুক গলায় পূর্ণদার সেই এক উত্তর—না, অনেক দিন তো বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাইনি। একটা সময় অবশ্য খুব হিল্লিদিল্লি করতাম, তবে সে অনেক বছর আগের ব্যাপার। আচ্ছা, স্লিপার তো নিচ্ছি, চটি নেওয়ার কোনও দরকার আছে কি? সেভিংসেট নিচ্ছি, কিন্তু আমার ছোট আয়না নেই তো!

শেষের দিকে কৌশিকের একটাই উত্তর : যা হাতের কাছে পাবেন, নিয়ে নেবেন। যা থাকবে না আমি তার জোগান দেব। হাতমুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে থাকবেন। আমি সকাল আটটার সময় গাড়ি নিয়ে আপনার বাড়িতে পৌঁছে যাচ্ছি।

ঠিক আটটার সময় সাদা রঙের একটা অ্যাম্বাসাডার নিয়ে পূর্ণদার বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছিল কৌশিক। গাড়ির শব্দেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন মানুষটি। এক হাতে স্যুটকেস, অন্য হাতে ব্যাগ।

কৌশিক বলল, 'বাহ্! আপনি তো দেখেছি রেডি।'

লাজুক মুখে মিনমিনে গলায় উত্তর দিলেন পূর্ণদা, "রেডি তো দু' ঘণ্টা আগেই হয়ে বসে আছি। ঘুম ভেঙেছে শেষ রাতে। রাত্তিরে ভাল ঘুমও হয়নি। ওই যে তোমাকে বললাম না—অনেক দিন বাড়ি ছেড়ে কোথাও না যাওয়ার জন্যে কেমন যেন জবুথবু হয়ে গিয়েছি।"

হেসে উঠল কৌশিক। 'সুন্দরবন ঘুরে আসার পরে দেখবেন রীতিমত চাঙ্গা হয়ে গেছেন। এক কাজ করুন, ফিরে আসার পরে আমার সঙ্গে কয়েকটা উইক-এণ্ড ট্রিপ দিন। শুক্কুরবার সন্ধেয় বেরুব, শনি কাটিয়ে রোববার রাত্তিরে ফিরব। দেখবেন কী রিফ্রেশিং! সাহেবদের কাছে এটা আমাদের শেখা উচিত। উইক-এণ্ড করলে দেখবেন শরীর-মন তাজা হয়ে গেছে। দিন, স্যুটকেসটা আমাকে দিন!'

পূর্ণদার স্যুটকেস গাড়ির ডিকিতে ঢুকিয়ে দিয়ে কৌশিক বলল, 'হ্যান্ডব্যাগটা সঙ্গে নিয়েই গাড়িতে বসুন।'

পেছনের সিটে দু'জনে বসার পরে কৌশিক গাড়ির ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল, 'মাধব, চলো এবার।'

গাড়ি ছোট রাস্তা থেকে বড় রাস্তায় উঠে আসতেই পূর্ণদা জিজ্ঞেস করলেন, 'ট্রেন কটায়?'

মৃদু হেসে জবাব দিল কৌশিক, 'আমাদের জার্নিতে ছোটখাটো একটা বদল এনেছি। আসলে হয়ে গেল বলতে পারেন।'

'কীরকম?'

'আমার এক ক্লায়েন্টের সঙ্গে কাল রাত্তিরে দেখা। হাসনাবাদ যাব শুনে বলল, আমার গাড়িটা নিয়ে যান। কয়েকটা দিন থাকুক আপনার সঙ্গে। আমি নেব না উনিও ছাড়বেন না। শেষে রফা হল—হাসনাবাদ গিয়ে গাড়িটা ছেড়ে দেব। কবে ফিরব তার তো ঠিক নেই।'

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে পূর্ণদা বললেন, 'এই খবরটা তুমি আগে দিলে আমি অযথা টেনশনে ভুগতাম না। আসলে ট্রেনটাই যত নষ্টের গোড়া। একবার ম্যাড্রাস থেকে ফেরার পথে করমণ্ডল এক্সপ্রেস ফেল করে বিতিকিচ্ছিরি অবস্থার মধ্যে পড়েছিলাম। ট্রেন ফেল করার ভয়টা সেই থেকে আমার মধ্যে এমন ভাবে ঢুকে গেছে যে—।'

'ভয়টা অনেকদিন ধরে আপনার সঙ্গে আছে, এবারে ওটাকে তাড়িয়ে দিন। হাসনাবাদ থেকে ফেরার সময় আমরা কিন্তু ট্রেনেই ফিরছি—।'

কৌশিকের কথায় গলা ছেড়ে হেসে উঠে পূর্ণদা বললেন, 'ঠিক আছে।'

গাড়ির জানলার কাচ তোলা। সকালের নরম হলুদ রোদ কাচের মধ্যে দিয়ে ভেতরে এসে পড়েছিল খানিকটা। পূর্ণদা হঠাৎ বলে উঠলেন, 'ওহো, প্যাকেটটাই তো দেখা হয়নি!'

'কিসের প্যাকেট?'

হ্যান্ডব্যাগের চেন টানতে টানতে জবাব দিলেন পূর্ণদা, 'কাল সন্ধেয় স্পেশাল ক্যুরিয়ার সার্ভিসে রনি একটা প্যাকেট পাঠিয়েছে। কী পাঠিয়েছে দেখতে যাব, তক্ষুনি পাওয়ার-কাট। খুঁজে-পেতে একটা মোমবাতি জ্বালালাম। হঠাৎ মনে হল, যদি ট্রান্সফরমার ফেটে গিয়ে থাকে, আলো তো আর চট করে আসবে না। তখন আমি স্যুটকেস গোছাচ্ছিলাম—ভাবলাম ওই কাজটা আগে সেরে নিই, প্যাকেট পরে খোলা যাবে। আলো অবশ্য আধ ঘণ্টার মধ্যে এসে গিয়েছিল, কিন্তু প্যাকেটের কথা তখন ভুলে গিয়েছিলাম। সকালে তাড়াহুড়ো, প্যাকেটটা ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছি—। ভেবেছিলাম ট্রেনে ওঠার পরে দেখা যাবে। কী আশ্চর্য! গেল কোথায়!' কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ঠাসা ব্যাগের মধ্যে হাত ঘোরাচ্ছিলেন পূর্ণদা।

হ্যান্ডব্যাগে চেপে চেপে এত জিনিসপত্র ঢোকানো হয়েছে যে, ব্যাগের চেহারাটাই গোল হয়ে গেছে। খোঁজার সুবিধের জন্যে পূর্ণদা এবার এক-একটা করে জিনিস বার করে রাখতে লাগলেন সিটের ওপর। প্রথমে বেরুল ছোট আর মাঝারি মাপের দুটো তোয়ালে, তার পর পলিথিনে মোড়া হাওয়াই চপ্পল। তিন নম্বর প্যাকেটটাও পলিথিনের, ভেতরে সবুজের আভা।

'এটা কী?'

কৌশিকের প্রশ্নের উত্তরে আমতা-আমতা করে পূর্ণদা বললেন, 'এগুলো মশা তাড়াবার কয়েল, যাচ্ছি তো নদী-নালা বনজঙ্গলের দেশে। ঝাঁক-ঝাঁক মশা থাকতে পারে। মশার কামড় খেতে ভয় পাই না, ভয় পাই ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়াকে।'

'খুব ভাল করেছেন। ওখানে ভয়ঙ্কর ওই রোগ-ছড়ানো মশার উৎপাত থাকাই স্বাভাবিক। কুমির আর বাঘ তাড়াবার কয়েল কেউ আবিষ্কার করলে কিন্তু দারুণ হত। ওই কয়েল জ্বালিয়ে নিশ্চিন্তে আমরা ঘোরাফেরা করতে পারতাম সুন্দরবনে।'

ব্যাগের মধ্যে হাত চালাতে চালাতে পূর্ণদা বললেন, 'আমার কাছে খুব পাতলা একটা নেটের মশারি আছে। দু-তিন জন অনায়াসে ওর মধ্যে শুতে পারে, কিন্তু গোটালে এইটকু—সঙ্গে এনেছি।'

'অ্যাঁ! ওটাও কি এই ব্যাগের মধ্যে আছে?'

কৌশিকের বিস্ময়ে পূর্ণদার অস্বস্তির মাত্রা একটু বাড়ল। 'না, স্যুটকেসে। আসলে ওটা একটা ইমার্জেন্সি প্রভিশন। যদি হঠাৎ লেগে যায়—।'

হেসে উঠল কৌশিক। 'এবার যদি বাঘ কুমিরের পেটে না যাই, আবার সুন্দরবনে যাব। সঙ্গী হিসেবে আপনাকে কিন্তু থাকতে হবেই। আসলে আপনি একটা বিষয় নিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত ভাবতে পারেন। মশারি বোধহয় বাঘ তাড়াবার কাজেও আসে। একটা লেখায় পড়েছিলাম—জঙ্গলের লাগোয়া গ্রামের একটা লোক খোলা উঠোনে মশারি টাঙিয়ে ঘুমোচ্ছিল। রাত্তিরে বাঘ এসে বসে ছিল মশারির ঠিক পাশে। বাঘ নাকি ঘেরা জায়গায়—তা যত হালকাই হোক না কেন—ঢুকতে ভয় পায়।'

পূর্ণদার ব্যাগের বারো আনা জিনিসপত্র এক-এক করে বেরিয়ে এসেছিল সিটের ওপর। উনি এবার হতাশ গলায় বললেন, 'না রনির পাঠানো প্যাকেটটা পাচ্ছি না তো—। হয় স্যুটকেসে ঢুকিয়েছি, নয় বাড়িতে ফেলে এসেছি।'

আশ্বস্ত করার গলায় কৌশিক বলল, 'যাকগে, আছে ঠিক কোথাও না কোথাও। স্যুটকেসের মধ্যে না পেলে বাড়িতে পাবেন। লঞ্চে ওঠার পরে স্যুটকেসটা দেখে নেবেন একবার।'

কৌশিকের আশ্বাসে খুব একটা কাজ হল না। পূর্ণদার কপালে বেশ কয়েকটা ভাঁজ পড়েছিল। 'প্যাকেটটা পেলাম না, আমার মাথায় এখন অন্য চিন্তা ঘুরছে—।'

'কী?'

'প্যাকেটের মধ্যে হয়তো রনির কোনও ইম্পরট্যান্ট মেসেজ ছিল।'

'কী মেসেজ?'

পূর্ণদার কপালের ভাঁজের সংখ্যা বোধহয় আর একটু বেড়েছিল। 'এমনও তো হতে পারে—রনি হয়তো জানিয়েছে, সাহেব—মেমের সুন্দরবন সফর এখন কোনও কারণে বাতিল হয়ে গেছে!'

আঁতকে উঠল কৌশিক। 'সে কি! দু-চার দিন আগেও তো টেলিফোনে ওর সঙ্গে কথা হয়েছে আপনার। তেমন কোনও ইঙ্গিত দিয়েছিল কি?'

'না-না, বরং বলেছিল—ট্রিপ ঠিক আছে। আমরা যেন আজ বেলা একটার মধ্যে হাসনাবাদের খেয়াঘাটে পৌঁছে যাই।'

'তাহলে আবার এ সব বলছেন কেন?'

'বলছি না তো। আশঙ্কা করছি। ও হঠাৎ এই সময় স্পেশাল ক্যুরিয়ার সার্ভিসে খাম পাঠাল কেন? এক কাজ করবে—।'

'কী?'

'গাড়িটা রাস্তার ধারে কোথাও একটু দাঁড় করাও। আমি চট করে স্যুটকেস থেকে খামটা বার করে নিই।'

দু'দিকে মাথা নাড়াতে নাড়াতে উত্তর দিল কৌশিক, 'আপনার হ্যান্ডব্যাগ দেখেই বুঝতে পারছি স্যুটকেসের অবস্থা কেমন। গোছানো স্যুটকেস হাটকালে এখন আর ওটা বন্ধ করতে পারবেন না—।'

'ন্‌না, খামটা বার করেই স্যুটকেস বন্ধ করে দেব।'

'খাম হয়তো স্যুটকেসেও নেই। বাড়িতে ফেলে এসেছেন। আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না, আমি আপনাকে খুব সহজ একটা সমাধানের পথ বাতলে দিচ্ছি।'

চোখেমুখে প্রশ্ন ফুটিয়ে কৌশিকের দিকে তাকালেন পূর্ণদা।

গলায় একটু জোর এনে কৌশিক বলল, 'আমরা তো বেড়াতে বেরিয়েছি—। বেড়িয়েই ফিরব। খেয়াঘাটে গিয়ে যদি দেখি সাহেব-মেমের পাত্তা নেই, আমরা টাকিতে ফিরে আসব। টাকিতে শুনেছি ইছামতীর ধারে মিউনিসিপ্যালিটির অসাধারণ একটা অতিথি-নিবাস আছে। তিনতলা বাড়ি, বেশ কয়েকটা ঘর। ওর কোনও-একটায় দিন-তিনেক আমরা শুয়ে-বসে-গল্প করে কাটিয়ে দেব। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের সঙ্গে আমার একবার আলাপ হয়েছিল—খুব ভালমানুষ, মনে হয় ঘব পেতে কোনও অসুবিধে হবে না। নিন, আপনার ব্যাগটা এবার গুছিয়ে রাখুন।'

কৌশিকের গলার মধ্যে হালকা একটা আদেশের সুর ছিল। পূর্ণদা প্রতিবাদ করতে গিয়েও পারলেন না। ধীর গতিতে ব্যাগ গোছানোর কাজে মন দিলেন।

গাড়ি ভিড়ের রাস্তা পেরিয়ে ভি আই পি রোডে উঠে পড়েছে। ওয়ান-ওয়ে, সকালের রাস্তা বেশ ফাঁকাই। ড্রাইভার এক্সিলারেটরে একটু চাপ দিতেই গাড়িব স্পিড ষাট-সত্তরে উঠে গিয়েছিল।

দু'দিকেব দৃশ্য সুন্দর, রাস্তা মসৃণ। জানলার দিকে তাকিয়ে কৌশিক বলল, "কলকাতার সব রাস্তাই যদি এই রকম হত। একটু বাদে যশোর রোডে পড়লেই অবশ্য চেহারাটা পালটে যাবে। তবে কলকাতার হাল তো আরও খারাপ। ধরুন এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাবেন—দু-তিন কিলোমিটার পথ, কিন্তু কখন পৌঁছবেন কেউ জানে না। রাস্তায় জ্যাম লেগেই আছে। ফুটপাথ বেদখল। এই ভাবে যদি চলতে থাকে, দু'দিন বাদে বোধহয় ধাক্কাধাক্কি করেও এগনো যাবে না পথে।"

ব্যাগ গোছাতে গোছাতে প্রশ্ন ছুড়লেন পূর্ণদা, 'কারণটা কী?'

'কারণ তো জলের মতো সোজা। রাস্তাঘাট বাড়েনি, যা আছে তার বেশির ভাগই আবার ভাঙাচোরা। আর, কলকাতার রাস্তাঘাটে চলার লোকসংখ্যা বেড়ে গেছে বহু গুণ।'

'আর কি বেড়েছে?'

'কী?'

'গাড়ির কথা বললে না?'

'হ্যাঁ, গাড়িও ভীষণ বেড়ে গেছে।'

"ভীষণ বেড়েছে বললে কম বলা হয়। বছর-দশেক আগে কলকাতার রাস্তায় আশি হাজার গাড়ি চলত। বছর-দুয়েক আগে সেই সংখ্যা দাঁড়ায় সাত লাখে। এখন গাড়ির সংখ্যা ন' লাখ। কলকাতার বড় রাস্তার কথা বাদ দাও, যে-কোনও ছোটখাটো রাস্তা পেরুনোও এখন কঠিন। গাড়ি চলছে তো চলছেই।"

'তাহলে কি এখন শহরের গাড়ির সংখ্যা কমাতে হবে?'

'হয় গাড়ি কমাও, নয় রাস্তা বাড়াও।'

রহস্যময় একটা হাসি ফুটে উঠেছিল কৌশিকের মুখে। "কেন, গাড়ির সংখ্যা কমানো তো অনেক দিনই শুরু হয়েছে। এখন আপনি ক'টা সরকারি বাস রাস্তায় দেখেন? প্রাইভেট বাসের সংখ্যাও কমছে। এরা রোজ দুটো করে লোক চাপা দেয়, আর জনতা খেপে গিয়ে

পাঁচটা করে বাস পোড়ায়। এই হারে চলতে থাকলে দেখবেন বেসরকারি বাসের সংখ্যাও অনেক কমে গেছে। এর পরে কোপ পড়বে প্রাইভেট কারের ওপর। প্রকৃতি বোধহয় এই ভাবেই সামঞ্জস্য বজায় রাখার কাজ চালায়। আপনার কী মনে হয়?"

পূর্ণদার ব্যাগ গোছানো হয়ে গেছে। খুক খুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করে বললেন, 'দু-তিনশো বছর আগে হলে আমাদের এ ভাবে সুন্দরবন দেখতে যাওয়ার দরকার হত না। আমরা সুন্দরবনের মধ্যেই থাকতাম। তখনকার সুন্দরবন আজকের সুন্দরবনের চাইতে দশ গুণ বড় ছিল।'

একটু ঘুরে বসল কৌশিক। 'তাই?'

পূর্ণদা গলার স্বর সামান্য ওপরে তুলে বললেন 'এখন সুন্দরবন কী, কোথায়—কেউ প্রশ্ন করলে তুমি ছোট করে বলে দিতে পারো—বঙ্গোপসাগরের উপকূলে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মোহনায় অবস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ। এর কিছুটা এখন পশ্চিমবঙ্গে, কিছুটা বাংলাদেশে। কিন্তু একটা সময় সুন্দরবন ছিল অন্তহীন। এই যে এখন আমরা যেখানে মোটর ছোটাচ্ছি—এই জায়গাটা ছিল সুন্দরবনের মাঝামাঝি অংশ। এই যে মেমসাহেব আসছেন, তাঁর পূর্বপুরুষ বার্নিয়ের ওই সুন্দরবন দেখেই মুগ্ধ হয়েছিলেন আজ থেকে সাড়ে-তিনশো বছর আগে। তখন পথ বলতে ছিল জলপথ। ঘন বাদাবনে ঠাসা একগাদা দ্বীপ। চারপাশে অসংখ্য নদীনালা।'

'তখন সুন্দরবনে জন্তুজানোয়ারও নিশ্চয়ই অনেক বেশি ছিল?'

'অবশ্যই। বনজঙ্গল তো ওদেরই জায়গা। ডাঙায় ছিল অসংখ্য বাঘ আর নদীনালা থিকথিক করত কুমিরে। বন কেটে বসত বানাবার ঘটনা তো অনেক পরের।'

'বার্নিয়েরের ভ্রমণকাহিনীতে এই সব জন্তুজানোয়ারের বর্ণনা নেই?'

'থাকবে না আবার! সুন্দরবনের প্রাকৃতিক রূপের বর্ণনায় তিনি পঞ্চমুখ। আবার বিপদসঙ্কুল পথেরও নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন।'

'আচ্ছা, বনের নাম সুন্দরবন হল কেন? দেখতে সুন্দর বলে?'

"হ্যাঁ, এটা একটা ব্যাখ্যা। দেখতে সুন্দর, তাই সুন্দরবন। তবে নামের ব্যাখ্যা নিয়ে আরও অনেক মত আছে। একটা মত হল, নামটা এসেছে চন্দ্রদ্বীপ বন থেকে। চন্দ্রদ্বীপ খুলনার একটা পুরনো জমিদারি। নানা পণ্ডিতের নানা মত। তবে আমার কাছে লাগসই ঠেকে একটা ব্যাখ্যাই। কেউ-কেউ বলেন, এক সময় সুন্দরবনে অসংখ্য সুন্দরী গাছ ছিল—ওই গাছের নাম থেকেই সুন্দরবন। সুন্দরী গাছ মুখের কথায় 'সোঁদর' হয়ে গেছে। সেই জন্যেই তো বলে 'সোঁদরবনের বাঘ'।"

কৌশিকের চোখেমুখে গল্প শোনার মুগ্ধতা এসে গিয়েছিল কিছুটা। একটু বুঝি ছেলেমানুষের ঢঙেই জিজ্ঞেস করে বসল, 'সুন্দরবনের রাজা কে তা নিয়ে তো কারও দ্বিমত নেই। কিন্তু সুন্দরবনের আশেপাশের নদীর রাজা কাকে বলা যায়? কুমিরকে কি?'

দু' দিকে মাথা নাড়তে নাড়তে কথাটা এককথায় খারিজ করে দেওয়ার ভঙ্গিতে পূর্ণদা বললেন, 'পাগল! রাজার চেহারা হবে রাজার মতো। বাঘের চেহারা চেয়ে দেখার মতো। কী গ্রেসফুল! গায়ের রং গাঢ় হলুদ, চামড়ায় আবার কালো রঙের ডোরাকাটা। প্রকাণ্ড চেহারা নিয়ে চলাফেরাও করে রাজকীয় চালে। আর কুমির! কী বিচ্ছিরি দেখতে। নদীর তীরে উঠে যখন রোদ পোহায় ঠিক পোড়াকাঠের মতো দেখায়। প্রাণের কোনও চিহ্ন

থাকে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক ভাবে পড়ে থাকতে পারে। যেমন ধূর্ত তেমন হিংস্র। নিজের পোড়াকাঠের চেহারাটা আবার শিকার ধরার কাজেও লাগায়।'

'কী ভাবে?'

"ক্যাওড়া গাছের তলা কুমির পছন্দ করে। কেন জানো? ক্যাওড়া ফল হরিণের খুব প্রিয়। হরিণরা ফল খাওয়ার জন্যে গাছের তলায় আসে। কুমিরের কাদামাখা চেহারাটা তো একেই পোড়া কাঠের মতো। তার ওপর পড়ে থাকে মড়ার মতো। হরিণদের ভুল হয়, ফল খেতে খেতে কাছাকাছি চলে এলে কুমির ছুটে গিয়ে হরিণ ধরে। গাঁয়ের মেয়ে বউদেরও ভুল হয়। নদীতে জলটল নিতে এসে ওই পোড়া-কাঠ কুমিরের খপ্পরে পড়ে। ডাঙার ওপরেও কুমিরের স্পিড সাঙ্ঘাতিক। আওতার মধ্যে এসে গেলেই চোখের নিমেষে ছুটে গিয়ে শিকার ধরে। অনেক কুমিরের পেটে মেয়েদের গায়ের বিস্তর গয়নাগাটি পাওয়া যায়। আচ্ছা, তুমি ত্রৈলোক্যনাথের 'ডমরুচরিত' পড়েছ?"

খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে দু'দিকে মাথা নাড়াল কৌশিক। স্নেহমেশানো ধমক দেওয়ার গলায় পূর্ণদা বললেন, 'তোমাদের এই এক দোষ! ইংরেজি বই ছাড়া কিছুই আর তোমাদের মনে ধরে না। ব্রিটিশ-আমলে ববং বাংলা বইপত্তর পড়ার দিকে ঝোঁক ছিল বেশি। পারলে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের বইটইগুলো পড়ে নিও। ক্লাসিক। ওর ডমরু একটা দুর্ধর্ষ চরিত্র। এন্তার গুল মারে। উপভোগ্য গুল। একটা মনে পড়ছে। বোধহয় এইরকমই—। ডমরু একটা অকেজো নোঙরকে বঁড়শি বানিয়ে প্রকাণ্ড একটা কুমির ধরেছিল। ভেবেছিল কুমিরের পেট কেটে বিস্তর গয়নাগাটি পাবে। পেয়েওছিল, কিন্তু নিতে পারেনি। দেখে একটা সাঁওতাল মেয়ে সব গয়না গায়ে পরে বেগুন বেচছে।'

গল্পের শেষে গল্পবলিয়ে এবং শ্রোতা দু'জনেই হেসে উঠল গলা ছেড়ে।

গাড়ি ভি আই পি রোড ছেড়ে যশোর রোডে উঠে এসেছিল। গাড়ির মধ্যে আসা রোদের ফালি জায়গা বদল করেছে। হাওয়ায় আরামপ্রদ শীত। আগের কথার জের টেনে পূর্ণদা বললেন, 'কুমির সত্যিই ভয়ঙ্কর প্রাণী। মাঝেমধ্যে ওরা নৌকোর যাত্রীকেও শিকার বানায়। একবার একটা রিপোর্টে পড়েছিলাম, সুন্দরবনের এক নদীতে এক মাঝি হাল ধরে বসে আছে। হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড কুমির এসে সেই হালে ভীষণ জোরে ধাক্কা মারল। সেই ধাক্কায় হাল-ধরা মাঝি ছিটকে পড়ল জলে। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে মাঝিকে কামড়ে ধরে জলের মধ্যে ডুব মেরেছিল কুমির।'

'সাঙ্ঘাতিক তো!'

'সুন্দরবন দেখতে দারুণ সুন্দর হলে কী হবে, ওখানে পদে পদে বিপদ। শুধু জলে কুমির আর ডাঙায় বাঘ নয়, প্রচুর বিষধর সাপও আছে সুন্দরবনে। বুনো শুয়োর আছে, বিষাক্ত পোকামাকড় আছে। এর ওপর আছে, ওই যে, যে জন্যে তোমাকে পিস্তলটা নিতে বলেছিলাম। নিয়েছ তো?'

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কৌশিক পাল্টা প্রশ্ন করল, 'সুন্দরবন এলাকায় কি আগের মতো জলদস্যু আছে এখনও?'

'নেই আবার! ধরতে গেলে প্রতি মাসেই বনের আশেপাশের নদীতে দু-তিনটে করে ডাকাতি হয়। খবরের কাগজেই তো বার হয় খবরগুলো। দেখনি? শুধু ডাকাতি নয়, স্মাগলিংও হয়—বাংলাদেশ বর্ডার তো। তবে যে জিনিসটা সবচেয়ে অ্যালার্মিং—তা হল

পোচিং। চোরাশিকারিরা লুকিয়ে-লুকিয়ে বাঘ মারে। বিদেশের বাজারে বাঘের চামড়ার বিরাট দাম। বাঘের সংখ্যা কমতে কমতে তো এখন একদম কমে গেছে। শুধু এখানে নয়, সব জায়গায়। এদের যদি থামানো না যায়—গোটা পৃথিবী থেকে বাঘ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এটা আমাদের বিরাট ক্ষতি। কিন্তু তুমি আমার কথার উত্তর দিলে না তো—। তোমার পিস্তলটা এনেছ?'

কৌশিক হঠাৎ টান হয়ে বসে গলা সামান্য তুলে বলল, 'মাধব, সামনের ওই বটগাছটার নীচে গাড়ি থামাও তো।'

অবাক হয়ে পূর্ণদা জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন?'

'এ সব রাস্তায় টানা এভাবে চলতে ভাল লাগে না। মাঝেমধ্যে থামা দরকার। চলুন, ভাঁড়ে একটু চা খাওয়া যাক। আমরা তো বেড়াতে বেরিয়েছি—।'

বিশাল বটগাছের নীচে দু-তিনটে চালাগোছের দোকানঘর। বটগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে পড়েছিল গাড়িটা।

॥ ৪ ॥

গাড়ি থেকে নেমে পড়ল কৌশিক আর পূর্ণদা। রাস্তার ধারে বিশাল এক বটগাছ। এই জায়গাটা একটু কোনাকুনিগোছের। তার ফলে রাস্তার পাশে কিছুটা বাড়তি জমি বেরিয়ে এসেছে। ওখানেই চালাঘরের তিনটে দোকান। একটা দোকানের সামনে তোলা উনুনে কেটলি বসানো। সরু বেঞ্চে দুটো লোক বসে আছে। ওদিকে একটা ভ্যান রিকশা। খোলা জায়গায় হু-হু করে হাওয়া বইছিল। হাওয়ায় শীতের ভাব। রোদ্দুর এখনও মিঠে। রোদ আর একটু চড়া হলে বোধহয় মিঠে ভাব কমবে। বটগাছের বেশ কিছু ঝুরি নেমেছে মাথার ওপরে। দুটো ঝুরি ধরে দুটো চাষিগোছের লোক গল্প করছিল। মাঠের মাঝে একটা ইটভাটা, তার চারপাশে খেত।

মাথার ওপরে হাত তুলে আড়মোড়া ভেঙে পূর্ণদা বললেন, 'এটাই হল বাংলার আসল চেহারা। খোলামেলা, শান্ত। চারদিকে কত সবুজ। আমার বরাবর ইচ্ছে ছিল, চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পরে এই রকম একটা জায়গায় ছোটখাটো বাড়ি বানিয়ে শেষ জীবনটা কাটিয়ে দেব।'

হেসে উঠল কৌশিক। 'এখনও বানাতে পারেন। আমরা তখন মাঝেমধ্যে এসে ছুটি কাটিয়ে যাব আপনার সঙ্গে। তবে শহরের আস্তানা তুলবেন না।'

'কেন?'

'অন্য শহরের কথা জানি না, তবে কলকাতার টান তো সাঙ্ঘাতিক, বিশেষ করে কলকাতায় যাদের অনেকগুলো বছর কেটেছে।'

'না-না, একবার এখনকার বাসিন্দা হলে আর ওমুখো হব না।'

'আপনাকে হতেই হবে।'

'কেন? কী দায় পড়েছে আমার?'

'কলকাতার বইয়ের দোকানগুলো তো এখানে আর তুলে আনতে পারবেন না। নতুন-নতুন বইপত্তর ছাড়া আপনার তো চলে না। বই কেনার জন্যে কলকাতায় আপনাকে যেতেই হবে।'

'আরে, বই তো আর প্রতিদিনের বাজার নয়, মাঝেমধ্যে গেলেই হবে।'

গলা ছেড়ে হেসে উঠল কৌশিক। 'ব্যস, তা হলে আমার আর কোনও আপত্তি নেই। গাঁয়ে বাড়ি, আর কলকাতার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ। নিন, সাইট সিলেকশন করুন এবার। কোন্ জায়গাটায় বাড়ি বানাতে চান আপনি?'

পূর্ণদা হঠাৎ ওঁর বুকপকেট চাপড়ে বললেন, 'এইরে, তোমাকে তো ওই সাহেব মেমের নামটাই জানানো হয়নি!' পকেট থেকে একটা ছোট নোটবুক বার করে দ্রুত কয়েকটা পাতা উলটে গেলেন পূর্ণদা। 'সাহেবের নাম হল গিয়ে রিচার্ড ডেভিস; আর মেমসাহেবের নাম ফ্রাঁসোয়া জোসি। নাম দুটো একটু সড়গড় করে নাও। হুট্ করে নাম ভুলে গেলে বিচ্ছিরি ব্যাপার হবে। রনির বন্ধু। সেদিক থেকে দেখতে গেলে আমাদের এক রকম অতিথিই। একজন ডেভিস আর একজন জোসি। নাম মনে রাখা খুব দরকার। নাম মানুষের কাছে খুব প্রিয়। ভুল নামে ডাকলে যে-কেউ চটে যায়। আবার ধরো, একজনের সঙ্গে তোমার সামান্য আলাপ—অনেক দিন পর তার সঙ্গে দেখা হওয়ার পরে তুমি যদি তাকে সঠিক নামে ডাকো—দেখবে খুব খুশি হবে। নামের আমি, নামের তুমি। নামে সত্যিই এসে যায়।'

লম্বা করে ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে কৌশিক বলল, 'খুব খাঁটি কথা। কিন্তু পূর্ণদা, আপনি যা আশঙ্কা করছিলেন—রনির ওই বন্ধ-খামে যদি সেই মেসেজ থাকে! রনি হয়তো জানিয়েছে অনিবার্য কারণে সাহেব-মেম সফর বাতিল করে দিয়েছে। তা হলে?'

কথাটা শুনে পূর্ণদার মুখ একটু শুকিয়ে গেল। করুণ গলায় বললেন, 'গাড়ি যখন দাঁড়িয়েই আছে, স্যুটকেস থেকে চট করে খামটা বার করে নেব?'

ভয়-পাওয়া গলায় কৌশিক জবাব দিল, 'না-না পূর্ণদা, ওর মধ্যে যাবেন না। স্যুটকেসের ওজন দেখেই টের পেয়েছি ওর মধ্য অনেক-কিছু আছে। একবার খুললে বন্ধ করা মুশকিল হবে। আমরা তো অনেকটা পথ এসেই গিয়েছি। সাহেব-মেম ট্যুর ক্যানসেল করলেও কিছু এসে যায় না। আমরা বেড়াতে বেরিয়েছি, বেড়িয়েই ফিরব। চলুন, চা খাওয়া যাক।'

পূর্ণদাকে এক রকম টানতে টানতেই চায়ের দোকানের সামনে নিয়ে এসে কৌশিক দোকানদারকে বলল, 'দুটো চা দেবেন, ভাঁড়ে।'

এই দোকানটা যদি কোনও গণ্ডগ্রামের মধ্যে হত, দোকানদার এবং আশেপাশের লোকজন শহুরে বাবুদের একটু বুঝি কৌতূহলের সঙ্গে দেখে নিত। কিন্তু এ রাস্তায় সব সময় গাড়ি চলে, গাড়ির বাবুরা মাঝেমধ্যেই গাড়ি থামিয়ে দোকানের খদ্দের হয় ; সুতরাং ওদের দিকে কেউ আলাদাভাবে মনোযোগ দিল না। একটু পরে সরু বেঞ্চির লোক দুটো উঠে পড়তেই কৌশিক বলল, 'আসুন পূর্ণদা, বসা যাক।'

দোকানদার জিজ্ঞেস করল, 'কেক, বিস্কুট আছে, দেব?'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন পূর্ণদা, 'না। তবে তুমি খেতে পারো কৌশিক।'

দু'দিকে মাথা নাড়ল কৌশিক। 'আমি তো খেয়েই বেরিয়েছি।' তারপর দোকানদারের

দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি একটা কেক আর দুটো বিস্কুট আমাদের গাড়ির ওই ড্রাইভারের কাছে পাঠিয়ে দিন। পরে একটা চাও দেবেন।'

গাড়ির দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল ড্রাইভার মাধব। দোকানের অল্পবয়সী কাজের ছেলেটা চটপট একটা প্লেটে কেক-বিস্কুট সাজিয়ে এগিয়ে গেল ড্রাইভারের দিকে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দোকানের পাশে এসে দাঁড়াল একটা মারুতি। মারুতি থেকে নেমে এল এক সাহেব আর তার সঙ্গী। সঙ্গী বাঙালি, পরনে জিন্‌সের প্যান্ট আর নীল পুলওভার। এসেই দোকানদারকে বলল, 'দুটো ডাব দিন। দেখে দেবেন। স্ট্র আছে তো?'

পূর্ণদা এই প্রথম দেখলেন, দোকানের খুঁটির গায়ে এক কাঁদি ডাব ঝুলছে। দোকানদার চা বানাবার তোড়জোড় শুরু করেছিল, কিন্তু সেটা থামিয়ে তড়িঘড়ি করে উঠে গিয়ে দুটো বড়সড় ডাব কেটে স্ট্র সমেত ওই দুই খদ্দেরের হাতে ধরিয়ে দিল। সাহেব খুব মনোযোগের সঙ্গে ডাবটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে গাড়িতে গিয়ে বসল।

সঙ্গী লোকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ডাব খেল, তারপর খোলাটাকে পাশের শুকনো নালার দিকে গড়িয়ে দিয়ে দাম মিটিয়ে মারুতির কাছে ফিরে গেল। একটু বাদে সাহেবের হাত থেকে শূন্য ডাবের খোলাটা নিয়ে নালার দিকে ছুড়ে দিয়ে উঠে পড়ল গাড়িতে। দরজা বন্ধ হতেই গাড়ি ছুটল সামনের দিকে।

পূর্ণদা বললেন, 'এই লোকটা ডেভিস নয় তো?'

দু' দকে মাথা নাড়িয়ে উত্তর দিল কৌশিক, 'না। সাহেব একা, সঙ্গে তো মেমসাহেব নেই।'

'মেমসাহেব হয়তো কোনও কাজ সেরে পরে আসবে।'

'না, এ ডেভিস নয়। আপনার কাছেই তো শুনেছি ডেভিস মাঝবয়সী। এই সাহেবের বয়সে বড় জোর ছাব্বিশ-সাতাশ।'

'কী জানি বাবা, আমি সাহেব-মেমের বয়েস বুঝতে পারি না। এই সাহেবটা তা হলে বোধহয় ট্যুরিস্ট।'

'উহুঁ, ট্যুরিস্ট নয়। ট্যুরিস্ট হলে এখানে নেমে চারদিক একবার তাকিয়ে দেখত। কে টুরিস্ট আর কে নয়, চোখ দেখলেই বোঝা যায়।'

'তা হলে নির্ঘাত কোনও এন জি ও-র সঙ্গে কানেকটেড। এদিকে শুনেছি কিছু জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান আছে। বিদেশ থেকে গ্র্যান্টও পায় কয়েকটা। সাহেবকে হয়তো তদারকিতে আসতে হয় মাঝেমধ্যে। চেনা জায়গা বলে কোনও দিকে আর তাকায়নি। 'না, তাও নয়। চেনা জায়গা হলে ডাবের সঙ্গে সাহেবের আগেই পরিচয় থাকত। সাহেব ডাবটা হাতে নিয়ে নতুন-কিছু দেখার চোখে অত খুঁটিয়ে দেখত না। ডাবের খোলটা কোথায় ফেলবে তা নিয়েও সাহেবের এত দুর্ভাবনা থাকত না।'

'দুর্ভাবনা করেছে তুমি কী করে বুঝলে?'

'ওদিকে তাকিয়েছিলাম। সাহেবের বডি ল্যাঙ্গোয়েজ দেখেই বুঝতে পেরেছি।'

একটু অবাক হয়ে পূর্ণদা বললেন, 'তুমি এর মধ্যে এত কিছু খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছ?'

'খুঁটিয়ে দেখিনি তো, চোখে পড়ে গেছে।'

'ওই একই হল। সঙ্গের লোকটা তা হলে বোধহয় সাহেবের বন্ধু। গাঁয়ের বাড়ি দেখাবার জন্যে সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে।'

দু-দিকে মাথা নাড়ল কৌশিক। 'না, বন্ধু নয়, আবার নিছক একজন গাইডগোছেরও নয়। আর একটু কাছাকাছি সম্পর্ক।'

'এ সিদ্ধান্তও কি সাহেবের সঙ্গীর শরীরের ভাষা পড়ে?'

হেসে উঠল কৌশিক। 'আপন রীতিমত জেরা শুরু করে দিয়েছেন পূর্ণদা। সাহেব কোথায় যাচ্ছে জানি না, তবে নিশ্চয়ই কোনও দরকারি কাজে। শখ করে কারও গাঁয়ের বাড়ি দেখতে যাচ্ছে না।'

'কী করে বুঝলে?'

দোকানদার দু' ভাঁড় চা ধরিয়ে দিয়েছিল দুজনের হাতে। চায়ের ভাঁড়ে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে কৌশিক বলল, 'আহ্! খাসা চা। ভাঁড়ে চা খেলে একই সঙ্গে পোড়া মাটি আর চায়ের গন্ধ পাওয়া যায়। পথে বেরিয়ে এমন চায়ে চুমুক দিলে বেড়াবার মেজাজ খুলে যায় চট করে। তাই না পূর্ণদা?'

পূর্ণদা ভাঁড়ে চা খেতে অভ্যস্ত নন, টইটম্বুর চায়ের ভাঁড় সামলাতে সামলাতে একটু হাসার চেষ্টা করলেন শুধু। তার পরে পর-পর দুটো চুমুক দিয়ে চায়ের পরিমাণ কমিয়ে শক্ত হাতে ভাঁড় কব্জা করে বললেন, 'তুমি পেশায় গোয়েন্দা, তাই হয়তো সহজ জিনিসকে একটু কঠিন করে দেখার অভ্যেস হয়ে গেছে তোমার। এবার আমিও একটু মাথা খাটাই। সাহেবরা ভারতবর্ষে বেড়াতে এলে শুধু কলকাতা আর এখানকার শহরতলি দেখে না। সাহেব হয়তো এর আগে ম্যাড্রাস, বোম্বে, রাজস্থান আর বেনারসে ঘুরেছে। গরমের দেশে এত ঘোরার পরে সাহেবমাত্রই হাঁপিয়ে ওঠে। দেখলে না গায়ে একটা পাতলা টি শার্ট। কিন্তু আমরা তো সোয়েটার-টোয়েটার পরে বসে আছি। লম্বা সফরে সাহেব এতই হাঁপিয়ে পড়েছিল যে, কোনও দিকে না তাকিয়ে গাড়িতে বসে চুপচাপ ডাব খেয়ে গেছে।'

বেশ তারিফ করার গলায় কৌশিক বলল, 'বাহ্! আপনারও বেশ দেখার চোখ আছে পূর্ণদা। সাহেবের কাছে এই শীতটা কোনও শীতই নয়। সুতরাং টি শার্ট পরার ব্যাখ্যাটা ঠিক। কিন্তু সাহেব মাসখানেক ধরে ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়ায়নি। যদি ঘুরত তা হলে সাহেবের ওই লাল টুকটুকে গায়ের রঙের ওপর একটু রোদে-পোড়া ভাব ধরত। সাহেব হয়তো আজ ভোরে কিংবা কাল কলকাতায় এসেছে সরাসরি। দিল্লিতে নেমে প্লেনও পালটাতে পারে। যাই হোক, ওই দিন-দুয়েকের ব্যাপার। সাহেবের মাসখানেক ধরে এ দেশে ঘোরাঘুরি না করার আর একটা কারণ হল—সাহেব কয়েকদিন আগেও অসুস্থ ছিল।'

'অসুস্থ! কই দেখে তো একবারও মনে হয়নি। দিব্যি গাঁট্টাগোট্টা চেহারা।'

'না-না, সেদিক থেকে ঠিক আছে। আপনি যদি সাহেবের মুখের দিকে একটু ভাল করে তাকাতেন তা হলে দেখতেন সাহেবের মুখে দুটো কাটা দাগ আছে। একটা দাগ কপালে। চুলের গোড়া থেকে ভুরু পর্যন্ত। এই দাগটা পুরনো দাগ। আর একটা দাগ থুতনিতে। বেশ ভাল রকম জখমের দাগ—ঠোঁটের নীচে থেকে থুতনির মাঝামাঝি পর্যন্ত। ওই ক্ষতটা টাটকা। বড় জোর তিন-চার দিন হল শুকিয়েছে। অমন একটা আঘাত নিয়ে সাহেব ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াবে—এটা ভাবার কোনও কারণ নেই। চোট সারার পরেই সাহেব নিজের দেশ ছেড়েছে। তার মানে সব মিলিয়ে ওই দু-তিন দিন সময়—।'

অবাক হয়ে পূর্ণদা বললেন, 'আরে, তুমি তো দারুণ অবজারভ্যান্ট। সাহেব আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল মাত্র কয়েকটা সেকেণ্ড, তার মধ্যে এত কিছু দেখে নিয়েছ!'

লাজুক মুখে উত্তর দিল কৌশিক। 'দেখিনি, চোখে পড়ে গেছে বলতে পারেন। চলুন, এবার যাওয়া যাক।'

ওরা গাড়িতে উঠতেই গাড়ি আবার চলতে শুরু করল। পূর্ণদা গাড়ির কাচ একটু নামিয়ে দিয়েছিলেন। অল্প ঠাণ্ডা হাওয়া গাড়ির এ জানলা দিয়ে ঢুকে ও জানলা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। পূর্ণদার মধ্যে বেড়াবার মেজাজ এসে গিয়েছিল খানিকটা। গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, তোমার কথাই মেনে নিলাম। এই সাহেবটা ট্যুরিস্ট নয়। কিন্তু বিদেশ থেকে অনেক ট্যুরিস্ট তো এখানে আসে—। শুধু এখানেই নয়, গোটা ভারতবর্ষে। আর ওদের আসা শুরু হয়েছে কয়েকশো বছর আগে থেকেই। ওদের কাছে আমরা কিন্তু খুব ঋণী। কয়েকজন যা ভ্রমণকাহিনী লিখে গিয়েছেন না—দুর্দান্ত! ওগুলো শুধু রসিয়ে-রসিয়ে পড়ার বিষয় নয়, পড়লে আমাদের দেশের অনেক পুরনো ইতিহাস জানা যায়। ইতিহাস মানে শুধু রাজা-রাজড়ার কাহিনী নয়। আমাদের দেশে তখন সমাজব্যবস্থা কেমন ছিল, পথঘাট কেমন ছিল—রীতিনীতি, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, পড়াশুনোর চর্চা—সব কিছু লেখা হয়েছে ওই সব ভ্রমণকাহিনীতে। এই ধরো গ্রিক দূত মেগাস্থিনিসের ভারত-বিবরণ। ওটা না থাকলে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস লেখাই কঠিন হয়ে পড়ত। তাও তো আবার মেগস্থিনিসের আসল পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গিয়েছিল—।'

'অ্যাঁ! বলেন কী! উদ্ধার হল কী ভাবে?'

'হয়নি তো। ঠিক পরের যুগের লেখকরা মেগাস্থিনিসের লেখার প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন নিজেদের লেখায়। তার মধ্যেই বেঁচে আছেন গ্রিসের ওই দূত। কিছু-কিছু মুসলিম পর্যটকের কাছেও আমাদের ইতিহাস হাত পেতেছে। এই যেমন ধরো—ইবন বতুতা। ফোর্টিন্থ্ সেঞ্চুরিতে ভারতে এসেছিলেন। তখন এ দেশে ওই পাগলা রাজার রাজত্বকাল। কী নাম যেন—হ্যাঁ-হ্যাঁ, মহম্মদ বিন তুঘলক। ইউরোপীয় পর্যটক মার্কো পোলোর কথা তো জানোই। উনি এসেছিলেন ইবন বতুতার কিছুকাল আগে। তবে দুটি ভ্রমণকাহিনী আমার দুর্ধর্ষ লেগেছে। একজন বার্নিয়ের আর একজন তাভার্নিয়ের। তুমি পারলে পড়ে নিও। সেভেনটিন্থ সেঞ্চুরির মাঝামাঝি সময়ে ভারতে এসেছিলেন ওঁরা। একসঙ্গেও ঘুরেছেন বেশ কিছু পথ। এই বাংলাদেশেই তো এসেছিলেন একসঙ্গে। তারপর রাজমহল থেকে দুজন দু'দিকে চলে গিয়েছিলেন। বার্নিয়ের যান কাশিমবাজারের পথে। পরে বাংলাদেশ ঘুরে গোলকুণ্ডায়। গোলকুণ্ডায় থাকার সময় সম্রাটের মৃত্যুসংবাদ পান।'

'কোন সম্রাট?'

'শাজাহান।'

বিস্ময় ফুটে উঠেছিল কৌশিকের চোখেমুখে। 'তখন তো ভারতের ইতিহাসের বিরাট পরিয়ড—মানে কাল।'

'শুধু কাল নয়, সংকটকাল। মুঘল সাম্রাজ্যের সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিমে। তখনকার দিনের বিস্তর খুঁটিনাটি ধরা পড়েছে ওই দুই পর্যটকের চোখে। ওঁরা অবশ্য আজকের মতো পর্যটক ছিলেন না—ছিলেন ব্যবসায়ী। তাভার্নিয়ের পাক্কা ব্যবসাদার। হিরে-জহরত, মণিমুক্তোর ব্যবসা করতেন। বার্নিয়েরও ব্যবসায়ী, তবে সেই সঙ্গে দার্শনিকও—তার ফলে নানা বিষয় ওঁর লেখায় চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে। সতীদাহের একটা যা বিবরণ দিয়েছেন না—পড়লে তোমার গায়ে কাঁটা দেবে।'

'কী রকম?'

'বেশ কয়েকটা সতীদাহের ঘটনা নিজের চোখে দেখেছেন বার্নিয়ের। ভয়ংকর সব ব্যাপার। একটার কথা বলছি। বার্নিয়ের লিখেছেন : ওই দৃশ্য আমি কখনও ভুলতে পারব না। বছর-বারো বয়েস মেয়েটার। ওকে যখন ওর স্বামীর চিতার সামনে নিয়ে আসা হল তখন ও ভয়ে আধমরা। কাঁপতে-কাঁপতে হাউ-হাউ করে কাঁদছিল। কিন্তু চারপাশে জড়-হওয়া আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে তার কোনও প্রতিক্রিয়া ছিল না। এমন ভাব যেন খুব স্বাভাবিক কোনও ঘটনা ঘটতে চলেছে। একটা বুড়ি এসে মেয়েটার হাত ধরল প্রথমে। তারপর চার-পাঁচটা ষণ্ডামার্কা পুরুত ওকে ধরে জোর করে ওর মৃত স্বামীর চিতার ওপরে বসিয়ে দিল। মেয়েটা ছটফট করে পালাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু ওইটুকু মেয়ের পক্ষে ওদের হাত ছাড়িয়ে পালানো অসম্ভব। মেয়েটাকে বুঝিয়েসুঝিয়ে সহমরণে রাজি করানো সম্ভব হল না দেখে পুরুতরা ওর হাত-পা চিতার কাঠের সঙ্গে দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিয়েছিল। তারপর মহানন্দে চিতায় আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মেরেছিল বাচ্চা মেয়েটাকে।'

আঁতকে উঠল কৌশিক। 'কী বীভৎস ব্যাপার! এ তো খুন!'

'খুনই তো। ঠাণ্ডা মাথায় খুন।'

'তা, ওই বার্নিয়ের সাহেব মেয়েটাকে বাঁচাবার কোনও চেষ্টা করেনি?'

'না, করেননি। কয়েকবার চেষ্টা করে পারেননি বলে দমে গিয়েছিলেন বোধহয়। তবে পরে একবার পেরেছিলেন।'

'পেরেছিলেন! কীরকম?'

পূর্ণদা একটু ঘুরে বসলেন। তারপর শুরু করলেন লম্বা কাহিনী। ''বার্নিয়ের লিখেছেন : এক আগা খাঁর এক কেরানি ছিল, তার নাম বেণীদাস। ও আমার বন্ধু ছিল। দু'বছর রোগে ভুগে মারা গেল বেণীদাস। আমি ওর চিকিৎসা করেছিলাম। স্বামী মারা যাওয়ার পরে বেণীদাসের স্ত্রী ঠিক করল, সহমরণে যাবে। আগা খাঁর লোকজন মহিলাকে থামাবার জন্যে অনেক বুঝিয়েছিল, কিন্তু তাতে কোনও কাজ হয়নি। তখন আগা খাঁ আমার কাছে এসে বললেন—আপনি তো অনেক দিন বেণীদাসের চিকিৎসা করেছিলেন, ওর বাড়ির লোকজনের সঙ্গে আপনার খুব জানাশোনা—আপনি একবার চেষ্টা করে দেখুন না। সঙ্গে সঙ্গে আমি ঘোড়া ছুটিয়ে গেলাম বেণীদাসের বাড়িতে। উঠোনে বেণীদাসকে শোয়ানো। চারপাশে একগাদা পুরুত, বাড়ির লোকজন। মৃত স্বামীর পায়ের কাছে বসে আছে ওর স্ত্রী। পোশাক আলুথালু। বুক চাপড়ে কাঁদছে। একটু শান্ত হলে আমি বললাম—আপনি সতী হবেন, খুব ভাল কথা। কিন্তু আপনার তো ছোট-ছোট কয়েকটি বাচ্চা আছে। আপনি সহমৃতা হলে তারা তো অনাথ হয়ে যাবে। আগা খাঁ আমাকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছেন—আপনি সহমরণে না গেলে আপনার বাচ্চাদের মানুষ করার জন্যে তিনি একটা মাসিক ভাতা দেবেন আপনাকে। আমরা জোর করে আপনার সহমরণে যাওয়া আটকাতে পারি, কিন্তু সেটা আমরা করতে চাই না। আপনি কী বলেন?'

কৌশিকও একটু ঘুরে বসেছিল। 'কী উত্তর দিল ওর বউ?'

'সাঙ্ঘাতিক উত্তর। বার্নিয়ের লিখেছেন : আমার কথা শুনে মহিলা কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে থাকার পরে বলল—আমাকে যদি সহমরণে যেতে না দেওয়া হয়, আমি দেয়ালে মাথা ঠুকে মরব।'

'সত্যি সাঙ্ঘাতিক! কী বলেছিলেন সাহেব তার উত্তরে?'

'দারুণ উত্তর। বার্নিয়ের লিখেছেন : আমি বললাম—বেশ, আপনি সহমরণে যান। কিন্তু তার আগে একটা কাজ করতে হবে আপনাকে। আপনার বাচ্চাদের এখানে নিয়ে আসছি। আপনি নিজের হাতে তাদের গলা কেটে স্বামীর চিতায় তুলে দেওয়ার পরে নিজে চিতায় উঠবেন। শুনে মহিলা থমকে গিয়ে হাঁটুতে মুখ লুকিয়েছিল। ওকে হঠাৎ ওই রকম ঝিমিয়ে পড়তে দেখে চারপাশের মতলববাজ লোকগুলো সরে পড়েছিল এক-এক করে। সেদিন সন্ধেবেলায় বার্নিয়ের জানতে পেরেছিলেন যে, বেণীদাসের বউ সহমরণে যাওয়ার সঙ্কল্প ছেড়েছে।'

বিস্ময় ও শ্রদ্ধামেশানো গলায় কৌশিক বলল, 'বাহ্! বার্নিয়ের সাহেব তো দারুণ একটা কাজ করেছেন।'

'একটা নয় বিস্তর ভাল কাজ। সাধে কি আমি বার্নিয়েবের এত ভক্ত। সাড়ে-তিনশো বছর আগেকার ওই সাহেবের সাক্ষাৎ বংশধর এখানে আসছেন। ফ্রাঁসোয়া জোসির সঙ্গে দেখা করার জন্যে তাই আমি এত উত্তেজিত হয়ে আছি। আচ্ছা, আমরা এখন এলাম কোথায়?'

জানলা দিয়ে বাইরের দিকে কিছুক্ষণ চোখ ঘোরাবার পরে কৌশিক উত্তর দিল, 'টাকি। তার মানে আর আধঘণ্টার মধ্যে আমরা হাসনাবাদে পৌঁছে যাচ্ছি।'

॥ ৫ ॥

সূর্য এখন মাথার ওপরে। রোদ্দুরে একটু চড়া ভাব, কিন্তু মাঝেমধ্যেই ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলক আসছিল। পূর্ণদা বললেন, 'এই ঠাণ্ডা হাওয়াটা বোধহয় নদীর ওপর থেকে ভেসে আসছে।'

কৌশিক দু' দিকের জানলায় চোখ ঘুরিয়ে বলল, 'নদী কি কাছেই?'

'খুব কাছে না হলেও খুব দূরে নয়। শুরু হয়ে গিয়েছে নদীনালার এলাকা। বার্নিয়েরের আমলে এ সব জায়গায় ছিল গভীর সুন্দবন। চারপাশে অসংখ্য দ্বীপ, দ্বীপের চারপাশে বিস্তর নদীনালা। সাহেব হয়তো নৌকোয় চেপে ঠিক এইখান দিয়ে যাওয়ার সময় প্রকৃতির কিছু বর্ণনা লিখেছিলেন।'

বেশ তারিফ করার গলায় কৌশিক বলল, 'আপনার সঙ্গে বেড়াতে আসার এটাই একটা মজা পূর্ণদা। পুরনো ইতিহাসের কত কিছু জানা যায়। আপনি একটা সময় নির্ঘাত খুব বেড়াতেন।'

'না-না, খুব একটা নয়। তেমন করে বেড়াইনি বলেই বোধহয় কল্পনাশক্তি একটু বেশি মাত্রায় কাজ করে।'

'তাই আবার হয় নাকি!'

'হ্যাঁ, তাই হয়।'

'একটা প্রমাণ দিন। ইতিহাস থেকে দেবেন কিন্তু।'

পূর্ণদা হেসে উঠে বললেন, 'তুমি দেখছি মাস্টারমশাইয়ের মতো হয়ে উঠেছ। কথায়-কথায় এমন প্রমাণ চাইলে আমাকে তো পালাতে হবে।'

কৌশিকও হেসে উঠল। 'আপনার সঙ্গে তো একটানা সাড়ে তিন ঘণ্টা কাটিয়ে দিলাম, কিন্তু কই—এর আগে তো একটাও প্রমাণ চাইনি। চেয়েছি?'

'চেয়েছ কি না তুমিই ভেবে দেখ।'

'ঠিক আছে, পরে ভাবব। এখন বলুন, কবির ওই লেখাটা কতখানি সত্যি? ওই যে কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা, মনে মনে। নিষেধ নেই, ভাল কথা। কিন্তু মনে মনে কত দূর পর্যন্ত হারিয়ে যাওয়া যায়?'

পূর্ণদা কপালে দু' হাত ঠেকিয়ে বললেন, 'কবিরা নমস্য, ওঁদের আবার এর মধ্যে টানছ কেন? তবে ইতিহাস বলে, বিজ্ঞানের অনেক আগে কল্পনা দৌড়য়। তুমি তো জুলে ভের্নের লেখা পড়েছ?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ পড়েছি, উনি তো সায়ান্স ফিকশন নিয়ে—।'

'কল্পবিজ্ঞান-কাহিনীর উনিই হলেন জনক। একটাও কিন্তু গালগল্প নয়। অসাধারণ কাহিনী, কিন্তু প্রতিটির পেছনে বেসিক সায়ান্স আছে। আর গল্পের মধ্যে কী নেই? সব আছে। আকাশ-পাতাল, জলস্থল চষে বেড়িয়েছেন লেখক।'

'খুব বেড়াতেন বুঝি জুলে ভের্ন?'

'না-না, একেবারেই নয়। তবে দেশবিদেশে বেড়াবার খুব শখ ছিল। আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগে জন্মেছিলেন। তখন বেড়ানো মানেই জাহাজ। তা, বেড়াবার লোভেই দশ-বারো বছর বয়েসে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে এক জাহাজে কেবিন-বয়ের চাকরি নিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পালাতে পারেননি, বাবার কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিলেন। বাবা ছিলেন দুঁদে উকিল। ছেলেকে ধরে বাড়িতে নিয়ে এসে খুব ধমকধামক দিয়েছিলেন বাবা। ছেলে তখন একটা প্রতিজ্ঞা করে বসেছিল। জব্বর প্রতিজ্ঞা। বলেছিল, আমি আর কখনও বাড়ি থেকে পালাব না। এবার থেকে শুধুই মনে মনে বেড়াব। ওই তোমার মনে মনে হারিয়ে যাওয়ার মতো। জুলে ভের্নের ওই কথাটা যে কত সত্যি—ওঁর বাবা তখন ভাবতেও পারেননি!'

আবার একটা গল্প শোনার মেজাজ তৈরি হয়েছিল কৌশিকের। একটু ঘুরে বসে ও জিজ্ঞেস করল, 'কী রকম?'

গল্প শুধু শোনার ব্যাপারে নয়, আগ্রহী শ্রোতাকে শোনানোরও একটা আনন্দ আছে। পূর্ণদা ঝলমলে মুখে বললেন, "জুলে ভের্ন ওঁর 'টোয়েন্টি থাউজ্যান্ডস লিগ্‌স আন্ডার দ্য সি'-তে 'নটিলাস' নামে একটা ডুবোজাহাজের কল্পচিত্র এঁকেছেন। জল থেকে বিদ্যুৎ তৈরি করে ওই ডুবোজাহাজ চলে। লেখার সময় এটা ছিল নিছকই কল্পনা। অনেক দিন পরে বিজ্ঞানের সাহায্যে ওই ধরনের একটা সাবমেরিন বানানো হয়েছিল। জল থেকে বিদ্যুৎ তৈরি করার উপায়ও আবিষ্কৃত হয়েছিল।"

'দারুণ তো! লেখকের কল্পনার জোর আছে। ঠিক মিলিয়ে দিয়েছেন!'

"এটা কিন্তু আন্দাজি ঢিল নয়। ভবিষ্যতের বিজ্ঞানের অগ্রগতি উনি নিখুঁত ভাবে কল্পনা করেছিলেন। 'ফাইভ উইকস ইন এ বেলুন'-এ উনি মধ্য আফ্রিকার নিখুঁত একটা ছবি এঁকেছেন। ওই সময় আফ্রিকার ওই এলাকায় সভ্য মানুষ খুব একটা পৌঁছতে পারেনি। একটা বইতে উত্তর মেরু অভিযানের চমৎকার এক কাল্পনিক কাহিনী ফেঁদেছেন। সেটাও নিখুঁত। ওই বইটা লেখার অনেক পরে রবার্ট পিয়ারি সত্যি-সত্যি উত্তর মেরু অভিযান

করেন। তবে ওঁর যে বইটা আমার দুর্ধর্ষ লেগেছে—সেটা হল চাঁদে অভিযান। আমাদের দেশে ঋষিদের ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা বলা হয়। ভের্নের ক্ষেত্রেও কথাটা সমান সত্যি। মাধ্যাকর্ষণ এলাকা পেরিয়ে গেলে শরীর ভারহীন হয়। বাতাসে ভাসে। এই বৈজ্ঞানিক সত্য ওই বইটিতে লেখক কল্পনা করেছিলেন। লেখক আগে যা ভেবেছিলেন, বিজ্ঞান পরে তাই প্রমাণ করেছে। একেবারে নিখুঁত হল স্পেসশিপ লঞ্চিং স্টেশনের কল্পনা। সুদূর ফ্রান্সে বসে লেখক কল্পনা করেছিলেন মহাকাশযান ছাড়া হচ্ছে আমেরিকার ফ্লোরিডা থেকে। এ কথা লেখার বহুকাল বাদে সত্যি-সত্যি দেখা গেল, বিজ্ঞানীরা স্পেসশিপ ছোড়ার জায়গা হিসেবে ওই ফ্লোরিডাকেই বেছে নিয়েছেন।"

'টেরিফিক!' ছেলেমানুষের মতো একটু হাততালিই দিয়ে ফেলল কৌশিক, তার পর বলল, 'তা, আপনার ওই ফরাসি সাহেব বার্নিয়ের ওইরকম কিছু মিলিয়ে-টিলিয়ে দিতে পারেননি?'

চাপা ধমক দেওয়ার গলায় পূর্ণদা বললেন, 'কী আশ্চর্য, উনি কি কল্পবিজ্ঞানের লেখক নাকি যে কিছু মিলিয়ে দেবেন! পর্যটক। ভারতে বেড়াতে এসে যা দেখেছেন, তাই লিখেছেন। তবে শুধু প্রকৃতি বর্ণনা নয়, এ দেশের লোকজন, তাদের জীবনযাত্রা, সামাজিক নিয়মকানুন, রীতিনীতি, অর্থনীতি—কিছুই বার্নিয়েরের চোখ এড়ায়নি। ওই সবের ওপর পাঠকদের বাড়তি লাভ হল সাহেবের নানা ব্যাখ্যা আর মন্তব্য। কবেকার লেখা, কিন্তু ওই লেখার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন মার্কস আর এঙ্গেলস।'

জানলার দিকে তাকিয়ে কৌশিক বলে উঠল, 'আমরা হাসনাবাদে এসে গিয়েছি।'

কৌশিকের কথা শুনে চঞ্চল চোখে বাইরের দিকে তাকালেন পূর্ণদা।

রাস্তার দু' দিকে দোকানপাট, বাড়িঘর। রাস্তায় লোকজনের সংখ্যাও কম নয়। গাড়ির গতি কমিয়ে ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, 'গাড়ি কি এখানে লাগিয়ে দেব?'

কৌশিক উত্তর দেওয়ার আগেই পূর্ণদা বলে উঠলেন, 'না-না, এখানে নয়, আরও এগিয়ে। মনে হয়, এই রাস্তার শেষেই খেয়াঘাট। আমাদের তো খেয়াঘাটেই অপেক্ষা করার কথা—।'

ড্রাইভার গাড়ির স্পিড একটু বাড়িয়ে দিল।

দু' দিকের দুই জানলায় দুই যাত্রীর মুখ। হঠাৎই গলার স্বর একটু ওপরে তুলে কৌশিক বলল, 'আরে! ওই সাহেব দেখছি এখানেই এসেছে।'

পেছনের দিকে চোখ ঘুরিয়ে পূর্ণদা জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন্ সাহেব?'

'রাস্তার ওই ডাব-খাওয়া সাহেব।'

'কোথায়?'

'সাহেবকে দেখতে পাইনি, সাহেবের মারুতি দাঁড়িয়ে আছে।'

একটু বাদেই এসে গেল খেয়াঘাট। সামনে মস্ত নদী। একধারে ঘাট। ঘাটের মাথায় ছাউনি। সামনে দোকানপাট। বেশির ভাগই চালাঘর। ঘাটের পাশেই দাঁড়িয়ে পড়ল অ্যাম্বাসাডর। থামতেই গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল কৌশিক আর ওর পূর্ণদা। চওড়া নদীর বুক থেকে হু-হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া ভেসে আসছিল।

কৌশিক আর পূর্ণদা চারদিকে চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে ঘাটের সামনে এসে দাঁড়াল। চওড়া বাঁধানো ঘাট ঢালু হয়ে নদীতে নেমে গিয়েছে। শেষের দিকে মস্ত বড় কাঠের

পাটাতন। যাত্রীবোঝাই একটা বড় নৌকো ঘাটের মুখে। যাত্রীরা ওপারে যাবে। নৌকো ছাড়ব-ছাড়ব করেও ছাড়ছে না, বোধহয় আবও কিছু যাত্রী পাওয়ার অপেক্ষায় আছে।

এদিক-ওদিক তাকাল দুজনেই ; কিন্তু কই, সাহেব-মেমের কোনও চিহ্ন নেই তো কোথাও!

একটু দমে-যাওয়া মানুষের গলায় পূর্ণদা বললেন, 'ওরা বোধহয় আসেনি তা হলে!'

চারদিকে অনুসন্ধানী চোখ ঘোরাতে-ঘোরাতে কৌশিক জিজ্ঞেস করল, 'আপনার সঙ্গে এ ব্যাপারে রনির শেষ কথা কী হয়েছিল?'

'ও বলেছিল—সাহেব-মেমরা এখানেই থাকবে। লঞ্চ ঠিক করা হয়ে গেছে। আমাদের মনে হয়, প্রোগ্রামটা ওরা বোধহয় বাতিল করে দিয়েছে শেষ পর্যন্ত। সেই খবরই ছিল হয়তো স্পেশাল ক্যুরিয়ার সার্ভিসের ওই খামে। আসলে রনি মাঝেমধ্যে এমন এক-একটা কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতো কাজকর্ম করে বসে না—। তুই ওই ক্যুরিয়ার সার্ভিসের মধ্যে না গিয়ে একটা ফোন করে তো ব্যাপারটা জানিয়ে দিতে পারতিস! ইর্‌রেস্পন্সিব্‌ল্‌!'

কথা বলতে বলতে পূর্ণদা ওঁর প্রবাসী ভাইপো রনির ওপর একটু চটেই গেলেন। আর ঠিক সেই সময়ই একটা লোক এসে জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা কি কলকাতা থেকে এসেছেন?'

কিছু-কিছু লোক আছে যারা খুব স্পষ্ট ভাষায় প্রশ্ন করলেও উত্তর দিতে গিয়ে বোধহয় থমকে যেতে হয়। এই লোকটাও সেই রকম। কুচকুচে কালো, পেটানো স্বাস্থ্য, উচ্চতায় ছ' ফুটের কাছাকাছি, একমাথা ঝাঁকড়া চুল। পরনে আধময়লা প্যান্ট-শার্ট। শার্টের ওপর ক্যাটকেটে সবুজ রংয়ের সোয়েটার। তবে ওই চেহারা আর পোশাক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পথে বাধা ছিল না। বাধা ছিল ওর অসম্ভব হিংস্র ধরনের চোখ। কৌশিক আর ওর পূর্ণদা—দুজনেরই প্রায় একসঙ্গে মনে হয়েছিল—এমন দৃষ্টি ওরা খুব একটা দেখেনি।

একটু থমকে যাওয়ার পরে কৌশিক পাল্টা প্রশ্ন করল, 'কেন?'

পাল্টা প্রশ্নে লোকটার চোখের ধার বোধহয় একটু কমে গিয়েছিল। আমতা-আমতা করে জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের মধ্যে কি পূর্ণ চ্যাটার্জি বলে কেউ আছেন?'

পূর্ণদার মধ্যে হঠাৎই যেন সাড় ফিরে এসেছিল। 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমি, কিন্তু কেন?'

উত্তর শুনে লোকটার বুনো চোখ কেমন যেন পোষমানা প্রাণীর মতো হয়ে গিয়েছিল। একগাল হেসে বলল, 'আপনাদের নিয়ে যাওয়ার জন্যে সেই তখুন থেকে দাঁড়িয়ে আছি।'

কৌশিকের চোখ এখনও ধারালো। 'কোথায় নিয়ে যাবে?'

'সাহেব-মেমের কাছে।'

উত্তর শুনে ছেলেমানুষের মতো খুশি হয়ে উঠেছিলেন পূর্ণদা। 'দেখ কাণ্ড! আমাদের আসতে একটু বোধহয় দেরিই হয়ে গেছে। ও মাধব, গাড়ির ডিকি থেকে আমাদের মালপত্তরগুলো বার করে দাও।'

কিন্তু পূর্ণদার খুশির কোনও ছোঁয়া লাগল না কৌশিকের চোখেমুখে। প্রায় আগের মতো গলাতেই জিজ্ঞেস করল, 'কোন্ সাহেব-মেম? কী নাম?

পরীক্ষার পড়া ভুলে-যাওয়া ছাত্রের মতো চেহারা হয়ে গিয়েছিল লোকটার। ঢোক গিলে বলল, 'ওদের খটোমটো নাম কি আমাদের মনে থাকে বাবু। সাহেবের নাম কী যেন, হ্যাঁ-হ্যাঁ দ্রাবিড় আর মেমসাহেব যিশু।'

হা-হা করে হেসে উঠলেন পূর্ণদা, তার পর স্নেহমাখানো গলায় সংশোধন করে দিলেন লোকটাকে। 'দ্রাবিড় নয়, ডেভিস। আর যিশু নয়, জোসি। কোথায় ওরা?'

'ওই তো ওদিকের লঞ্চে। অনেকক্ষণ এসে গেছেন।'

লোকটার উত্তর শুনে সব সংশয় কেটে গিয়েছিল কৌশিকের। ঠিক লোক, ঠিক লোকের কাছেই এসেছে।

মাধব ডিকির পাশে দাঁড়িয়েছিল, কৌশিকের ইঙ্গিত পাওয়ামাত্রই ও ডিকি খুলে স্যুটকেস আর কিটব্যাগ বার করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ছুটে গিয়ে দু' হাতে স্যুটকেস আর কিটব্যাগ তুলে নিল লোকটা। কৌশিক মাধবকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে কিছু টাকা ওর হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'তুমি এখানেই কোথাও দুপুরের খাওয়া খেয়ে নিও। গাড়ি এখন এখানেই থাক। আধ ঘণ্টা চল্লিশ মিনিটটাক এখানে থেকো। যদি কোনও দরকার থাকে, আমরা তার মধ্যেই ফিরে আসব। না ফিরলে গাড়ি নিয়ে ফিরে যেয়ো। সাবধানে যাবে কিন্তু।'

মাধব সায় দিয়ে বলল, 'গাড়ির পেছনের সিটে একটা ব্যাগ আছে—।'

কৌশিক ব্যাগ বার করতেই ওই লোকটা বলল, 'ওটাও আমায় দিয়ে দেন।'

একটু হেসে জবাব দিল কৌশিক, 'ঠিক আছে, আমার কাছেই থাক। তোমার নামটা তো জানা হল না—।'

'আমার নাম?' আর এক গাল হেসে লোকটা বলল, 'আমার নাম গণেশ—গণেশচন্দ্র ঢালি।'

তিনজনের দল ঘাটের দিকে আর একটু এগোতেই যাত্রীবোঝাই বড় নৌকোটা নোঙর তুলে নদীতে ভেসে পড়ল।

ঘাটের সিমেন্টের সিঁড়ি খুব লম্বা একটা তক্তার সঙ্গে মিশে গেছে। ওই তক্তার কাছাকাছি পৌঁছতেই সাদা রংয়ের একটা লঞ্চ চোখে পড়ল পূর্ণদা আর কৌশিকের।

গণেশ লোকটা সত্যিই খুব বলশালী, পূর্ণদার ভারী স্যুটকেসসমতে হাত অক্লেশে ওপর দিকে তুলে চেঁচাল, 'হরেনদা, ঘাটে লঞ্চ ভেড়ান, বাবুরা এসে গেছে।'

একটু দূরে সাদা রংয়ের একটা লঞ্চ। লঞ্চের ওপরে তিন-চারটে মাঝিমাল্লাগোছের লোক। ওদের মধ্যে একটা লোক হাতটাত নেড়ে সারেংয়ের কেবিনের দিকে তাকিয়ে কী-সব যেন বলতেই লঞ্চ দুলে উঠল, তারপর লঞ্চটা আস্তে আস্তে এগিয়ে এল ঘাটের কাছে।

কিন্তু সাহেব-মেম কোথায়?

ঘাটের আর একটু কাছে লঞ্চ ভিড়তেই মাঝিমাল্লাদের মধ্যে তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। মোটা দড়ির পাকানো একটা বান্ডিল ঘাটের দিকে ছুড়তেই এ পাশের তক্তার এক ধারে দাঁড়ানো একটা লোক ধরে ফেলল সেটা, তার পর চটপট দড়ির ফাঁস তৈরি করে পরিয়ে দিল বেঁটেখাটো একটা থামের গলায়। লঞ্চ আর একটু কাছে আসতেই লঞ্চ থেকে সরসর করে নেমে এল একটা তক্তা।

সরু তক্তা এদিকের চওড়া তক্তায় পড়তেই হয়ে গেল একটা সেতু। এক মাঝি লম্বা একটা বাঁশ নামিয়ে দিল তক্তায়। ঘাটের প্রান্তের লোকটা সেই বাঁশটা একটু উঁচু করে ধরল। বাঁশের অপর প্রান্ত লঞ্চের মাঝির হাতে। এটা হল তক্তা-সেতুর রেলিং।

গণেশ ছোট্ট একটা হাঁক পেড়ে বলল, 'বাবুরা এটা ধরে ধরে উঠে পড়েন লঞ্চে। সাবধানে উঠবেন। এই তুমি লগির ওদিকটা একটু নিচু করো।'

পূর্ণদা আর কৌশিক বাঁশ ধরে ধরে তক্তার ওপর দিয়ে উঠে এল লঞ্চে।

দোতলা লঞ্চে। ওরা উঠতেই লঞ্চের একতলার সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে এল সাহেব আর মেম।

মেমসাহেবের পরনে হালকা নীল রংয়ের সালোয়ার-কামিজ। অসম্ভব ফর্সা রং। দুটো গাল আর নাক টুকটুকে লাল। কাঁধ পর্যন্ত ছাঁটা সোনালি চুল হাওয়ায় উড়ছিল। মুখে হাসি। চোখের তারার ঝিলিক তুলে কৌশিক আর পূর্ণদার দিকে বার-দুই তাকাতেই তৎপর হয়ে উঠলেন পূর্ণদা। একটু বাধো-বাধো ভঙ্গিতে সামনের দিকে ডান হাতটা সামান্য বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'দিস ইজ মি, পূর্ণ চ্যাটার্জি।'

দু' হাত জড় করে নমস্কারের ভঙ্গিতে একটু ঝুঁকে মেমসাহেব বলল, 'নোমোস্কার আংকল। আমি জোসি, রনির বন্দু।' তার পর পেছনে দাঁড়ানো হাফ প্যান্ট আর শার্ট পরা সাহেবকে দেখিয়ে বলল, 'আমার আর এক বন্দু ডেভিস।'

পূর্ণদা বাড়ানো হাত গুটিয়ে নিয়ে নমস্কার করে কৌশিককে দেখিয়ে বললেন, 'মিট মাই ইয়ং ফ্রেন্ড, কৌশিক।'

জোসির চোখের তারায় খুশির ঝিলিক খেলে গেল আর এক দফা। হাসতে হাসতে বলল, 'আহ্‌হ্‌! আমার আর একজন বন্দু।'

কৌশিক ঝলমলে মুখে জবাব দিল, 'আমরা দুজনেই আপনাদের বন্ধু।'

ডেভিসের বয়েস পঁয়তাল্লিশের আশেপাশে, কিন্তু মাথার সামনের দিকের চুল বেশ পাতলা হয়ে গেছে। চোখে হাই পাওয়ারের চশমা। মুখচোখের দিকে তাকাতেই মনে হয়, মানুষটি বড় মাপের স্কলার। ডেভিস পরিষ্কার বাংলায় জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের পথে কোনও অসুবিধে হয়নি তো?'

পূর্ণদা দু' দিকে মাথা নাড়িয়ে জবাব দিলেন, 'না-না, কোনও অসুবিধে হয়নি। দুজনে মিলে দিব্যি গল্প করতে করতে চলে এলাম।'

'ব্রেকফাস্ট হয়েছে তো?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, দুজনেই পেট পুরে খেয়ে এসেছি সকালে।'

'তা হলে আসুন আমরা একটু চা খাই। তারপর আপনারা চেঞ্জ করে একটু বিশ্রাম নিয়ে নিন। একঘণ্টা পরে লাঞ্চ নেব আমরা। আসুন।'

দোতলা থেকে একতলার সিঁড়ি ধরল সাহেব। সাহেবের পেছনে কৌশিক আর ওর পূর্ণদা, সবশেষে মেমসাহেব।

সিঁড়ির নীচে সরু একটা করিডর—দশ-বারো ফুট লম্বা। করিডর থেমেছে ছোট্ট কিন্তু সাজানো গোছানো একটা ডাইনিং-রুমে। ছ' জনের বসার মতো চেয়ার-টেবিল। টেবিলের মাঝখানে হিন্ডালিয়ামের একটা গ্লাসে কিছু দেশি ফুল। চারদিকের ছোট-ছোট জানলা-দরজায় নতুন পর্দা টাঙানো। বোঝা যায়, সাহেব-মেমদের জন্যেই কেনা হয়েছে।

ওরা টেবিলে মুখোমুখি বসতেই সুদৃশ্য কাপে চা আর প্লেট ভর্তি বিস্কুট এসে গেল।

ডেভিস সামনের দিকে হাত একটু বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'নিন চা খান।'

পূর্ণদা আর কৌশিক চায়ের কাপ তুলে নিল হাতে। পূর্ণদা ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে তারিফ করার গলায় বললেন, 'বাহ্! গুড টি।'

চায়ের কাপ কৌশিকের হাতেই ধরা। ও ডেভিসের দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি এত ভাল বাংলা শিখলেন কোত্থেকে?'

গলা ছেড়ে হেসে উঠে ডেভিস বলল,'বিকজ আই ওয়াজ বর্ন ইন ইন্ডিয়া।'

'আপনি ভারতে জন্মেছেন!'

'হ্যাঁ, বম্বেতে। আমার বাবা চাকরি করতেন ব্রিটিশ আর্মিতে। আমি জন্মাবার দশ বছর আগে থেকেই বাবা ভারতে। এ দেশে আমার আসতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। অফকোর্স দ্যাট ওয়াজ নট মাই ফল্ট। আয়্যাম দ্য ফোর্থ চাইল্ড অব মাই পেরেন্টস।'

ডেভিসের কথা শুনে টেবিলের তিন শ্রোতাই হেসে উঠেছিল।

মুচকি হেসে ডেভিস বললেন, 'বাট আই ওয়াজ লাকি। আমি জন্মাবার দু' বছর বাদেই বাবা কলকাতায় বদলি হয়ে এসেছিলেন। কলকাতা তখন দারুণ সুন্দর শহর। ভারত স্বাধীন হওয়ার পরেও আমরা কলকাতায় পাঁচ বছর থেকে গিয়েছিলাম। ভারত নিয়ে বাবার সঙ্গে গল্প হলেই বাবা বম্বের কথা বলে, আমি বলি কলকাতার কথা। বম্বের কথা আমার মনে নেই। মনে থাকার কথাও নয়। তবে বম্বের গল্প এত শুনেছি যে মনে হয়, বাবার সঙ্গে সঙ্গে আমিও ওখানেও অনেক ঘুরেছি। একটা ঘটনাব কথা বলছি। বাবা বলেছে, বম্বেতে একটা সময় প্রত্যেক উইক-এন্ডে পার্টি হত। পার্টির শুরুতেই এক গ্লাস শ্যাম্পেন দেওয়া হত সবাইকে। প্রত্যেকেই চোখ-নাক বন্ধ করে এক চুমুকে ওই গ্লাসটা শেষ করত। ইউ নো হোয়াই? শ্যাম্পেনের প্রথম গ্লাসে কয়েক গ্রেন করে কুইনিন মেশানো থাকত। ব্রিটিশরা দেশি টেররিস্টদের চাইতে বেশি ভয় করত ম্যালেরিয়াকে।'

ডেভিস থামতেই আর একবার উঁচু গলায় হেসে উঠেছিল তিনজন শ্রোতা।

পূর্ণদা বললেন, 'সেই বিচ্ছিরি ম্যালেরিয়া আবার ফিরে এসেছে দেশে। এখানে, মানে, এই লঞ্চে মশাটশা নেই তো? আমি তো মশার ভয়েই সঙ্গে করে—।'

কৌশিকের হাঁটুর ছোট্ট একটা ধাক্কা খেয়েই থমকে গেলেন পূর্ণদা। আর একটু হলেই বুঝি ওঁর মুখ থেকে মশা মারার কয়েল আর মশারির কথা বেরিয়ে পড়ছিল!

চা শেষ হতেই জোসি বলল, 'না, আপনাদের আর ধরে রাখব না। লং জার্নি করে এসেছেন। টেক সাম রেস্ট। একঘণ্টা পরে লাঞ্চে ডাকলে অসুবিধে হবে তো?'

ডেভিস সঙ্গে সঙ্গে জোসিকে সংশোধন করে দিয়ে বলল, 'বলো অসুবিধে হবে না তো?'

জোসি চোখ বড়-বড় করে বাংলা শুধরে নিতে যাওয়ার মুখে পূর্ণদা বলে উঠলেন, 'না-না, আমাদের কোনও অসুবিধে হবে না।'

ওরা টেবিল ছেড়ে উঠে পড়তেই করিডরের ওই প্রান্তে দাঁড়ানো গণেশ বলল, 'আসেন, আপনাদের ওপরের ঘরে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।'

॥ ৬ ॥

যে ডাক্তারের খুব পশার, তার চেম্বার উপচে পড়ে ভিড়ে। কিন্তু ডাক্তারবাবু যদি দু-তিন দিনের জন্যে শহরের বাইরে যান, ওই সময় তাঁর চেম্বার খাঁ-খাঁ করে। ছোটখাটো প্রয়োজনীয় কাজ মেটাবার জন্যে চেম্বারে হয়তো কম্পাউন্ডার বা সেক্রেটারি গোছের কেউ থেকে যায়, কিন্তু তাদের আর কতটুকুই বা কাজ! মাঝেমধ্যে এক-আধজন আসে, এবং চটপট ফিরে যায়। শূন্য দফতর শূন্যই থেকে যায় বেশির ভাগ সময়।

অন্য পেশায় ব্যস্ত মানুষদের কর্মস্থলে অনুপস্থিতির ক্ষেত্রেও এই ব্যাপারটা ঘটে থাকে কম-বেশি।

তরুণ গোয়েন্দা কৌশিক মিত্রের চেম্বারের চেহারাটিও এখন ওই রকম। পুরনো ও হবু মক্কেলরা জেনে গেছে, গোয়েন্দা এখন শহরের বাইরে। দিন-সাতেকের মধ্যে ফেরার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু সাজানো গোছানো চেম্বারের দরজা খোলা। ঘরের দু' দিকে দুটো ছোট মাপের চেয়ার-টেবিল। একটিতে বসে কৌশিক, অন্যটিতে ওর প্রবীণ সহকারী সনাতন মুখার্জি, যিনি মুখার্জিবাবু নামেই পরিচিত।

সহকারীকে নিয়ে একেবারে গোড়ার দিকে একটু খটকা ছিল অনেকের। এ কেমন সহকারী। যুবক গোয়েন্দার দ্বিগুণ বয়সী! কিন্তু প্রবীণ সহকারীটি তাঁর বুদ্ধি আর তৎপরতার জোরে বেয়াড়া সংশয়টা দূর করে দিয়েছেন বেশ কিছু দিন। কিন্তু ভালমানুষ মুখার্জিবাবু মাঝেমধ্যে কৌশিকের কাছে অনুযোগের গলায় বলেন 'স্যার, আপনি পাঁচজনের সামনে আমার নামে একটু বেশি-বেশি প্রশংসা করেন। এটা কিন্তু ঠিক নয়। আপনি আমাকে যে ভাবে চলতে বলেন, আমি সেই ভাবে চলি। যা করতে বলেন তাই করার চেষ্টা করি। আমার দৌড় ওইটুকুই। পথ বাতলে দিলে সবাই চলতে পারে। আমার জায়গায় অন্য যে কেউ থাকলে সেও পারত।'

মুখার্জিবাবু মানুষটি বেশ রসিক, আর কথাও বলতে পারেন অনর্গল। কৌশিকের হাতে কাজের চাপ তেমন না থাকলে সহকারীকে খুঁচিয়ে দিয়ে দিব্যি কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে দেয়। মুখার্জিবাবুর ওই ধরনের কথার জবাবে বেশ একটু প্রতিবাদ করার গলাতেই কৌশিক বলে, 'কী বলছেন আপনি! আপনার সঙ্গে যার-তার তুলনা হয় না। আমি আপনাকে একটা কাজ হয়তো করতে বললাম, কিন্তু কী ভাবে করলে কাজটা ঠিক-ঠিক হবে, সেটা তো আর সব সময় আগে থেকে বলি না, বলা যায়ও না। আপনি তখন আপনার মাথা খাটিয়ে কাজটা বার করে আনেন। আপনার উপস্থিত-বুদ্ধিও চমৎকার। কখনও-কখনও এমন বুদ্ধি খাটান যে মনে হয়, আপনার জায়গায় আমি থাকলে নির্ঘাত ফেল করে যেতাম।'

ব্যস, এমন কথার পরেই শুরু হয়ে যায় মুখার্জিবাবুর অনর্গল বোলচাল: "ছি-ছি স্যার, এমন কথা শোনাও পাপ। আপনি স্যার আমার চাইতে বয়সে আদ্ধেক, কিন্তু বুদ্ধি ধরেন একশো গুণ বেশি। সাধে কি আপনাকে 'স্যার' বলি। আপনি আপত্তি করেন। কিন্তু আমি বলব—। কেননা গুণীকে সম্মান জানাতেই হয়, বয়েসটা কোনও ফ্যাক্টর নয়। আমি আপনার কাজে লাগবার জন্যে যেটুকু যা শিখেছি, সে তো আপনার কাছ থেকেই শেখা। এই যে বডি-ল্যাঙ্গুয়েজ পড়ার বিদ্যে! আপনি না শেখালে কি ওটা শিখতে পারতাম! ওহ্! শরীরের ভাষা দুর্দান্ত ভাষা! মুখের ভাষা শোনার দরকার নেই। স্রেফ একটা লোকের চোখমুখের ভাব, হাত-পা নাড়া, বসা বা দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে তার মনের কথা পড়ে ফেলা—সত্যি সাঙ্ঘাতিক! কেউ-কেউ আমাকে বলে, হয়তো রাগাবার জন্যেই বলে—বুড়ো বয়েসে একটা ছোকরা গোয়েন্দার অ্যাসিস্ট্যান্টগিরি করতে লজ্জা হয় না আপনার? আমি বলি, না। বয়েস কম হলে কী হবে, বুদ্ধিতে তো পাকা। তোমাদের দোষটা কী জানো, তোমরা গল্পের বই পড়ে পড়ে শিখেছ—গোয়েন্দার সহকারী গোয়েন্দার হাঁটুর বয়সী হয়। আরে বাবা, জীবনের সঙ্গে গল্পের বই মেলে না। ঠিক বলিনি স্যার?"

এই রকম জায়গায় কৌশিক মুচকি হেসে বলে থাকে : 'আমি আপনার কথা ঠিক বলে মানছি কি না—সেটা আমার শরীরের ভাষা পড়ে বুঝে নিন না।'

অমনি শুরু হয়ে যায় মুখার্জিবাবুর আর এক প্রস্ত লেকচার।

আসলে মানুষটি কথা বলতে খুব ভালবাসেন, কিন্তু এই ক'টা দিন ওঁর খুব খারাপ কাটছে। কৌশিক বলে গেছে, চেম্বার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত যেমন খোলা থাকে তেমনি খোলা রাখবেন। পুরনো মক্কেলরা এলে কী প্রয়োজন জেনে নিয়ে দিন-সাতেক বাদে আসতে বলবেন। নতুন মক্কেল এলে কেস-হিস্ট্রি নিয়ে নেবেন। পরে যেন আমার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে আসে। আর বকেয়া অফিস-ওয়ার্ক সেরে রাখবেন।

কিন্তু অফিসের বকেয়া কাজ দেড় দিনেই সারা হয়ে গিয়েছে। পুরনো মক্কেলরা গোয়েন্দার খোঁজখবর করেছিল, কিন্তু 'নেই' বলতে আর কতক্ষণ লাগে! নতুন কোনও মক্কেল এলে লম্বা করে কেস-হিস্ট্রি নেওয়া যেত, কিন্তু এর মধ্যে একটাও নতুন কেস আসেনি।

একটা খবরের কাগজ গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ার পরেও হাতে প্রচুর সময় থেকে যায় মুখার্জিবাবুর। এক সময় যাত্রা-থিয়েটারে অভিনয় করার ঝোঁক ছিল মানুষটির, সেই ঝোঁক থেকে এখনও উনি মাঝেমধ্যে গলা সামান্য তুলে খবরের কাগজ পড়েন। কিন্তু এখনকার বাংলা গদ্য বড্ড সাদামাটা। ওই গদ্যে পুরনো দিনের থিয়েটারি মেজাজ ঠিক খোলে না। কিছুটা খোলে সাধুভাষায় ভারী-ভারী শব্দওয়ালা সম্পাদকীয় পড়ে। কিন্তু গলা কাঁপিয়ে পুচকে দুটো সম্পাদকীয় পড়তে কতক্ষণই বা আর সময় লাগে!

তারপর? তারপর বসে বসে হয়তো মাছি তাড়ানো যেত। কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এই ঘরে একটাও মাছি নেই। আজকের খবরের কাগজটা পুরো পড়া হয়ে গেছে। অকেজো হয়ে বসে থাকলে হাই ওঠে, তবে আজ তেমন হাইও উঠছিল না।

হঠাৎ চেম্বারের সামনে এসে ঘ্যাঁচ করে একটা পুলিশের জিপ থামল। জিপ থেকে নামলেন বিশাল চেহারার পুলিশ ইন্সপেক্টর অবনী ঘোষরায়। তারপর জুতোয় মসমস শব্দ তুলে চেম্বারের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়ার গলায় বললেন, 'কী মুখার্জি, কৌশিক এখনও ফেরেনি বনজঙ্গল থেকে?'

ইন্সপেক্টরকে দেখেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন মুখার্জিবাবু। বললেন, 'না স্যার, উনি তো বলে গেছেন দিন-সাতেকের আগে ফিরবেন না।'

ইন্সপেক্টরের গলায় একই সঙ্গে হতাশা আর বিরক্তি ফুটে উঠল। 'ওকে এই ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়ানো বন্ধ করতে বলো তো। যে পেশায় এসেছে সেই পেশা ফুল টাইম ডিমান্ড করে। বেড়ানোর যদি বাই থাকে, তা হলে স্কুল-কলেজে পড়ানোর চাকরি নিতে বলো। বছরে দু-তিনটে লম্বা ছুটি, তখন যত খুশি সাধ মিটিয়ে বেড়াক—কেউ কিছু বলতে আসবে না।'

এ কথাগুলো উত্তর চাওয়ার জন্যে বলা নয়, সুতরাং মুখার্জিবাবু মুখেচোখে অপ্রস্তুত একটা হাসি ফুটিয়ে মাথা চুলকোতে লাগলেন।

দোর্দণ্ডপ্রতাপ পুলিশ ইন্সপেক্টরের চেহারা এবার একটু করুণ দেখাচ্ছিল। 'আচ্ছা কৌশিক কি এমন কথা বলেনি যে, বেড়াবার জায়গাটা তেমন ভাল না লাগলে ও আগেও ফিরে আসতে পারে—।'

'না, বরং বলেছে—।'

'কী বলেছে?'

সঠিক কথাটা এই মুহূর্তে বলতে চাইছিলেন না মুখার্জিবাবু, কিন্তু ইন্সপেক্টরের বাজখাঁই গলা আর স্থির দৃষ্টির চাপে আমতা-আমতা করে বলে ফেললেন, 'না, মনে হয় সিরিয়াসলি বলেননি, তবে বলছিলেন কি—বেড়াবার জায়গাটা তেমন ভাল লেগে গেলে সাতদিনটা দশদিন হতে পারে।'

'অ্যাঁ! বলো কি! ও কি আর বেড়াবার সময় পেল না!'

মাথার টুপি খুলে হাতে নিয়েছিলেন ইন্সপেক্টর, মুখচোখ হতাশাগ্রস্ত মানুষের মতো দেখাচ্ছিল। 'এখন কী করি বলো তো? ওর সঙ্গে একটু কথা বলতে পারলে ভাল হত! ও কি কনট্যাক্ট নাম্বার-টাম্বার কিছু দিয়ে গেছে?'

দু' দিকে মাথা নাড়ালেন মুখার্জিবাবু।

এবার একটু চটেই গেলেন ইন্সপেক্টর। 'কদ্দিন বলেছি একটা মোবাইল ফোন রাখো। কখন কী দরকার হয় কেউ কি বলতে পারে! আমার জন্যে নয়, ওর নিজের জন্যেই তো দরকার। আজকাল তো হাতে হাতে এখন মোবাইল। গোয়ালা, জেলেরাও মোবাইল ছাড়া চলতে পারে না।'

'জেলে মানে—।'

এবার একটা ধমকই দিয়ে ফেললেন ইন্সপেক্টর, তারপর বললেন, 'জেলে মানে যারা মাছ ধরে। কয়েকদিন আগে একটা রিপোর্টে পড়ছিলাম : কেরালার জেলেদের হাতে হাতে মোবাইল। যারা হাই সি-তে মাছ ধরতে যায় তাদের ট্যাঁকে থাকে মোবাইল। তীরে থাকে মালিকরা—তাদের সঙ্গে রীতিমত বিজনেস টক চালায় মাছ ধরতে ধরতে। কী মাছ ধরা পড়ল, কোথায় তার ভাল বাজার—সব কথা হয়ে যায় ফোনে ফোনে। জেলেদের দু-চারদিন বাদে তীরে ফেরার জন্যে হাঁ করে বসে থাকার দরকার নেই। বিগ ক্যাচ হলে ফোনে ফোনেই পার্টির কাছে মাছ বেচা পর্যন্ত হয়ে যায়। কয়েকটা কোম্পানি তো ওই জেলেদের কাছেই মোবাইল বেচে লাল হয়ে গেল। এক গ্লাস জল হবে, নাকি জলও নেই এ ঘরে!'

ব্যস্ত হয়ে মুখার্জিবাবু জাগ থেকে এক গ্লাস জল ভরে এগিয়ে দিলেন।

ঢকঢক পুরো গ্লাসটা শেষ করার পরে ইন্সপেক্টরের উত্তেজনা বোধহয় একটু কমেছিল। আর সেই ফাঁকেই মুখার্জিবাবু ফস করে জিজ্ঞেস করে বসলেন, 'যে দুটোকে ধরেছেন তারা কি খুন করার কথা স্বীকার করেছে?'

ইন্সপেক্টর তীক্ষ্ণ চোখে মুখার্জিবাবুর দিকে তাকিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'তুমি এ সব জানলে কোত্থেকে?'

'কৌশিকই বলেছে। ও তো সব কেসের কথাই আমাকে বলে।'

অথৈ জলে ভেসে যাওয়ার সময় মানুষ হাতের পাশে খড়কুটো পেলেও চেপে ধরে। অনেকটা সেই ভঙ্গিতেই ইন্সপেক্টর বললেন, 'ও, তুমি তো গোয়েন্দার সহকারী। তা, কৌশিক কি কেসটার মেরিট নিয়ে কিছু বলেছে তোমাকে?'

'ওই, আপনার কাছ থেকে যা শুনেছেন, তাই বলেছেন। আর কিছু নয়।'

'না-না, আমি যে পথে এগিয়েছি—সেটা ঠিক কি বেঠিক তাই নিয়ে—।'

'উহুঁ, ও নিয়ে একটা কথাও বলেন নি। শুধু বলেছেন—।'

'কী বলেছে?'

'বলেছেন, অবনীদা চেম্বারে আসতে পারেন। তা, আমি তো থাকছি না—আপনাকে যদি কোনও কাজের কথা বলেন, করে দেবেন।'

জলের খড়কুটো একটু বুঝি আশ্রয়ের মতো হয়ে উঠেছিল ইন্সপেক্টরের কাছে। সামান্য উৎসাহের গলায় বললেন, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, এ ব্যাপারে তোমার সঙ্গেও তো একটু কথা বলা যেতে পাবে।'

ঘরে ঢুকে কৌশিকের চেয়ারটায় বসে পড়লেন ইন্সপেক্টর।

মুখার্জিবাবুর মধ্যে ওঁর স্বাভাবিক তৎপরতা ফিরে এসেছিল। চটপট কাবার্ড খুলে একটা ফ্লাস্ক বার করে বললেন, 'স্যার, কাছেই একটা দোকানে খুব ভাল কফি বানায়। যাব আর আসব। আপনি এক মিনিট বসুন।'

ইন্সপেক্টর হ্যাঁ-না কিছু বলার আগেই প্রবীণ মানুষটি শাঁ করে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। ফিরে এলেন এক মিনিটের বদলে আড়াই মিনিটের মধ্যে। কাবার্ডে মক্কেলদের জন্যে কিছু কাপ-প্লেট আছে। মুখার্জিবাবু চটপট কাপ-প্লেট বার করে তোয়ালে দিয়ে মুছে কাপে কফি ঢেলে এগিয়ে দিলেন ইন্সপেক্টরের দিকে। 'খান স্যার, চিনি নেই।'

'আপনার?'

'নিচ্ছি স্যার।' মুখার্জিবাবু আর একটা কাপে কফি ঢাললেন কিছুটা, তবে সঙ্গে প্লেট নিলেন না।

কাপে একটা চুমুক দিয়ে ইন্সপেক্টর বললেন, 'বাহ্! ভাল কফি।'

প্রশংসা শুনে উৎসাহিত হলেন মুখার্জিবাবু, 'ফ্রেশ কফি। শুনেছি এই ম্যাড্রাস শপের নিজস্ব একটা বাগান আছে তামিলনাড়ুতে। শীতকালে কিন্তু কফি খেতে বেশ লাগে। তবে শীতটা হঠাৎ খুব কমে গেছে, না?'

এই প্রশ্নের উত্তরের ধারেকাছে গেলেন না পুলিশ অফিসার। গম্ভীর মুখে কফিতে আর একটা চুমুক দিয়ে বললেন, 'তুমি তো আমার এই কেসের গোড়ার দিকের ব্যাপারটা শুনেছ কৌশিকের কাছ থেকে। এখনকার ডেভেলপমেন্টটা শোনো এবার। কী হল, দাঁড়িয়ে কেন? বোসো।'

মুখার্জিবাবু বসে পড়লেন সামনের চেয়ারে। কফিতে আরও একটা চুমুক দিয়ে ইন্সপেক্টর পকেট থেকে বড়সড় একটা রুমাল বার করে মুখচোখ মুছে নিয়ে বললেন, 'সাদা চামড়ার লোক বলে ঝামেলাটা আরও বেড়েছে। একটা নয়, দুটো নয় ; তিন-তিনটে খুন। দুটো সাহেব আর একটা মেম। একটা সাহেব আর একটা মেমের বডি আইডেনটিফায়েড হয়েছে। দুটোই আমেরিকান। বখে-যাওয়া আমেরিকান। এদেশে নেশা করতে এসেছিল। গাঁজা-ভাঙ-চরস-সিদ্ধি—এই সব। নেশাখোরদের যা হয় তাই হয়েছিল, অর্থাৎ চট করে এ দেশের আন্ডারওয়ার্ল্ড এলিমেন্টদের খপ্পরে পড়ে গিয়েছিল। তা ওখানেই থাকলে পারতিস, এখানে মরতে এলি কেন?'

'ওখানে মানে কোথায়?'

'বেনারসে। ওখানে বাবা বিশ্বনাথের চরণে ঠাঁই নিলে আমাকে আর এই ধকলের মধ্যে পড়তে হত না—।'

ইন্সপেক্টরকে থামিয়ে দিয়ে মুখার্জিবাবু বললেন, 'আপনি যে লোকদুটোকে ধরেছেন তারা এই ধরনের কথা বলেছিল না?'

'হ্যাঁ, তা বলেছিল, কিন্তু তিন নম্বর সাহেবটা? এই তিন নম্বর সাহেবটার জামাপ্যান্ট খুলে নেওয়া হয়েছিল। গায়ে একটা সুতোও ছিল না। আর ওর মুখটা ভারী কিছু দিয়ে এমন ভাবে থেঁতলে দেওয়া হয়েছে যে, লোকটাকে দেখতে কেমন ছিল—বোঝার কোনও উপায় নেই। এই বডিটা শনাক্ত করা যায়নি।'

'লোকদুটোকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কোনও হদিস পাননি?'

'না-না, পেলে তো কথাই ছিল না। এন্তার জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। সকাল, দুপুরে, মাঝরাত্তিরে। বেধড়ক পিটিয়েছি, কিন্তু মুখ থেকে কিচ্ছু বার করতে পারিনি। পাক্কা ক্রিমিনাল। এখন মুশকিল হল—আর দু-চারটে দিন হয়তো লক-আপে রাখতে পারব, কিন্তু তার পরে পারা যাবে বলে মনে হয় না। জামিন পেয়ে যাবে। বুঝতে পারছি—ওরাই খুনি, কিন্তু সেটা প্রমাণ করার মতো কিছুই আমার হাতে আসেনি এখনও।'

মুখার্জিবাবুর মুখে চিন্তার ছাপ। কফির কাপটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ, কিন্তু সেখানেও এক ফ্যাকড়া। সাহেব-মেমকে গলার নলি কেটে খুন করার বারো ঘণ্টা আগে খুন করা হয়েছে ওই মাথা-থ্যাঁতলানো সাহেবটাকে। মৃত্যুর কারণ—মাথায় ভারী-কিছু দিয়ে আঘাত নয়, গলায় ফাঁস দিয়ে মারা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই ক্রিমিনাল দুটো ওদের দু' ভাবে খুন করল কেন? আর ওই বারো ঘণ্টার সময়ের তফাতই বা কেন? আর খুন করার মোটিভই বা কী?'

'পাশপোর্ট, টাকা পয়সা হাতানো হয়তো—।'

'নো। নেশাভাঙ-করা সাহেব-মেমের কাছ থেকে ওগুলো হাতাবার জন্যে খুন করার প্রয়োজন নেই। নেশা চড়িয়ে দিয়ে বেহেড করলেই ওগুলো হাতানো যেত। তা ছাড়া এই সব সাহেব-মেম বড়-বড় হোটেলে দেখা দামি পোশাক-আশাক পরা সাহেব-মেম নয়। কলকাতার রাস্তাঘাটে বেশ কিছু সাহেব-মেম দেখা যায় না—যারা ভদ্রলোকের পাতে দেওয়ার মতো নয়। সাহেবের পরনে হয়তো নোংরা একটা পাজামা, খালি গা, পায়ে হাওয়াই চপ্পল। মেমসাহেবের পরনে নোংরা পাজামা আর গেঞ্জি। ওরা যে বিদেশি তার প্রমাণ হল গলায় ঝোলানো চৌকো একটা থলি। ওই থলির মধ্যে থাকে পাশপোর্ট আর টাকা পয়সা। যে দুটোকে গলার নলি কেটে খুন করা হয়েছে ওরা হল ওই ভবঘুরে-মার্কা। ওদের সঙ্গে বেশি টাকা পয়সাও থাকে না।'

'মেমসাহেবের বয়স কত?'

'ইয়ং, তবে তুমি যা ভাবছ—তা নয় মুখার্জি। শি ওয়াজ নট রেপ্‌ড। একবার ভেবেছিলাম, মেয়েটাকে নিয়ে দুই সাহেবের মধ্যে লড়াই বেধেছিল—। কিন্তু, তা নয়। তিনজন এক দলেরও নয়। গলার নলি-কাটা সাহেব-মেম দুটো পাঁড় নেশাখোর। মাথা-থ্যাঁতলানো সাহেবটা নেশাভাঙ করত না—পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট বলছে। তার মানে ওই সাহেবকে খুন করার জন্যেই পোড়ো বাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছিল।'

'কোনও ফিঙ্গার প্রিন্ট—।'

'না-না, কিচ্ছু পাওয়া যায়নি। ফরেনসিক এক্সপার্টের ফাইন্ডিংসের দিকে তাকিয়ে

ছিলাম আমি। ভেবেছিলাম আঙুলের ছাপ পাব, এই দুটো ক্রিমিনালের আঙুলের ছাপের সঙ্গে তা মিলে যাবে। আমার কপাল তো, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখছি একটুর জন্যে অঙ্ক মেলে না।'

'যে দুটো লোককে ধরেছেন তারা কি সত্যিই পাকা ক্রিমিনাল?'

একটু অসন্তুষ্ট হয়ে ইন্সপেক্টর উত্তর দিলেন, 'পুলিশের চাকরিতে বহু বছর হয়ে গেল, আমি স্রেফ ছায়া দেখে বলে দিতে পারি—লোকটা দাগি কি না। ওই দুটোকে লক-আপে পুরেই আমি রেকর্ডের খোঁজ করেছিলাম—। লোকদুটোর গুণের কোনও ঘাটতি নেই। বেশ কয়েকবার পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। চুরি, ছিনতাই, স্মাগলিং, কিডন্যাপিং—কী চার্জ নেই ওদের নামে?'

'খুনের চার্জ ছিল কি কখনও?'

'না, মার্ডার চার্জটা নেই। এবারই শুধু—। তবে মহা ঘোড়েল পার্টি। একটুর জন্যে প্রমাণটা হাতে আসছে না আমার—।'

মুখার্জিবাবু একটু কেশে গলা সাফ করে বললেন, 'আপনার কি ধারণা এরাই খুনি?'

গাঁক-গাঁক করে জবাব দিলেন ইন্সপেক্টর, 'ধারণাফারনা নয়, আমি হান্ড্রেড পার সেন্ট শ্যিওর। দে আর দ্য মার্ডারার্স্। কিন্তু ওদের খুনি বলে প্রমাণ দিতে পারছি না, কারণ অল্পের জন্যে ওটা হাতে আসেনি এখনও। চাকরি থেকে রিটায়ার করার সময় এসে গেছে প্রায়। সাবা জীবন ধরে বিচিত্র ধরনের অপরাধী ঘেঁটে ঘেঁটে আমার চোখ এখন, ওই যাকে বলে, এক্স-রে আই হয়ে গেছে। কোনও অপরাধীর সামনে দাঁড়ালেই তার ভেতরটা দেখতে পাই পরিষ্কার।'

কফি ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। এক চুমকে সেটা মেরে দিয়ে ইন্সপেক্টর একটু নিচু গলায় বললেন, 'আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে, একটু গ্যাম্বল করা বলতে পারো।'

উৎসাহী শ্রোতার গলা আরও নিচু হল 'কী?'

দাগি লোকদুটোর সঙ্গে এবার ভাল ব্যবহার করব। এমন ভাবভঙ্গি করব যেন ওদের গপ্পো বিশ্বাস করে ফেলেছি আমি। কাল সকালে ওদের কোর্টে প্রোডিউস করতে হবে। আমার রিপোর্টে থাকবে—ইনভেস্টিগেশন ইজ ওভার। ব্যস, তা হলে ওদের বেল পেতে কোনও অসুবিধে হবে না। তার পরেই শুরু হবে আমার দ্বিতীয় দফার কাজ। যে পোড়োবাড়িতে এই লোকদুটোর ঠেক, যেখান থেকে বডি-তিনটে পাওয়া গেছে ; সেখানে আড়াল থেকে নজর রাখার জন্যে দুটো ইনফর্মার ফিট করব। আর একটা লোক ছদ্মবেশে ওদের শ্যাডো করবে। কোথায় যাচ্ছে, কী করছে, কার সঙ্গে কথা বলছে—সব রিপোর্ট করবে আমাকে। এই কাজে যে ইনফর্মারটা খুব নির্ভরযোগ্য—সে এখন দেশে। বাকি যার কথা ভাবছি, সে একটু অলস প্রকৃতির, মধ্যিখানে দু-চার ঘণ্টা অন্য ধান্দাতেও যেতে পারে। তাই যদি হয়, আমার পুরো পরিকল্পনাটাই মাটি। খুন হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই আমি স্পটে পৌঁছে লোকদুটোকে ধরে ফেলেছি। তার মানে খুনের পরে প্রমাণ-সাক্ষী লোপাট করার জন্যে খুনিরা যা করে, সেই কাজগুলোর এখনও কিছু-কিছু বাকি। এখন যদি সর্বক্ষণ ওদের ছায়ার মতো অনুসরণ করা যায়, কিছু প্রমাণ-ট্রমান আমার হাতে এসে যাবে নির্ঘাত। আমি তাই বলছিলাম কি—।'

'কী?'

'তুমি যদি এই কাজটা করতে পারো মুখার্জি। এই কাজে তোমার খুব সুনাম শুনেছি কৌশিকের মুখে। তোমার হাতে তো কাজটাজ নেই এখন। কৌশিকের সঙ্গে আমার যা সম্পর্ক, তোমার সার্ভিস নিলে ও নিশ্চয়ই কিছু মনে করবে না।'

'না-না, কিছু মনে করার প্রশ্নই উঠছে না। তা ছাড়া উনি তো আমাকে বলেই গেছেন—আপনি কোনও কাজ দিলে যেন করি।'

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে চাপা গম্ভীর গলায় ইন্সপেক্টর বললেন, 'গোয়েন্দার অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে পাঁচজন তো তোমাকে চেনে,—সুতরাং—।'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মুখার্জিবাবু বললেন, 'ভেক ধরতে হবে তো? ও নিয়ে আপনি কিছু ভাববেন না। একটা সময় যাত্রা-থিয়েটার করতাম, আমার মেক-আপ নেওয়ার হাত খুব ভাল। এমন ছদ্মবেশ ধরব যে আপনিও হয়তো চিনতে পারবেন না আমাকে।'

আর একবার হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠে পড়লেন ইন্সপেক্টর। 'ঠিক আছে। কাল সকাল ন'টার সময় থানায় চলে এসো। কী করতে হবে—সব বুঝিয়ে বলব।'।

চেম্বার থেকে চলে যাওয়ার সময় ইন্সপেক্টর ঘোষরায়কে একটু বুঝি নিশ্চিন্ত দেখাচ্ছিল।

॥ ৭ ॥

লঞ্চের দোতলার একটা চমৎকার ঘরে কৌশিক আর ওর পূর্ণদার থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। ঘরের দু-দিকে দুটো সিংগল খাট। বিছানা পরিপাটি করে পাতা : ওপরে ফুলতোলা চাদর। ঘরের মধ্যিখানে নিচু মাপের একটা কাঠের টেবিল, দু-পাশে দুটো প্লাস্টিকের চেয়ার। দেয়ালে লাগানো ছোট একটা কাবার্ডও আছে।

গণেশ এ ঘরে ওদের মালপত্তর আগেই ঢুকিয়ে দিয়েছিল। ঘরে পৌঁছে দেওয়ার পরে বলল, 'আপনারা তা হলে এখন বিশ্রাম নেন। কোনও দরকার পড়লে হাঁক পাড়লেই আমি হাজির হব। আমি নীচে যাচ্ছি। আমার নাম মনে আছে তো?'

মৃদু হেসে জবাব দিল কৌশিক, 'মনে আছে গণেশ, শ্রী গণেশচন্দ্র ঢালি।'

একগাল হেসে নীচে নেমে গেল গণেশ।

দু-হাত ওপরে তুলে আড়মোড়া ভেঙে পূর্ণদা ঝলমলে মুখে বললেন, 'ওয়ান্ডারফুল! এমন একটা অসাধারণ ট্রিপ হবে—আমি কল্পনাও করতে পারিনি! সত্যি কথা বলতে কি—এখানে পৌঁছবার আগে পর্যন্ত বেশ একটু দুশ্চিন্তার মধ্যেই ছিলাম। সাহেব-মেমকে সত্যি-সত্যি পাব কি না, পেলেও ব্যবস্থা কেমন হবে—এই নিয়ে দুশ্চিন্তা। খুব বড়-বড় কথা বলে তো তোমাকে নিয়ে এসেছি—এখন এসে যদি দেখতাম সব ভোঁ-ভাঁ, আমার লজ্জার আর শেষ থাকত না।'

কৌশিক হেসে উঠল। 'চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার এটা একটা কুফল পূর্ণদা। হাতে এখন আপনার প্রচুর সময়, তাই মনের আনন্দে দুর্ভাবনা করার সময় পাচ্ছেন অঢেল। তবে আপনার তো এটা হওয়ার কথা নয়, আপনার বইপত্তরের জগৎ আছে। এখন অবশ্য

একটা বইই আপনার মাথায় ভর করেছে, তা হল ফ্রাসোয়াঁ বার্নিয়েরের ওই ভ্রমণবৃত্তান্ত। তাই না?'

ছেলেমানুষের মতো দু দিকে মাথা নাড়াতে নাড়াতে জবাব দিলেন পূর্ণদা, 'উহুঁ, আই অ্যাম নাউ মোর ইন্টারেস্টেড ইন বার্নিয়ের'স বংশধর। আমি জোসির সঙ্গে কথা বলতে বলতে রীতিমত রোমাঞ্চিত হচ্ছিলাম। ভাবা যায়, আজ থেকে সাড়ে-তিনশো বছর আগে যে বিখ্যাত পর্যটক বাংলাদেশ, সুন্দরবন বেড়িয়ে গেছেন ; তার বংশধরের সঙ্গে আমরা এখন গল্প করছি। কোথায়? না, সুন্দরবনে! সত্যি কথা বলতে কি, আমার বারবার মনে হচ্ছে—আমি ইতিহাসের কয়েকটা জ্যান্ত পাতার সামনে দাঁড়িয়ে আছি!'

সায় দিয়ে কৌশিক বলল, 'এ ভাবে ভাবলে সত্যি একটু গা-ছমছম করারই কথা। তবে আমার যেটা অবাক লাগছে তা হল—পূর্বপুরুষের লেখা অতকাল আগের একটা ভ্রমণকাহিনী পড়ে ভদ্রমহিলা এতটাই মুগ্ধ যে, সত্যি-সত্যি সুন্দরবন দেখতে চলে এলেন!'

'শুধু আসাই নয়—সোনার বাংলার বর্ণনা পড়ে এত চার্মড যে, এখানে আসার আগেই কত কষ্ট করে বাংলা শিখে নিয়েছে।'

মৃদু তর্ক করার গলায় কৌশিক বলল, 'ওর একটা অ্যাডভানটেজ ছিল, যাকে বলে অ্যাডেড অ্যাডভানটেজ ; বাংলা শেখার জন্যে একটা বাঙালি স্বামী পেয়েছিল।'

উত্তরে প্রায় ধমকেই উঠলেন পূর্ণদা। 'বাজে কথা রাখো তো। ইউরোপে সাদা চামড়ার মেয়ে বিয়ে করে তাকে বাংলা শেখাতে যাবে বাঙালি স্বামী? বরং উল্টোটাই ঘটবে। বাঙালি স্বামী চেষ্টা করবে—কত তাড়াতাড়ি মাতৃভাষাটা ভোলা যায়। বাঙালি ছেলেদের আমার খুব চেনা আছে।'

হাসি মুখে প্রতিবাদ জানাল কৌশিক। 'সব বাঙালির ছেলেকে এক ভাবে দেখবেন না। আমিই তো আলাদা ধরনের।'

পূর্ণদাও হাসলেন। 'বিয়ে করো আগে, তারপর বোঝা যাবে। তবে হ্যাঁ, বাঙালি মেয়ে বিয়ে করলে একটু-আধটু দাপট দেখালেও দেখাতে পারো। কিন্তু সাদা চামড়ার বিদেশিনী বিয়ে করলে পায়ে-পায়ে ঘুরে মিউ-মিউ করবে। আর তখন তোমার প্রথম কাজই হবে—বাংলাটা ভোলার প্রাণপণ চেষ্টা করা।'

'ব্যতিক্রম তো আছে।'

'সেই জন্যেই তো বলে, ব্যতিক্রম প্রুভ্‌স দ্য রুল। চলো, লঞ্চের চারদিকটা একবার দেখে আসি।'

ঘরের ভেজানো দরজা খুলেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন পূর্ণদা। 'আরে! লঞ্চ এর মধ্যেই এতটা চলে এসেছে!'

মাঝনদীতে লঞ্চ।

হাসনাবাদের খেয়াঘাট বহু দূরের ঝাপসা একটা ছবি হয়ে গেছে। ওপারে সবুজ একটা রেখা। নদীর ঘোলা জলে খুব একটা ঢেউ নেই। ছুটন্ত লঞ্চের দু পাশে শুধু বড়-বড় ঢেউ ভাঙছিল। খোলামেলা বাতাস ডাঙার চাইতে একটু বেশি ঠাণ্ডা।

সারেংয়ের ঘর পেরিয়ে লঞ্চের সামনের দিকে এগিয়ে এল কৌশিক আর পূর্ণদা। ঝকঝকে সাদা রংয়ের লঞ্চ। দু দিকে কাঠের রেলিং। লঞ্চের সামনের দিকে নিচু মাপের একটা চৌকি। তার ওপর বাহারি একটা চাদর পাতা। হাওয়ায় যাতে ওটা উড়ে না যায়

তার জন্য চাদরের চারটে প্রান্ত চৌকির পায়ার সঙ্গে বাঁধা। মাথার ওপরে হলুদ পলিথিনের আচ্ছাদন। ওটা ভেদ করে চাপা হলুদ আলো ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে। এদিক-ওদিক গোটা ছ-সাতেক প্লাস্টিকের চেয়ার। পূর্ণদা বললেন, 'বাহ্! বসার জায়গাটা তো চমৎকার। চারদিকের প্রকৃতি আর নদী দেখতে দেখতে গল্প করা যাবে।'

ডানদিকে রেলিংয়ের পাশে মোটা দড়ির একটা বেড়ের ওপর ভারী লোহার নোঙর বসানো। ডানদিক দিয়ে ঘুরে লঞ্চের পেছন দিকে এল ওরা।

পেছনে চিমনি, পাশে জলের ট্যাঙ্ক ; আরও পেছনে একসারি ফুলের টব। দূরে দূরে কয়েকটা জেলে-নৌকো। কচুরিপানার ঝাঁক ভেসে যাচ্ছে জলে। ঝাঁকের ওপর মাছরাঙা। কখনও-কখনও মাছরাঙা রঙ-বাহারি পাখা হাওয়ায় ভাসিয়ে ছোটখাটো চক্কর মারছে, তারপর ছোঁ মেরে জলের ওপর থেকে মাছ ধরে উড়ে যাচ্ছে আকাশে। ওই দৃশ্যের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকার পরে কৌশিক ভরাট গলায় বলল, 'সত্যি পূর্ণদা, আপনাকে কী বলে যে ধন্যবাদ জানাব! অসম্ভব একটা ভাল জায়গায় বেড়াতে এনেছেন।'

পূর্ণদা কৌশিককে একবার ভাল ভাবে দেখে নেওয়ার পরে কেটে কেটে বললেন, "যাক, বাঁচালে! তোমার 'ধন্যবাদ' শোনার জন্যে আমি কখন থেকে হা-পিত্যেশ করে বসে আছি!"

পূর্ণদার কথায় গলা ছেড়ে হেসে উঠেছিল কৌশিক। তারপর দুজনে হাসতে হাসতে ঘরে এসে ঢুকল। পূর্ণদা বললেন, 'নাও, চটপট তৈরি হয়ে নাও। সাহেব-মেমের কাছে এক ঘণ্টা মানে একঘণ্টাই। একঘণ্টা বাদেই লাঞ্চের ডাক পড়বে।'

চটপটই তৈরি হয়ে নিল দুজনে। বাইরের পোশাক পাল্টে পাজামা-পাঞ্জাবি। কৌশিক পূর্ণদার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী হল, আপনি বলেছিলেন যে লুঙ্গি পরবেন!'

একটু অপ্রস্তুত হলেন মানুষটি। 'পরব, পরে পরব। একটু ফ্যামিলিয়ার হয়ে নিই ওদের সঙ্গে।' পাঞ্জাবির ওপরে শালটা ছোট করে জড়িয়ে নিলেন পূর্ণদা।

কিছুক্ষণ বাদেই গণেশ এসে হাজির হল। 'আসেন, ভাত দিয়েছে আপনাদের।'

পূর্ণদা বললেন, 'ঠিক আছে, যাও যাচ্ছি।'

গণেশ সরে যেতেই কৌশিক বলল, 'এতক্ষণ বাদে একটু সুন্দরবনী টাচ পেলাম। অন্য জায়গা হলে সাহেব-মেমের অতিথিদের কাছে এসে বলা হত: আইয়ে সাব, খানা রেডি।'

মৃদু হেসে পূর্ণদা বললেন, 'চলো। খাবারের ডাক শুনতেই মনে হচ্ছে বেশ খিদে পেয়ে গেছে। আসলে সকালে তাড়াহুড়ো করার জন্যে ঠিকমতো ব্রেকফাস্ট হয়নি। কিংবা এমনও হতে পারে—খিদে পাওয়ার পেছনে আছে এখানকার জলহাওয়ার গুণ।'

নীচে নেমে এসে ওরা দেখল, জোসি একটা প্লেটে স্যালাড সাজাচ্ছে। ওদের দেখে একটু ঝুঁকে পড়ে বলল, 'নোমোস্কার।'

পূর্ণদা হাত তুলে হাসতে হাসতে বললেন, "দেখা হলেই নমস্কার বলে গ্রিট করে না বাঙালিরা । প্রথম মিটিংয়ে নমস্কার, আর ফাইনালি চলে যাওয়ার সময় নমস্কার। এখন শুধু 'আসুন আসুন' বললেই হবে।"

জোসি হাত জোড় করেই বলল, 'আসুন আসুন।'

চমৎকার ভাবে সাজানো টেবিল। ঝকঝকে চিনে মাটির প্লেট, আর প্লেটের চারদিকে

কাঁটা-চামচ। মধ্যিখানের পাত্রগুলোও একই সেটের। ভাত, আলু সেদ্ধ, গোলমরিচ-ছড়ানো ঢ্যাড়শ সেদ্ধ, ডাল সেদ্ধ আর মাছ। বড়-বড় গোটা ছয়েক মাছকে কৌশিকের প্রথমে কাঁচা বলেই মনে হয়েছিল। একটু খুঁটিয়ে দেখে বুঝল, ওগুলো বেক্ করা। একপাশে বড় বাটিতে অল্প ভাত।

চেয়ারে বসে পরে পূর্ণদার বেশ মেজাজ এসে গিয়েছিল। খুশি-খুশি গলায় বললেন, 'জোসি, তুমি নিশ্চয়ই তোমার কুক্কে অ্যাসিস্ট করেছ?'

জোসির মুখে হাসি বুঝি লেগেই থাকে, সেই জন্যে হয়তো ওর সব সময় আলাদা করে হাসার দরকার হয় না। সোনালি চুল ঝাঁকিয়ে জবাব দিল, 'সব না। একটু-একটু। তবে আমি বাংলা রান্না জানি। আমার আগের বার্র্ শিখিয়েছে।'

'বার্র্!'

ডেভিস জোসির সাহায্যে এগিয়ে এল। 'শি মিন্স হার এক্স-হাবি—।'

খোলা গলায় হেসে উঠলেন পূর্ণদা। 'ওহ্! বার্র্ মানে বর। তোমার প্রাক্তন বর।'

সোনালি চুলের ঢেউয়ে একবার আঙুল চালিয়ে নিয়ে জোসি বলল, 'অ্যান্নীশ ওয়াজ আ ওয়ান্ডারফুল কুক। আমাকে অনেক বাংলা ডেলিকেসি রেঁধে খাইয়েছে। আমি কয়েকটা শিখে নিয়েছি।'

'খুব ভাল, তা অনীশের সেকেন্ড নেম কী?'

'ডাটা।'

'অনীশ দত্ত। বাহ্! তা হলে তুমি শুধু বাংলা ভাষাই শেখোনি, বাঙালি রান্নাও শিখেছ। ভেরি গুড।'

জোসি প্রতিটি প্লেটে দু-চামচ করে ভাত তুলে দিয়ে বলল, 'প্লিজ, খান আপনারা—।'

শুরু হল লাঞ্চ। টেবিলে সাজানো খাদ্যবস্তু থেকে যে যার পছন্দসই আইটেম তুলে নিল প্লেটে। ডেভিস প্রথমেই ছুরি দিয়ে কেটে আধখানা মাছ তুলে নিল। কৌশিকরা দেখল সাহেব ন্যাটা। বাঁ হাতের কাঁটা দিয়ে নিপুণভাবে মাছের কাঁটা ছাড়িয়ে একটুখানি মুখে দিয়ে বলল, 'ই'টস ভেরি টেসট্‌ফুল। বাট হোয়াট ফিশ ইজ দিস?'

কৌশিক আর পূর্ণদা এই ধরনের মাছ আগে কখনও দেখেনি। দরজার আড়ালে রাঁধুনি ছিল। একটু গলা তুলে কৌশিক জিজ্ঞেস করল, 'এটা কী মাছ? নাম কী মাছের?'

রাঁধুনি কাঁচুমাচু মুখে এগিয়ে এসে বলল, 'এটা ভাঙ্গান মাছ, এই নদীর। বাগদার খোঁজ করেছিলাম, কিন্তু জেলেরা দিতে পারেনি।'

পূর্ণদা তাকে আশ্বস্ত করার গলায় বললেন, 'না-না, তোমার মাছ খুব ভাল। সাহেবের ভীষণ ভাল লেগেছে।'

ডেভিসও রাঁধুনিকে বাহবা দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'ব্যাঙঅ্যান মাছ খুব ভাল।'

জোসি গোলমরিচ-ছড়ানো কয়েক টুকরো সেদ্ধ ঢ্যাড়শ প্লেটে তুলে নিয়ে কাঁটা দিয়ে গেঁথে গেঁথে খাচ্ছিল।

পূর্ণদা বেশ কিছু ভাত, আলু সেদ্ধ আর ডাল প্লেটে তুলে নিয়ে বললেন, 'জোসি, উড ইউ মাইন্ড আমরা যদি হাত দিয়ে খাই—।'

'নো-নো, নট অ্যাট অল, আপনার যেমন খুশি তেমন খান। প্লিজ—।'

পূর্ণদা কাঁটা-চামচ সরিয়ে রেখে পাঞ্জাবির হাতা গুটিয়ে হাত লাগালেন ভাতে। ওঁর দেখাদেখি কৌশিকও হাত দিয়ে খেতে শুরু করল। কিছুটা খাওয়ার পরে পরিতৃপ্ত মুখে

পূর্ণদা বললেন, 'এই সব বয়েল্ড আর বেক্‌ড ফুডই ভাল, স্পাইস অ্যাভয়েড করা উচিত। তাতে শরীর ভাল থাকে।'

জোসির মুখে দুষ্টু একটা হাসি ফুটে উঠেছিল। 'কিন্তু আংকল, আমি স্পাইস—মস্‌ল্যাঁ ভালবাসি। সোনার বাংলায় কত রকমের মস্‌ল্যাঁ আছে।'

খাবারের প্লেট থেকে হাত গুটিয়ে নিয়ে পূর্ণদা বললেন, 'সোনার বাংলার এই সব মশলাপাতির খবর তুমি কি ফ্রাসোয়াঁ বার্নিয়েরের বই পড়েই জেনেছ?'

কাঁধ পর্যন্ত নেমে আসা সোনালি চুলের ঢেউ নাচিয়ে জবাব দিল জোসি, 'হ্যাঁ।'

মৃদু উত্তেজনার ছাপ ছড়িয়ে পড়েছিল পূর্ণদার চোখেমুখে। 'তোমাকে বলা হয়নি, তোমাদের ফ্যামিলির এই গ্রেট ম্যান বার্নিয়েরের ট্রাভেল-স্টোরির আমি ভীষণ ভক্ত। ভাবা যায়, আজ থেকে সাড়ে-তিনশো বছর আগের লেখা বই। কী চমৎকার অবজার্ভেশন। গোটা পৃথিবীকে সোনার বাংলার খবর তো বার্নিয়েরই প্রথম দেন। আমি সত্যি ওঁর একজন ভীষণ অ্যাডমায়ারার।'

'আমি জানি, আপনার নেফিউ রনি আমাকে বলেছে।'

পূর্ণদার চোখে একই সঙ্গে বিস্ময় আর মুগ্ধতার আভা ফুটে উঠেছিল। 'জোসি, তুমি একটু বার্নিয়েরের গল্প শোনাও। দেয়ার মাস্ট বি মেনি স্টোরিজ অ্যাবাউট হিম ইন ইয়োর ফ্যামিলি। একটা ফ্যামিলিতে অত বড় একটা মানুষ জন্মানো কি চাট্টিখানি কথা! আচ্ছা উনি কি অল্প বয়েস থেকেই খুব পড়াশোনা নিয়ে থাকতেন? তোমার বাবা-কাকা-দাদুরা কী বলেন?'

জোসি ছুরি দিয়ে এক টুকরো আলু কেটে নিয়ে প্লেটে রাখল, তারপর বলল, 'না, একেবারেই নয়। সাড়ে তিনশো-চারশো বছর আগে আমাদের ফ্যামিলিতে কেউ তেমন পড়াশুনোই করত না। আমরা তখন পুরো ফার্মার ছিলাম। চাষ হত জমিতে। বার্নিয়েরের বাবা-মাও চাষের কাজ করত। বার্নিয়ের করত। বাট হি ওয়াজ আ বিট ওয়েওয়ার্ড। চাষের কাজে মন দিত না। দুষ্টুমি করত। দু-তিনবার বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল।'

'তাই!'

'আংকল আপনাকে একটু স্যালাড দিই?'

পূর্ণদা প্লেটটা একটু বাড়িয়ে দিলেন। জোসি পূর্ণদা আর কৌশিকের পাতে কিছুটা স্যালাড দিয়ে ডেভিসের দিকে ফিরতেই ও হাত তুলে নিষেধ করে ওর প্রিয় ব্যাঙঅ্যান মাছের বাকি অর্ধেকটাও ছুরি দিয়ে গেঁথে প্লেটে তুলে নিল।

জোসি এক টুকরো আলু মুখে ফেলে বলল, 'আমাদের গ্রামের নাম অ্যাজু। ইট ওয়াজ আ স্মল স্লিপি ভিলেজ। বার্নিয়েরের সময়ে ওখানে লোক খুব কম ছিল। গ্রামের মানুষজন ছিল খুব সিম্পল। গ্রাম ছেড়ে কেউ কোথাও যেত না। কিন্তু বার্নিয়ের ইন হিজ আর্লি ডেজ গ্রাম ছেড়ে একটা লম্বা ট্রিপে গিয়েছিল। ইট ওয়াজ নট অ্যান ইজি থিং দোজ ডেজ।'

'কোথায় গিয়েছিলেন?'

'নর্থ জার্মানি, পোল্যান্ড, সুইৎজারল্যান্ড অ্যান্ড ইতালি। তিন-চার বছর ঘুরেছিল। কিন্তু আংকল আপনি খাচ্ছেন না কেন?'

পূর্ণদা দু' টুকরো শশা আর টম্যাটো মুখে ফেলে দ্রুত চিবিয়ে নিয়ে বললেন, 'আর কোথায় গিয়েছিলেন?'

'পরে গিয়েছিলেন। মিশর, জেদ্দা অ্যান্ড মেক্কা। কায়রো ওর খুব ভাল লেগে গিয়েছিল। হি স্পেন্ট দেয়ার ওয়ান ফুল ইয়ার।'

'হিন্দুস্থানে কি তার পরেই এসেছিলেন?'

'তখন না, আরও পরে। একটা হিন্দুস্থান-বাউন্ড শিপে উঠেছিল। সমুদ্রে ছিল টুয়েন্টি-টু ডেজ। নেমেছিল সুরাটে। না, আমি আর কিছু বলব না এখন। আপনি খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন।'

কৌশিক সায় দিয়ে বলল, 'ঠিকই বলেছে জোসি, গল্প শুনতে গিয়ে কিছুই খাওয়া হচ্ছে না আপনার। আমরা তো এখন আছি। পরে আবার গল্প শুনবেন।'

ডেভিস মুচকি হেসে বলল, 'মুখের দুটো ফাংশান। কথা বলা আর খাওয়া। এ ব্যাপারে আমাকে বুদ্ধিমান বলতেই হবে। আই সেলডম টক হোয়াইল আই ইট।'

ডেভিসের কথায় হেসে উঠেছিল সবাই।

কৌশিক ইচ্ছে করেই প্রসঙ্গটা এবার অন্য দিকে ফেরাল। 'জোসি, আপনি ফ্রান্স থেকে ভারতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সালোয়ার-কামিজ কোত্থেকে জোগাড় করলেন?'

সালোয়ার-কামিজেব কথা উঠতেই জোসির লাল গাল দুটো আরও লাল হয়ে গেল। "ওহ্! বিউটিফুল আউটফিট! এটা আমাকে আমার এই ইন্ডিয়ান ফ্রেন্ড মালা প্যারিতে প্রেজেন্ট করেছে। ইট'স ভেরি কমফরটেবল। আমি দেশে ফিরেও পরব।"

'শাড়ি পরেছেন কখনও?'

'হ্যাঁ, পরেছি। অ্যান্‌নীশ শাড়ি পরতে আমাকে হেল্‌প করেছে। শাড়ি একা-একা পরা খুব কঠিন। বাট আই লাভ ইট। আই হ্যাভ ওয়ান উইথ মি হেয়ার। তুমি আমাকে শাড়ি পরতে হেল্‌প করবে?

প্রস্তাবটা শুনে কৌশিক একটু বুঝি আঁতকে উঠেছিল।

পূর্ণদা হেসে উঠে বললেন, 'তোমাকে ও কী করে শাড়ি পরাবে? শাড়ির ও কী জানে! ও তো ব্যাচেলর। বিয়ে-থা চট করে করবে বলেও মনে হয় না।'

কথাটা শুনে জোসির চোখ দুষ্টু-দুষ্টু হয়ে উঠেছিল। ওই চোখে কৌশিকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেন ইউ মাস্ট হ্যাভ মেনি গার্ল-ফ্রেন্ডস।'

ঢোক গিলে জবাব দিল কৌশিক, 'গার্ল-ফ্রেণ্ড আছে কি না জানি না, তবে দু-তিনজন বান্ধবী আছে।'

ডেভিস এবার ছুরি দিয়ে ভেটকি মাছের আর্ধেকটা কেটে নিয়ে প্লেটে তুলল। ওদিকে চোখ পড়তেই জোসি দু-টুকরো মাছ কেটে পূর্ণদা আর কৌশিকের প্লেটে তুলে নিয়ে বলল, 'মাছ খান। আমি জানি বেঙ্গলিরা মাছ খেতে খুব ভালবাসে। ফিশ অ্যান্ড রাইস।'

পূর্ণদা হাসতে হাসতে বললেন, 'আমি এখন নিরামিষ বেশি পছন্দ করছি। নিরামিষ বোঝো? মানে, ভেজ ডিশ।'

বলতেই ব্যস্ত হয়ে উঠল জোসি। সেদ্ধ আলুর প্লেটটা তুলে নিয়ে বলল, 'আপনাকে একটু পট্যাটো দেব?'

মাছ-সমেত হাত তুলে পূর্ণদা বললেন, 'না-না, ব্যস্ত হয়ো না। আমার যা লাগে তুলে নেব। তুমি তো কিছুই খাচ্ছ না। আমি কি তোমাকে একটু মাছ তুলে দেব?'

মিষ্টি হেসে জোসি বলল, 'নো, থ্যাঙ্কস। আমি নিচ্ছি।' ছুরি দিয়ে খুব সরু করে

একফালি ভেটকি কেটে নিয়ে প্লেটে তুলল জোসি।

গল্পে গল্পে এক সময় খাওয়া শেষ হয়ে গেল ওদের।

খাওয়ার টেবিলের একদম ধারের দিকে ছোট্ট একটা ওয়াশ-বেসিন আছে।

পূর্ণদা সেই বেসিনে হাত ধুয়ে ন্যাপকিনে হাত মুছতে মুছতে বললেন, 'দারুণ খেলাম জোসি। প্রতিটি আইটেমই চমৎকার।'

সায় দিয়ে কৌশিকও বলল, "হ্যাঁ, সত্যিই চমৎকার। ইট'স এ গ্র্যান্ড ফিস্ট!"

পূর্ণদা বললেন, 'তোমাকে দু-একটা বাঙালি খাবারের রেসিপি শিখিয়ে দিচ্ছি। ট্রাই করো। আমার মনে হয় তোমার ভাল লাগবে।'

আগ্রহী হয়ে জোসি বলল, 'বলুন।'

হাসতে হাসতে কৌশিক বলল, 'জোসি আপনি শিখুন। আমি একটু ওপর থেকে আসছি।'

আসলে কৌশিকের বেশ শীত লাগছিল। গায়ে শুধু একটা পাঞ্জাবি। খাওয়ার পরে শীত বোধহয় একটু বেশি করে চেপে ধরে। লম্বা পায়ে দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে লঞ্চের ওপর তলায় উঠে এসেছিল ও।

রোদ্দুর এখন আগের তুলনায় ম্লান, তবু এই রোদটাই ওর বেশ ভাল লাগছিল। হাওয়া লঞ্চের পেছন দিকে কম। ওই দিকে যাওয়ার পথে চিমনির কাছে এসে থমকে গেল কৌশিক। চিমনির ওপাশে গণেশ। লোকটা হাত তুলে দূরের একটা লঞ্চের দিকে কী যেন ইশারা করছে। দূরের ওই লঞ্চের ডেকেও একজন। ওই লোকটাও কী যেন ইঙ্গিতে জানাচ্ছিল। একটু বাদেই নদীর বাঁকে মিলিয়ে গেল ওই লঞ্চটা।

এবার দুলকি চালে এগিয়ে এল কৌশিক। তারপর গণেশের চোখে চোখ পড়তেই বলল, 'কী গণেশ, খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?'

একগাল হেসে গণেশ বলল, 'না, এবার খেতে যাব। আপনাদের খাওয়া হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ, খেয়েছি। হাওয়াটা ভারী সুন্দর। দূরে একটা ডিঙি নৌকো চোখে পড়ছে, কিন্তু আর কোথাও লঞ্চটঞ্চ দেখতে পাচ্ছি না তো?'

আর একগাল হেসে গণেশ জবাব দিল, 'এদিকে আর লঞ্চ কোথায় দেখবেন? সকালের দিকে দু-একটা আসে। যাই বাবু, সারেং ডাকছে।'

বিশাল চেহারার লোকটা আরও বিশাল ছায়া ফেলে এগিয়ে গেল সারেঙের ঘরের দিকে। ওদিকে তাকিয়ে থাকতে বেশ কয়েকটা ভাঁজ ফুটে উঠেছিল গোয়েন্দার কপালে।

॥ ৮ ॥

ভোরবেলায় লেকের চারদিকে লম্বা পায়ে একঘণ্টা চক্কর দেওয়ার পরে বাড়ির পথ ধরেছিলেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইন্সপেক্টর অবনী ঘোষরায়। আজকাল কাকভোরে হাঁটার সময় ওঁর মাথায় কিছু আধ্যাত্মিক চিন্তা ঘোরাফেরা করে। এটা হয়তো বয়স বাড়ার লক্ষণ। তবে

যারই লক্ষণ হোক না কেন, ওই ধরনের চিন্তাভাবনা খেলে গেলে ওঁর মনে বেশ একটু ফূর্তি আর ডোন্ট কেয়ারের ভাব আসে। আজ মনে হচ্ছিল : দারা-পুত্র-পরিবার-অপরাধী-বড় সাহেব—কেউ কারও নয়। সব মায়া। গুন গুন করে গাইলেন, 'হেসে নাও দু দিন বই তো নয়।' গান বড়বাবুর ঠিক আসে না। কিন্তু প্রাণে ভাব এলে, আর তখন তিনি যদি একা থাকেন, গাইতে দোষ কোথায়!

বড়বাবুর কোয়ার্টার্স থানার দোতলায়। থানার কাছাকাছি আসতেই আধময়লা পাজামা-পাঞ্জাবি পরা, দাড়ি-টুপিওয়ালা এক মুসলমান সেলাম ঠুকল। থানার বড়বাবুরা চলতে-ফিরতে এমন সেলাম, নমস্কার হরবখত পান ; সুতরাং তিনি সেদিকে আলাদা ভাবে নজর না দিয়ে একটু মাথা ঝাঁকিয়ে যেমন হাঁটছিলেন তেমনি হেঁটে গেলেন।

লোকটা এবার মিনমিনে গলায় বলল, 'স্যার, একটা কথা ছিল।'

বড়বাবু পেছনে না ফিরে গাঁক-গাঁক করা গলায় জবাব দিলেন, 'দশটার সময় থানায় এসো।'

'দরকারি কথা স্যার।'

বড়বাবু এবার ঘুরে দাঁড়িয়ে বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী?'

লোকটা দ্রুত পায়ে কাছে এসে এগিয়ে এসে বলল, 'স্যার, আমাকে চিনতে পারছেন না?'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এবার লোকটার দিকে তাকালেন ইন্সপেক্টর, তারপর ঝলমলে মুখে বললেন, 'আরে! তুমি তো জব্বর মেক-আপ নিয়েছ মুখার্জি! কোনও খবর আছে নাকি?'

'আছে স্যার, পচন আর ভোলার ব্যাপারে—।'

কপালে ভাঁজ ফেলে ইন্সপেক্টর জিজ্ঞেস করলেন, 'ওরা আবার কারা?'

'ওই সাহেব-মেম মার্ডার কেসের আসামি। আপনার খাতায় তো ওদের ভাল নাম লেখা আছে—বদ্যিনাথ আর মনোহর। কিন্তু ওদের মহল্লায় সবাই ওদের পচন আর ভোলা নামেই চেনে।'

থানার পাশেই ঝাঁকড়া একটা বটগাছ আছে, চোখের ইঙ্গিতে মুখার্জিকে ওই গাছের নীচে ডেকে নিয়ে গিয়ে ইন্সপেক্টর জিজ্ঞেস করলেন, 'খবরটা কী?'

শীতের ভোরের রাস্তা কেমন যেন ঝিমিয়ে আছে। আশেপাশে কেউ কোথাও নেই। তবে গলার স্বর খুব নামিয়ে মুখার্জিবাবু বললেন, 'কাল তো স্যার ওরা কোর্টে জামিন পেয়ে গেল, তারপর থেকে আপনার কথামতো আমি ওদের পিছু নিয়েছিলাম। জানেন তো স্যার ওরা একই বস্তির বাসিন্দা, কাছাকাছি ঘর। আমি পালা করে ওদের বাড়ির দিকে নজর রাখছিলাম। দিনের বেলায় ওরা আর বাড়ি থেকে বেরোয়নি। তবে আমার মন বলছিল রাত্তিরে বেরুবে। ওদের বাড়ির কাছাকাছি একটা রুটি-চাপাটি ভাত-ডালের দোকান আছে। সামনে বেঞ্চিটেঞ্চি পাতা। আমি ওখানেই বসেছিলাম। হঠাৎ দেখি—।'

'কী দেখলে?'

'দেখলাম একটা বড় কালো ট্রাঙ্ক রিকশায় চাপিয়ে পচন আর ভোলা বস্তি থেকে বেরুল।'

ইন্সপেক্টরের চৌকো মুখ কঠিন হয়ে উঠেছিল। 'তুমি পিছু নিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ স্যার, আর একটা রিকশায় চেপে আমি ওদের ফলো করেছিলাম। সোজা রাস্তা ছেড়ে ওরা গলির পথ ধরেছিল। দেড়-দু কিলোমিটার দূরে নেমে একটা পুরনো বাড়ির মধ্যে ট্রাঙ্কটাকে ঢোকাল।'

'তারপর?'

'আমি কাছেই একটা পান-বিড়ির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে নজর রেখেছিলাম। ঘণ্টাখানেক বাদে ওরা ওই বাড়ি থেকে বেরুল—খালি হাতে। তারপর আবার ওই গলির পথ ধরল। বুঝলাম বাড়ি ফিরে যাচ্ছে।'

সামান্য অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন ইন্সপেক্টর। 'কী আশ্চর্য! তখনই তো আমাকে খবর দেবে।'

কাঁচুমাচু মুখে মুখার্জিবাবু বললেন, 'তখনই তো খবর দেওয়ার জন্যে থানায় এসেছিলাম স্যার। কিন্তু বারোটা বেজে গিয়েছিল। ডিউটি-অফিসার বললেন, বড়বাবু শুয়ে পড়েছে। এখন ডাকা যাবে না। সকালে এসো।'

'কী আশ্চর্য! তুমি তো বলবে, জরুরি রেড করার ব্যাপার। বড়বাবুকে খবর দিন।'

মাথা চুলকে মুখার্জিবাবু বললেন, 'বলতে পারিনি স্যার। থানায় তখন বাইরের লোকজন ছিল—বোধহয় কোনও পেটি কেসের ব্যাপার। তা ভাবলাম, আপনি তো ভোরে বেড়াতে যান, তখন এসেই ধরব।'

কথাটা শোনার পরেই প্রতাপশালী ইন্সপেক্টরের তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। হাঁকডাক করে জিপ বার করলেন, তারপর দুজন আর্মড কনস্টেবলকে জিপে উঠতে বলে মুখার্জিবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমিও পেছনে উঠে পড়ো। কোথায় কী ভাবে যেতে হবে—ড্রাইভারকে বলো। বাড়িটা চিনতে পারবে তো?'

'হ্যাঁ স্যার। দরজার পাল্লার মাথার দিকে চক দিয়ে লেখা আছে—ছাপ্পানোর তিন।'

সূর্যের আলো অল্প-অল্প ছড়িয়ে পড়েছিল আকাশে। রাস্তা এখনও ফাঁকাই। একটা ঝাঁকুনি মেরে জিপ ছুটল রাস্তায়। কোন দিকে যেতে হবে—পেছনের সিটে বসে নির্দেশ দিচ্ছিলেন মুখার্জিবাবু।

মিনিট-পনেরোর মধ্যেই এসে গেল সেই বাড়িটা। ইন্সপেক্টর চাপা গলায় মুখার্জিকে বললেন, 'তুমি জিপেই বসে থাকো। কাউকে মুখ দেখাবে না। আমরা আসছি।'

ইন্সপেক্টর আর দুজন কনস্টেবল এগিয়ে গেল বাড়িটার দিকে। একটু বাদে দরজার কড়া নাড়তে লাগলেন ইন্সপেক্টর বেশ জোরে জোরে। দরজা খুলল বেশ কিছুক্ষণ পরে। তবে পুরোটা নয়, একটুখানি। কে যেন জিজ্ঞেস করল, 'কউন হো?'

উত্তরে এক ধাক্কায় দরজাটা খুলে ফেলে হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়লেন ইন্সপেক্টর। পেছন-পেছন কনস্টেবল দুজনও।

পুরনো ধাঁচের মাঠকোঠাগোছের বাড়ি। বাড়ির এক ধার দিয়ে খাড়াই সিঁড়ি নেমে এসেছে দরজা পর্যন্ত। মাঝবয়সী মোটাসোটাগোছের যে লোকটা দরজা খুলেছিল, তার ঘুমজড়ানো চোখে বিস্ময়। বোঝা যায়, কড়া নাড়ার শব্দেই লোকটার ঘুম ভেঙেছে। গায়ে কম্বল। বাজখাঁই গলায় ইন্সপেক্টর বললেন, 'এ বাড়ির মালিককে ডাকো।'

ফ্যাসফেসে গলায় জবাব দিল লোকটা, 'বাড়ির মালিক আমিই স্যার।'

লোকটার পা থেকে মাথা পর্যন্ত বার দুই দেখে নিয়ে ইন্সপেক্টর জিজ্ঞেস করলেন, 'কী নাম তোমার?'

'রঘু, রঘুপতি জালান।'

বিড়বিড় করে উঠলেন ইন্সপেক্টর, 'রঘু না ঘুঘু।' তারপর গলার স্বর এক পর্দা তুলে বললেন, 'কী করা হয়?'

'ছোটমোটো কারবার স্যার। চুন-বালি-সিমেন্টের একটা দুকান আছে।'

'এটা তো এক নম্বর কারবার, দু নম্বর কারবারটা কিসের?'

চোখ কপালে তুলে জবাব দিল লোকটা, 'আর কুছু করি না স্যার।'

ইন্সপেক্টরের গলায় এবার বাজ ডাকল। 'কাল রাত্তিরে যে মালটা ঘরে ঢুকেছে, সেটা বার করো।'

আকাশ থেকে পড়ল রঘু। 'কউন মাল স্যার? আমার কুনও মাল তো ইখানে আসে না। সব সিধা গোডাউনে যায়। আমার দুকানের কাছেই গোডাউন। আজ সকালেই এক লরি ইঁটা আসার কথা আছে।'

দাঁতে দাঁত ঘষলেন ইন্সপেক্টর। 'তুমি সত্যিই ঘুঘু। কাল রাত্তিরে তোমার এই বাড়িতে একটা ট্রাঙ্ক ঢোকেনি?'

'টেরাংক!'

'ট্রাঙ্ক বোঝো না? বাক্স, বাকস্—। একটা কালো রঙের বাক্স কাল রাত্তিরে তোমার এই বাড়িতে ঢোকেনি?'

একটু বুঝি থমকে গিয়েছিল রঘু। তারপর বেশ জোরের সঙ্গে দু-দিকে মাথা নাড়িয়ে বলল, 'কুনও বাক্স্-উক্স্ আসেনি স্যার।'

তীব্র চোখে রঘুর দিকে তাকালেন ইন্সপেক্টর, তারপর একটু কেটে-কেটে বললেন, 'কাল রাত্তিরে ভোলা আর পচন কালো রঙের যে বাক্সটা এই বাড়িতে ঢুকিয়েছিল—সেটা কোথায়?'

এবার চটপট উত্তর দিল রঘু। 'ওই সব নামে আমি কাউকে চিনি না স্যার।'

উত্তর শুনে খেপে গেলেন ইন্সপেক্টর। রঘুর গায়ে একটা ধাক্কা মেরে বললেন, 'চলো, উপর চলো। তোমার ঘরের তল্লাশি নেব।'

ইন্সপেক্টর ধরতে গেলে ঠেলতে ঠেলতেই ওপরে তুলে নিয়ে গেলেন রঘুকে। পেছনে কনস্টেবল দুজন। ওপরে উঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'ঘরে কি জেনানা-টেনানা আছে?'

'জি হাঁ। জেনানা ঔর লেড়কা।'

'ঘর থেকে বেরুতে বলো।'

রঘু ঘরে ঢোকার একটু পরে এক মহিলা একগলা ঘোমটা টেনে তিন-চার বছরের ঘুমন্ত একটা ছেলেকে কোলে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল।

লম্বাটে ধাঁচের ঘর। ঘরের এক দিকে বিছানা-পাতা চওড়া খাট। বেশ উঁচু খাট। তবু খাটের পায়ার নীচে দু খানা করে ইট গুঁজে খাট আরও উঁচু করা হয়েছে। একটু ঝুঁকে পড়ে ইন্সপেক্টর দেখলেন, খাটের তলা মালপত্তরে ঠাসা। ওঁর ইঙ্গিতে কনস্টেবল দুজন ওই সব মালপত্র টেনে টেনে বার করতে লাগল। বেশির ভাগই মুখ বাঁধা বস্তা। একটা কাঠের বাক্স আর একটা ছোট মাপের লোহার সিন্দুকও ছিল।

বস্তাগুলোর মধ্যে চাল, ডাল, পেঁয়াজ, আলু। কাঠের বাক্সের মধ্যে একগাদা কাঁসার বাসন। লোহার সিন্দুকের মধ্যে বেশ কিছু সোনা আর রুপোর গয়না, বিষয়-আশয়ের কয়েকটা দলিল আর ব্যবসার কাগজপত্র।

ঘরের দেয়াল-আলমারি দুটো খুলেও আপত্তিকর কিছু পাওয়া গেল না। এদিকে একটা কাঠের টেবিল আর চেয়ার। টেবিলের পায়ার কাছে একটা দেশি মদের শূন্য বোতল আর কাচের গ্লাস। বোতলটা দু-আঙুলে তুলে নিযে হাওয়ায় দুবার নাচিয়ে ইন্সপেক্টর রঘুর দিকে তাকিয়ে বলেলন, 'রাত্তিরে এত মাল টেনেও সকালে মাথা এত সাফ! আর ক'টা ঘর আছে?'

'ব্যস্ আর একটা।'

'জেনানাকে এবার ও ঘর থেকে এই ঘরে ডেকে নাও। আমরা ওই ঘরটা দেখব।'

তাই শুনে রঘু চলে গেল পাশের ঘরে। একটু বাদে আবার ওর বউ একগলা ঘোমটা টেনে ঘুমন্ত ছেলেকে কোলে নিয়ে বেরিয়ে এর ঘর থেকে। ওই ঘরে এবার সদলে ঢুকলেন ইন্সপেক্টর।

দ্বিতীয় ঘরটা গুদোম মার্কা। এক দিকে গোটা দুয়েক ভাঙা চারপাই, দাঁড়-করানো একটা খাটিয়া। ঘরের মধ্যিখানে একটা দড়ি টাঙানো, তাতে দু-তিনটে আধময়লা ধুতি, শাড়ি ঝুলছে। নীচের তাকে পেতলের একটা ঘড়া আর বাসনপত্তর। ও দিকে কাঠের একটা পাটাতনের ওপর লেপ-তোষক-তাকিয়া ডাঁই করা।

ঘরে ঢুকেই তল্লাশির কাজ শুরু করে দিয়েছিল কনস্টেবল দুজন। ওদিকের জিনিসপত্তর এদিকে এল, এদিকের জিনিসপত্তর ওদিকে গেল। কিন্তু বেকার খাটুনি, আপত্তিকর কিছুই পাওয়া গেল না।

ইন্সপেক্টর একটু বোধহয় মুষড়ে পড়েছিলেন। গম্ভীর মুখে হাতের লাঠি দেয়ালের কয়েকটা জায়গায় ঠুকলেন। নিরেট দেয়াল, কোথাও কোনও চোরাকুঠুরি নেই। রঘুর দিকে না তাকিয়েই জিজ্ঞেস করলেন, 'আর ঘর কোথায়?'

'ব্যস স্যার, আমার কামরা এই দুটাই।'

উত্তরে সন্তুষ্ট না হয়ে ইন্সপেক্টর ওই ঘব থেকে বেরিয়ে বারান্দার ধারের একচিলতে রান্নাঘরটায় ঢুকলেন, তারপর নাকে রুমাল চেপে বাথরুমটাও দেখে এলেন।

রঘু মুখ চুন করে দাঁড়িয়েছিল, তারপর করুণ গলায় বলল, 'বেকার তকলিফ উঠালেন স্যার। আমি ছোটমোটো কারবারি আদমি, উল্টাসিধা কুছু করি না।'

রঘুর কথার কোনও ছায়া পড়ল না ইন্সপেক্টরের মুখে। ওঁর চোখ ঘুরছিল চারদিকে। কোণের দিকের অন্ধকার-অন্ধকার জায়গায় কয়েকটা ঝুড়ি আর প্যাকিং-বক্স।

ওদিকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে ইন্সপেক্টর জিজ্ঞেস করলেন, 'আরে, এটা কি ছাতে যাওয়ার সিঁড়ি?'

'জি।'

'ছাতে কি ঘরটর আছে?'

'না স্যার, কুছু নেই।'

'তা হলে সিঁড়ি কেন?'

'সিরিফ একটা জলের টাংকি আছে।'

'আমরা ছাতে যাব।'

একটু বুঝি আঁতকে উঠে রঘু বলল, 'যাবেন না স্যার। ছাতের সিঁড়ি বহোত্ কমজোরি। কারপোরেশনের লোক এসে সিঁড়িটা ভেঙে দিতে বলেছে। আপনি উঠলে একটা একসিডেন্ট হয়ে যেতে পারে।'

কথাটা কানেই নিলেন না ইন্সপেক্টর। ওঁর ইঙ্গিতে কনস্টেবল দুজন হাত লাগিয়ে সিঁড়ির মুখের জমানো ঝুড়ি আর প্যাকিং-বক্সগুলো ঝপাঝপ সরিয়ে ফেলল। প্রথমে উঠলেন ইন্সপেক্টর, ওঁর পেছনে দুই কনস্টেবল। সবার শেষে রঘু। সিঁড়ির মাথায় চিলেকোঠা। ছোট্ট ছাত, ছাতের ধারে একগাদা বাঁশ।

চিলেকোঠার দরজায় শেকল লাগানো ছিল। একটানে শেকলটা খুলে ফেলে ভেতরে উঁকি মারলেন ইন্সপেক্টর। ঘরের ভেতরটা অন্ধকার-অন্ধকার, রাবিশ আর হাবিজাবি মালপত্তরে ঠাসা।

ঘরের মধ্যে কনস্টেবল দুজন ঢুকে পড়ে তল্লাশি নিতে শুরু করেছিল। বাইরে ইন্সপেক্টর আর রঘু। মালপত্তর টানাহ্যাঁচড়ার বিকট শব্দ উঠছিল মাঝেমধ্যে। একটু বাদে কনস্টেবল দুজন ধরাধরি করে কালো রঙের বিরাট একটা ট্রাঙ্ক বাইরে নিয়ে এল।

ট্রাঙ্ক খুলেই চমকে উঠলেন ইন্সপেক্টর। ট্রাঙ্কটা বোঝাই হাড়গোড়ে। ইন্সপেক্টরের চোখে রীতিমত আগুন ঝরছিল। রঘুর দিকে তাকিয়ে হিসহিসে গলায় বললেন, 'প্রথমে লাশ গায়েব। এখন হাড়গোড়ও গায়েব করা হচ্ছে!'

দু-কানের লতিতে আঙুল ঠেকিয়ে জিব কেটে রঘু বলল, 'রাম-রাম, ই কউনো আদমির হাড্ডি না স্যার। সব হাড্ডি জানবারের।'

রঘুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত আর একবার দেখে নিয়ে গাঁক-গাঁক করে ইন্সপেক্টর বললেন, 'হাড় মানুষের না জানোয়ারের—পরীক্ষা করলেই জানা যাবে। কিন্তু তুই ব্যাটা এতক্ষণ ধরে মিথ্যে কথা বলছিলি কেন?'

এবার একেবারে ভেঙে পড়ল রঘু। 'এ কাম খুব গন্দা কাম। আমাদের জাতে চোলে না। আমার চুনা-সিমেন্টের কারবার খুব ছোটমোটো। মগর মুলুকে বাপ-মা-ভাই-বহিন অনেক আছে। হামার কামাইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে সবাই। আমি টাকা না পেঠালে ওরা খেতে পায় না।'

থাবার মধ্যে ইঁদুর পেলে বেড়ালের চেহারা যেমন হয়, ইন্সপেক্টরের চেহারা এখন ঠিক সেই রকম। কেটে কেটে বললেন, 'তাই তুই রোজগার বাড়াবার জন্যে মানুষ খুনের কারবারে নেমেছিস?'

আর একবার আঁতকে উঠল রঘু। 'মানুষ না স্যার, সব জানবারের হাড্ডি। ধাপার ওদিকে একটা ময়দান আছে। সিখানে অনেক জানবারের হাড্ডিউড্ডি পড়ে থাকে। গাই, ভঁইসা, কুত্তা-উত্তা। তো, আমি লোক লাগিয়ে কুছ-কুছ হাড্ডিউড্ডি জোগাড় করি।'

'করে কী করিস? এ মাল এখন যাবে কোথায়?'

মাথা চুলকে রঘু বলল, 'ইক একটা অন্য ধরনের কারবার আছে স্যার। ফকির-উকির, তান্ত্রিক-উন্ত্রিক এই মাল কেনে। তারপর এগুলো দিয়ে তাগা-তাবিজ বানায়। এ সব নাকি বেমারি সারায়। কামও হয় কুছু-কুছু। আমার জান-পহেচান একটা লেড়কা একদম দুবলা-পাতলা হয়ে গিয়েছিল। তো, এক ফকির কালা সুতলি দিয়ে একটা জানবারের নখুন বেঁধে লেড়কার গলায় ঝুলিয়ে দিল। আজিব বেপার! তিন সাল কত দাওয়াই খেয়েছিল লেড়কা, কুছু হয়নি ; কিন্তু ওই জানবারের নখুন লাগিয়ে লেড়কা এক মাহিনার মধ্যে ইয়া তাগড়া হয়ে গেল।'

রঘুর চোখে চোখ রেখে ইন্সপেক্টর কেটে কেটে বললেন, 'তোর গলাতেও আমি এবার

জানোয়ারের নোখ-বাঁধা তাগা পরাব। চল, থানায় চল এবার।' তারপর কনস্টেবল দুজনের দিকে তকিয়ে নির্দেশ দিলেন, 'তোমরা ট্রাঙ্কটাকে জিপে নিয়ে গিয়ে তোলো। সাবধানে সিঁড়ি ভাঙবে।'

অপারেশন শেষ হয়ে গেল আধঘণ্টার মধ্যে।

শীতের সকালে রাস্তায় এখনও তেমন লোকজন বার হয়নি। বেশির ভাগ দোকানপাটেই ঝাঁপ বন্ধ।

ইন্সপেক্টর রঘুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুই জিপেব পেছনে গিয়ে বোস,' তার পরেই সংশোধন করলেন নিজেকে, 'না, তুই সামনে আয়।'

ড্রাইভারের পাশে বসল রঘু, তার পাশে ইন্সপেক্টর। পেছনে কালো ট্রাঙ্ক। দু পাশে দুই সরু সিটে দুই কনস্টেবল আর ছদ্মবেশী মুখার্জিবাবু।

থানায আসার পর ট্রাঙ্ক গেল মালখানায়, আর রঘুকে ঢোকানো হল লক-আপে। নিজের ঘরে ঢুকে ইন্সপেক্টর ঘোষরায় প্রথমেই ফোন করলেন ডক্টর দাসকে। পাওয়া গেল ডাক্তারবাবুকে। ইন্সপেক্টর বললেন, 'থানা থেকে বড়বাবু বলছি স্যার। আপনি যদি পাঁচ মিনিটের জন্যে একবার থানায় আসেন, খুব ভাল হয়। এখন রুগি দেখছেন? ঠিক আছে, কলেজে যাওয়ার পথে একবার ঘুরে যাবেন।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে ইন্সপেক্টর উল্টোদিকে বসা মুখার্জিবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ডক্টর দাস অ্যানাটমির প্রফেসর। এই পাড়াতেই থাকেন। আমাকে প্রথমেই জানতে হবে—হাড়গোড়গুলো মানুষের কি না। চা খাবে তো?'

মুখার্জিবাবুব জবাব দেওয়ার আগেই বেল বাজালেন বডবাবু। একজন কনস্টেবল উঁকি মারতেই বললেন, 'আমাদের একটু চায়ের ব্যবস্থা করো। আর শোনো, এর জন্যে কেক, বিস্কুটটিস্কুটও দিতে বলবে সঙ্গে।'

বড়বাবুকে একটু খুশি-খুশি দেখাচ্ছিল। হাসি মুখে মুখার্জিবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি খুব ভাল সার্ভিস দিয়েছ মুখার্জি। তোমার কাজে আমি খুব সন্তুষ্ট। যে কাজটা করলে তাতে দুটো জিনিসের দরকাব হয়। এক, ইনটেলিজেন্স ; দুই ডেডিকেশন। তা, বুদ্ধি আর কাজের প্রতি ঝোঁক—দুটোই তোমার আছে। মনে হয়, যে ভাবে আমরা এগোচ্ছি, ততে সুফল ফলবেই। এই রঘুটাকে তোলার পরে মনে হচ্ছে—আমার সন্দেহটা ঠিক। সন্দেহটা কী বলো তো?'

'কী?'

'ওই পচন আর ভোলা উটকো দুটো ক্রিমিনাল নয়, একটা বড় র‍্যাকেটের মেম্বার। একটু ছেড়ে খেলার যে খেলাটা খেলছি, সেটা যদি ঠিকমতো চলে, পুরো ঝাঁকটাকেই মনে হয় তুলতে পারব। পচন আর ভোলাকে আমি শেষের দিকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম—তোমরা বাপু নির্দোষ, আমি ভুল করে তোমাদের তুলে এনেছি। জামিনের ব্যাপারে তাই আর আটকাচ্ছি না। আসলে, আমি চাই—নির্ভাবনায় ওরা আবার চরে বেড়াক। অপকর্ম যেমন করছিল, তেমনি করুক। তোমরা শুধু আড়াল থেকে নজর রেখে যাও। তবে তোমরা বলতে আমি কিন্তু তোমার ওপরেই বেশি নির্ভর করছি।'

ইন্সপেক্টর টেবিলের ড্রয়ার খুলে কিছু টাকা বার করে মুখার্জিবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এটা তোমার কাছে রেখে দাও।'

'টাকা কেন স্যার।'

'আগে ধরো, তার পর বলছি।'

ইতস্তত করে মুখার্জিবাবু ভাঁজ করা টাকার বান্ডিলটা নিলেন। ইন্সপেক্টর বললেন, "টাকা দিচ্ছি টানা নজরদারি চালাবার জন্যে। দরকার মতো তোমাকে ট্যাক্সি, রিক্‌শা ভাড়া নিতে হবে। হোটেলে খেতে হবে। প্রয়োজনে আমাকে ফোন করতে হবে পাবলিক বুথ থেকে। পিছু নিতে গিয়ে লোকাল ট্রেনেও চাপতে হতে পারে। আমি 'ফেলো কড়ি মাখো তেলে' বিশ্বাসী। তোমার বেগার খাটুনি খাটার দরকার নেই।"

চা এসে গিয়েছিল। বড়বাবুর জন্যে কালো চা। মুখার্জিবাবুর চায়ের সঙ্গে চারটে বিস্কুট আর একটা কেকও ছিল।

চা খাওয়ার পরে বিশাল চেহারার ইন্সপেক্টর উঠে দাঁড়িয়ে কোমরের বেল্টটা একটুখানি ওপরের দিকে টেনে তুললেন, তার পর টেবিল থেকে খাটো মাপের লাঠিটা তুলে নিয়ে বললেন, 'যাই, রঘুপতিকে একটু কড়কে আসি, কড়কানোর ভাল বাংলা কী জানো? জিজ্ঞাসাবাদ।'

'মিনমিনে গলায় মুখার্জিবাবু বললেন, 'আমি তা হলে এখন আসি স্যার।'

'এসো। তবে নজরদারির কাজ যেমন চালাচ্ছিলে, টানা চালিয়ে যাও।'

॥ ৯ ॥

চমৎকার একটা আড্ডা বসেছিল লঞ্চের দোতলায়। একটু আগে নদীর আকাশ লাল করে সূর্য ডুবেছে। বাতাসে মৃদু ঠাণ্ডার ভাব, কিন্তু গায়ে গরম জামা বা শাল থাকলে এই শীত বেশ উপভোগ্য। অন্তত পক্ষে কৌশিক আর ওর পূর্ণদার তাই মনে হচ্ছিল। দুজনেই দুটো শাল গায়ে জড়িয়ে নিয়ে সারেংয়ের ঘরের সামনে গদিপাতা চৌকির ওপরে বসেছিল। ওদের দু দিকে দুটো ডেক-চেয়ার মার্কা চেয়ারে ডেভিস আর জোসি। জোসের পরনে সুতির স্কার্ট, ডেভিসের গায়ে ফুল-হাতা সুতির সার্ট।

একটু আগেই এক রাউন্ড চা হয়ে গেছে। একটা খাঁড়ির কাছাকাছি জায়গায় নোঙর ফেলা হয়েছে লঞ্চের। রাতে লঞ্চ এখানেই থাকবে। গল্প ছুটছিল বলগাহীন গতিতে। গল্পের একদিকে তিন-চারশো বছর আগেকার মুঘল ভারত, চতুর্দশ লুইয়ের ফ্রান্স—অন্যদিকে হালের বাগদা চিংড়ির চাষ ও হাসনাবাদ বাজারের সব্জির দর।

আকাশে ঝকঝকে জ্যোৎস্না। চাঁদ এখনও বোধহয় ওঠেনি। উঠলেও সুন্দরবনের ঠাসা ওই জঙ্গলের আড়ালে পড়ে আছে। ডেভিস বলল, 'একটু হুইস্কি খাওয়া যাক এবার। আপনারা খান তো?'

চমৎকার ভাবে হেসে জবাব দিলেন পূর্ণদা, 'পনেরো-বিশ বছর আগে দু-তিন বার খেয়েছি, কিন্তু আমার জিভ অ্যালকোহলের স্বাদটাকে ঠিক নিতে পারেনি। তার ফলে হার্ড ড্রিংকসের আর ভক্ত হতে পারলাম না। বাট মেনি অব মাই ফ্রেন্ডস ড্রিংক রেগুলারলি, অ্যান্ড আই গিভ দেম কম্পানি অলমোস্ট রেগুলারলি। আপনারা খান। আই অ্যাসিওর ইউ, আপনাদের ড্রিংকসের আসরে আমরা সঙ্গী হিসেবে খারাপ হব না।'

'কাউশিক, আই থিংক ইউ টেক হুইস্কি।'

ডেভিসের এই কথাটারও জবাব দিলেন পূর্ণদা। 'ও তো পাক্কা টিটোটেলার। কোনও রকম নেশাটেশা করে না। আমি তো তবু মাঝেমধ্যে সিগারেট-টিগারেট খাই।' বলার পরে আর এক দফা হাসলেন পূর্ণদা।

এবার সাহেবও হাসল। হাসতে হাসতে পূর্ণদার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই বয়েসেও যখন নন-ড্রিংকার হয়ে আছেন, আপনার আর ড্রিংকার হওয়ার চান্স নেই। আর কাউশিক ইয়াংম্যান, ওর সামনে গোটা জীবনটা পড়ে আছে, ড্রিংকার হতে চাইলে তার অনেক সুযোগ পাবে। আমরা তা হলে একটু ড্রিংক করি?'

'নিশ্চয়ই। উইথ অল প্লেজার।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।' বলার পরেই জোসির দিকে তাকিয়ে ডেভিস জিজ্ঞেস করল, 'হোয়াট ডু ইউ লাইক টু হ্যাভ?'

'কনিয়্যাক, জাস্ট আ স্মল ওয়ান।'

উত্তর শুনে ডেভিস আঙুল নাড়িয়ে পারভেজকে ডাকল। চটপটে, হাসিখুশি এই ছেলেটা ইতিমধ্যেই বোধহয় ডেভিসের খাস বেয়ারা হয়ে গিয়েছে। ডেভিস চাপা গলায় কী সব বলতেই তৎপরতা বেড়ে গিয়েছিল পারভেজের। প্রথমে ও বেঁটে একটা টেবিল এনে রাখল সাহেবের পাশে। তার পর দু-তিন দফা দ্রুত ওপর-নীচ করে ড্রিংকসের আয়োজন সম্পূর্ণ করে ফেলল।

মদের বোতল এল, গ্লাস এল, সোডা ও জল এল, এবং মিনিট-পাঁচেকের মধ্যেই কৌশিক আর ওর পূর্ণদার জন্যে এসে গেল কফি ও কাজু বাদাম। আড্ডার দ্বিতীয় দফা শুরুর মুখেই জঙ্গলের মাথা থেকে মাঝারি মাপের চাঁদ লাফিয়ে উঠল আকাশে।

ওই চাঁদের দিকে তাকিয়ে ছেলেমানুষের মতো হাততালি দিয়ে উঠল জোসি। 'ওহ্! লাভলি! এই হল এখানকার চাঁদ। চারদিকটা দেখুন, ঠিক যেন একটা পেন্টিং। বার্নিয়েরের লেখায় ঠিক এই রকম একটা ডেসক্রিপশন আছে। তখনকার সুন্দরবন আর এখনকার সুন্দরবন বোধহয় এক রকমই আছে। তাই না আংকল?'

হা-হা করে হেসে উঠলেন পূর্ণদা। 'কিছু মিল তো পাবেই। কিন্তু এই সাড়ে-তিনশো বছরের মধ্যে অনেক কিছুই আকাশ-পাতাল পাল্টে গেছে। সেই সন্দরবনের দশ ভাগের এক ভাগও আছে কি না সন্দেহ। আসলে লোকসংখ্যা তো বহু গুণ বেড়ে গেছে। তাদের থাকার জন্যে বন কেটে বসত হয়েছে। বসত বোঝো? যাকে বলে হিউম্যান হ্যাবিটেশন। তবে হ্যাঁ, প্রকৃতি মোটামুটি এক রকমই আছে।'

ঘন জঙ্গলের মাথার ওপরে ওঠা চাঁদের দিকে আর একবার তাকিয়ে নিয়ে জোসি মুগ্ধ মানুষের গলায় বলল, 'সত্যিই, সোনার ব্যাংলা!'

'ব্যাংলা নয় বাংলা। সোনার বাংলা।'

পূর্ণদার কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সংশোধন করল জোসি, 'রাইট, সোনার বাংলা। আসলে আমাদের দেশে সব সময় বেঙ্গলি না পাওয়ার জন্যে আমার বাংলা একটু রাস্টি হয়ে গেছে। তবে আপনাদের সঙ্গে আছি তো, দেখবেন আমি আবার আগের মতো বাংলা বলতে পারব। অ্যান্নীশের সঙ্গে যখন ছিলাম, তখন আমার ঘরে শুধু বাংলা বলতাম। আমার বাংলা তখন খুব ভাল ছিল। ক্রেডিট অ্যান্নীশের।'

পূর্ণদা আর একবার মাস্টারমশাইগিরি করলেন, 'অ্যান্নীশ নয়, অনীশ।'

সঙ্গে সঙ্গে বাধ্য ছাত্রীর মতো মুখ করে জোসি বলল, 'রাইট, অ্যান্নীশ নয়—অ্যান্নীশ। এবার ঠিক বলেছি আংকল?'

পূর্ণদা হাসি চেপে বললেন, 'হ্যাঁ, এখনকার মতো ঠিক। আচ্ছা, বার্নিয়েরের সময় তো ফ্রান্সের সম্রাট ছিলেন ফোর্টিনথ লুই। ওঁর ফাইনান্স মিনিস্টারের নামটা মনে পড়ছে না। মনে আছে তোমার?'

'মঁশিয়ে কালবার্ট।'

"হ্যাঁ-হ্যাঁ, মঁশিয়ে কালবার্ট। তা, দেশে ফিরে গিয়ে বার্নিয়ের তখনকার হিন্দুস্থানের সম্পদ, অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক ব্যবস্থা ইত্যাদি নিয়ে লম্বা একটা চিঠি লিখেছিলেন কালবার্টকে। ওই চিঠিটা আজও অনেকের কাছে বিস্ময়। সেই আমলে ওই রকম বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ কল্পনা করা যায় না। কার্ল মার্ক্স ও এঙ্গেল্স্ও বার্নিয়েরের এই ভ্রমণকাহিনীর খুব মনোযোগী পাঠক ছিলেন। আজ থেকে শ' দেড়েক বছর আগে ওই বইটা নিয়ে মার্ক্স আর এঙ্গেল্সের মধ্যে চিঠি চালাচালি হয়েছিল। বইটার ওঁরা খুব প্রশংসা করেছেন। তবে মার্ক্সের একটা কথা কিন্তু আমার মাথায় ঠিক ঢোকেনি। ঢোকার কথাও নয়। আমি পণ্ডিত তো নয়ই, লেখাপড়াও জানি যৎসামান্য—। আর, মার্ক্স এত বড় একজন সমাজবিজ্ঞানী! যাকগে ও সব কথা।"

ডেভিস বলল, 'না-না, আপনি বলুন। শুনতে বেশ লাগছে।'

পূর্ণদা বিব্রত মুখে একটু হেসে বললেন, 'এটা হল গিয়ে বয়েস বাড়ার লক্ষণ। শ্রোতা পেলেই লেকচার ঝাড়তে ইচ্ছে করে। কিন্তু আমার কথাগুলোকে তোমরা গালগল্প হিসেবে ধরবে—যাকে বলে র‍্যাম্বলিং।'

ডেভিস হুইস্কির গ্লাসে লম্বা একটা চুমুক দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, আপনি বলুন।'

পূর্ণদা বললেন, "এঙ্গেলস্‌কে লেখা ওঁর চিঠির এক জায়গায় মার্ক্স লিখেছিলেন, 'বার্নিয়ের ঠিকই বলেছেন, গোটা প্রাচ্য দেশের বৈশিষ্ট্য হল—ভূ-সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অভাব। তিনি এই প্রসঙ্গে তুরস্ক, পারস্য ও হিন্দুস্থানের নাম করেছেন। এই বৈশিষ্ট্যই হল, তাঁর মতে, প্রাচ্যের অমরাবতীর সোপানের মতো।' তার মানে মার্ক্স জমিজমায় ব্যক্তিগত মালিকানা না থাকাটা সমর্থন করেছেন।"

ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে কৌশিক বলল, 'তাই তো।'

'কিন্তু বার্নিয়ের ওঁর বইতে স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন—জমিজমায় ব্যক্তিগত মালিকানা না থাকাটাই হিন্দুস্থানের অবনতির কারণ।'

'তাই?'

'হ্যাঁ, তাই। বার্নিয়ের তো এ ব্যাপারে বেশ খোলামেলা ভঙ্গিতে লিখেছেন। কোথাও কোনও অস্পষ্টতা নেই।'

জোসি কনিয়াকের গ্লাসে ছোট্ট একটা চুমুক দিল।

চাঁদ জঙ্গলের মাথা ছাড়িয়ে আর একটু ওপরে উঠে গেছে। নদীতে জোয়ার এসেছে বোধহয়। জলে ছলাত্-ছল্ শব্দ উঠছিল। লঞ্চ অল্প-অল্প দুলছে।

ডেভিস বলল, 'সাড়ে তিনশো বছর আগেকার ইন্ডিয়ান ইক্‌নোমিক্স। বার্নিয়ের ওঁর এই কথাটার কি কোনও ইন্টারপ্রিটেশন দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, পরিষ্কার ভাষায়। ওঁর কথার মধ্যে কোনও ঝাপসা ব্যাপার নেই। সেই সময় হিন্দুস্থানের সব সম্পত্তির মালিকানা ছিল শুধু বাদশাহের। বাদশা ওর পেয়ারের লোকদের—যেমন, সুবেদার, জায়গিরদার বা জমিদারদের প্রচুর জমিজমা দিত ভোগ করার জন্যে। শর্ত ছিল—তোমাকে এতগুলো জেলা, গ্রাম, পুকুর, দিঘি দেওয়া হল। প্রজাদের কীভাবে রাখবে না রাখবে, সে তোমার ব্যাপার। কিন্তু তোমার রোজগারের বাড়তি অংশ বছরের শেষে ট্যাক্স হিসেবে দিতে হবে বাদশাহকে। ওই সব এলাকায় যে সব চাষি বা বণিক থাকত, তাদের নিজেদের কাজে কোনও উৎসাহ থাকত না। কেননা, যাই রোজগার করুক না কেন, তার কোন নিরাপত্তা নেই, মালিকানা নেই। এলাকার সুবেদার বা জায়গিরদার ওদের সম্পত্তি যে কোনও সময় কেড়ে নিতে পারে। নিতও। আবার ওই সব সুবেদার, জায়গিরদার বা জমিদারদের মনস্তত্ত্বও ছিল অনেকটা ওই রকমেরই। ভাবত, আজ ছোটখাটো রাজা সেজে বসে আছি, কিন্তু বাদশাহের নেকনজর আমার ওপর থেকে সরে গেলেই রাতারাতি ফকির হয়ে যাব। আমার জায়গায় তখন আর একজন রাজা সাজবে। সুতরাং এলাকার উন্নতি চুলোয় যাক। চাষের সুবিধের জন্যে খাল কাটা, ব্যবসাপত্তরের সুবিধের জন্যে রাস্তাঘাট, দোকানপাট বানাবার কোনও দরকার নেই। যতক্ষণ গদিতে আছ, দু হাতে লুঠপাট করে ফুর্তি করো। বংশধরদের জন্যে কিছু তো রেখে যাওয়া যাবে না। যাই করি না কেন, কোনও কিছুর ওপর নিজস্ব মালিকানা থাকবে না। সব মালিকানা একজনের—দিল্লিশ্বরের। তামাম হিন্দুস্থানের তিনিই হলেন একমাত্র মালিক। বার্নিয়ের ফ্রান্সের ওই মিনিস্টারকে লেখা চিঠিতে পরিস্কার ভাষায় জানিয়েছেন—হিন্দুস্থানের সম্রাট যদি সমস্ত ভূ-সম্পত্তির মালিক না হতেন এবং সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা যদি মেনে নেওয়া হত, তা হলে হিন্দুস্থানের অনেক উন্নতি হত।'

ডেভিস এক চুমুকে গ্লাসটা শেষ করে বলল, 'কারেক্ট, এখন তো সেই দিকেই গোটা পৃথিবীর নজর গেছে। যাকে বলে প্রাইভেটাইজেশন। বাংলাটা কী যেন?'

'বেসরকারিগণ'—উত্তর দিল কৌশিক।

জোসি নিচু গলায় বলল, 'কিন্তু বার্নিয়ের তো লিখেছেন, গোটা পৃথিবীর সব সোনা তখন হিন্দুস্থানে এসে ঢুকত—।'

সায় দিয়ে পূর্ণদা বললেন, 'ঠিক। তবে ওঁর পরের কথাগুলো যদি একটু মনোযোগ দিয়ে পড়তে তা হলে বুঝতে সমস্যাটা কোথায়। তোমার অবশ্য দোষ নেই। তুমি তো ভারতে এই প্রথম এলে। তুমি যদি মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাস একটু খুঁটিয়ে পড়ো, তা হলে বুঝতে পারবে—গোলমালটা কোথায়। সেই আমলে গোটা পৃথিবীর সোনাদানা ভারতে ঢুকত ঠিকই, কিন্তু সাধারণ ভারতবাসী যেমন গরিব ছিল ঠিক তেমনিই থেকে গিয়েছিল। ওদের দুঃখ-কষ্ট একটুও ঘোচেনি। এ এক অদ্ভুত প্যারাডক্স। বার্নিয়ের কিন্তু আসল কারণগুলো ঠিক-ঠিক ব্যাখ্যা করেছেন। অবাক কাণ্ড, ওই দিকে আর কোন পর্যটকের চোখ যায়নি।'

ডেভিস শূন্য গ্লাসে হুইস্কি ঢালতে ঢালতে জিজ্ঞেস করল, 'কী রকম?'

পূর্ণদা একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে বললেন, 'ইউরোপ-আমেরিকায় ব্যবসার লেনদেনে সোনা বিনিময় হত অনেকখানি। আমেরিকার সোনা ওই ভাবে ইউরোপে এল। সেই সোনার বেশ কিছুটা অংশ হাত ঘুরতে ঘুরতে তুরস্ক, ইয়েমেন আর পারস্যাতে আসত।

হিন্দুস্থানের পণ্য-ভর্তি বেশ কিছু জাহাজ আসত ওখানে। হিন্দুস্থানের পণ্যের চাহিদা ছিল বিরাট। সেই সব পণ্য বিক্রির সুবাদে বিস্তর সোনা উঠত হিন্দুস্থানের জাহাজে। এতো গেল রফতানি। হিন্দুস্থান আমদানিও করত অনেক কিছু। ভাল-ভাল বিদেশি ঘোড়ার খুব চাহিদা ছিল হিন্দুস্থানে। বছরে প্রায় পঁচিশ হাজার ঘোড়া শুধুমাত্র উজবেকিস্তান থেকেই ভারতে আসত। সমরখন্দ, বোখরা থেকে টাটকা ও শুকনো ফলও আসত প্রচুর পরিমাণে। এই সব কেনাকাটায় হিন্দুস্থানের বণিকরা কিন্তু সোনা খরচ করত না। পণ্য কিনত পণ্যের বিনিময়ে। হিন্দুস্থানের বাণিজ্যের এটা ছিল বিশেষত্ব। তার ফলে জাহাজে চেপে গোটা দুনিয়ার তাল তাল সোনা আসত হিন্দুস্থানে।'

কৌশিক চোখ বড়-বড় করে বলল, 'বাণিজ্য তো আর এক-আধ দিন হয়নি। বছরের পর বছর ধরে হয়েছে। তার হলে হিন্দুস্থানের সাধারণ লোকজন অত গরিব ছিল কেন?'

পূর্ণদা হাসতে হাসতে বললেন, 'সেই ব্যাখ্যাই তো বার্নিয়ের দিয়েছেন। অত যে সোনা তার প্রায় পুরোটাই ছিল আনপ্রোডাকটিভ। দস্যু আর সম্রাটের ভয়ে সেই সোনার অনেকটাই ব্যবসায়ীরা লুকিয়ে রাখত মাটির তলায়। কিছুটা যেত বিলাসিতায়। সোনা থেকে জরি তৈরি করে আমির ওমরাহদের পাগড়ি-পোশাক বানানো হত। মেয়েদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত সাজাবার জন্যে গয়না তৈরি হত নানা ধরনের। গয়নার লোভ এমনই ছিল যে, গরিব মানুষদের অনেকে আধপেটা খেয়ে সোনার গয়না বানাত। তার মানে হিন্দুস্থানের বাণিজ্য করে আনা সোনার বেশির ভাগটাই যেত অকাজে। এই জন্যে সেদিন তাল তাল সোনা পেয়েও দারিদ্র ঘোচেনি হিন্দুস্থানের লোকদের।'

ডেভিস হুইস্কির গ্লাসে লম্বা একটা চুমুক মেরে বলল, 'আচ্ছা, হিন্দুস্থানে তখন লুঠতরাজ, যুদ্ধটুদ্ধ তো লেগেই ছিল। তা, এমন তো হতেই পারে—যে লোকগুলো মাটির তলায় সোনা লুকিয়েছিল, তাদের অনেকে খুন হয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ, সেটা হওয়া অস্বাভাবিক নয়।'

'তা হলে এখনও ওই সোনাগুলো মাটির তলাতেই রয়ে গেছে। অ্যান্ড নোবডি নোজ।'

পূর্ণদা হাসতে হাসতে বললেন, 'হ্যাঁ তাই তো। ভারতবর্ষের বেশ কিছু জায়গায় তো মাটি খুঁড়ে অনেক সোনার তাল পাওয়া গেছে।'

ডেভিস এবার একটু অবিশ্বাসীর ভঙ্গিতে দু-কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'ওই সব সোনা বোধহয় অন্য কোনও কারণে মাটির তলায় ঢুকেছিল।'

'অন্য কারণে মানে?'

'ইন্ডিয়ার কয়েকটা জায়গায় তো খুব আর্থকোয়েক হয়। সেই সময় কিছু বাড়ি হয়তো মাটির তলায় ঢুকে গিয়েছিল। বাড়ির সঙ্গে সোনাও গিয়েছিল মাটির তলায়।'

বেশ সমঝদারের ভঙ্গিতে সায় দিলেন পূর্ণদা। 'কথাটা আপনি কিন্তু মন্দ বলেননি। ভূমিকম্পে বাড়িঘরের সঙ্গে সোনার তাল মাটির তলায় ঢুকতে পারে। আর আপনার এই ধারণাটা যদি ঠিক হয়—আমি কিন্তু একটুও দুঃখিত হব না।'

কথাটা পূর্ণদা এমন ভঙ্গিতে বললেন যে, জোসি আর কৌশিক হেসে উঠেছিল। ডেভিসও হাসল, তবে একটু পরে।

রাত্তিরে খাওয়ার টেবিলে গল্প ঘুরে গিয়েছিল অন্য দিকে। ডিনারের টেবিলে প্রধান পদ রুটি আর যৎসামান্য মশলামাখানো মুর্গির মাংস।

মুর্গির ছোট্ট একটা পিস কাঁটা দিয়ে গেঁথে নিয়ে মুখে ফেলে জোসি বলল, "আংকল, আপনার নামটা কিন্তু খুব সুইট—'পূর্ণাদা চ্যাটার্জি।' আমও কাউশিকের মতো আপনাকে পূর্ণাদা বলে ডাকব।"

পূর্ণদা একটু হেসে উঠে বললেন, "আমার নাম 'পূর্ণদা' নয়, 'পূর্ণ'। সারনেম চ্যাটার্জি। বাঙালিদের কাস্টম হল—সিনিয়রদের রেসপেক্ট দেওয়ার জন্যে নামের সঙ্গে 'দা' যোগ করে। 'দা' ফর 'দাদা'। দাদা মানে এলডার ব্রাদার। মেয়েদের বেলায় 'দি' বা 'দিদি'—মানে এলডার সিস্টার। এই সাফিক্সটা খুব এক্সটেনডেড। অনেকে একই সঙ্গে কারও বাবা আর ছেলেকে 'দাদা', মা আর মেয়েকে 'দিদি' বলে। তুমি আমাকে স্বচ্ছন্দে 'পূর্ণদা' বলে ডাকতে পারো। অ্যান্ড আই উইল সার্টেনলি অ্যাপ্রিশিয়েট ইট।"

দাদা আর দিদির ব্যাখ্যা চোখ বড়-বড় করে শোনার পরে জোসি বলল, "হাউ সুইট! আমি তা হলে আপনাকে এখন থেকে 'পূর্ণাদা' বলে ডাকব। নামটা ঠিক-ঠিক বলতে পেরেছি তো?'

স্নেহপ্রবণ মানুষের ভঙ্গিতে পূর্ণদা জবাব দিলেন, 'তোমার ডাকটা কৌশিকের ডাকের চাইতে হাজার গুণ ভাল।'

এটাসেটা গল্প করতে করতে খাওয়া শেষ হল এক সময়।

একটু বাদে 'গুড নাইট' জানিয়ে কৌশিক আর ওর পূর্ণদা ওপরে উঠে এল। নীচে দুটো ঘর—একটা জোসির আর একটা ডেভিসের। নীচের বদ্ধ জায়গা থেকে ওপরে আসার সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে গেল ওদের ওপর দিয়ে। পূর্ণদা গায়ের শালটা মাথার দিকে টেনে দিলেন। 'বেশ শীতের বাতাস ছেড়েছে।' তার পর ঘরের দিকে এগোতে এগোতে বললেন, 'এইবার একমাত্র কাজ হল লেপমুড়ি দিয়ে একঘুমে রাত কাবার করে দেওয়া।'

কৌশিক বলল, 'আপনি যান, আমি একটু পরে যাচ্ছি।'

'ও, লঞ্চের ছাতে ঘুরে ঘুরে সুন্দরবনের নৈশ-প্রকৃতি দেখবে। বেশ দেখো, তবে বেশিক্ষণ দেখো না, ঝপ্ করে ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে।' বলতে বলতে স্লাইডিং ডোর টেনে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন পূর্ণদা।

লঞ্চের পেছন দিকে চলে গেল কৌশিক। চিমনি আর জলের ট্যাঙ্কের ছায়ায় এদিকটা একটু অন্ধকার-অন্ধকার। কিন্তু ওদিকে ফুটফুটে চাঁদের আলো। ও পাশের চাঁদের আলোর মধ্যে দিয়ে আকাশের দিকে তাকাল কৌশিক। চাঁদ এখন আকাশের অনেকটা ওপরে। সারা আকাশ ছেয়ে আছে ঝকঝকে আর জ্বলজ্বলে তারায়। কলকাতার ধোঁয়াকালি মাখানো আকাশে এমন উজ্জ্বল তারা দেখা যায় না। কাছেই সন্দরবনের ঠাসা জঙ্গল। চারদিক আশ্চর্য রকমের শান্ত। এখানে বোধহয় সন্ধের পরেই নিশুতি রাত নেমে আসে।

চারদিক দেখতে দেখতে লঞ্চের পেছন দিকে ধীর গতিতে কিছুক্ষণ পায়চারি করল কৌশিক, তার পর জলের ট্যাঙ্কের পাশে রাখা হাতল-ভাঙা চেয়ারটায় বসে পড়ল। ট্যাঙ্ক আর চিমনি শীতের বাতাস আটকাচ্ছিল খানিকটা। এমন একটা জায়গায় চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থাকার আনন্দই আলাদা। শাল দিয়ে কান-মাথা ঢেকে নিয়েছিল কৌশিক। সময় এখানে বুঝি অন্য কোনও নিয়মে গড়ায়। হঠাৎ-হঠাৎ মনে হচ্ছিল, এই জায়গাটায় ও বোধহয় অনেকক্ষণ বসে আছে।

সময়ের সঠিক হিসেবটা যে মুহূর্তে ও ধরার চেষ্টা জুড়েছিল, ঠিক তক্ষুনি জলের ওপর ভারী কিছু একটা পড়ার শব্দ উঠল। খুব একটা জোরালো শব্দ নয়, কিন্তু এখানকার আশ্চর্য রকমের নিস্তব্ধ রাতে ওই শব্দটাই অনেকখানি। লঘু অথচ দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে লঞ্চের রেলিং ধরে নীচের দিকে উঁকি মারল কৌশিক। তার পরেই নিজেকে আড়াল করার জন্যে বসে পড়ল।

চাঁদের আলোয় এক পলকেই ও অনেকখানি দেখে ফেলেছে। লঞ্চের গায়ে একটা ইমার্জেন্সি বোট ঝোলানো ছিল, সেই বোটটা জলের ওপর নামিয়ে নিয়েছে গণেশ।

সারেংয়ের ঘরের ছাউনিতে ও দিকের রেলিংয়ের কাছে এক টুকরো জমাট অন্ধকার। চার হাত-পায়ে হেঁটে ওই অন্ধকার জায়গাটায় চটপট পৌঁছে গেল কৌশিক। তার পর হাঁটু মুড়ে মাথা বাড়িয়ে নীচের দিকে উঁকি মারল আবার। গণেশ খুব সাবধানে দাঁড় টেনে নৌকোটাকে লঞ্চের পেছন দিকে নিয়ে আসছে।

ও দিকের নিচু জানলার কাছে এসে দাঁড়াল নৌকোটা। দাঁড়াতেই একটা দড়ির মই এসে পড়ল নৌকোর ওপর। মইয়ের প্রান্ত নৌকোর পাটাতনের সঙ্গে বেঁধে দিল গণেশ। একটু বাদেই ওই দড়ি বেয়ে যে নেমে এল তার পরনে ট্রাউজার্স, গায়ে জ্যাকেট আর মাথায় চাপা টুপি। একটু খুঁটিয়ে দেখেই চমকে উঠল কৌশিক। জোসি। জোসির হাতে খুব লম্বা একটা টর্চ। ও নামার একটু পরেই নামল ডেভিস। পরনে শিকারিদের মতো পোশাক, হাতে বন্দুক।

গণেশ নৌকোর পাটাতন থেকে দড়ির প্রান্তটা খুলে দিয়ে দাঁড় টানতে লাগল ধীরে ধীরে। ধীরে টানলেও নৌকো বোধহয় স্রোতের মুখে। বেশ একুট তাড়াতাড়িই নৌকো এগোতে লাগল সুন্দরবনের ঠাসা জঙ্গলের দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই নৌকো ঢুকে গেল খাঁড়ির বিপজ্জনক এলাকায়। খাঁড়ির কয়েক হাতের মধ্যেই ঘন জঙ্গল।

জোয়ারের জল ফুলে উঠেছিল নদীতে। ছলাৎ-ছল ছলাৎ-ছল্ করে জল ভাঙছিল লঞ্চের গায়ে। জানলা থেকে নেমে আসা দড়ির মইয়ের প্রান্তটা জলের ওপর নাচছিল ঢেউয়ের তালে তালে।

॥ ১০ ॥

শীতের আর একটা সকাল। তবে কালকের চইতে শীত আজ অনেক কম। সকাল ছ'টা, অল্প-অল্প সোনালি রোদ ফুটেছে সবে। সেই রোদের ছোট্ট একটা ফালি এসে পড়েছে থানার বড়বাবুর ঘরে। বড়বাবুর চেয়ারের উল্টো দিকে একটু ঝোলা গোঁফের এক মারোয়াড়ি ভদ্রলোক বসে আছেন।

ইন্সপেক্টর ঘোষরায় আর একবার ভদ্রলোককে দেখে নিয়ে বেশ তারিফ করার গলায় বললেন, 'মুখার্জি, তোমার মেক-আপ নেওয়ার হাতটা সত্যিই দারুণ। পথেঘাটে তোমাকে এই ভাবে দেখলে আমি কিন্তু কিছুতেই চিনতে পারতাম না। এক-একদিন এক-এক রকমের ছদ্মবেশ ধরার তালিম তুমি পেলে কোত্থেকে?'

'ওই যে বললাম না স্যার—এককালে যাত্রা-থিয়েটারে ভিড়েছিলাম। শখের দল, সব সময় পয়সা খরচা করে মেক-আপ ম্যান রাখতে পারতাম না আমরা। তখন যে যার মেক-আপ নিজেরাই নিতাম। আমি চিরকালই একটু খুঁতখুঁতে স্বভাবের। চাইতাম না মেক-আপের কোথাও কোনও খামতি থাকুক। এখন মনে হচ্ছে, ওই স্বভাবটাই আমাকে ঝামেলায় ফেলেছে। মেক-আপ আর মারোয়াড়ি-মার্কা জামা-ধুতিতেই সন্তুষ্ট থাকলে ভাল হত। পুরনো দিনের মারোয়াড়িদের মতো জুতোটা পরেই ভুল করেছি। জুতোটা আমাদের সেই যাত্রা আমলের। বাড়িতে পড়ে থেকে থেকে লোহার মতো শক্ত হয়ে গিয়েছিল। ওই জুতো পরে অনেকক্ষণ ধরে হাঁটাহাঁটি করার জন্যে পায়ের ছাল-চামড়া উঠে গেছে। জুতো জোড়া পায়ে না থাকলে বিপত্তিটা হত না।'

সামান্য অসহিষ্ণু হয়ে ইন্সপেক্টর বললেন, 'তুমি পুরো ব্যাপারটা গোড়া থেকে বলো তো—।'

মুখার্জিবাবুর মুখ একটু ম্লান হল। 'বলছি স্যার। পচন আর ভোলা ওদের গলি থেকে বেরুল দুপুর দুটো নাগাদ। আমি গলির মোড়ের দোকানটায় খদ্দের সেজে বসেছিলাম, ওরা বেরুতেই ওদের পিছু নিলাম। ওরা একটা বাসে উঠল। সামনের গেটে ওরা, পেছনের গেটে আমি। দুপুরের বাস। খুব একটা ভিড় ছিল না। আমি পেছন থেকেই নজর রেখেছিলাম ওদের ওপর। ওরা নামল লালবাজারের সামনে। আমিও নামলাম। ওরা লালবাজারের পাশের রাস্তা ধরল। তার পর ঘুরতে ঘুরতে বাগরি মার্কেটের একটা ওষুধের দোকানে এসে ঢুকল।'

'ওষুধের দোকান!'

'হ্যাঁ স্যার। ওখানে হোলসেল দরে ওষুধ কেনাবেচা হয়। ওই রকম অনেকগুলো দোকান আছে ওখানে। আমি উল্টো দিকের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে নজর রেখেছিলাম ওদের ওপর। দোকানটা ওদের খুবই চেনাশোনা, না হলে ওই ভাবে সেল্‌স কাউন্টারের সুইংডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকতে পারত না।'

'ভেতরে ঢুকে কী করল ওরা? দেখতে পেয়েছিলে?'

'হ্যাঁ স্যার। ভেতরে চেয়ার-টেবিলে একটা লোক বসে ছিল। বোধহয় মালিক। ওর প্রায় মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে মিনিট-দশেক কী-সব বলে বেরিয়ে এল ওরা।'

'বেরিয়ে যখন এল, হাতে কিছু ছিল?'

'না স্যার।'

'দোকানের নাম, নম্বর খেয়াল করেছ?'

'হ্যাঁ স্যার, নোটবুকে লিখে নিয়েছি।'

তার পর কী করল দুই শাগরেদ?'

'একই পথে ফিরে এসে আর একটা বাসে উঠল। আমিও উঠলাম অন্য গেট দিয়ে। নামল মানিকতলার কাছে কালোয়ার পট্টিতে। ওখানে অনেক লোহালক্কড়ের দোকান। সেই সব দোকানের একটায় ঢুকল। দোকানগুলো খুব লম্বাটে গোছের। মস্ত মস্ত লোহার রড, বিম ঢুকে যায় ওই সব ঘরে। তা, পচন আর ভোলা একটা দোকানে ঢুকে সেই দোকানের একেবারে পেছন দিকে চলে গিয়েছিল। অন্ধকার-অন্ধকার দোকান, বাইরে থেকে ঠাহর

করতে পারছিলাম না—ওরা কী করছে ওখানে! বেরিয়ে এল মিনিট বিশেক বাদে, পচনের হাতে একটা মোটা ক্যাম্বিশের র‍্যাশন-ব্যাগ মার্কা ব্যাগ।'

'ব্যাগে কী ছিল বুঝতে পেরেছিলে?'

'না স্যার, তবে যাই থাকুক না কেন, ভারী কিছু নয়। কিন্তু ব্যাগটা যে ভাবে মজবুত করে ধরে হাঁটছিল, আমার মনে হয়—।'

সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়লেন ইন্সপেক্টর ঘোষরায়। 'কী মনে হয়েছিল?'

'খুব দরকারি কাগজপত্তর কিংবা—।'

'কিংবা কী?'

'মোটা টাকার বাণ্ডিল। টাকাই হবে নির্ঘাত, না হলে ব্যাগ অত শক্ত করে ধরে সতর্ক ভঙ্গিতে জোর পায়ে হাঁটত না।'

'তারপর?'

'শিয়ালদার দিকের একটা রানিং ট্রামে উঠে পড়ল—সেকেন্ড ক্লাসে। সেকেন্ড ক্লাসে উঠতে দেখে আমার সন্দেহটা পাকা হল। এইরকম একটা কেস আগেও দেখেছিলাম। টাকাপয়সা নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অনেকে র‍্যাশন-ব্যাগ পছন্দ করে। ইচ্ছে করে ট্রামের সেকেন্ড ক্লাসে ওঠে, যাতে গুণ্ডা বা ছিনতাইবাজদের নজরে না পড়ে—।'

সারা জীবন ধরে অপরাধী-ঘাঁটা দুঁদে ইন্সপেক্টরের এই ধরনের ব্যাখ্যা সোনার ধৈর্য থাকে না। হাত তুলে মুখার্জিকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'তারপর কী হল? কী করল ওরা ব্যাগটা নিয়ে? গেল কোথায়?'

'শেয়ালদা স্টেশনে, নর্থ স্টেশনে। একটা ট্রেন দাঁড়িয়েছিল। লোকাল ট্রেন। লোকজন উঠছিল। কিন্তু ওরা ট্রেনে না উঠে কামরাগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতে হাঁটা লাগাল। হাঁটতে হাঁটতে ইঞ্জিনেব একেবারে কাছাকাছি চলে গেল। বুঝলাম, এমন কারও জন্যে এসেছে যার এই ট্রেনে চেপে কোথাও যাওয়ার কথা—।'

ইন্সপেক্টর টেবিল থেকে কাচের পেপারওয়েটটা হাতের মুঠোয় তুলে নিলেন। 'ওরা কি ট্রেনের প্রথম কামরার সামনেই দাঁড়িয়েছিল?'

'না-না, পিছোতে-পিছোতে আবার ট্রেনের মাঝামাঝি জায়গায় চলে এসেছিল। আমার তখন মনে হল, যার কাছে এসেছে সে হয়তো ট্রেনের যাত্রীই নয়। প্ল্যাটফর্ম একটা মিটিং-পয়েন্ট। একবার ঠিক এই রকম একটা কেস দেখেছিলাম—।'

আর একবার অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন ইন্সপেক্টর। 'থাক-থাক, ও সব কথা থাক। হল কী তারপর?'

মুখার্জির মুখ আর একবার ম্লান হল। 'ট্রেন ছাড়ল। একটা কামরার পাশাপাশি হাঁটছিল ওরা। তারপর ট্রেন স্পিড নেওয়ার মুখেই লাফিয়ে উঠল সেই কামরাটায়। আমিও উঠতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু ওই পুরনো জুতোটা এমন হড়কে গেল যে—। কপাল ভাল যে ট্রেনের নীচে পড়িনি—।'

একটা অল্পবয়সী ছেলে দু কাপ চা নিয়ে ঢুকল। বড়বাবুর জন্যে কালো চা আর ওঁর অতিথির জন্যে দুধমেশানো চা, প্লেটের ধারে দুটো বিস্কুট।

চায়ে একটা চমুক দিয়ে ইন্সপেক্টর বললেন, 'ট্রেনটা কোথায় যাচ্ছিল খেয়াল করেছ?'

'না, করা আর হয়ে ওঠেনি। অন্য সময় হলে করতাম। আসলে পায়ের তখন যাচ্ছেতাই

অবস্থা। ফোসকা-টোসকা পড়ে একেবারে—। ওই অবস্থায় ওদের পিছু নিতে গিয়ে ওই অত লম্বা প্লাটফর্ম বারদুয়েক হাঁটাহাঁটি করেছি। পায়ের অবস্থা কেমন হয়েছে দেখবেন—।'

হাত তুলে নিষেধ করে ইন্সপেক্টর বললেন, 'ওষুধপত্তর লাগিয়েছ তো?'

'লাগিয়ে ব্যান্ডেজ জড়িয়েছি। এখন তো আমার পায়ে হাওয়াই চপ্পল।'

'পায়ে ব্যান্ডেজ নিয়ে কিন্তু নজরদারির কাজ চলবে না। ওপরের মেক-আপ যতই পাল্টাও না কেন, পায়ের ব্যান্ডেজ তোমার একটা আইডেন্টিফিকেশন মার্ক হয়ে যাবে।'

ইন্সপেক্টরের কথায় নড়েচড়ে বসলেন মুখার্জিবাবু। 'ঠিক বলেছেন স্যার, এই ব্যাপারটা তো একেবারেই আমার মাথায় আসেনি।'

মুখার্জিকে লাগসই ছোট্ট একটা লেস্‌ন দিতে পেরে একটু খুশি হয়েছিলেন ইন্সপেক্টর। এবার স্নেহের গলায় বললেন, 'কই, তুমি চা-বিস্কুট খাও।'

মুখার্জিবাবু চায়ে ডুবিয়ে একটা বিস্কুট খেলেন। তারপর পরামর্শ চাওয়ার গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'এই পোশাকের সঙ্গে পা-ঢাকা কাপড়ের জুতো পরা যেতে পারে স্যার?'

'কেন যাবে না? কলকাতা শহরে সবাই সব কিছু পরে। তা ছাড়া, একটা কথা তোমাকে বলে রাখছি, পায়ের জুতো নিয়ে কখনও কোনও এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে যাবে না। ওই যে ইংরেজিতে একটা কথা আছে না—কী কথা বলো না? ওই যে, হ্যাঁ-হ্যাঁ, হোয়ার দি শু পিন্‌চেস্‌—তোমার জুতোয় পেরেক উঠলে সে কষ্ট শুধুমাত্র তোমারই। অন্য কারও নয়। তোমাকে আমার একটা কষ্টের অভিজ্ঞতার কথা বলি। জীবনে একবারই আমি তাজমহল দেখেছি। তখন চাকরিতে ঢুকিনি, সবে বি. এসসি পাশ করেছি। বন্ধুরা মিলে তাজমহল দেখতে গিয়েছিলাম। ওই বয়সে তাজমহল দেখার উত্তেজনাই আলাদা। অনুষ্ঠানের কোনও ত্রুটি ছিল না কোথাও। গরমকালের চাঁদনি রাত, ফুরফুরে হাওয়া বইছিল। কিন্তু তাজমহলের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হব কী করে? আমার পা তো ফুলে ঢোল। কলকাতা থেকে নতুন বাহারি জুতো কিনে পায়ে গলিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। সেই জুতোর জন্যে রোজ একটা করে ফোসকা পড়ত পায়ে। পায়ের যন্ত্রণায় তাজমহলের সৌন্দর্য উপভোগ করা আমার মাথায় উঠে গিয়েছিল সেই রাতে। ওই ঘটনা থেকে আমি সারা জীবনের মতো একটা শিক্ষা নিয়ে নিয়েছি। বেশি হাঁটাহাঁটির ব্যাপার থাকলে কক্ষনো নতুন জুতো পরে যাবে না। আর নজরদারির কাজে তো নয়ই। এই কাজে যে কোন মুহূর্তে বিপদে পড়তে পারো। আর বিপদে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে যে দু-তিনটে জিনিস দরকার—তার একটা হল—চোঁচা দৌড়। তা, ফোসকা-ধরা পায়ে বেয়াড়া জুতো থাকলে ছোটা কি সম্ভব?

আর একটা বিস্কুট চায়ে ডুবিয়ে দু দিকে মাথা নাড়লেন মুখার্জিবাবু। তার পর চুপচাপ চা শেষ করলেন। রোদের আর একটা ফালি জানলা দিয়ে ঢুকে পড়েছিল বড়বাবুর ঘরে। মাঝেমধ্যে দমকা ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকছিল।

বড়বাবুর পরনে মর্নিং-ওয়াকের পোশাক। এই সময় বেড়িয়ে ফিরে উনি সোজা দোতলার কোয়ার্টার্সে উঠে যান। একেবারে তৈরি হয়ে নামেন সাড়ে ন'টা-দশটা নাগাদ। থানার চাকরি, ঘরে ফেরার ঠিক থাকে না প্রায়ই। মুখার্জিবাবু বড়বাবুকে ধরার সময়টা ভালই বেছে নিয়েছেন। এই সময় নিশ্চিন্তে কথাবার্তা বলার সময় থাকে খানিকটা। তা ছাড়া ভোরের হাওয়ায় বেড়িয়ে ফেরার পরে মানুষটার মেজাজও বেশ খুশ থাকে।

রুমাল দিয়ে ঠোঁটের কোনাদুটো মুছে নিয়ে মুখার্জিবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'স্যার, কাল ওই অ্যানাটমির প্রফেসর এসেছিলেন থানায়?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, তুমি চলে যাওয়ার ঘণ্টা-দেড়েকের মধ্যেই এসে গিয়েছিলেন।'

'ট্রাঙ্কের হাড়টাড়গুলো পরীক্ষা করলেন?'

'কেন করবেন না? সেই জন্যেই তো ডাক্তারকে ডাকা।'

'কী বললেন পরীক্ষা করে?'

ইন্সপেক্টরকে এবার যেন একটু বিমর্ষ দেখাল। 'না হে, ওর মধ্যে একটাও মানুষের হাড় নেই। সব জন্তু-জানোয়ারের হাড়গোড়।'

অত খাটাখাটুনি বেকার হয়েছে জেনে মুখার্জির চোখমুখও কিছুটা শুকনো হয়ে উঠেছিল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে বললেন, 'রঘু লোকটা তা হলে দেখছি ঠিকই বলেছে স্যার।'

এবার একটু চটে উঠলেন ইন্সপেক্টর ঘোষরায়। 'ঠিকই যদি হয় তা হলে শেষ পর্যন্ত মিথ্যে কথা বলে গিয়েছিল কেন? কত ধানাইপানাই। এমন ভাব দেখাচ্ছিল যেন কালো ট্রাঙ্ক ও জন্মে দেখেনি। আর ওগুলো যদি ধাপার মাঠ থেকে কুড়নো জন্তু-জানোয়ারের হাড়গোড় হয়, তুই ব্যাটা চিলেকোঠায় ওটা ওই ভাবে লুকিয়ে রেখেছিলি কেন?'

ইন্সপেক্টরের কথাগুলো এবার রীতিমত হেঁয়ালির মতো ঠেকল মুখার্জিবাবুর কাছে। একটু থতমত খেয়ে গিয়ে বলল, কিন্তু স্যার, আপনিই তো বললেন, ডাক্তারবাবু হাড়গোড়গুলো পরীক্ষা করে বলেছেন—ওর মধ্যে একটাও মানুষের হাড় নেই। আপনার কি মনে হয় ডাক্তারবাবুর পরীক্ষা ভুল?'

আবার একটু চটে গেলেন ইন্সপেক্টর। 'ডক্টর দাস অ্যানাটমির সিনিয়র প্রফেসর, মানুষের হাড়গোড়ই হল ওর সাবজেক্ট। এই ব্যাপারে উনি ভুল করবেন কেন?'

আর একবার থতমত খেলেন মুখার্জিবাবু। 'আমি তো বলিনি স্যার, আপনিই বলছিলেন—।'

'অবাক কাণ্ড! আমি কখন বললাম যে, ডাক্তার ভুল বলেছে?'

এবার ঘাবড়ে গেলেন মুখার্জিবাবু। 'ওগুলো তা হলে কিসের হাড়?'

'জন্তু-জানোয়ারের।'

হেঁয়ালির জালে এখন পুরোপুরি জড়িয়ে গিয়ে চুপ করে গেলেন মুখার্জিবাবু।

চোখ থেকে চশমা খুলে টেবিলের ওপর রাখলেন ইন্সপেক্টর ঘোষরায়। তারপর পকেট থেকে বড়সড় একটা রুমাল বার করে চোখমুখ, ঘাড়গলা ভাল করে মুছে নিয়ে রহস্যপূর্ণ একটা হাসি হেসে বললেন, 'সারা জীবন তো পুলিশের চাকরি করে কেটে গেল। অভিজ্ঞতা কম হল না। মানুষের জীবনটা বড় বিচিত্র। আর অপরাধের রকমসকমগুলো আরও বিচিত্র। ব্যাপারটা একটু বোঝার চেষ্টা করো মুখার্জি। ট্রাঙ্কের হাড়গোড়গুলো যে জন্তু-জানোয়ারের—সে বিষয়ে আমাদের আর কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু আসল সন্দেহটা তো থেকেই যাচ্ছে। কোনও জন্তু-জানোয়ারের হাড়গোড় কোনও লোক কি চোরাই সোনাদানার মতো লুকিয়ে রাখে? কী?'

মুখার্জিবাবু এখনও হেঁয়ালির মধ্যে ডুবে আছেন। কিন্তু কোনও মতে বড়বাবুর কথায় সায় দিয়ে বললেন, 'ঠিক।'

বিজ্ঞ মানুষের ভঙ্গিতে ইন্সপেক্টর বললেন, 'আমাদের কাজ হচ্ছে এখন এই সন্দেহের জায়গায় দাঁড়িয়ে পুরো ব্যাপারটাকে অন্য ভাবে বিশ্লেষণ করা। অন্য ভাবে বিশ্লেষণ করতে গিয়েই ওই ভাবনাটা আমার মাথায় খেলে গিয়েছিল। আমি সঙ্গে সঙ্গে ট্রাঙ্কটা পাঠিয়ে দিয়েছি অখিল রুদ্রের কাছে। রুদ্রকে চেনো তো?'

দু দিকে মাথা নাড়ালেন মুখার্জিবাবু।

ছোট্ট একটা ধমক দেওয়ার গলায় ইন্সপেক্টর বললেন, 'তুমি গোয়েন্দাগিরির লাইনে আছ অথচ অখিল রুদ্রকে চেনো না। নামটা অন্তত শোনা উচিত ছিল তোমার। উনি দেশের পাঁচজন বিখ্যাত নারকোটিকস-এক্সপার্টের একজন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ওই সব হাড়ের মধ্যে ঢুকিয়ে নারকোটিকস পাচার করা হচ্ছে। ড্রাগের ব্যবসা এখন পৃথিবীর সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা। এক কেজি হেরোইন বিদেশে পাচার করতে পারলে কোটি কোটি টাকা হাতে এসে যাবে।'

মুখার্জিবাবুর চোখ বড়-বড হয়ে উঠেছিল। 'হাড়গোড়ের মধ্যে ওই সব লুকনো আছে নাকি স্যার?'

'আমার অনুমান। আর মনে হয়, অনুমানটা মিথ্যে নয়। আমি রুদ্রকে ফোন করে বলেছি, ফাইন্ডিংস-রিপোর্ট একটু পরে পাঠালেও ক্ষতি নেই। কিন্তু কী পেলেন সেটা আমাকে যেন ফোন করে জানান। মালটা আমি কালকেই পাঠিয়ে দিয়েছি ওঁর কছে। আশা করছি আর কিছুক্ষণের মধ্যে রুদ্রর ফোন পাব।'

নড়েচড়ে বসলেন মুখার্জিবাবু। যাক, পরিশ্রমটা তা হলে কাজে এসেছে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে জিজ্ঞেস করলেন, 'রঘুকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কিছু বার করতে পারলেন স্যার?'

'ও হচ্ছে নাটের গুরু। ভাঙবে, তবু মচকাবে না। কড়কে কিছু কাজ হল না। সেই এক প্যানপ্যানানি—বড়বাবু, আমি ছোটোমোটো কারবারি। চুল-বালি-সিমেন্টের কারবার করি। বাজার এখন বহোত খারাপ বলে ওই গন্দা কামে হাত দিয়েছি। আমাদের জাতের কেউ যদি এখন জানতে পারে আমি জানবারের হাড্ডি বেচি, আমার হাতে কেউ পানি খাবে না। মুলুকে আমার লেড়কি আছে, ওর সাদি দিতে পারব না। বলতে বলতে কেঁদেই ফেলেছিল ব্যাটা। বুঝলাম, লাঠি ছাড়া এর মুখে সত্যি কথা ফুটবে না। মারতামও, কিন্তু অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়েছি। ভয় হচ্ছিল—।'

'ভয়!'

'হ্যাঁ, ভয়ই। কাঁদতে কাঁদতে ব্যাটা হাঁপাচ্ছিল, আর ওর ঢাকের মতো পেটটা বিচ্ছিরি ভাবে ওঠানামা করছিল। বুঝলাম, বাংলা মাল টেনে টেনে লিভারটার বারোটা বাজিয়েছে। লাঠির বাড়ি খেলে যদি উল্টোপাল্টা কিছু হয়ে যায়! এখন তো আবার মানবাধিকার কমিশন-টমিশনের নানা রকম হ্যাপা আছে। শান্তিতে যে নিজের কাজ করব, তার উপায় নেই। তবে এখনও তোমাকে আমি বলছি—এরা তিন-চারটে ছুটকো লোক নয়, মস্ত একটা র‍্যাকেটের মেম্বার। জাল ফেলে চাঁইগুলোকে তুলতে হলে একটু ধৈর্যের দরকার। তুমি কী বলো?'

মুখার্জিবাবু সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন।

ইন্সপেক্টরকে একটু বুঝি অস্থির দেখাচ্ছিল। একবার ঘড়ির দিকে তাকালেন, তারপর

টেলিফোনটা টেনে নিলেন সামনের দিকে। মুখার্জিবাবু পরিষ্কার বুঝতে পারলেন, মাদক দ্রব্য বিশেষজ্ঞ অখিল রুদ্রের টেলিফোন পাওয়ার জন্যে ভেতরে-ভেতরে একটু ছটফটানি শুরু হয়ে গিয়েছে বড়বাবুর। বোধহয় অস্থিরতা কাটাবার জন্যেই উনি বেসুরো তালে টেবিলে একবার তবলাও বাজিয়ে নিলেন। তারপর শূন্য দৃষ্টিতে দু-একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে নেওয়ার পরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কৌশিকের কী খবর মুখার্জি? ফোনটোন করেছিল?'

'না স্যার, এই ভাবে বেড়াতে, টেড়াতে গেলে একেবারেই ফোন করে না। বলে, সমস্যা সমস্যার জায়গায় থাক, আমি মনের সুখে দুটো দিন বেড়িয়ে নিই।'

কথাটা শুনে দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইন্সপেক্টর ভুরু কোঁচকালেন। 'গোয়েন্দার মুখে এই সব কথা! ও কি লুকিয়ে-লুকিয়ে কবিতা-টবিতা লিখছে নাকি আজকাল?'

'দেখিনি তো স্যার।'

'দেখবে কী করে? লুকিয়ে-লুকিয়ে লিখলে দেখা যায় নাকি? ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের ছোকরা। বয়েসটা তো ভাল নয়। নির্ঘাত ওই রোগটা ওর মাথায় চেপেছে। ওই রোগ ধরা মানেই গোয়েন্দাগিরির বারোটা বাজা।'

তরুণ মালিক সম্পর্কে এই ধরনের কথা ভাল লাগছিল না মুখার্জিবাবুর। একটু প্রতিবাদ করার গলায় বললেন, 'না স্যার, উনি কবিতা লেখেন না।'

'এত শ্যিওর হচ্ছ কী করে? ও কি আর তোমাকে দেখিয়ে-দেখিয়ে লিখবে?'

'না স্যার, তা লিখবেন না। তবে আমি শুনেছি, যারা কবিতা লেখে তারা মাঝে মাঝে বিড়বিড় করে কবিতা বলে। একটু আবৃত্তি-টাবৃত্তি করে। কিন্তু ওঁর মুখে কখনও শুনিনি তো—।'

মুখার্জিবাবুর ব্যাখ্যায় কান দিলেন না ইন্সপেক্টর। হঠাৎই একটু অভিমানী মানুষের গলায় বলে উঠলেন, 'এটা ঠিক করেনি কৌশিক। সুন্দরবনে বেড়াতে যাচ্ছ—ঠিক আছে যাও। হাতে এখন কাজ নেই। তা ছাড়া এটা বেড়াবারই বয়েস। কিন্তু একটা ফোন করতে কী অসুবিধে ছিল? তুমি তো আমার মুখেই শুনে গেলে আমার এলাকায় তিন-তিনটে খুন হয়ে গেছে। সবে তদন্তের কাজ শুরু করেছি—। আমার কাজ আমি ঠিকই সামলাতে পারব, ওর জন্মের আগে থেকেই সামলাচ্ছি। কিন্তু ও তো আমাকে একটা ফোন করে জিজ্ঞেস করতে পারত—কী অবনীদা, খবরটবর কী? এটা তো আমি আশা করতেই পারি মুখার্জি। ওর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা শুধু ইন্সপেক্টর আর গোয়েন্দার নয়। ওকে তো আমি ছোট ভাইয়ের মতো দেখি, বন্ধুর মতো দেখি। তুমি তো সব জানো মুখার্জি। আমার বউ ভাল কিছু একটা রান্না করলে প্রথম কথাই হল—কৌশিককে খবর দাও।'

বড়বাবুর এই কথাগুলোর সঙ্গে পুরোপুরি একমত হলেন মুখার্জিবাবু। তারপর মালিকের হয়ে একটু সাফাই গাওয়ার গলায় বললেন, 'উনি কিন্তু স্যার আপনাকে খুব ভালবাসেন। খুব মানেন।'

উত্তরে গর্জন করে উঠলেন বড়বাবু। 'গুলি মারো ওই সব মানামানি আর ভালবাসার। ও ইদানীং একটু বেশিমাত্রায় খামখেয়ালি হয়ে উঠছে, এটা ওর পেশার পক্ষে কিন্তু একেবারেই ভাল নয়। আচ্ছাও সুন্দরবনের কোন্ দিকটায় গেছে?'

'কোন্ দিকে মানে?'

'আরে বাবা, সুন্দরবনে তো নানা দিক থেকে যাওয়া যায়। সাধারণত দুটো রুট পছন্দ করে ট্যুরিস্টরা। একটা নামখানা, আর একটা হল গিয়ে বসিরহাটের দিক—। কৌশিক কোন্ দিকে গেছে?'

একটু থতমত খেয়ে গিয়ে মুখার্জিবাবু বললেন, 'ওসব কিছুই বলেননি আমাকে। শুধু বলেছেন, সুন্দরবনে যাচ্ছি।'

উত্তর শুনে বিরক্তই হলেন ইন্সপেক্টর। 'তুমি গোয়েন্দার সহকারী, অথচ ওর এটুকু খবরাখবরও রাখবে না! কোথায় যাচ্ছে, কী ভাবে যাচ্ছে, কোথায় থাকবে—অন্তত এটুকু ইনফর্মেশন রাখা উচিত ছিল তোমার। ধরো, এখন ওর কাছে একটা জরুরি খবর পাঠাবার প্রয়োজন পড়ল। কী করবে তুমি? কিছু মনে কোরো না মুখার্জি, তোমরা শখের গোয়েন্দা কোম্পানি তো—। তোমাদের একটা জিনিসের অভাব আছে, সেটা হল বেসিক ট্রেনিং।'

বকুনি খেয়ে রীতিমত কাঁচুমাচু হয়ে গিয়েছিলেন মুখার্জিবাবু। ওর মুখ থেকে কিছু একটা বার হতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই সামনের টেলিফোনটা বেজে উঠল।

রিসিভারটা তুলে নিলেন ইন্সপেক্টর। পুলিশ অফিসাররা প্রয়োজনে অসম্ভব নিচু গলায় গোপন কথা সারতে পারেন টেলিফোনে। এটাও বোধহয় বেসিক ট্রেনিংয়ের মধ্যে পড়ে। গলা একেবারে খাদে নামিয়ে কথা বলছিলেন ঘোষরায়।

চওড়া টেবিলের ওপারে মুখার্জিবাবু। ওখানে বসে একটা শব্দও শুনতে পাচ্ছিলেন না। তবে দেখতে পেলেন কথা বলতে বলতে ইন্সপেক্টরের মুখের রং কালো হয়ে উঠছে। শরীরের ভাষা পড়ার বিদ্যে অল্পস্বল্প জানা আছে মুখার্জিবাবুর। উনি বুঝতে পারলেন টেলিফোনে যে খবরটা এসেছে, সেটা ভাল নয়।

কথা শেষ হলে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন ইন্সপেক্টর, তার পর কিছুক্ষণ গুম হয়ে থাকার পরে খসখসে গলায় বললেন 'অখিল রুদ্র ফোন করছিল। না, হাড়গোড়ের মধ্যে কোনও মাদকদ্রব্য লুকনো নেই।'

॥ ১১ ॥

সকাল ঠিক ছ'টার সময় ঘুম ভেঙে গিয়েছিল পূর্ণ চ্যাটার্জির। কাচের জানলার ভেতর দিয়ে ভোরের আবছা আলো এসে পড়েছিল ঘরের মধ্যে। বহু দিন বাদে বাড়ির বাইরে রাত কাটানোর পরে সকালে ঘুম ভাঙলে কেমন যেন একটা বিভ্রম তৈরি হয়। চোখের সামনের সব কিছুই তখন অচেনা-অচেনা ঠেকে। বিভ্রমটুকু কেটে গেলে অবশ্য শরীরের মধ্যে অন্য ধরনের তৎপরতা জেগে ওঠে। সুন্দরবনের নদীতে লঞ্চের কেবিনে রাত কাটানোর মধ্যে কিছুটা যেন রোমাঞ্চের ভাবও আছে। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়েই উঠে বসেছিলেন পূর্ণদা।

আবছা আলোয় চোখ সয়ে এসেছে ওঁর। কিন্তু ওদিকের খাটের দিকে তাকিয়েই একটু বুঝি চমকে উঠলেন। কাল সন্ধের সেই পাজামা-পাঞ্জাবি পরে খাটের এক ধারে কুঁকড়ে, দলা পাকিয়ে ঘুমোচ্ছে কৌশিক। গায়ের শাল বুকের ওপর ছড়ানো। পাশে ভাঁজ করা লেপ

যেমন ছিল, ঠিক তেমনি পড়ে আছে। নিজের মনে মনে বললেন কৌশিকের পূর্ণদা—কাল রাতে বেচারার এমনই ঘুম পেয়েছিল যে, ঠিক ভাবে শুতেও পারেনি। পোশাক পাল্টায়নি, গায়ে লেপ দেয়নি, সারারাত কষ্ট পেয়েছে শীতে।

এক লহমায় বছর-সাতেক আগের কয়েকটি দৃশ্যের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল পূর্ণ চ্যাটার্জির। বিয়ের আগের ওঁর মেয়ে বন্যা ঠিক এই কাণ্ডটা করত প্রায়ই। হয়তো বেড়িয়ে কিংবা কোচিং সেরে ফিরেছে—। কিন্তু বাড়িতে ফিরে পোশাক-আশাক ছাড়ার পাট নেই। টান মেরে হাতের ব্যাগটা চেয়ারের ওপর ছুড়ে ফেলে দিয়ে বিছানায় শুয়েই টিভি চালিয়ে দিত।

মা-মরা মেয়ের মায়ের ভূমিকা কিছুটা পালন করতেন বাবা। কিন্তু ততে খুব একটা কাজ হত না। 'উঠছি, উঠব' বলতে বলতে এক সময় ঘুমিয়েই পড়ত মেয়ে। বাবার কাজ ছিল তখন মেয়েকে ঠেলেঠুলে তোলার চেষ্টা করা, কিন্তু বেশির ভাগ সময়েই কাজ হত না তাতে। অর্ধেক দিন ওই ঘুমের জন্যেই রাতের খাওয়া হত না মেয়ের।

কৌশিক অসম্ভব বুদ্ধিমান, সব ব্যাপারে চৌকস ; কিন্তু ঘুমে কুঁকড়ে-থাকা ছেলেটাকে এই মুহূর্তে কিছুটা অসহায়ই দেখাচ্ছিল। পূর্ণদা আস্তে আস্তে বিছানা থেকে নেমে ভাঁজ-করা লেপটা খুলে কৌশিককে ঢেকে দিলেন। কিন্তু এইটুকু করেই সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। খাটের একদম ধারে শুয়ে আছে ছেলেটা, ঘুমের ঘোরে এদিকে ফিরলেই মেঝেয় পড়বে। সুতরাং ওর ঘুম না ভাঙিয়ে খাটের মাঝামাঝি জায়গায় ওকে সরাবার চেষ্টা করলেন। আর সেই চেষ্টাতেই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল গোয়েন্দার। ভাঙা মাত্রই ও প্রায় লাফ মেরে উঠে বসল, তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়েই ছিটকে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

দ্রুত পায়ে লঞ্চের পেছন দিক দিয়ে ঘুরে এসে ওপাশের রেলিং ধরে উঁকি মারল কৌশিক। লঞ্চের গায়ে বোটটাকে আগের মতোই ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। নীচের জানলা দিয়ে বাইরে ছুড়ে দেওয়া দড়ির মইটাও অদৃশ্য। অর্থাৎ গভীর রাতের সফর শেষ করে ফিরে এসেছে গণেশ আর সাহেব-মেম। কিন্তু কোথায় গিয়েছিল ওরা!

নৌকোটা তখন বাঁক নিয়ে ঢুকে গিয়েছিল খাঁড়ির মধ্যে। কয়েক হাতের মধ্যে সুন্দরবনের বিপজ্জনক জঙ্গল। ওরা কি জঙ্গলে নেমেছিল? যদি নেমে থাকে, কেন? গভীর রাতে ওই জঙ্গলের মধ্যে ঢোকা আর হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়ে চলাফেরা করার মধ্যে বিশেষ কোনও তফাত নেই।

নিজের ওপর রাগ হয়ে গিয়েছিল কৌশিকের। গায়ে-মাথায় শাল জড়িয়ে সারেংয়ের ঘরের বাইরের দিকে ছাউনির আড়ালে ও লুকিয়েছিল প্রায় ঘণ্টা-আড়াই। তারপর আর পারেনি। জোয়ারের ফুলে-ওঠা জলের ওপর থেকে লাফিয়ে-ওঠা কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া মাঝেমধ্যেই কামড় বসাচ্ছিল ওকে। তবু ধৈর্যের পরীক্ষায় হারতে চায়নি। ঠিক করেছিল, ঘরে গিয়ে শীত একটু কাটাবার পরে ফিরে আসবে আবার।

ঘরে গিয়ে মনে হয়েছিল, এখনও যখন ওরা ফেরেনি, ভোর-রাতের আগে ফিরবে না। ভাবনাটা মনের ওপর চেপে না বসলে কিছুতেই বিছানায় একটুখানি গড়াতে যেত না। আর গড়াতে গিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল অঘোরে।

ভোরের লালচে-হলুদ মেশানো আলো ছড়িয়ে পড়েছিল আকাশে, নদীর জলে আর ওপাশের ঠাসা জঙ্গলে। কিন্তু এই অপরূপ দৃশ্য এখন উপভোগ করার মতো মনের অবস্থা

ছিল না কৌশিকের। কিছুক্ষণ মাথা ঝুঁকিয়ে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকার পরে আস্তে আস্তে ঘরে ফিরে এসেছিল আবার।

ফিরতেই উদ্বিগ্ন মুখে পূর্ণদা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার, তুমি ঘর থেকে অমন করে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিলে কেন?'

এমন প্রশ্নের চটজলদি মিথ্যে উত্তর বানাতে একটুও সময় লাগে না গোয়েন্দার, কিন্তু ও কোনও উত্তর দেওয়ার উৎসাহ বোধ করল না।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখে পূর্ণদার উদ্বেগ বোধহয় আর একটু বেড়ে গিয়েছিল। 'কিছু হারিয়েছে-টারিয়েছে নাকি?'

মানুষটাকে থামাবার জন্যেই একদিকে মাথা সামান্য কাত করল কৌশিক।

উদ্বেগের মাত্রা আরও কিছুটা বাড়ার ফলে দু-পা এগিয়ে এসে পূর্ণদা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী?'

'ওয়ালেট।'

'পাওনি?'

মৃদু গলায় উত্তর দিল কৌশিক, 'পেয়েছি।'

'তা হলে অমন থম্ মেরে আছ কেন? টাকাপয়সা কিছু খোয়া গেছে নাকি?'

চটপট এবার নিজেকে গুছিয়ে নিল কৌশিক।

পূর্ণদা বললেন, 'মাঝরাত্তিরে প্রকৃতি দেখার সময়েই হারিয়েছিল নির্ঘাত।'

উত্তরে মৃদু হাসল কৌশিক।

পূর্ণদাও হাসলেন। 'মাঝরাত্তিরে লঞ্চের ওপর সওদা করার মতো কী পেয়েছিলে যে মানিব্যাগ বার করতে হয়েছিল!'

মিথ্যে অজুহাত দেওয়ার জিভ তৈরি হয়ে গিয়েছিল গোয়েন্দার। 'গলা খুসখুস করছিল। ওয়ালেটে কিছু লবঙ্গ ছিল, খাওয়ার জন্যে বার করেছিলাম।'

উত্তরটা শুনে কড়া ধাঁচের অভিভাবক হয়ে উঠলেন পূর্ণদা। 'কাল রাত্তিরে তোমাকে বারবার বলেছিলাম—বেশিক্ষণ খোলা জায়গায় থেকো না। নতুন জায়গা, তার ওপর জলের ওপর ঠাণ্ডাটা একুট বেশিই লাগে।'

'বেশিক্ষণ থাকিনি তো—।'

'আলবত ছিলে। না হলে সন্ধের জামাকাপড় না ছেড়ে ওই ভাবে কুঁকড়েমুকড়ে ঘুমোতে না। আর, তুমি কী বলো তো? পাশে অমন পুরু একটা লেপ, সেটা পর্যন্ত গায়ে চাপাতে খেয়াল ছিল না!'

কৌশিক এবার অপরাধ স্বীকারের হাসি হাসল। একই কথা বেশিক্ষণ গড়াতে দিতে না চাইলে এমন হাসি হাসাই ভাল। কিন্তু কড়া অভিভাবকের উপদেশের বিষয় যদি 'দায়িত্বজ্ঞান আর শৃঙ্খলাবোধ' হয়, সেটা একতরফা হলেও বেশ কিছুক্ষণ গড়ায়। তবে মাঝপথে পারভেজ ঢুকে পড়ে সেটা থামিয়ে দিয়েছিল।

পারভেজের হাতে ছোট্ট ট্রে, তার ওপর ধোঁয়া-ওঠা দু কাপ চা আর একটা প্লেটে খানকতক বিস্কুট।

পারভেজের হাত থেকে চায়ের কাপটা নিয়ে পূর্ণদা হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী, তোমাদের সাহেব-মেম কী করছে?'

ওরা ঘুমোচ্ছে বাবু। ন'টার আগে উঠবে না।'

চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে মুখ থেকে আরামের শব্দ বার করে কৌশিকের দিকে তাকিয়ে পূর্ণদা বললেন, 'বেশির ভাগ সাহেব-মেম বেলা পর্যন্ত ঘুমোয়। কেন বলো তো?'

'কেন?'

"ওদের দেশে তো আর আমাদের মতো ভোরবেলায় সূর্য ওঠার দেশ নয়। শীতকালে বেশির ভাগ দিন আবার সূর্যের মুখই দেখা যায় না। বরফ পড়ে তার বদলে। তার ফলে ওদের একটু বেলায় ওঠা অভ্যেস হয়ে যায়। তবে ঘুম থেকে উঠে আমাদের মতো গড়িমসি করতে করতে চা আর খবরের কাগজ নিয়ে বসে না। ওয়ার্কিং ডেতে সকালে উঠে এক কাপ কফি আর একটা, যাকে বলে 'কুইক স্যান্ডুইচ' মেরে দিয়ে কাজে বেরিয়ে পড়ে। ওদের তরিবত করে খাওয়া বলো, খবরের কাগজ পড়া বলো, টিভি দেখা বলো—সব সন্ধেবেলায়। কী হল, চা খাচ্ছ না কেন?'

মৃদু হেসে চায়ের কাপটা হাতে তুলে নিল কৌশিক। ধীরে ধীরে চায়ে চুমুক দিচ্ছিল ও, কিন্তু ওর মাথার মধ্যে আস্ত একটা রহস্যের জাল। এত বড় একটা গোলমেলে জাল, কিন্তু কোথাও বিন্দুমাত্র আলোর ইশারা নেই।

চা-বিস্কুট খেয়ে পূর্ণদা একবার লঞ্চের ছাত থেকে ঘুরে এসে ঝলমলে মুখে বললেন, 'অসামান্য দৃশ্য কৌশিক। সুন্দরবন সত্যিই সুন্দরবন, এর সৌন্দর্যের কোনও তুলনা হয় না। বার্নিয়ের সাহেব ধরতে গেলে গোটা এশিয়াটাই ঘুরেছেন, কিন্তু সেরা জায়গা বলে রায় দিয়েছিলেন এই জায়গাটাকে—ওঁর ভাষায় সোনার বাংলা। কিন্তু দুঃখটা কোথায় জানো—এমন জায়গা নিয়ে আমাদের পর্যটন দফতর উঠেপড়ে লাগে না কখনও। সরকারের খানদুয়েক লঞ্চ আছে বোধহয়—এক-রাত্তির দু-দিনের ট্রিপ মারে গোটা-কয়েক। রাত কাটাবার জন্যে একটা-দুটো ট্যুরিস্ট রিজর্ট আছে—ব্যস। কিন্তু এলাকাগুলো যদি ঠিক-ঠিক ডেভেলপ করা যায়—দেশ-বিদেশ থেকে কী পরিমাণ ট্যুরিস্ট আসবে ভাবা যায় না! একবার বিখ্যাত এক শিল্পপতির একটা বক্তৃতার রিপোর্ট পড়েছিলাম কাগজে। উনি বলেছিলেন: পশ্চিমবঙ্গের কোস্টাল এরিয়া আর সুন্দরবনটন আমাদের হাতে ছেড়ে দিন—দেখুন আমরা কী করতে পারি! আপনারা শুধু রাস্তাঘাট আর ট্রান্সপোর্টের ওপর নজর দিন। গোয়া তো ট্যুরিস্ট টেনে টেনে বড়লোক হয়ে গেল। ওই গোয়ার দশ গুণ বেশি পর্যটক টানব আমরা এই রাজ্যে। কী নেই বলুন তো এখানে? পশ্চিমবঙ্গকে সম্পদশালী হতে গেলে যে দু-তিনটে জিনিসের ওপর নজর দিতে হবে সবার আগে, তার একটা হল পর্যটন। তবে আমার মনে হয়, শিল্পপতির ওই প্রজেক্টের সঙ্গে সাড়ে-তিনশো বছর আগেকার ওই ফরাসি সাহেবের পরামর্শগুলো কাজে লাগতে পারে এখানে। ব্যক্তিগত মালিকানা দিতে হবে। প্রয়োজনে যতখানি বেশি সম্ভব, ততখানি। এটা করতে পারলে এই রাজ্যে ব্যবসাপত্তর আর চাকরি-বাকরির সুযোগ এক লাফে বেড়ে যাবে অনেকখানি। বেড়াবার দারুণ একটা জায়গা হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ গড়ে উঠতে পারলে এখানকার হাইওয়ে শুধু নয়, সাধারণ রাস্তাঘাটের ধারেও কত হোটেল, মোটেল, রিজর্ট, শপিং-কমপ্লেক্স গড়ে উঠবে বলো তো? কী বিশাল সম্ভাবনা! তুমি কথাগুলো মানো তো?'

মুচকি হেসে কৌশিক বলল, 'কেন মানব না! আমরা সবাই চাই বাংলার উন্নতি হোক, বাঙালির উন্নতি হোক, এ সব কথা আমাদের খুব উদ্বুদ্ধ করে। আমরা তো একটু ভাবপ্রবণ জাত—।

'একটু নয়, অনেকখানি। কিন্তু ভাবপ্রবণ হওয়াটা দোষের নয়। আমি তোমাকে বিবেকানন্দের একটা কথা কোট করছি। লাখ কথার এক কথা। বিবেকানন্দ বলেছেন : ভাবপ্রবণ জাত বলে বাঙালিকে নিয়ে অনেকে একটু ঠাট্টাবিদ্রূপ করে থাকে। কিন্তু আমি বলব, ভাবপ্রবণ হওয়াটা দোষ নয়, গুণ। ভাবপ্রবণ হলেই মনের মধ্যে সত্য উদ্ভাসিত হয়। স্বামীজির এই কথাটা বিরাট কৌশিক। মনের মধ্যে সত্য না জাগলে তোমার দৃষ্টি পরিচ্ছন্ন হবে না। চোখের জোর না বাড়লে কাছের বা দূরের কিছুই তুমি ভাল ভাবে দেখতে পাবে না, বুঝতে পারবে না।'

কৌশিক অদ্ভুত ধরনের একটা হাসি হেসে বলল, 'খুব খাঁটি কথা। কিন্তু এমন যদি হয়, সব কিছু দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না। তা হলে?'

কথাটা হেঁয়ালির মতো ঠেকল পূর্ণদার কাছে। 'মানে?'

'মানেটাই তো বুঝতে পারছি না। কথায় বলে না—বিনা মেঘে বজ্রপাত। আকাশে এককুচিও মেঘ নেই, দিব্যি নীল আকাশ—অথচ বজ্রপাত হল।'

কৌশিককে একটু খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে পূর্ণদা জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি আজকাল ধাঁধার চর্চা করছ?'

রহস্যপূর্ণ ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে কৌশিক বলল, 'না, করি না। তবে করতে ইচ্ছে করছে। শুনেছি, গাঁ-গঞ্জে ধাঁধা খুব চলে। আচ্ছা, এই গণেশ লোকটাকে আপনার কেমন মনে হয় পূর্ণদা?'

'কেন? কিছু বলেছে নাকি?'

'না-না, এমনি জিজ্ঞেস করছি। লোকটার চোখের দৃষ্টিটা ভারী অদ্ভুত। কখনও-কখনও অসম্ভব হিংস্র ধরনের ; আবার কখনও-কখনও সরল-সাদাসিধে, গোবেচারা-মার্কা। লক্ষ্য করেছেন আপনি?'

মুচকি হেসে পূর্ণদা বললেন, 'করেছি। দু-ধরনের ওই রকম চাউনি হওয়ার কারণটা কী জানো? ওরা হল সুন্দরবনের আসল বাসিন্দা। ওর পূর্বপুরুষরা সুন্দরবনের বাদাবনে চার-পাঁচশো বছর কাটিয়েছে বংশ-পরম্পরায়। তখনকার সুন্দরবন মানে নদী-নালা থিকথিক করছে কুমিরে, আর জঙ্গল ভর্তি বাঘে। শুধু বাঘ নয়—সেই সঙ্গে আছে অসংখ্য বিষধর সাপ, দাঁতাল শুয়োর। একটা সময় এই জঙ্গলে আবার বুনো মোষ আর গণ্ডারও থাকত। এ তো গেল প্রাণীদের কথা। আর কী থাকত বলো তো?'

'কী?'

'থাকত বলা ঠিক নয়, হানা দিত। মগ আর ফিরিঙ্গি দস্যু। মগ মানে আরাকানের লোক, আর ফিরিঙ্গি বলতে পর্তুগিজ দস্যু—যাদের তখন বলা হত হার্মাদ। নিষ্ঠুরতায় এদের জুড়ি ছিল না পৃথিবীতে। হাসতে হাসতে মানুষ খুন করত। শুধু যে টাকা-পয়সা, চালডাল, ঘরের নানান সরঞ্জাম লুঠ করত তাই নয়—গাঁয়ের লোকদের ধরেও নিয়ে যেত ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করবে বলে। বন্দিদের কীভাবে রাখত জানো? সরু লম্বা বেত সবার হাতের তালু ফুটো করে ঢুকিয়ে দিয়ে এক-একটা ঝাঁক বানাত। নৌকোর খোলে পিছমোড়া করে ফেলে রাখত বন্দিদের। খাওয়ার জন্যে পাটাতনের ওপর ছড়িয়ে দিত কিছু চালডাল। পাখির মতো খুঁটে-খুঁটে খেত বন্দিরা। ক্রীতদাসের হাটে পৌঁছবার আগেই মারা যেত বেশ কয়েকজন। বানানো কথা নয়, পুরনো দিনের জার্নালে এক সাহেবের রিপোর্টে পড়েছি। তা—বাঘ,

কুমির, সাপ আর দস্যুর সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে লড়াই করে যাদের বাঁচতে হত—তাদের দৃষ্টি হিংস্র হবে না তো কাদের হবে? কাল এক ফাঁকে গণেশের সঙ্গে আমি অনেকক্ষণ গল্প করেছি। ওর পদবি ঢালি। এই ঢালি হচ্ছে প্রতাপাদিত্যের আমলের ঢালি। ওদের সম্পর্কে কিছু জানো?'

প্রশ্নের উত্তরে দু-দিকে মাথা নাড়াল কৌশিক।

ভোরের আবছা আলো গাঢ় হলুদ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। ঘরের কাচের জানলা দিয়ে নদী দেখা যাচ্ছে। সকালের আলো মাঝেমধ্যে ঢেউয়ের মাথায় ঝিলিক মেরে যাচ্ছিল।

পূর্ণদার চোখমুখ এখন খুঁটিয়ে দেখলে যে কারও মনে হবে, মানুষটা মনে মনে কয়েকশো বছর পিছিয়ে গেছেন। ঝকঝকে মুখে বললেন, 'ইতিহাস জিনিসটা খুব জ্যান্ত। কখন আবার বেশি করে জ্যান্ত মনে হয় জানো, যখন তুমি ইতিহাসের দুটো প্রান্ত একসঙ্গে জুড়তে পারছ—তখন। জোড়ার সুযোগ অবশ্য সব সময় মেলে না। এই ধরো আজ থেকে সাড়ে-তিনশো বছর আগেকার পৃথিবীবিখ্যাত পর্যটক বার্নিয়েরের—ভাবা যায়—তাঁর বংশধর এখন আমাদের সঙ্গে এই লঞ্চে।'

একটু যেন অসহিষ্ণু গলায় কৌশিক বলল, 'আপনি গণেশ ঢালির কথা বলুন।'

পূর্ণদা কী যেন মনে করার চেষ্টা করে বললেন, "সব লাইন খেয়াল নেই, কয়েকটা মনে আছে—তাও ভাঙা-ভাঙা। অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি ভারতচন্দ্র প্রতাপাদিত্যের চমৎকার একটা পরিচয় তুলে ধরেছেন কবিতার মধ্যে। সেই যে—'যশোর নগর ধাম প্রতাপ আদিত্য নাম/মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।' তার পরের লাইনটা মনে নেই। চতুর্থ লাইনে আছে 'ভয়ে সব ভূপতি দ্বারস্থ।' 'কায়স্থ'র সঙ্গে 'দারস্থ'—দারুণ মিল। পঞ্চম আর ষষ্ঠ লাইনে আছে—'বরপুত্র ভবানীর প্রিয়তম পৃথিবীর/বাহান্ন হাজার যাঁর ঢালী'—। এই ঢালীরা ছিল প্রতাপাদিত্যের বিখ্যাত ঢালী সৈন্য। সুন্দরবনে এখনও ঢালি পদবীর অসংখ্য লোক আছে—হিন্দু-মুসলমান দুই ধর্মেরই। গণেশ ঢালি হিন্দু। এই গণেশ হল গিয়ে প্রতাপাদিত্যের সেই বিখ্যাত ঢালি সৈন্যের বংশধর।'

'গণেশ বলেছে?'

'হ্যাঁ, ও বলতেই ইতিহাসের ব্যাপারটা মাথায় খেলে গিয়েছিল আমার।

'গণেশ কি ভারতচন্দ্রের কবিতার কথা জানে?'

'না-না, ও ওসব জানবে কোত্থেকে? ওদের মধ্যে তো আর পড়াশুনোর চর্চা ছিল না। ও অবশ্য প্রাইমারি স্কুলে দু-তিন বছর পড়েছে। বিদ্যে মানে কোনও মতে নিজের নামটা সই করতে পারে—। তবে, তাই বা কম কী। প্রতাপাদিত্য হচ্ছেন বাংলার সেই বারো ভুইয়াঁর একজন। তখন ভুইয়াঁ মানে রাজাই। প্রতাপাদিত্য সুন্দরবনের রাজা হয়েছিলেন আজ থেকে শ-চারেক বছর আগে। রাজার বিখ্যাত সৈন্যদলের বংশধর বলে আমাদের এই শ্রীগণেশচন্দ্র ঢালির বেশ একটা গর্ব আছে। ওর কথাবার্তায় সেটা টের পাচ্ছিলাম বারবার। তবে ঢালিদের আর একটা পরিচয় গণেশ বোধহয় জানে না। কিংবা জানলেও চেপে গেছে আমার কাছে।'

'কী সেটা?'

'রাজার রাজত্বকাল কদ্দিনই বা চলে। প্রত্যাপাদিত্যের রমরমা ছিল বেশ কয়েক বছর।

তার পর সেই সময়টা ফুরোতেই দেশে অরাজক অবস্থা শুরু হয়ে গিয়েছিল। এলাকাটা আবার সুন্দরবন। অসংখ্য খালবিল, বন হিংস্র প্রাণীতে ভর্তি। ঢালি যোদ্ধাদের অনেকে তখন বেঁচে থাকার জন্যে সহজ পথটা ধরেছিল—।'

'সহজ পথ মানে?'

'সেই আমলে সুন্দরবন-এলাকায় যাদের গায়ে জোর ছিল, হাতে অস্ত্র ছিল, তাদের বাঁচার সহজ পথ ছিল তো একটাই—দস্যুগিরি। দস্যুগিবিতে তখন নেমে পড়েছিল ঢালিদের অনেকেই। গণেশদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে কয়েকজন সাঙঘাতিক ডাকাত থাকা কিন্তু অসম্ভব নয়।'

পূর্ণদার কথা শুনতে শুনতে টান-টান হয়ে বসেছিল গোয়েন্দা। কপালে ভাঁজ পড়েছিল কয়েকটা। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে বলেছিল, 'আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে—গণেশ ওদের বংশের এই দুই নম্বর পেশাটায় ছিল, কিংবা এখনও আছে অল্পস্বল্প।'

পূর্ণদা হা-হা করে হেসে উঠে বললেন, 'এই না হলে গোয়েন্দা! দুটো দিনের জন্যে আরাম করে বেড়াতে এসেছ—কিন্তু এখানে এসেও প্যাঁচ-পয়জার কষা। গণেশের তীব্র চাউনিটাই খেয়াল করে রেখেছ, অন্যটা মনে রাখতে চাইছ না। মাঝেমধ্যেই ও ঠিক শিশুর মতো হাসে, তখনও ওর দৃষ্টিটাও শিশুর মতো হয়ে যায়।'

একটু বুঝি তর্ক করার ঝোঁক চেপেছিল কৌশিকের। 'কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান বলে পূর্বপুরুষদের অনেক দোষগুণ জিনের ভেতর দিয়ে উত্তরপুরুষদের মধ্যে চলে আসে।'

'তার মানে দস্যুর ছেলে দস্যুই হবে। শোনো, আমি অত বিজ্ঞান-টিজ্ঞান বুঝি না। তবে এটা জানি, মানুষের প্রকৃতি বেশির ভাগ সময় সাধারণ নিয়মের বাইরে গিয়েই কাজ করে থাকে। এর পেছনে পরিবেশ, শিক্ষার বিরাট একটা ভূমিকা আছে। আমি একটাই উদাহরণ দিচ্ছি—দস্যু রত্নাকর তো মহাকবি বাল্মীকি হয়েছিল। তুমি বলবে এটা ঐতিহাসিক সত্য নয়, নেহাতই কল্পনা। বেশ কল্পনাই যদি হয়, প্রতিটি কল্পনা আকাশ থেকে পড়েছে—এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। অনেক কল্পনার পেছনে বাস্তবের কোনও ঘটনা থাকে। যিনি রত্নাকর আর বাল্মীকির কল্পনা করেছিলেন, তিনি হয়তো কোন ডাকাতের সাধু হয়ে যাওয়ার ঘটনা দেখেছিলেন। এমন হওয়া তো অসম্ভব নয়।'

গল্পে গল্পে অনেকটা সময় কেটে যাওয়ার পরে পারভেজ এসে বলল, 'সাহেব-মেম উঠে পড়েছেন, আপনাদের নাস্তা করার জন্য ডাকছেন।'

লঞ্চ নোঙর তুলে ভেসে পড়েছে আবার নদীতে। ব্রেকফাস্টের আয়োজন হয়েছে সারেংয়ের ঘরের সামনের বাহারি চাদরপাতা চৌকিতে। কৌশিক আর ওর পূর্ণদাকে দেখেই জোসি আর ডেভিস সহাস্যে 'গুড মর্নিং' জানাল।

ব্রেকফাস্টের বেশ চওড়া ব্যবস্থা। রুটি, মাখন, জ্যাম আর ডাবল ডিমের পোচ। কয়েকটা আপেল আর প্লেট ভর্তি খেজুরও ছিল।

সকালে ঘুম ভাঙার পরে দেখা হলে সাহেবদের একটা বাঁধা প্রশ্ন থাকে। পূর্ণদার দিকে তাকিয়ে সেই প্রশ্নটাই করল ডেভিস—'রাত্রে ভাল ঘুম হয়েছিল তো?'

ভাল ঘুমের চিহ্ন পূর্ণদার চোখেমুখে। 'হ্যাঁ, আপনার?'

'আমিও। বিছানায় পড়েই ঘুম। আই স্লেপ্ট লাইক আ লগ।' ডেভিসও হাসল, কিন্তু কৌশিক লক্ষ্য করল, হাসির মাঝেই হাত আড়াল করে একটা হাই লুকোবার চেষ্টা করছে সাহেব।

জোসির চোখে সানগ্লাস। রোদের আভায় গালদুটো কালকের চাইতেও বেশি লাল। হাতে শুঁড়-বার করা ক্যামেরা। নানা অ্যাঙ্গেল থেকে সুন্দরবনের জলজঙ্গলের ছবি তুলে যাচ্ছিল একটার পর একটা।

খাওয়ার শেষের দিকে কৌশিকের মনে হল, কে যেন দ্রুত পায়ে ওর পেছন দিয়ে ওদের ঘরের দিকে চলে গেল।

ব্রেকফাস্টের শেষের দিকটা হঠাৎই সংক্ষিপ্ত করে ফেলল কৌশিক, তারপর পট থেকে আধ কাপ চা ঢেলে কয়েক চুমুক খাওয়ার পরে 'আসছি' বলে উঠে পড়েছিল। নিজেদের কেবিনের দিকে যাওয়ার পথে কৌশিকের চটিতে শব্দ উঠল না একটুও।

কেবিনের স্লাইডিং ডোরের আধখানা খোলা। ঘরের মধ্যে উঁকি মারতেই গণেশের সঙ্গে চোখাচোখি। গণেশ ওকে দেখে একটু বুঝি থতমত খেয়ে গিয়েছিল, তারপর এক গাল হেসে বলল, 'জলের জাগটা দিতে এসেছিলাম।'

গণেশ বেরিয়ে যেতেই জাগটা হাতে তুলে নিল কৌশিক। ঢাকনা খুলে দেখল, জাগের জল প্রায় তলানিতে এসে ঠেকেছে।

তার মানে নির্জলা মিথ্যে বলেছে গণেশ। কিন্তু কেন বলল?

চারদিকে সন্ধানী দৃষ্টি ঘোরাতেই একটু চমকে উঠল গোয়েন্দা। পূর্ণদার স্যুটকেসের ডালা খোলা, আর ভেতরটা কেমন যেন হাটকানো। অত্যন্ত পরিপাটি মানুষ পূর্ণদা, গোছানো জিনিস নিশ্চয়ই এ ভাবে তছনছ করবেন না। তা হলে?

॥ ১২ ॥

পূর্ণদা কেবিনে ঢুকে মৃদু ধমকের গলায় বললেন, "তুমি তো অদ্ভুত ছোকরা! 'আসছি' বলে ঘরে এসে চুপচাপ বসে আছ!' একটু বিব্রত মুখে উঠে দাঁড়িয়ে কৌশিক বলল, 'এই তো যাচ্ছিলাম—চলুন।"

কাঁধ ঝাঁকিয়ে পূর্ণদা বললেন, 'এখন আর গিয়ে কী হবে? ওরা তো নীচে নেমে গেছে।'

কৌশিকের বিব্রত ভাবটা আর একটু বুঝি বাড়ল। 'আমার ও ভাবে দুম্ করে চলে আসাটা বোধহয় ঠিক হয়নি। কিন্তু আমি তো ওদের বলেই এসেছি। ওরা কি একটু অসন্তুষ্ট হয়েছে?'

হা-হা করে হেসে উঠে পূর্ণদা বললেন, "না-না, একেবারেই নয়। ওরা যাকে বলে একেবারে খাঁটি ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা। কালকের তুলনায় শীত একটু কমে গেছে ঠিকই, কিন্তু আমাদের কাছে এ শীত তো আরামেরই। রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে বসে থাকতে বেশ লাগছিল আমার। কিন্তু জোসি রীতিমত ঘামছিল। চোখমুখ লাল টকটকে। ইউরোপের মানুষ তো। তার ওপর এই প্রথম গরমের দেশে আসা। আমি বললাম—কী জোসি, খুব

গরম লাগছে? কী ভদ্র দেখ! মিষ্টি করে হেসেবলল—নো, নট দ্যাট হট! আমি বললাম—খুব বুঝেছি, আর বাহাদুরি দেখাতে হবে না। ডেভিস খুব একটা ঘামেনি। আসলে ও তো এ দেশের জলহাওয়ায় বেশ কিছুটা অভ্যস্ত। তবে পা ছড়িয়ে বসে লম্বা-লম্বা হাই তুলছিল। গরমে ঝিমুনি আসে, হাই ওঠে। একটু জোর করেই ওদের বিশ্রাম নিতে পাঠিয়ে দিলাম। বললাম—টেক সাম রেস্ট। লাঞ্চ আওয়ারে দেখা তো হচ্ছেই। তবে জোসি এই ক' মিনিটের মধ্যে গোটা একটা রিলই ছবি তুলে ফেলেছে। যা দেখে তাতেই মুগ্ধ। বুঝতে পারছিলাম, ওর এই মুগ্ধতার পেছনে ওর পূর্বপুরুষের লেখা সোনার বাংলার বর্ণনা কাজ করছে অনেকখানি। প্রথম দিকে ওর এই ভাল লাগার ব্যাপারটা আমার একটু বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছিল। কিন্তু এখন আর তা মনে হচ্ছে না। কী ব্যাপার, তুমি অমন থমথমে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? বোসো। আরে বাবা, এমন একটা অসাধারণ ট্রিপের প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করো। পরে দেখবে এই ভ্রমণটা টনিকের কাজ করছে। ছ' মাস তেড়েফুঁড়ে খাটবে, কিন্তু একটুও ক্লান্ত বোধ করবে না। আমার এনার্জি তো এর মধ্যেই দ্বিগুণ হয়ে গেছে। সব কিছু দারুণ রিফ্রেশিং! কী, আমার কথাটা তুমি মানছ না?"

'না-না, কেন মানব না! ঠিকই বলেছেন আপনি। আচ্ছা, পূর্ণদা—।'

কৌশিকের গম্ভীর গলা শুনে একটু অবাক হয়ে পূর্ণদা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী?'

'আপনার স্যুটকেসটাকে দেখুন—কী বিচ্ছিরি ভাবে হাটকানো। আপনি নিশ্চয়ই এটা করেননি।'

নিজের স্যুটকেসের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়েই গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন পূর্ণদা। তার পর হাসতে হাসতেই বললেন, "এই জন্যেই বলে ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। তোমার গোয়েন্দাগিরির ভূতটা ক'টা দিনের জন্যে ঘাড় থেকে নামাও তো—।"

কৌশিক কিন্তু একটুও হাসল না। ওর গলার স্বর বোধহয় আর একটু গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। 'স্যুটকেসের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, কেউ এটা হাটকেছে। আপনি অসম্ভব পরিপাটি মানুষ, আপনি নিশ্চয়ই এ ভাবে ঘাঁটাঘাঁটি করবেন না।'

পূর্ণদা দু-দিকে মাথা নাড়াতে নাড়াতে বললেন, 'তুমি কিছু মনে কোরো না ভাই, তোমার মাথাটা একদম গেছে। কাজ থেকে কদ্দিন ছুটি নাওনি? এক কাজ করো, আমাদের এই লঞ্চ-ট্রিপটা শেষ হওয়ার পরে তুমি দিন-পনেরো কোনও পাহাড়-টাহাড় থেকে বেড়িয়ে এসো। হাতের কাজ তো নয়ই, মাথার কাজও করবে না। সম্পূর্ণ বিশ্রাম চাই তোমার।'

পূর্ণদার সস্নেহ ধমক, উপদেশের কোনও রকম ছায়া পড়ল না কৌশিকের ওপর। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরেও একই রকমের গলায় জিজ্ঞেস করল, 'স্যুটকেস এ ভাবে অগোছালো নিশ্চয়ই আপনি করেননি?'

"ইয়েস, আমি করেছি। সকালে খাটের ওপর তুলে স্যুটকেসের ডালা খুলেছিলাম আমি। খাটের একদম ধারে রেখেছিলাম, হঠাৎ কনুইয়ের ধাক্কা লেগে ওটা মেঝেয় পড়ে যায়। তাতেই ভেতরের মালপত্তর তালগোল পাকিয়ে গেছে খানিকটা। এটা পরে তোমার মাথার যন্ত্রণার কারণ হবে আন্দাজ করতে পারলে তখনই সব পাট-পাট করে আবার গুছিয়ে রাখতাম। ভেবেছিলাম ক'টা দিন তো এখানে থাকতে হবে, তার মানে বেশ কয়েকবার স্যুটকেস খুলতে হবে, তখন না হয় গোছানো—। তা ছাড়া সাহেব-মেম তো

আর আমাদের বেডরুমে উঁকি মারতে আসছে না, অত টিপটপ থাকার কী দরকার! কী, অপরাধীর স্বীকারোক্তি শুনে এবার শান্তি হয়েছে তো গোয়েন্দার?"

কৌশিক গম্ভীর মুখে চেয়ারে কিছুটা ছড়িয়ে বসে বাইরের দিকে তাকাল। বাইরের রোদ আর একটু ঝলমলে। ঘরের কাচের জানলার দিকে চোখ রাখলেই বেড়াবার মজা উপভোগ করা যায়। চওড়া নদী দূরের তীরভূমিতে গিয়ে মিশেছে। দূরে সবুজ গাছপালার অপরূপ রেখা। নানান ধরনের পাখি উড়ছে আকাশে। ছুটন্ত লঞ্চের দুলুনিটাও উপভোগ্য। গোয়েন্দার চোখ বাইরের দিকে থাকলেও দৃষ্টি বোধহয় কোথাও ছিল না। এই ভাবে কয়েকটা মুহূর্ত কাটাবার পরে হঠাৎ ও ঘুরে বসে জিজ্ঞেস করল, 'পূর্ণদা সেই প্যাকেটটা খুলেছেন?'

'কোন্ প্যাকেটটা?'

'আসার আগের দিন রনি যেটা স্পেশাল ক্যুরিয়ার সার্ভিসে পাঠিয়েছে আপনার কাছে।'

ছেলেমানুষের মতো জিভ কাটার পরে পূর্ণদা বললেন, 'দেখ কাণ্ড! এত সুন্দর লঞ্চে ওঠার পরে ওটার কথা ভুলেই মেরে দিয়েছি। আসলে আমার টেনশন ছিল তো অন্য কারণে। ভেবেছিলাম আমার ভাইপো বোধহয় সাহেব-মেমের ট্রিপ বাতিল হওয়ার খবর জানিয়ে চিঠি পাঠিয়েছে। কিন্তু এসে এদের পেলাম, এত সুন্দর লঞ্চ পেলাম ; আর ওদের ব্যবহার তো তুলনাহীন—। এই সব কারণেই প্যাকেটটার কথা মাথা থেকে মুছে গিয়েছিল বেমালুম।'

কথাগুলোর কোনও রকম প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। কৌশিকের মধ্যে। কেমন যেন যান্ত্রিক গলায় বলল, 'দেখুন তো এবার খামের মধ্যে কী আছে।'

'দেখছি। মনে করিয়ে দিয়ে ভাল করেছ। তুমি মনে না করালে আমার আর মনে পড়ত না এখন।'

কথাটা বলার পরেই স্যুটকেস খুলে ডালার উল্টো দিকের লম্বা প্যাকেটটায় হাত ঢোকালেন পূর্ণদা। হাতে উঠে এল একগাদা কাগজপত্র, কিন্তু তার মধ্যে বিদেশ থেকে পাঠানো কোনও খাম নেই। কাজপত্রগুলো আবার যথাস্থানে ঢুকিয়ে রেখে স্যুটকেসের তলায়, পাশে হাত ঘোরালেন, কিন্তু হাতে কোনও খাম ঠেকল না।

মুচকি হেসে এবার পূর্ণদা বললেন, 'যত্ন করে রেখেছি তো, এত তাড়াতাড়ি পাওয়ার কথা নয়। জামাকাপড়ের মধ্যিখানে রেখেছি বোধহয়। দাঁড়াও, এগুলো এক-এক করে খাটের ওপর নামাই। খাম বার করে স্যুটকেসটা আবার গুছিয়ে রাখা যাবে। অগোছালো স্যুটকেস দেখে তোমার আর দুশ্চিন্তা হবে না তা হলে। আর তুমি চাইলে স্যুটকেস এবার থেকে তালা দিয়েও রাখতে পারি। যা বলবে তাই করব।'

কথা ফুরোলেও মজার হাসিটা পূর্ণদার ঠোঁটে ঝুলতেই লাগল। এক-এক করে স্যুটকেস থেকে জামা-প্যান্ট, পাজামা-পাঞ্জাবি, তোয়ালে, লুঙ্গি ইত্যাদি বার করতে লাগলেন পূর্ণদা। সাত দিনের প্রয়োজনের তুলনায় ঢের বেশি জামাকাপড় এনেছেন উনি। প্লাস্টিকে মোড়া মাঝারি মাপের একটা প্যাকেট দেখিয়ে বললেন, 'এটা কী বলো তো?'

প্রশ্নেরকোনও উত্তর দিল না কৌশিক।

মৃদু হেসে পূর্ণদা বললেন, 'এটা হল গিয়ে সেই অসম্ভব পাতলা নেটের মশারিটা। দেখতে এইটুকু, কিন্তু জনা তিন-চারেক প্রমাণ সাইজের লোক এর মধ্যে আরামসে শুতে পারে। দেখবে নাকি?'

কৌশিকের কপালে দু-তিনটে ভাঁজ উঠেছিল। ও চাপা গলায় বলল, 'আপনি রনির পাঠানো খামটা বার করুন তো আগে।'

স্যুটকেসের মালপত্র খালি করার গতি পূর্ণদা এবার একটু বাড়ালেন। দেখতে দেখতে স্যুটকেস বেমালুম খালি হয়ে গেল, কিন্তু রনির পাঠানো খাম কোথাও নেই।

পূর্ণদার মুখের হাসি মিলিয়ে গিয়েছিল। অপরাধী-অপরাধী মুখ করে বললেন, 'এই আমার এক দোষ। কোনও জিনিস খুব যত্ন করে রাখতে গেলেই দেখি হারায়। হারানো মানে সত্যি-সত্যি হারিয়ে যাওয়া নয়। ক'দিন বাদেই সেটা পেয়ে যাই। আমার এখন কী মনে হচ্ছে জানো?

কী মনে হচ্ছে জানতে চাইল না কৌশিক।

আগের কথার জের টেনে পূর্ণদা বললেন, 'আমার এখন মনে হচ্ছে ওটা আমি টেবিলের ড্রয়ারে রেখে দিয়েছি। হ্যাঁ, তাই হবে। পাওয়ার কাট হতেই ড্রয়ার খুলে মোমবাতি আর লাইটার বার করেছিলাম। তারপর মোমবাতি জ্বেলে—হ্যাঁ-হ্যাঁ, এখন আর কোনও সন্দেহ নেই—লাইটারের সঙ্গে সঙ্গে রনির খামটাকেও ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রেখেছি। উদ্বেগ-উত্তেজনা একটু বাড়লেই দেখেছি আমার অবস্থা সুকুমার রায়ের সেই বড়বাবুর মতো হয়ে ওঠে। চশমা কপালে তুলে রেখে চশমা খুঁজে মরি।'

গলা খুলে হাসলেন পূর্ণদা, কিন্তু তার কোনও ছায়া পড়ল না কৌশিকের চোখেমুখে। ওর গম্ভীর হওয়ার কারণটা নিজের মতো করে বুঝে নিয়ে পূর্ণদা বললেন, 'আরে বাবা, তুমি যা ভাবছ তা নয়। এখানে চোর-ছ্যাঁচোড় নেই। লঞ্চের সবার সঙ্গেই আলাপ হয়েছে আমার। এরা সব সাদামাঠা, খেটে খাওয়া গাঁয়ের লোক। যদি কারও চুরি করার স্বভাব থাকত, এই যে স্যুটকেসের ডালার পকেটে আমার সাড়ে চার হাজার টাকা আছে—এটা চুরি যেত না সবার আগে? ঠিক বলেছি কি না বলো?'

ঠিক-বেঠিকের তর্কের মধ্যে ঢুকল না কৌশিক। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পরে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, রনির পাঠানো ওই খামের মধ্যে কী থাকতে পারে বলে আপনার মনে হয়?'

'যা মনে হয়েছিল তা তো গাড়িতে ওঠার পর থেকেই তোমাকে বলতে বলতে এসেছি। একটা ভয়ই পাচ্ছিলাম—সাহেব-মেম সফর বাতিল করেছে—এই খবরটাই রনি চিঠি লিখে জানিয়েছে। তা সে আশঙ্কা তো সত্যি হয়নি।'

'আপনার সঙ্গে রনির হালে কি এমন কোনও কথা হয়েছিল যে, ও কোনও দরকারি জিনিস আপনাকে পাঠাতে পারে—।'

'ধ্যুর, ও কি আবার আমাকে দরকারি জিনিস পাঠাবে! তবে হ্যাঁ—।'

একটু কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল কৌশিক, 'কী?'

'ও আমাকে মাঝেমধ্যে এই রকম খামে বিলিতি বুক কোম্পানির ক্যাটালগ পাঠায়। পছন্দসই কিছু বইপত্তর পেলে ওকে জানাই, ও তখন সেই বইগুলো কিনে পাঠায়। এটা হচ্ছে ওর একটা স্মল সার্ভিস টু নিঃসঙ্গ কাকা। আজকাল বিলিতি বইয়ের যা দাম হয়েছে কিনব বললেই তো আর কেনা যায় না। একটা পাউন্ড মানে বাহাত্তর টাকা, একটা ইউ এস ডলার মানে পঁয়তাল্লিশ টাকা। অথচ আজ থেকে মাত্র পনেরো বছর আগেও ব্যাপারটা আমাদের আয়ত্তের মধ্যে ছিল। ইনফ্লেশনটা এখন কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে বলো তো? এর থেকে কি চট করে মুক্তি পাওয়া সম্ভব! তোমার কী মনে হয়?'

গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার ওপরে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেওয়ার গলায় কৌশিক বলল, 'স্যুটকেসটা গুছিয়ে রেখে স্যুটকেসে চাবি লাগিয়ে দিন।'

'কেন?'

'স্যুটকেস খুলতে আর বন্ধ করতে দু সেকেণ্ডের বেশি সময় লাগে না বলে। আমি একটু আসছি।' কথাটা বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল কৌশিক।

কৌশিক ফিরল একটু দেরিতে। তারপর নানান গল্পে বেলা গড়াতে লাগল। বক্তা ধরতে গেলে পূর্ণদাই। কথার মধ্যে হারানো খামের কথা আর তোলেননি। আসলে খাম হাবানোটা যে কোনও ঘটনা—এই ব্যাপারটাই উনি বোধহয় উড়িয়ে দিয়েছিলেন। আবামপ্রদ, নিশ্চিন্ত ভ্রমণের মধ্যে থাকলে যে ধরনের কথাবার্তা একজনের মুখ থেকে খুব সহজে বেরিয়ে আসে—ঠিক তেমন ধরনের কথাবার্তাই বলে যাচ্ছিলেন পূর্ণদা। মধ্যিখানে এক এক করে উঠে গিয়ে দুপুরের স্নানও সেরে নিয়েছিল দুজনে। দুপুব একটা নাগাদ গণেশ এসে একগাল হেসে বলল, 'ভাত দিয়েছি, খাবেন চলেন।'

চটপট তৈরি হয়ে দুজনে নেমে গেল নীচে।

করিডরে ওদের দেখেই জোসি একটু ঝুঁকে পড়ে হাত জোড় করার ভঙ্গি করে বলল, 'আসুন-আসুন পূর্ণদা, কাউশিক।'

পূর্ণদা হেসে উঠে বললেন, "তুমি তো খুব ভাল স্টুডেন্ট জোসি, দেখা হলেই যে 'নোমোস্কার' বলতে নেই, এটা তো ঠিক মনে রেখেছে। তবে দু হাত জুড়ে নমস্কার করার ভঙ্গি করেছ কেন? ওটারও দরকার নেই। ওনলি 'আসুন-আসুন' উইল ডু।"

বাধ্য ছাত্রীর মতো হাত নামিয়ে নিয়ে জোসি বলল, 'আসুন-আসুন।'

পূর্ণদা আর একবার হেসে উঠে অবিকল মাস্টারমশাইয়ের ঢঙে বললেন, 'গুড।'

কৌশিকের চোখ আটকে গিয়েছিল ডেভিসের ওপর। পরনে হাফপ্যান্ট আর স্যান্ডোগেঞ্জি। মানুষটার স্বাস্থ্য যে এত ভাল আগে বোঝা যায়নি। চওড়া কাঁধ, বডিবিল্ডারের বুক। দু হাতের দুটো মস্ত বাইসেপ থেকে পেশী যেন উপচে পড়ছে। কিন্তু শার্ট পরলে এই মানুষটির চেহারাই পাল্টে যায়। একটু চোয়াল ভাঙা মুখ, মাথায় পাতলা চুল, চোখে হাই পাওয়ারের চশমা। দেখলে তখন ওকে স্কলার ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না।

এক টেবিলে কয়েকবার খাওয়া-দাওয়া করলে চেয়ারগুলোও বুঝি নির্দিষ্ট আসন হয়ে যায়। তখন যে যার চেয়ারে গিয়ে বসে। নির্দিষ্ট চেয়ারে কৌশিক আর ওর পূর্ণদাও বসল।

লাঞ্চের মেনুতে রকমফের। আজ মাছ ফ্রাই, আলু ফ্রাই। বরবটি আর পটলের ফালি দিয়ে সেদ্ধ-সেদ্ধ তরকারি। ভাতের সঙ্গে রুটির ব্যবস্থাও আছে।

স্যালাডের প্লেটটা এগিয়ে দিয়ে মিষ্টি হেসে জোসি বলল, 'খাওয়া শুরু করা যাক তা হলে।'

পূর্ণদা বললেন, 'নিশ্চয়ই। এত ভাল-ভাল খাবার বেশিক্ষণ সামনে ফেলে রাখা ঠিক নয়।'

চামচ দিয়ে যে যার পছন্দসই খাবার তুলে নিল প্লেটে। বাঁ হাতি ডেভিস কাঁটা দিয়ে বড় একটা ফিশফ্রাই তুলে নিল। খাওয়ার সময় ওর মাথা বোধহয় একটু বেশি নিচু হয়। হঠাৎ অবাক হয়ে কৌশিক লক্ষ করল, ডেভিসের বাঁ হাতের বাইসেপের পাশে মস্ত এক

পাঁচমুখো সাপের উল্কি। ফিশফ্রাইয়ের টুকরো কাঁটায় গেঁথে মুখে দেওয়ার সময় সাহেবের হাতের উল্কির সাপও নড়ছিল।

কৌতূহল দমন করতে না পেরে কৌশিক জিজ্ঞেস করে বসল, 'আপনার হাতে ওটা কী?'

কৌশিকের দৃষ্টি অনুসরণ করে প্রশ্নটা ধরতে পারল সাহেব, তারপরে মুচকি হেসে বলল, "ইট'স এ ট্যাট্টু। আই লাভ ইট। বাই দি ওয়ে, ট্যাট্টুকে বাংলায় কী যেন বলে?'

'উল্কি।'

'রাইট, উলাকি।'

পূর্ণদার নজরও পড়েছিল সাহেবের উল্কির ওপর। অবাক হয়ে বললেন, 'পঞ্চমুখী সাপ। সাপের চেহারার সঙ্গে আমাদের ভাগবতের কালনাগের মিল আছে দেখছি।'

তারিফ করার গলায় ডেভিস বলল, 'আপনি ঠিক বলেছেন মিস্টার চ্যাটার্জি। এ হচ্ছে কালীয়া, যাকে দমন করেছিল শ্রীকৃষ্ণ।'

বিস্ময় ঠিকরে পড়ছিল পূর্ণদার চোখমুখ থেকে। 'আপনি দেখছি আমাদের হিন্দুশাস্ত্রের কথাও জানেন। যমুনা নদীতে কালীয়কে দমন করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ।'

ডেভিস হাসতে হাসতে বলল, 'আমি হিন্দুশাস্ত্র একটু-একটু জানি। তন্ত্রামন্ত্রা বিশ্বাস করি, ফকিরের কেরামতিতে বিশ্বাস করি। আমি কাশীতে আর আজমিরে অনেক দিন ছিলাম। আই বিলিভ ইন কাল্ট।'

কৌশিক বলল, 'কিন্তু উল্কি করাতে তো খুব কষ্ট হয় শুনেছি।'

চওড়া কাঁধ ঝাঁকিয়ে সাহেব জবাব দিল, "হ্যাঁ, একটু। বিকজ ইট'স এ ইনডিলাইয়েবল প্যাটার্ন। পিগ্‌মেন্টস আর ইনসার্টেড ইন পাংচার্‌স। কিন্তু তার পর এটাকে কত সুন্দর দেখতে লাগে বলুন তো?"

পূর্ণদা উল্কির ভক্ত নন একেবারেই। একটু কষ্ট করে হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, তা ঠিক।'

হঠাৎ ডেভিস প্রসঙ্গ পালটিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, মিস্টার চ্যাটার্জি, আপনি তো বার্নিয়েরের খুব অ্যাডমায়ারার। আপনার কি মনে হয়, আজ থেকে সাড়ে-তিনশো বছর আগে বার্নিয়ের শুধুমাত্র বেড়াবার জন্যেই হিন্দুস্থানে এসেছিলেন?'

পূর্ণ চ্যাটার্জি একটু অবাক হয়ে বললেন, 'তা ছাড়া আবার কী? ওঁর ট্রাভেল স্টোরি পড়ে তাই তো মনে হয়। তা ছাড়া উনি ছিলেন একজন অত্যন্ত শিক্ষিত মানুষ, দার্শনিক। সব কিছু দেখা এবং বোঝার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। উনি আবার পেশায় ছিলেন চিকিৎসক।'

'কী রকম ডাক্তার? কোয়াক?'

'না-না, হাতুড়ে ডাক্তার হতে যাবেন কেন? আরে, এ ব্যাপারে আমাদের তর্ক করার কোনও মানে হয় না! ওঁর বংশধর জোসিই তো আছে আমাদের সঙ্গে। জোসিই তো সব বলতে পারবে।'

মৃদু অভিমানের ভঙ্গিতে ঠোঁট উল্টে জোসি বলল, 'আমি ডেভিসকে সব বলেছি। কিন্তু ও বিশ্বাস করতে চায় না।'

অবাক হলেন পূর্ণদা। 'বিশ্বাস করতে চায় না। সে আবার কী কথা!'

বরবটি আর পটলের ফালি দিয়ে বানানো তরকারির ওপর কাঁটা ঘোরাতে ঘোরাতে জোসি বলল, 'বার্নিয়ের ওয়াজ আ কোয়ালিফায়েড ডক্টর। লাইসেনসিয়েট পরীক্ষায় পাশ

করে ডক্টর হয়েছিলেন। ডেভিসের যুক্তি হল—উনি যদি অত বড় একজন ফিজিশিয়ান হবেন তা হলে ফ্রান্সে প্রাকটিস না করে ডেঞ্জারাস হিন্দুস্থানে এতগুলো বছর নষ্ট করলেন কেন?'

পূর্ণদা বুঝতে পারলেন ডেভিস জোসিকে নিয়ে একটু মজা করছে। হাসতে হাসতে জোসিকে বললেন, 'তুমি বললে না কেন বার্নিয়ের বিরাট ডাক্তার না হলে তামাম হিন্দুস্থানের সম্রাট ঔরঙ্গজিবের হাউস-ফিজিসিয়ানের চাকরি পেতেন না উনি।'

ডেভিস বাঁ হাতের কাঁটা দিয়ে আর একটা ফ্রাই গেঁথে প্লেটে তুলে নিয়ে বলল, 'বার্নিয়েরের বড় ডাক্তার কি ছোট ডাক্তার সে তর্কের মধ্যে আমি যেতে চাই না। আমার ধারণা, বার্নিয়ের হিন্দুস্থানে এসেছিলেন ব্যবসা করতে। আপনি কি বার্নিয়েরের ব্যবসা করার কোনও রেফারেন্স পেয়েছেন কোথাও?'

'না-না, অন্য কোথাও ওঁর ব্যবসা করার রেফারেন্সের কথা শুনিনি।'

'কিন্তু তখন তো বেশির ভাগ ইউরোপিয়ানরা হিন্দুস্থানে ব্যবসা করার জন্যেই আসত। ইন্ডিয়া ওয়াজ আ ল্যান্ড অব গোল্ড অ্যান্ড জুয়েল। বার্নিয়েরের সময় আর একজন ফ্রেঞ্চ ট্রাভেলার হিন্দুস্থানে এসেছিলেন, তাভারনিয়ের—আপনি তো সেদিন বলছিলেন, উনি বিরাট ব্যবসাদার ছিলেন। হিন্দুস্থান থেকে কোটি কোটি টাকা রোজগার করে আর বিস্তর হিরে, চুনি, পান্না সঙ্গে নিয়ে দেশে ফিরে গিয়েছিলেন।'

পূর্ণদা হেসে উঠে বললেন, 'সে কি আমার কথা। তাভারনিয়েরের কথা। আমি ওঁর লেখা বই পড়েই বলেছি। তাভারনিয়ের ছিলেন একজন নামকরা জুয়েলার। হিরে, মণি, মুক্তো—এই সব কেনাবেচাই ছিল ওঁর ব্যবসা। ওঁর খদ্দেরদের মধ্যে ওদিকে ছিলেন ঔরঙ্গজিব এদিকে বাংলার শায়েস্তা খান। দেশে ফিরেও কিং ফোর্টিন্থ লুইয়ের কাছে বিরাট মাপের হিরে ও দামি রত্নটত্ন বিক্রি করেছেন। বিরাট ব্যবসাদার ছিলেন তাভারনিয়ের। তবে হ্যাঁ, ওঁর ভ্রমণকাহিনীটিও অসাধারণ। সাড়ে-তিনশো বছর আগেকার হিন্দুস্থানের ব্যবসা-বাণিজ্য কেমন ছিল জানতে হলে—এই বইটা সবার আগে পড়া দরকার।'

পূর্ণদা আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন তার আগেই চাপা একটা হইচই শোনা গেল একতলার রান্নাঘরের দিকে। তার পরেই পারভেজ প্রায় ছুটে এসে বলল, 'কাল, একটা বাঘ মরেছে জঙ্গলে।'

পূর্ণদা চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ভাবে?'

'সেটা এখনও জানা যায়নি। ফরেস্ট-গার্ডরা জঙ্গলে ঢুকেছে। আমরা এইমাত্র একটা জেলের মুখ থেকে খবরটা শুনলাম।'

কৌশিক প্রশ্ন করল, 'কোথায়? মানে জঙ্গলের কোন্ দিকটায় বাঘ মরেছে?'

পারভেজের উত্তেজনা এবার একলাফে অনেকটা বেড়ে গেল। 'কাল রাত্তিরে আমাদের লঞ্চ যেখানে নোঙর ফেলেছিল, তার কাছেই খাঁড়ির পাশের জঙ্গলে। ওই জঙ্গল থেকে লঞ্চ পর্যন্ত বাঘের সাঁতরে আসা কিছুই নয়। আমরা আবার রান্নাঘরের দরজা খোলা রেখে শুয়েছিলাম—।'

ডেভিস হঠাৎই উত্তেজিত হয়ে বলল, 'কেন? দরজা খুলে শুয়েছিলে কেন? তোমরা তো সুন্দরবনের লোক, তোমরা কি জানো না জঙ্গলের কাছাকাছি থাকলে রাত্তিরে দরজা খোলা রেখে শুতে নেই?'

ধমক খেয়ে কাঁচুমাচু হয়ে গিয়েছিল পারভেজ।

জোসি শুকনো মুখে জিজ্ঞেস করল, 'বাঘটা কী ভাবে মরল?'

দু-দিকে মাথা নাড়িয়ে পারভেজ জবাব দিল, 'সেটা এখনও জানতে পারিনি।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে পূর্ণদা বললেন, 'জঙ্গলের বাঘ নানা কারণে মরতে পারে। এক নম্বর—চোরাশিকারির গুলিতে। দু নম্বর—এক বাঘের এলাকায় আর এক বাঘ ঢুকে পড়লে। তখন একটা বাঘের আক্রমণে আর একটা বাঘ মরে। তা ছাড়া—।'

কৌশিক কেমন যেন পালা করে ডেভিস আর জোসির মুখের দিকে তাকিয়ে ওদের প্রতিক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করছিল। একটুখানি চঞ্চলতা যেন ওদের চোখেমুখে ঘোরাফেরা করছিল, কিন্তু তার বেশি আর কিছুই নয়।

॥ ১৩ ॥

রাত পৌনে এগারোটা। শীত আগের তুলনায় কমে গেছে বেশ খানিকটা। তবে মাঝেমধ্যে কনকনে দমকা হাওয়া ছাড়ছিল। রাস্তায় বিশেষ লোকজন নেই। গাড়ির সংখ্যাও কমে গেছে। কিন্তু শীত কম-বেশি যাই হোক না কেন, দরকারি কাজকর্ম, কথাবার্তা তো আর থেমে থাকতে পারে না। থানার বড়বাবু অবনী ঘোষরায়ের ঘরে পিওনগোছের একটি লোক ঢুকতেই নড়েচড়ে বসলেন উনি। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লোকটাকে একবার দেখে নিয়ে চাপা গলায় ইন্সপেক্টর বললেন, 'তুমি তো দেখছি একেবারে বহুরূপী মুখার্জি। এক-একবার এক-এক ধরনের ভোল্। চমৎকার মেক-আপ। কিন্তু এত ড্রেসফ্রেস তুমি জোগাড় করছ কোত্থেকে? কোনও থিয়েটার কোম্পানির সঙ্গে জানাশোনা আছে নাকি?'

লাজুক হেসে মুখার্জিবাবু বললেন, "না, স্যার। আমরা যখন যাত্রা-থিয়েটার করতাম তখন চরিত্র অনুসারে যে যার পোশাক-আশাক বানিয়ে নিত। কোম্পানির হাতে দুটো পয়সা এলে কস্টিউমের খরচা দিয়ে দিত। তা, সব মিলিয়ে তো কম চরিত্রে অভিনয় করিনি। আমি সব পোশাক খুব যত্ন করে বাক্সে রেখে দিতাম। কখন কোন্‌টা আবার কাজে লেগে যাবে—কে জানে! কিন্তু যাত্রা-থিয়েটার করার কপাল নিয়ে ক'জন জন্মায় বলুন! একটু নামটামও করেছিলাম। তবে আমাদের নট্টকোম্পানিই উঠে গেল। দু-একটা দল থেকে তখন ডাক পেয়েছিলাম স্যার, কিন্তু কেঁচে গেল। আসলে স্যার, এ লাইনে বড্ড খেয়োখেয়ি, ল্যাং মারামারি! কিছু লোক তো মালিকের কান ভারী করার জন্যে বসে থাকে সব সময়।"

যাত্রা-থিয়েটার করতে না পারার পুরনো দুঃখ হঠাৎই উথলে উঠেছিল মুখার্জিবাবুর, কিন্তু এ সব কথা শোনার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র উৎসাহ ছিল না থানার বড়বাবুর। উনি পেন্সিলের উল্টো দিকটা কানের মধ্যে ঘোরাতে ঘোরাতে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী খাবে? চা না কফি?'

যাত্রা-থিয়েটারের সোনালি জগৎ নিয়ে স্মৃতিচারণ করার সময় এই ধরনের একটা রসকষহীন প্রশ্ন শুনে একটু মুষড়ে পড়েছিলেন মুখার্জিবাবু। কিন্তু পঞ্চাশ-পেরুনো এই মানুষটি একই সঙ্গে দেখে দেখা এবং ঠেকে শেখার দলে। বুঝে গেছেন, ব্যক্তিগত দুঃখ নিয়ে কোনও এক জায়গায় বেশিক্ষণ থেমে থাকা অর্থহীন। ছোট্ট একটা ঢোক গিলে বড়বাবুর কথার জবাব দিলেন মুখার্জিবাবু। 'কফিই বলতে পারেন স্যার। তবে আমার কফিতে বেশি করে দুধ আর চিনি দিতে বলবেন।'

বেল বাজালেন বড়বাবু। সুইং-ডোর ঠেলে একজন কনস্টেবল উঁকি মারতেই বড়বাবু বললেন, 'আমাদের জন্য দুটো কফির ব্যবস্থা করো তো। একটা আমি যেমন খাই তেমনি, আর একটা যত খুশি দুধ আর চিনি দিয়ে বানাতে বলবে। আর শোনো, রাজনৈতিক দলের কোনও উঠতি নেতা-টেতা দেখা করতে এলে ছোটবাবুর ঘর দেখিয়ে দেবে। বলবে, আমি এখন খুব ব্যস্ত। লক্ষ রাখবে, হুট্ করে কেউ যেন আমার ঘরে ঢুকে না পড়ে।'

কনস্টেবল সরে যেতেই নিচু গলায় বড়বাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কী, এই দু-দিনের খবরাখবর কী বলো? নজরদারি করেছিলে হারামজাদা ঘুঘুটার ওপর?'

'হ্যাঁ, আমি তো ওব পেছনেই লেগেছিলাম।'

'কী দেখলে, সব বলবে—এমনকী যে সব ব্যাপার তোমার খুব তুচ্ছ বলে মনে হয়েছে—সে সবও।'

ঠোঁটের ওপবের সরু, পাকানো নকল গোঁফটা আলতো করে দু-তিনবার চেপে ধরার পরে মুখার্জিবাবু বললেন, 'রঘু জালান তো কোর্ট থেকে জামিন পেয়ে গেল স্যার। তা, আদালত থেকে বেরুবার পরে যারা ওর জামিন নিতে এসেছিল—তাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ গুজগুজ, ফিসফাস করার পরে একটা ট্যাক্সিতে চাপল। দুপুরবেলা তো, স্ট্যান্ডে বেশ কয়েকটা ট্যাক্সি ছিল। আমি চাপলাম ওদের ঠিক পরেরটায়।'

'কোথায় ও নামল ট্যাক্সি থেকে?'

'ওর সেই বাড়িতে—যে বাড়িটা আপনি রেড করেছিলেন স্যার।'

'বাড়িতে ছিল কতক্ষণ?'

'সন্ধে পর্যন্ত। সঙ্গের লোকজন ওকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে চলে গিয়েছিল। তবে ওদের ভেতর থেকে সন্ধেবেলায় একজন ফিরে এসেছিল আবার। পাক্কা ক্রিমিনাল-মার্কা চেহারা লোকটার। হাবভাব দেখেই বোঝা যায়—রঘুর এক নম্বরের শাগরেদ। বুঝলাম, বেরুবে বলেই সন্ধেবেলায় লোকটাকে আসতে বলেছে রঘু। ও আসার মিনিট-পাঁচেকের মধ্যেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল দুজনে।'

'বেরিয়ে কোথায় গিয়েছিল?'

'একটা ট্যাক্সিতে উঠল। আমার কপাল ভাল, ওদের ট্যাক্সিটা ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমিও একটা পেয়ে গিয়েছিলাম। পিছু নিয়েছিলাম ওদের ট্যাক্সির। এ গলি সে গলি, এ রাস্তা সে রাস্তা ঘুরে থামল গিয়ে ধাপা-ট্যাংরায়। আপনি ও দিকে এর মধ্যে গেছেন স্যার?'

'না, বহুকাল যাওয়া হয়নি।'

'গেলে বুঝতে পারতেন, অন্নপ্রাশনের ভাত বেরিয়ে আসা বলতে কী বোঝায়! ধাপা-ট্যাংরা এলাকায় সার-সার ট্যানারি। এখন বোধহয় আরও বেড়ে গেছে। কাঁচা চামড়া ওখানে ট্যান করা হয়। কী উৎকট গন্ধ আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। তবে যারা ওখানে

নিয়মিত যায়, গন্ধটা তাদের বোধহয় গা-সওয়া হয়ে গেছে। রঘুকে দেখে তাই তো মনে হয়েছিল। একবারের জন্যেও রুমাল বার করে নাকে চেপে ধরেনি।'

'কী করছিল রঘু ওখানে গিয়ে?'

"কোথাও খুব নিয়মিত যাতায়াত থাকলে হাবভাব যেমন হয়, রঘুর হাবভাব ঠিক সেই রকমই ছিল। ট্যাক্সি থেকে নামল বিশাল এক ট্যানারির সামনে। তিন-মানুষ উঁচু পেল্লায় এক লোহার গেট। গেটটা বন্ধ ছিল ভেতর দিক থেকে। ট্রাক বা ভ্যানের জন্য খোলা হয় গেট। লোকজনের যাতায়াতের জন্যে গেটের এক ধারে ছ' ফুট বাই তিন ফুট দরজা আছে। ওই দরজাটাও বন্ধ ছিল, কিন্তু রঘুরা কাছে যেতেই খুলে গিয়েছিল দরজা। ওরা ঢুকতেই দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আবার। আমি আর কী করব! ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলাম। এদিক-ওদিক পায়চারি করলাম। ধারে কাছে কোনও চায়ের দোকান ছিল না। থাকলে অন্তত কিছুক্ষণ বসে বসে নজরদারির কাজ চালানো যেত। রঘুরা ওই ট্যানারি থেকে বেরুল পাক্কা এক ঘণ্টা বাদে। চোখমুখ দেখে দুজনকেই বেশ খুশি খুশি মনে হচ্ছিল।"

'তারপর? তার পর কোথায় গেল?'

'সোজা হাঁটতে লাগল। ভাবলাম ট্যাক্সির খোঁজ করছে। ওখানে কোনও ট্যাক্সির স্ট্যান্ড নেই। কেউ যদি ট্যাক্সিতে চেপে এসে ছাড়ে, তা হলেই পাওয়া সম্ভব।'

'এলাকাটা কেমন?'

'বাজে। মাঝারি মাপের রাস্তার একধারে ট্যানারির উঁচু দেয়াল, আর এক ধারে বস্তি আর মাঠকোঠাগোছের বাড়িঘর। রাস্তার দূরে দূরে দু-তিনটে স্ট্রিট ল্যাম্প। টিমটিমে আলো। চিনে পাড়া।'

'হ্যাঁ, ট্যানারদের মধ্যে প্রচুর চিনে আছে।'

'ছোট-ছোট চোখ। চোখমুখ দেখে চিনেদের মনের কথা বোঝা শক্ত। আচ্ছা, ওরা খুব ডেঞ্জারাস টাইপের লোক হয়, না স্যার?'

মুখার্জিবাবুর প্রশ্ন শুনে হা-হা করে হেসে উঠলেন বড়বাবু। তারপর হাসতে হাসতেই বললেন, 'খামোকা ডেঞ্জারাস হতে যাবে কেন? ধাপা আর ট্যাংরার বেশির ভাগ চিনেই কারবারি লোক। ট্যানার হিসেবে ওদের খুব সুনাম। বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট এলাকায় ওদের প্রচুর জুতোর দোকান আছে। এক সময় তো চিনেবাড়ির জুতোর খুব চাহিদা ছিল। বড়-বড় কোম্পানি ফেলে লোকে চিনেবাড়ির জুতো কিনতে ছুটত। এখনকার খবর অবশ্য আমি জানি না। চিনে রান্নারও তো খুব সুখ্যাতি আছে। কিছু কিছু চিনে রেস্তোরাঁয় লোকে লাইন দিয়ে বসে থাকে খাওয়ার জন্যে। ট্যাংরাতেও শুনেছি ইদানীং বেশ কয়েকটা সাজানোগোছানো রেস্টুরেন্ট হয়েছে। চিনেপাড়া, চিনে মালিক, চিনে রাঁধুনি, চিনে ওয়েটার—খাবার ভাল না হয়ে উপায় নেই।'

'কিন্তু স্যার, এ দোকানটা তেমন সাজানো-গোছানো নয়।'

'তুমি ওখানে আবার খেতেও ঢুকেছিলে নাকি?'

'খাব বলে ঢুকিনি স্যার, রঘুর পিছু নিতে গিয়ে ঢুকতে হয়েছিল। হঠাৎ দেখি ডান দিকের একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল ওরা। পা চালিয়ে পিছু নিলাম ওদের। দেখি, পাঁচ-সাতটা বাড়ি পরে একটা বাড়ির পর্দা ঠেলে ঢুকে পড়ল ভেতরে। পর্দাটা বেশ ভারী, ভেতরের কিছুই দেখা

যাচ্ছিল না। গলির মধ্যে ওই ভাবে একা-একা দাঁড়িয়ে থাকা তো বিপজ্জনক। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে সদুত্তর দিতে পারব না। তখন চোর বলে ঠেঙাতে শুরু করলে তো গেলাম! আজকাল এই ধরনের পিটুনি তো লোকটা মারা না যাওয়া পর্যন্ত থামে না। গলি ছেড়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালাম। দূর থেকে নজর রাখছিলাম বাড়িটার ওপর।'

'তারপর?'

'দেখি, কিছু-কিছু লোক পর্দা ঠেলে ভেতরে ঢুকছে, কেউ-কেউ আবার বেরিয়েও আসছে। যারা বেরুচ্ছে, তাদের মনে একটু যেন ফূর্তির ভাব। চড়া গলায় কথা বলতে বলতে হাঁটছে। তখনই আমার সন্দেহ হল।'

'সন্দেহ! কী সন্দেহ?'

'আবার গেলাম পর্দা ফেলা ঘরটার কাছে। নাক টানতে টানতে দু-চারবার পায়চারি করলাম ওখানে।'

'নাক টানছিলে কেন, সর্দি হয়েছিল নাকি?'

"না-না, নাক টানা মানে ঘ্রাণ নেওয়া। চিনে খাবারের ঘ্রাণ কি আর ভারী পর্দা টাঙিয়ে ঢেকে রাখা যায়? বুঝলাম, ওটা একটি স্থানীয় চিনে রেস্টুর‍্যান্ট। একটু ঝুঁকি নিয়েই ঢুকে পড়লাম আমি। যদি দেখি খাবারের দোকান নয়, 'স্যরি' বলেই কেটে পড়ব।"

'ঢুকলে?'

'হ্যাঁ, ঢুকলাম। যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই। একটা চিনে রেস্টুর‍্যান্ট। তবে সাজানো-গোছানো বলতে যা বোঝায় তেমন কিছু নয়। এটাকে কী বলব, রেসিডেন্সিয়াল কোয়ার্টার্স-কাম-রেস্টুর‍্যান্ট। ঘরের মধ্যিখানে মস্ত একটা টেবিল, তার চারপাশে গোটা চোদ্দো-পনেরো চেয়ার। সবাই খাবার-দাবার আর ড্রিংক্স নিয়ে বসে পড়েছে। সবাই ধরতে গেলে সবাইকে চেনে। বুঝলাম, একেবারেই ঘরোয়া ঠেক।'

বড়বাবু চোখ বড় বড় করে বললেন, 'ওখানে সবাই যদি সবাইকে চেনে, তুমি তো তা হলে সবার কাছেই অচেনা।'

'হ্যাঁ স্যার, ওখানে গিয়ে ঝপ্ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ার পরে আমার তো তাই মনে হচ্ছিল। সবার চোখই আমার ওপর। সাইড পকেটে নট্টকোম্পানির কিছু পুরনো চিঠিপত্তর ছিল। ওই লোকগুলোর চোরা চাউনি এড়াবার জন্যে পকেট থেকে ওই চিঠিগুলো বার করে খুঁটিয়ে দেখার ভান জুড়ে দিলাম। আমার কপাল ভাল বলতে হবে, ওই নক্‌শাটা কাজে লেগে গিয়েছিল দারুণ ভাবে। দোকানের বারম্যান টাইপের বুড়ো চিনেটা এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'মেরা কোই চিঠ্‌ঠিউঠ্‌ঠি হ্যায়?' গম্ভীর ভাবে দু দিকে মাথা নাড়িয়ে জানিয়ে দিলাম—না, নেই। বুঝলাম, ক্যুরিয়ার সার্ভিসের কোনও চেনা লোকের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছে আমাকে। কিছুক্ষণ বাদেই টের পেলাম আমার ধারণা অভ্রান্ত।'

'কী ভাবে?'

একটু পরেই ওই বুড়ো চিনেটা আমার সামনে এক পেগ রাম আর জলের বোতল নামিয়ে রেখে গেল ঠক্ করে। তার মানে ওই বুড়োটা যার সঙ্গে আমাকে গুলিয়ে ফেলেছে—সে ব্যাটা রামভক্ত। অর্ডার না দেওয়া সত্ত্বেও রাম এসে যেতে দেখে চোরা-চাউনি-দেওয়া লোকগুলো বুঝল, আমি এই দোকানের পুরনো খদ্দের। তখন যে যার কথাবার্তা আর খাওয়া-দাওয়ায় মন দিয়েছিল আবার।'

মুচকি একটা হাসি ফুটে উঠেছিল বড়বাবুর ঠোঁটের ফাঁকে। 'চোরা চাউনির হাত থেকে বেঁচে তো গেলে, কিন্তু ওই মদটা নিয়ে করলে কী? ও সব কি তোমার চলেটলে?'

একটু লাজুক-লাজুক মুখ করে মুখার্জিবাবু বললেন, 'আপনাকে মিথ্যে কথা বলব না স্যার, আমি যখন আমাদের নট্টকোম্পানিতে ছিলাম তখন এ সব আমাদের একটু খেতেটেতে হত। সিজন-টাইমে গাঁ-গঞ্জে যখন রাতেব পর রাত পালা চলত, তখন আমাদের মাস্টারই বলত . ফাঁকে ফাঁকে দু-পাত্তর রাম টেনে নাও, নইলে সারা রাত ধরে পালা টানতে পারবে না। তা, তখনই অভ্যাসটা তৈরি হয়ে গিয়েছিল।'

'অ্যাঁ, বলো কী হে' তার পর থেকেই ওটা চালিয়ে যাচ্ছ?'

জিভ কেটে মুখার্জিবাবু বললেন, 'যাত্রা-থিয়েটার ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওটাও ছেড়ে দিয়েছি স্যার। তখন খেয়ে ভাল থাকতাম, এখন না খেয়ে ভাল থাকি। তা ছাড়া স্যার, আমাদের এই এখনকার পেশায় নেশা-ভাঙের দাস হওযাটা ঠিক নয়, কী বলেন স্যার?'

গলা খুলে হেসে উঠে বডবাবু বললেন, 'জ্ঞান তো খুব টনটনে। তা, ওই একটা পেগেই থেমেছিলে, না কি—।'

'আসলে ওই বুড়ো চিনেটা যাব সঙ্গে আমাকে গুলিয়ে ফেলেছিল তার ভূমিকাতেই আমাকে অভিনয় করে যেতে হয়েছিল স্যার। আমি ইচ্ছে করেই ওর ভুল ভাঙাইনি। ভুল ভাঙানো মানেই আবাব ঘবভর্তি লোকেব কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে পডা। তার থেকে উটকো জায়গায় একটা বিপদটিপদও ঘটে যাওয়া অস্বাভাবিক নয।'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মুখার্জিবাবুকে মেপে নিয়ে বড়বাবু কেটে কেটে জিজ্ঞেস করলেন, 'তা, ওদের কৌতূহলী দৃষ্টি এড়াবার জন্যে শেষ পর্যন্ত ক'টা পাত্তর মেরেছিলে?'

'তিন স্যার।'

'তিন! তা হলে তো রঘু আর ওর শাগরেদেব ওপর নজরদারি করা তোমার মাথায় উঠে গিয়েছিল।'

'না স্যার। তিন পর্যন্ত আমার কোনও অসুবিধে হয় না। এটা আমার স্যার অনেক বছর আগের হিসেব থেকেই জানি। তবে সত্যি কথা বলতে কি, কাল সন্ধেয় ড্রিংকটা আমি একেবারেই এনজয় করতে পারিনি। আসলে বহু বছর তো ও সব আর ছুঁইটুইনি।'

'এবার পর-পর ক'টা দিন ছোঁও, দেখবে কালকের অসুবিধেটা কেটে গেছে একদম। দিব্যি আবার আগের মতো এনজয় করতে পারছ।'

জিভ কেটে মুখার্জিবাবু বললেন, "না স্যার, আমি আর ও লাইনে যাচ্ছি না। না খেয়েই যদি ভাল থাকতে পারি, তা হলে আর অকারণে পয়সা খরচা করতে যাব কেন? রবীন্দ্রনাথের কোন্ একটা নাটকে শুনেছিলাম স্যার—একটা চরিত্র আর একটা চরিত্রকে বলছে, 'আমি এখন বিনি-মদের নেশা করি।' ফাস ক্লাস সংলাপ স্যার। এই বিনি-মদের নেশাটা যদি চালু হয়ে যায়—লোকের শরীর আর পয়সাকড়ি দুটোই বাঁচবে।"

থানার কাছেই একটা ছোট্ট চা-বিস্কুট-ডিম ভাজার দোকান আছে। কফির খদ্দের এখানে বিশেষ নেই, কিন্তু বড়বাবুর জন্যে দোকানদার কফির ব্যবস্থা রেখেছে। ওখান থেকে এক ছোকরা একটা ট্রেতে চাপিয়ে দু কাপ কফি নিয়ে এল। বড়বাবুর জন্যে চিনি ছাড়া কালো কফি, আর ওঁর অতিথির জন্যে দুধ চিনি মেশানো কফি।

কফির কাপে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে বড়বাবু বললেন, 'কফি খাও মুখার্জি।'

কফির কাপে চুমুক দিয়ে কেমন যেন একটা গা-ঝাড়া দেওয়ার ভঙ্গি করলেন মুখার্জিবাবু।

ভঙ্গিটা নজরে পড়তেই বড়বাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার, কফিটা ভাল হয়নি নাকি?'

'এ কফি কোথায় স্যার, এ তো গরম ঘোল।'

'ঠিক আছে, আর খেও না। আমি পালটে দিতে বলছি—।'

'না-না, পালটাতে বলার দরকাব নেই। আমার বাপ-মাযেব একটা উপদেশই আমি সাবা জীবন ধরে মেনে চলার চেষ্টা করি স্যাব। বাবা-মা বলতেন : যখন যেখানে যা পাবি, সোনা মুখ করে খাবি ; দেখবি তোর আর কোনও কষ্ট থাকবে না। তা আমি এটা মেনে চলি স্যার।'

দোর্দণ্ডপ্রতাপ পুলিশ ইন্সপেক্টর দেয়ালঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে নিযে গাঁক-গাঁক করা গলায় বললেন, 'এত গালগল্প যখন জুড়েছ, বুঝতে পারছি, কাজের কাজ কিছুই হয়নি।'

'না স্যার, একেবারে যে হয়নি, তা নয়।'

'যদি হয়েই থাকে, সেটার কথা বলছ না কেন? তখন থেকে শুধু রসিয়ে-রসিয়ে মদ খাওয়ার গপ্পোই শুনিয়ে যাচ্ছ।'

হঠাৎই কেমন যেন অসহিষ্ণু হয়ে পড়লেন বড়বাবু।

ম্লান মুখে একটা ঢোক গিলে মুখার্জিবাবু বললেন, 'রঘু আর ওর শাগরেদের দিকে নজর রেখেছিলাম স্যার। দুজনে মিলে খুব ফিসফিস, গুজগুজ করছিল। এক ফাঁকে রঘু একটা খাম ধরাল শাগরেদের হাতে। শাগরেদ যে ভাবে ওটা যত্ন করে জামার ভেতরের পকেটে ঢোকাল তাতে বুঝলাম—খামে মোটা টাকা আছে।'

'কী কথাবার্তা হচ্ছিল ওদের মধ্যে—সে সব কিছু কানে আসেনি?'

'না স্যার, দুজনেই খুব সেয়ানা। পটাপট বেশ কয়েকটা পাত্তর মেরে দিয়েছিল, কিন্তু গলার স্বর একেবারেই ওপরে তুলছিল না। একবারই শুধু—তখনই প্রিন্সেস স্ট্রিটের একটা কোম্পানির নাম কানে এসেছিল। আমি হাত আড়াল করে ন্যাপকিনের ওপর ওই নামটা লিখে নিয়েছিলাম চট করে। আজ বিকেল তিনটেয় অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল—।'

'আজ? গিয়েছিলে তুমি? দেখা পেয়েছিলে ওদের?'

প্রশ্নের উত্তরে নিস্পৃহ ভঙ্গিতে উত্তর দিলেন মুখার্জিবাবু, 'হ্যাঁ স্যার।'

উত্তেজনার চাপে সামনের দিকে একটু বুঝি ঝুঁকে পড়েছিলেন বড়বাবু। 'কী দেখলে প্রিন্সেপ স্ট্রিটে গিয়ে?'

'ওখানে ওই নামের বেশ বড়সড় একটা ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি আছে। নাম—চাঁদ ট্রাভেল্‌স।'

'গিয়ে দেখলে রঘু এসে গেছে?'

'না স্যার। আমি ওখানে পৌঁছবার মিনিট-পনেরো বাদে এসেছিল। রঘু আর ওর ওই শাগরেদ। ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির অফিসে না ঢুকে রাস্তাতেই দাঁড়িয়েছিল ওরা। বুঝতে পারলাম কারও জন্যে অপেক্ষা করছে।'

'তুমি—তুমি কোথায় ছিলে তখন?'

'একটু দূরে, একটা পানের দোকানের সামনে।'

'তোমাকে ওরা আবার চিনে ফেলেনি তো?'

'কী করে চিনবে স্যার। আমার কালকের মেক-আপের সঙ্গে আজকের মেক-আপের কোনও মিল নেই। কাল আমার এই গোঁফটা ছিল না। মাথার এই টুপিটা ছিল না। কাল চোখে চশমা ছিল। আজ নেই। তা ছাড়া প্রিন্সেপ স্ট্রিট তো ছোটখাটো অফিসে ভর্তি। চারপাশে আমার মতো পিওন মার্কা লোক ছিল গাদা-গাদা। আমি ওদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলাম দিব্যি।'

'কী হল তারপর? কী করল রঘু হারামজাদা?'

'অপেক্ষা করছিল স্যার, কিন্তু অপেক্ষা যে ওদের জন্যে—সেটা বুঝতে পারিনি!'

'ওদের জন্যে মানে কাদের জন্যে?'

'ওই স্যার ভোলা আর পচনের জন্যে।'

টানটান হয়ে বসলেন ইন্সপেক্টর। 'ওরা কী করছিল ওখানে?'

'একটা ট্যাক্সি থেকে নামল স্যার। তারপর ট্যাক্সির ডিকি থেকে দু পেটি মাল নামাল।'

'কী মাল?'

'বুঝতে পারলাম না স্যার। প্যাকিং বক্সে যত্ন করে মোড়া। চারদিক আবার স্টিলের টেপ দিয়ে বাঁধা। যে ভাবে দুজনে ধরে ধরে ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির অফিসে ঢোকাল, তাতে বুঝলাম বেশ ভারী মাল।'

'তার পর?'

'আমি পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়েছিলাম। ভিড়ের আড়াল থেকে লক্ষ্য করলাম, রঘু একটা খাম ধরাল পচনের হাতে। বুঝলাম টাকার খাম। খাম পেয়ে পচন আর ভোলা বুঝি খুশি হয়নি। ওই নিয়েই বোধহয় কিছু বলেছিল। ব্যাস, সঙ্গে সঙ্গে দাবড়ে উঠেছিল রঘু। পচনরাও একটু রুখে দাঁড়িয়েছিল। কী বলছে শোনার জন্যে আর একটু কাছে এগিয়ে গিয়েছিলাম।'

'শুনতে পেলে কিছু?'

'এটা বুঝলাম, পরের লটের মাল পরশু আসবে। মাল আনার জন্যে ওরা রওনা দেবে কাল।'

'কোথায়?'

'সেটা শুনতে পাইনি স্যার। শুধু এটা কানে এসেছিল, যদি অবশ্য ভুল না শুনি, কাল সওয়া-তিনটের সময় ওরা শিয়ালদা স্টেশন থেকে রওনা দেবে।'

'কোন্ ট্রেন, কত নম্বর প্ল্যাটফর্ম, কোন্ ডেস্টিনেশন—এ সব কিছুই কানে আসেনি?'

'না স্যার।'

রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন ইন্সপেক্টর অবনী ঘোষরায়। 'এই ক্রিমিনালগুলো দেখছি ঠিক রেল কোম্পানির অ্যানাউন্সারদের মতো। একই কথা পরের পর অ্যানাউন্স করে যাচ্ছে মাইকে। কিন্তু যেগুলো তুমি কিছুতেই বুঝতে পারবে না, সেগুলো হচ্ছে—ট্রেনের নাম, প্ল্যাটফর্ম নম্বর আর ডিপারচার বা অ্যারাইভ্যালের টাইম।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে মুখার্জিবাবু বললেন, 'গতবার যে প্ল্যাটফর্ম থেকে ওরা ট্রেনে চেপেছিল সেই প্ল্যাটফর্মে নজর রাখব একটু বেশি করে।'

'কারেক্ট। দরকার বুঝলে ট্রেনে চেপে ফলো করবে। আর, গতবারের মত বেয়াড়া জুতো পরে যাবে না কিন্তু—।'

'না স্যার।'

হঠাৎ বেশ গম্ভীর আর উদাসীগোছের হয়ে গিয়েছিলেন বড়বাবু। কিছুক্ষণ বাদে খসখসে গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, ও যে আর কখনওই কলকাতায় ফিরবে না—চিঠি লিখে সে কথা জানিয়ে দিয়েছে তোমাকে?'

'কে স্যার?'

'তোমাদের গ্রেট শখের গোয়েন্দা—কৌশিক মিত্তির।'

॥ ১৪ ॥

জোসিদের লাঞ্চ শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লঞ্চের ইঞ্জিন থেমে গিয়েছিল। একটু বাদেই নদীর জলে নোঙর ফেলার শব্দ উঠল ঝপাং করে। ছোট্ট একটা ঝাঁকুনি মেরে থেমে গিয়েছিল লঞ্চ। গণেশ ঢালি এসে ডেভিসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'স্যার, আমরা সজনেখালি এসে গিয়েছি। আপনারা সবাই এখানে নামবেন তো?'

কপালে ভাঁজ ফুটিয়ে গণেশের দিকে তাকাল সাহেব। ওর চাউনি দেখেই গণেশ বুঝতে পারল, কথাটা ঠিক ধরতে পারেনি সাহেব। আরও ভেঙে বোঝাবার জন্যে এবার ও বলল, 'সজনেখালি অভয়ারণ্য স্যার। যারাই সুন্দরবনে বেড়াতে আসে, তারাই একবার এখানে নামে।'

ডেভিসের সাহায্যে এগিয়ে এলেন পূর্ণদা। 'এটা হচ্ছে সুন্দরবন টাইগার প্রজেক্টের কোর এরিয়া। জায়গাটার নাম সজনেখালি, তার থেকে সজনেখালি রিজার্ভ ফরেস্ট। বাংলায় বলে অভয়ারণ্য। এখানে একটা ওয়াচ-টাওয়ার আছে।'

ছেলেমানুষের মতো হাততালি দিয়ে উঠল জোসি। "দ্যাট'স ওয়ান্ডারফুল! ওয়াচ-টাওয়ার থেকে টাইগার দেখা যাবে পূর্ণাদা?"

মুচকি হেসে পূর্ণদা বললেন, 'তেমন কপাল করে এলে দেখতে পাবে। আর তোমার কপাল জোর থাকলে আমাদেরও কপাল খুলবে।'

ডেভিস অপ্রস্তুত মুখে বিড়বিড় করে উঠল, 'আই ফরগট অল অ্যাবাউট দ্যাট।' তার পর গণেশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমিই তো তোমাকে কাল বলেছিলাম, আজ লাঞ্চের পরে টাইগার প্রজেক্টের কোর এরিয়ায় একবার নামব আমরা। কিন্তু এখানে নামতে গেলে তো শুনেছি পারমিট লাগে।'

একগাল হেসে জবাব দিল গণেশ, 'সে সব আগেভাগেই জোগাড় করে নিয়েছি স্যার। এখানকার ফরেস্ট ডিপার্টের সঙ্গে আমার খুব জানাশোনা।'

ব্যাঘ্র প্রকল্পের কোর এরিয়ায় নামার মুখে সব পর্যটকের মধ্যেই বেশ একটা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এখানে উত্তেজনা সব চাইতে বেশি দেখা যাচ্ছিল জোসি আর পূর্ণদার মধ্যে।

ডেভিস 'জাস্ট আ মিনিট' বলে ঢুকে গিয়েছিল ওর ঘরে।

পূর্ণদা জোসির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'একটু আগেই বাঘ মারার খবর শুনলাম, আর এখন আমরা বাঘ দেখার জন্যে কোর এবিয়ার ওয়াচ-টাওয়ারে উঠতে যাচ্ছি। এ ভাবে অবশ্য বাঘ দেখা যায় না বলেই শুনেছি। আর দেখবেই বা কী করে? বাঘ থাকলে তো দেখবে।'

সরল মেয়ের মতো বড়-বড় চোখ তুলে জিজ্ঞেস করল জোসি, 'বাঘ নেই?'

'না-না, থাকবে না কেন? তবে সে থাকা না থাকারই মতো। তোমাকে একটা সহজ হিসেব দিচ্ছি। আজ থেকে শতখানেক বছর আগে ভারতে বাঘের সংখ্যা ছিল প্রায় চল্লিশ হাজার। কিন্তু আজ থেকে বছর ত্রিশ আগে সেই সংখ্যা নেমে এসেছিল আঠারোশোতে। ডিফারেন্সটা একবার ভেবে দেখ। ছিল ফর্টি থাউজ্যান্ড, নেমে এসেছে জাস্ট এইটটিন হান্ড্রেডে। দে আর নাউ ফেসিং এক্সটিংশন। এত সুন্দর একটা প্রাণী পৃথিবী থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে! কী ভয়ংকর ব্যাপাব বলো তো?'

জোসির চোখ আর একটু বুঝি বড় হল। গালেব রং আর একটু বেশি লাল। অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেন পূর্ণদা?'

উত্তর দিতে গিয়ে পূর্ণদা বোধহয় একটু উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলেন। 'কিলিং। রেকলেস কিলিং। পোচার্স কিল দেম রেগুলারলি। চোরাশিকারিরা বাঘ মারছে লুকিয়ে লুকিয়ে। এই যে কাল রাতে যে বাঘটা মাবা পড়েছে, সেটাও হয়তো চোরাশিকারিদের কীর্তি।'

'কিন্তু কেন মারছে?'

পূর্ণদার উত্তেজনার হার বোধহয় আর একটু বাড়ল। 'তুমি এ দেশে এই প্রথমবার এসেছ, তাই এখানকার ব্যাপারস্যাপার ঠিক ধরতে পারছ না। পোচার্স আর কিলিং টাইগার্স ফর ফেচিং কুইক মানি। আমি শুনেছি চোরাশিকারিরা একটা বাঘ মারতে পারলে সেই বাঘের চামড়া দেশের বাজারে এক লাখ টাকায় হাসতে হাসতে বেচে দেয়। বিদেশের বাজারে ওই চামড়ার দাম বহু গুণ বেশি। বাঘ মারার এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কারণ।'

'কিন্তু এখানকার গাভ্‌মেন্ট পোচারদের আটকাবার জন্যে কোনও স্টেপস্‌ নেয়নি?'

'নিয়েছে। খুব সম্ভবত এখানে নাইনটিন সেভেন্টিসিক্সে টাইগার প্রজেক্ট চালু হয়েছে। চোরাশিকারিদের আটকাবার জন্যে ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে নানারকম। বাঘরা সাধারণত যে এলাকায় থাকে, সেই এলাকাটা আলাদা ভাবে মার্ক করে বলা হল—কোর এরিয়া। তবে বাঘরা যে ওখানেই সব সময় থাকবে তার কোনও মানে নেই, পরের এলাকার নাম বাফার এরিয়া। টাইগার প্রজেক্ট করার ফলে বাঘের সংখ্যা একটু বেড়েছিল। ১৯১২-এ বাঘের সংখ্যা ছিল আঠারোশো বা তার চাইতে একটু বেশি। যত দূর মনে পড়ছে, ১৯১২ সালে ওই সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল সাড়ে তিন হাজারে। এখনকার সংখ্যা ঠিক কত বলতে পারব না। তবে মনে হয়, খুব বেশি নয়। এখনও তো চোরাশিকারিদের হাতে বাঘ মারার খবর প্রায়ই কাগজে বার হয়। এখান-সেখান থেকে বাঘের চামড়া সিজ করার খবরও পড়ি।'

পোশাক-আশাক পালটে ফুলহাতা শার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে ডেভিস ওর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'স্যরি জোসি, স্যরি মিস্টার চ্যাটার্জি অ্যান্ড কাউশিক, আমার একটু দেরি হয়ে গেল।'

ডেভিসের ধবধবে সাদা শার্টের ওপরে ফিতে দিয়ে বাঁধা কুচকুচে কালো রংয়ের দূরবিন ঝুলছিল। সেদিকে তাকিয়েই জোসি ছুট লাগাল ওর ঘরে। ছুটতে ছুটতেই বলল, 'আমার ক্যামেরাটা নিয়ে আসছি। ওয়েট ফর আনাদার মিনিট প্লিজ।'

জোসির এক মিনিট মানে এক মিনিটই। ও ছুটে ঘরে ঢুকেছিল, তার পর ক্যামেরা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল প্রায় ছুটেই।

লঞ্চের লম্বা সেই তক্তাটা সরসর করে সারেংয়ের দলবল নামিয়ে দিল সজনেখালি অভয়ারণ্যের জেটিতে। গণেশ অনেকটা কাঠবেড়ালির ভঙ্গিতে নেমে গেল ওই তক্তা বেয়ে। সারেং লম্বা একটা বাঁশ নামিয়ে দিল। তক্তা-সেতুর রেলিং। বাঁশের অন্য প্রান্তটা ধরে গণেশ হাঁক পাড়ল, 'আপনারা সব নেমে আসেন এক এক করে। পায়ের দিকে তাকিয়ে নামবেন।'

জেটিতে পা দিয়েই হা-হা করে হেসে উঠলেন পূর্ণদা। তার পর কৌশিককে একটা কনুইয়ের খোঁচা মেরে বললেন, 'পড়ো, সামনের ওই হোর্ডিংটায় কী লেখা আছে পড়ো।' বলার পরে ওর পূর্ণদাই পড়লেন, "বড় বড় করে লেখা আছে 'ওয়েলকাম টু সুন্দরবন', নীচে মস্ত এক রয়াল বেঙ্গল টাইগারের ছবি। তার মানে ওই বাঘটাই আমাদের স্বাগত জানাচ্ছে। ভেবে দেখো, একটা বাঘ মানুষকে স্বাগতম জানায় কখন!"

পূর্ণদার কথায় কৌশিকও বেশ গলা ছেড়ে হেসে উঠেছিল। অন্য সময় হলে জোসি নির্ঘাত ওদের হাসির কারণ জিজ্ঞেস করত। ডেভিসও কৌতূহলী চোখে তাকাত। কিন্তু দুজনের কারুরই কৌতূহল দেখাবার অবকাশ ছিল না এখন।

হোর্ডিংয়ের পাশের বাদাবনে একগাদা বাঁদর। জোসি মনের আনন্দে পরের পর বাঁদরের ছবি তুলে যাচ্ছিল। আর চোখে দূরবিন এঁটে আশেপাশের সব কিছু দূর পর্যন্ত দেখতে শুরু করে দিয়েছিল ডেভিস।

জেটির মুখে অভয়ারণ্যের গেট। গেট পেরুবার মুখে কৌশিক বলল, 'জলে থাকতে থাকতে ডাঙার কথাই ভুলতে বসেছিলাম পূর্ণদা। কথায় বলে, পায়ের তলার মাটি—। পায়ের তলায় মাটি না থাকলে ঠিক ভরসা পাওয়া যায় না, তাই না?'

হাসতে হাসতে জবাব দিলেন পূর্ণদা, 'পায়ের তলায় মাটি পেলেই কিন্তু মানুষ সন্তুষ্ট হয় না। তারপর খোঁজ পড়ে মাথার ওপরের ছাতের। তবে এই ব্যাঘ্র প্রকল্পের অভয়ারণ্যে ও সব নিয়মটিয়ম অচল। একটু খেয়াল করে দেখো, আমরা এখন খাঁচার মধ্যে। চিড়িয়াখানার ঠিক উলটো ব্যাপার এখানে। চিড়িয়াখানায় বাঘ থাকে খাঁচার মধ্যে, মানুষ বাইরে। এখানে আমরা খাঁচার ভেতরে, বাঘ বাইরে। যদিও এই মুহূর্তে তেনাদের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না।'

চারদিকে দ্রুত একবার চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে কৌশিক বলল, 'আরে, সত্যিই তো তাই! আমরা তো পুরোপুরি খাঁচার মধ্যে।'

জেটির মুখ থেকে খাঁচা তৈরি হয়ে গেছে। কয়েক পা অন্তর প্রায় দু-মানুষ উঁচু পিলার দু-দিকে। পিলারগুলো প্রায় ঢেকে রেখেছে বেশ মোটাসোটা কাঁটাতারের বেড়া। এই বেড়াটা সোজা কিছুটা যাওয়ার পরে ঘুরে গেছে দু-দিকে। মস্ত একটা এলাকা বেশ উঁচু কাঁটাতারের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। বাঘ হঠাৎ কাছাকাছি এসে পড়লেও যাতে ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়তে না পারে—তার জন্যেই এই সতর্কতা।

খাঁচাভর্তি মানুষ দেখার বিদঘুটে শখ চাপে যদি কোনও বাঘের, তার সেই ইচ্ছা পূরণের

সুযোগ আছে এখানে ষোলো আনার ওপর আঠারো আনা। কিন্তু ঘটনাটা এই যে, মানুষের মতো বিদঘুটে শখ বাঘের কখনও চাপে না।

জোসি, পূর্ণদারা ছাড়া আরও দু-তিন ঝাঁক পর্যটক ছিল অভয়ারণ্যে। সবার চোখই বাদাবনের চারপাশে ঘুরছিল। কিন্তু গাঢ় হলুদ রংয়ের ওপর ডোরাকাটা কোনও প্রাণীর চিহ্নও ছিল না কোথাও। এদিকে খাঁচাভর্তি মানুষের ভিড় হয় বলেই বোধহয় বাঘরা এদিকটা বড় একটা মাড়ায় না, বিশেষ করে দিনের বেলায়। তবু এলাকাটায় বেশ একটু গা-ছমছমে ভাব আছে। কারণ, এটা সুন্দরবনের মুক্ত বাঘদের খাস-তালুক। বাঘ দেখা না গেলেও তাদের খাস-তালুক, যাকে কোর এরিয়া বলে, সেটা দেখাও কম নয়!

অভয়ারণ্যের মধ্যিখানে বিশাল একটা ওয়াচ-টাওয়ার। তিন-চারতলা সমান উঁচু। সিঁড়ি গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে ওপরে উঠে গেছে। একদম উপরে রেলিং ঘেরা গোল বারান্দা। ওখানে দাঁড়ালে বাঘের এলাকার বহু দূর পর্যন্ত দেখা যায়।

ডেভিস চোখে দূরবিন সেঁটে চারদিক দেখছিল খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে। জোসি ছবি তুলে যাচ্ছিল একটার পর একটা। পূর্ণদা গোল বারান্দায় দুটো চক্কর মেরে মুগ্ধ কণ্ঠে বললেন, "অসাধারণ দৃশ্য! এখানকার প্রকৃতির একেবারে নিজস্ব একটা সৌন্দর্য আছে! এমন তুমি পৃথিবীর আর কোথাও পাবে না। এখানকার ভূগোলটাই যে অন্যরকম। সুন্দরবন নামের নানা ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু সব ব্যাখ্যা ছেড়ে আমি এখন থেকে একটা ব্যাখ্যাকেই পুরোমাত্রায় সাপোর্ট করে যাব। সেটা হল—দেখতে সুন্দর, তাই সুন্দরবন। কৌশিক তুমি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবে?'

লম্বা করে ঘাড় কাত করে কৌশিক জবাব দিল, 'হ্যাঁ, একশোবার।'

ওয়াচ-টাওয়ারের মাথায় আরও কিছুক্ষণ থাকার পরে ওরা ওখান থেকে নেমে এল এক-এক করে। টাওয়ারের পাশেই মস্ত এক ঘেরা পুকুর। ওদিকে ফরেস্ট গার্ডের অফিস। এদিকে একটা ঘর থেকে সরকারি দামে সুন্দরবনের মধু বিক্রি হচ্ছে। পর্যটকদের মধ্যে একটা শ্রেণী আছে, বেড়াতে আসার জায়গায় কেনাকাটা করার কিছু থাকলে, সে সব সংগ্রহের জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়ে। প্রিয় জায়গার প্রিয় স্মৃতি বলে কথা!

মধু অবশ্য এমন এক স্মৃতি যা বেশি দিন ধরে রাখা যায় না। বাড়িতে নিয়ে গেলে তার আয়ু দু-চার-ছ মাস, বড় জোর এক বছর। তবে বছরখানেক বাদে শহরের বাড়িতে বসে সুন্দরবনের মধু খেলে অভয়ারণ্যের মধুময় স্মৃতি আর একবার জাগ্রত হতে পারে প্রবল ভাবে। সেটাও কম কথা নয়! পর্যটকদের ছোটখাটো একটা লাইন পড়ে গিয়েছিল মধুভাণ্ডারে।

জোসি আর ডেভিস এদিকে ঘেঁষেইনি। ওরা নির্জন খাঁচাপথের ও দিকটা ধরে হাঁটা দিয়েছিল। পূর্ণদার ঝোঁক মধুর চাইতে মূর্তির দিকে বেশি। নদীর ধারে আটচালাগোছের একটা ঘরে বনবিবির কয়েকটা মূর্তি বসানো আছে, পূর্ণদা পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন সেই মূর্তিগুলোর দিকে।

কৌশিক এই মুহূর্তে দলছাড়া। চারদিক দ্রুত চোখে একবার দেখে নিয়ে লম্বা পায়ে ও ঢুকে গিয়েছিল ফরেস্ট গার্ডদের অফিসে।

অভয়ারণ্যের এই খাঁচার পথ হারিয়ে ফেলার কোনও আশঙ্কা নেই। দলছুট হলেও দলের লোকরা শেষ পর্যন্ত দলেই ফিরে আসবে। সেই নিয়মেই আধ ঘণ্টা-চল্লিশ মিনিট

বাদে লঞ্চের ছোটখাটো ঘেরাটোপ-জেটির মুখে ফিরে এসেছিল জোসি, ডেভিস আর পূর্ণদা।

জেটির দু-পাশের নিচু জমিতে নদীর জল আছড়ে পড়ছিল। জলের ধার থেকেই শুরু হয়েছে বাদাবন। গাছের ওপরে, মাটিতে কয়েক ঝাঁক বাঁদর। ছোটখাটো লালচে চেহারা। খাঁচাবন্দি মানুষগুলোর দিকে ওরা তাকাচ্ছে না।

ধরতে গেলে প্রতিটি বাঁদরই কিছু না কিছু খেতে ব্যস্ত। যারা মাটিতে, কাদা খুঁচে কিছু তুলে নিয়ে তারা মুখে পুরছে। যারা গাছের মাথায়, তারা দু হাতে গাছের পাতা সরিয়ে কী যেন তুলে নিয়ে মুখে ঢোকাচ্ছে। চিড়িয়াখানায় দর্শকদের কাছ থেকে বাদাম-ছোলা ভেট-পাওয়া বাঁদরদের সঙ্গে এদের চেহাবা-চরিত্রের মস্ত অমিল।

অমিল থাকাই স্বাভাবিক। এরা শুধু বনের বাঁদর নয়, বাঘের খাস-তালুকের বাসিন্দাও। দু বেলা বুনো বাঘ দেখে, হয়তো কখনও কখনও বাঘের খাদ্যও হয়ে যায়।

জোসি বাঁদরদের আরও কয়েকটা ছবি তোলার পরে পূর্ণদা জোসিকে বললেন, 'এই বাঁদররা কিন্তু হরিণদের খুব বন্ধু। বাঘদের খাদ্যতালিকার গোড়াতেই থাকে হরিণ। বাঘ হয়তো কোনও হরিণকে তাক করে গুঁড়ি মেরে এগোচ্ছে—এটা যদি গাছের ওপরে থাকা বাঁদরদের নজরে পড়ে যায়, ওরা অমনি হুপ-হাপ করে, চিৎকার-চেঁচামেচি করে, গাছের ডাল ঝাঁকিয়ে হরিণকে সতর্ক করে দেয়। হরিণ এই সতর্কতা বোঝে। অমনি ছুট লাগায় প্রাণ বাঁচাতে।'

জোসি কেমন যেন কৃতজ্ঞ চোখে একটা বাঁদরের ঝাঁকের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, 'দে আর রিয়েলি গুড ফ্রেন্ডস।'

'হ্যাঁ, ভাল বন্ধু যে, সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। অনেক সময় বাঁদররা গাছের ফল, পাতা ছিঁড়ে হরিণদের খেতেও দেয়। হরিণরাও রিটার্ন দেয়।'

'রিটার্ন! কী রকম?'

'ছোটখাটো রিটার্ন অবশ্য। আমি শিকারিদের বইতে পড়েছি। ছবিও দেখেছি কয়েকটা। হরিণরা চরছে, তাদের পিঠে বেশ কয়েকটা বাঁদর। দে আর টেকিং ফ্রি জয়-রাইড্স। হরিণরা উপকারী বন্ধুকে একবারও পিঠ থেকে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করে না।'

পূর্ণদা থামতেই ডেভিস হাসতে হাসতে বলল, 'কিন্তু আমাদের আর একজন উপকারী বন্ধু কাউশিক কোথায়? ফিরছে না কেন এখনও?'

'সত্যিই তো, কৌশিক গেল কোথায়? অনেকক্ষণ ওর দেখা নেই!'

পূর্ণদাকে একটু উদ্বিগ্ন হতে দেখে ডেভিস হাসল। 'ডোন্ট ওয়ারি। দিস ইজ আ সেফ প্লেস। ওদিকে একটা ছোট মিউজিয়াম আছে, ও হয়তো ওটা খুব ভালভাবে দেখছে।'

বলতে না বলতেই কৌশিক এসে হাজির হল।

পূর্ণদা মৃদু শাসনের গলায় বললেন, 'কোথায় ছিলে এতক্ষণ? আমরা তো বেশ কিছুক্ষণ চলে এসেছি এখানে। জায়গাটা খুবই প্রোটেকটেড, তবু বলা তো যায় না—!'

দাঁড় করিয়ে রাখার জন্যে একটু দুঃখপ্রকাশ করে কৌশিক বলল, 'হঠাৎ আমার একজন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল। এখানকার ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে কাজ করে। ওর সঙ্গে গল্প করতে করতে জানতে পারলাম, শ্রীকৃষ্ণ মাইতি এই হাসনাবাদেই থাকেন। শ্রীকৃষ্ণদার কথা আপনাকে বলেছি পূর্ণদা?'

পূর্ণদা দু-দিকে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, 'তোমার পরিচিতের সংখ্যা কম করে পাঁচ হাজার। আমি তাদের মধ্যে খুব বেশি হলে পনেরো-কুড়িজনকে চিনি। শ্রীকৃষ্ণ মাইতির কথা শুনেছি বলে তো মনে হচ্ছে না।'

'দারুণ ভাল মানুষ। চমৎকার ছড়া লেখেন, গান লেখেন, কবিতা লেখেন। ওঁর ছড়া, গান নিয়ে কয়েকটা ক্যাসেটও বেরিয়েছে। বিউটিফুল। আমাকে ওঁর বাড়িতে আসার জন্যে বহুবার নেমন্তন্ন করেছেন। কিন্তু পাঁচটা বেয়াড়া কাজকম্মে ফেঁসে থাকি বলে একবারও যাওয়া হয়নি। ওঁর সঙ্গে কথা হল?'

'উনিও কি এখানে আছেন?'

'না-না, থাকলে তো আপনাদের সঙ্গে আলাপ করানোর জন্যে টেনে নিয়ে আসতাম। পা ভেঙে প্লাস্টার করে বাড়িতে পড়ে আছেন। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের ওই ভদ্রলোক মোবাইলে ধরে দিলেন। টেলিফোনে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণদার একটাই কথা।—আজ রাত্তিরে তুমি আমার বাড়িতে খাবে, থাকবে। কাল থেকে আবার তোমাদের লঞ্চে থেকো। হাসনাবাদের একটা কলেজে পড়ান শ্রীকৃষ্ণদা।'

অবাক হয়ে পূর্ণদা বললেন, 'কিন্তু হাসনাবাদ তো এখান থেকে বেশ কিছুটা দূরে। তার ওপর আবার নদীপথ। তুমি যাবে কী করে?'

'সে ব্যবস্থা শ্রীকৃষ্ণদাই পাকা করে ফেলেছেন। ফরেস্ট গার্ডদের একটা বোট যাবে সন্ধেবেলায় হাসনাবাদে। ডে-শিফ্‌টের গার্ডদের নামিয়ে নাইট-শিফ্‌টের গার্ডদের নিয়ে আসবে। যাওয়ার পথে তুলে নিয়ে যাবে আমাকে।'

উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল পূর্ণদাকে। 'কী আশ্চর্য! এত বড় নদী, রাত্তিরে আমাদের লঞ্চ কোথায় নোঙর করবে, সে সব তো কিছুই তুমি জানো না—।'

একটু মাথা চুলকে কৌশিক বলল, 'জানি, মানে জেনে ফেলেছি। সারেং বলেছিল, আজ রাত্তিরে আমাদের লঞ্চ নোঙর করবে মরিচঝাঁপির কাছে।'

'মরিচঝাঁপি!'

'মরিচঝাঁপির কথা মনে নেই? একটা সময় তো ওই জায়গাটার নাম প্রায়ই খবরের কাগজে বার হত। সুন্দরবনের একটা চর। উদ্বাস্তুরা জোর করে ওই চরটার দখল নিয়েছিল। তাই নিয়ে তখন বিরাট গণ্ডগোল। এখন অবশ্য ফাঁকা হয়ে গেছে। ওর কাছাকাছি আজ রাতে নোঙর করবে আমাদের লঞ্চ—এম জি সদাগর।'

'তাই?' ডেভিসের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন পূর্ণদা।

একটু বিব্রত মুখে উত্তর দিল ডেভিস, 'জায়গাটার নাম আমি ঠিক মনে করতে পারছি না, বাট কাউশিক মাস্ট বি কারেক্ট, বিকজ হি ওয়াজ প্রেজেন্ট হোয়াইল আই ওয়াজ টকিং টু দ্যাট গাই।'

জোসি দুঃখপ্রকাশের শব্দ বার করে বলল, 'কিন্তু আজ সন্ধ্যায় তোমাকে যে আমরা তা হলে খুব মিস করব কাউশিক!'

সপ্রতিভ ভঙ্গিতে জবাব দিলে কৌশিক, মর্নিং-শিফ্‌টের গার্ডদের বোটে কাল সকালেই তো ফিরে আসছি। লস পরে কমপেনসেট করে দেব।'

জোসির চোখ এবার একটু দুষ্টু-দুষ্টু হয়ে উঠেছিল। 'কাউশিক, তুমি সত্যি সত্যি একজন পোয়েটের কাছে যাচ্ছ তো, নাকি—।'

'নাকি?'

'টু আ-নিউ-ফাউন্ড গার্ল ফ্রেন্ড।'

কৌশিক হো-হো করে হেসে উঠে বলল, 'আমি সত্যি কি মিথ্যে বলছি, তুমি আমার সঙ্গে গিয়ে নিজের চোখে দেখবে চলো। সিয়িং ইজ বিলিভিং।'

দুষ্টুমি এবার সারা চোখেমুখে ছড়িয়ে পড়েছিল জোসির। 'না, আমি যাব না। তোমার কথা সত্যি হলে আমি খুব এম্‌ব্যারাস্‌ড হব। আর যদি মিথ্যে হয়, তোমার গার্ল ফ্রেন্ড আমাকে দেখে ভীষণ রেগে যাবে।'

সোনালি চুল, ডাগর চোখের রূপসী জোসির কথা শুনে বাকি তিন জন হেসে উঠেছিল গলা ছেড়ে।

সেই সন্ধেয়, সাতটা নাগাদ, মরিচঝাঁপির কাছে নোঙর কবা এম জি সদাগর থেকে ফরেস্ট গার্ডদের বোটে চেপে হাসনাবাদের পথে হাত নাড়তে নাড়তে রওনা হয়ে গিয়েছিল কৌশিক।

ঝকঝকে তারা উঠেছে আকাশে, কিন্তু চাঁদের এখনও দেখা নেই। আলো-আঁধারি ছড়িয়ে আছে সুন্দরবনের ঠাসা জঙ্গল আর দীর্ঘ নদীতে। কিছুটা পথ যাওয়ার পর কৌশিকের মনে হল—যাক, পুরোটাই মিথ্যে বলতে হয়নি পূর্ণদাদের। শ্রীকৃষ্ণদা, মানে শ্রীকৃষ্ণ মাইতি সত্যিই একজন ভাল কবি। ছড়ার হাত তো চমৎকার। বিজ্ঞানের অনেক কঠিন কঠিন বিষয় ছোটদের উপযোগী করে ছড়ার মধ্যে তুলে ধরেছেন। ওঁর ছড়ায় সুর বসিয়ে নামকরা শিল্পীরা গান গেয়েছে। ক্যাসেটও বেরিয়েছে কয়েকটা।

মিথ্যেটুকু হল—সজনেখালির ফরেস্ট গার্ডদের মধ্যে ওর চেনা কেউ ছিল না। ও ওদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে শ্রীকৃষ্ণ মাইতিকে নিজে থেকেই ফোন করেছিল। মিথ্যের বাকি অংশ হল—লম্বা-চওড়া চেহারার অধিকারী শ্রীকৃষ্ণদার পা ভাঙেনি। দিব্যি আছেন বহাল তবিয়তে। পা ভাঙার গল্প না শোনালে জোসিরা নির্ঘাত বলত—ওকে আমাদের লঞ্চে একদিন খাওয়ার জন্য নেমন্তন্ন করো।

মিথ্যের একেবারে শেষ দিকটাও নির্দোষ। শ্রীকৃষ্ণদা কোনও কলেজে পড়ান না। পেশায় উনি একজন জবরদস্ত পুলিশ অফিসার। হাসনাবাদের সার্কেল ইন্সপেক্টর। নতুন রহস্যের কিছু ইঙ্গিত টেলিফোনেই শুনিয়ে দিয়েছে ও। শুনে শ্রীকৃষ্ণদা স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন, পুলিশ এবং ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের সমস্ত সাহায্য তুমি পাবে। তদন্তের কাজ পুরো মাত্রায় চালিয়ে যাও।

ওহ্! সত্যি কথার শেষটুকু হল—শ্রীকৃষ্ণদা সত্যিই বলেছেন, রাত্রে তুমি আমাদের বাড়িতে খাবে এবং থাকবে।

॥ ১৫ ॥

হাসনাবাদের সার্কেল ইন্সপেক্টর শ্রীকৃষ্ণ মাইতির বয়েস পঞ্চাশের আশেপাশে। উচ্চতায় ছ' ফিটের কাছাকাছি। বেশ বলশালী চেহারা। গায়ের রং একটু চাপা। চোখে চশমা। গলার স্বর বেশ ভারী। পরনে পুলিশের উর্দি না থাকলে মানুষটির চেহারা বেশ

কিছুটা পালটে যায়। আরও পালটায় যখন নিজের লেখা ছড়ার বই থেকে ছড়া পড়েন। ভারী কণ্ঠস্বরে আর ছন্দের ধাক্কায় যে মগ্ন ভাব ফুটে ওঠে তখন, তা ওঁর পেশার থেকে অনেক দূরের।

কিন্তু কৌশিকের শ্রীকৃষ্ণদা পেশা আর নেশাকে মেশাননি। পুলিশের চাকরির সুবাদে যখন কুখ্যাত ডাকাত আর স্মাগলারদের ধাওয়া করেন তখন ওঁর চেহারা একেবারে অন্য রকম। ডাকাতদের দেখলে সাধারণ মানুষদের বুকে কাঁপুনি ধরে, আর ওই সব ডাকাতদেরই বুকে কাঁপুনি ধরান জাঁদরেল পুলিশ অফিসার শ্রীকৃষ্ণ মাইতি।

শ্রীকৃষ্ণদা এই মুহূর্তে ছড়ার জগৎ থেকে ঠিক একশো মাইল দূরের বাসিন্দা। পরনে পুলিশের পোশাক। ওঁর ঘরে টেবিলের ঠিক উল্টো দিকে বসে কৌশিক পাক্কা এক ঘণ্টা ধরে লঞ্চের গোলমেলে ঘটনাগুলো শোনাল।

সব কিছু শোনার পর শ্রীকৃষ্ণদা গম্ভীর মুখে নিচু গলায় বললেন, 'রীতিমত রহস্যজনক ঠেকছে। সাহেব-মেম সুন্দরবনে স্রেফ বেড়াতে এসেছে বলে মনে হয় না। আচ্ছা, ভ্রমণকাহিনীর ওই বিখ্যাত লেখকের নাম কী যেন বললে—।'

'ফাঁসোয়া বার্নিয়ের।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, বার্নিয়ের। ওই মেমসাহেব যে সত্যি-সত্যিই ওই বার্নিয়ের বংশধর—তার কোনও প্রমাণ কি তোমরা পেয়েছ?'

'না, তা পাইনি। তবে জোসি যখন বার্নিয়েরের কথা বলে, তখন ওর চোখমুখের চেহারাই পালটে যায়। আর বার্নিয়েরের ওই ভ্রমণবৃত্তান্ত যে ওর খুব ভালভাবেই পড়া, সে তো পূর্ণদার কথা থেকেই টের পাই। বইটা ওর ভালভাবে পড়া না থাকলে পূর্ণদা ঠিক ধরে ফেলতেন।'

দু দিকে মাথা নাড়তে নাড়তে শ্রীকৃষ্ণদা বললেন, 'কোনও একটা বই ভাল ভাবে পড়া আব সেই বইয়ের লেখকের বংশধর হওয়া তো এক নয়। এনিওয়ে—।'

সামনের টেলিফোনটা বেজে উঠতেই রিসিভার তুললেন শ্রীকৃষ্ণদা। তার পর দু-চারটে 'হুঁ, হ্যাঁ', 'ঠিক আছে' ইত্যাদি গোছের কথা বলার পরে 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে নামিয়ে রাখলেন রিসিভার।

তারপর কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে বললেন, 'তুমি যেমন ব্যবস্থা চেয়েছিলে ঠিক তেমনটিই হয়েছে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট তোমার সঙ্গে পুরো মাত্রায় কোঅপারেট করবে। আর আমরা তো আছিই। আমাদের এস. পি. তোমার আবার খুব অ্যাডমায়ারার। তবে, সত্যি কথা বলতে কি, আমি তোমার জন্যে একটু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছি।'

মৃদু হেসে তরুণ গোয়েন্দা বলল, 'কেন? আপনি কি আমার ওপর আস্থা রাখতে পারছেন না?'

'আস্থা আছে বলেই তো তুমি যেমন চেয়েছিলে তেমন অ্যারেঞ্জমেন্টই করেছি। কিন্তু কৌশিক, এটা শহর নয়, সাধারণ গাঁ-গঞ্জও নয়। এ বড় সাংঘাতিক জায়গা, এর নাম সুন্দরবন। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি, তুমি ওদের পিছু নিয়ে বনের কোর এরিয়ায় ঢুকবে। জায়গাটা ভীষণ বিপজ্জনক, বিশেষ করে মাঝরাতে। ওরা যদি জঙ্গলে ঢোকে, গার্ডরা ওদের ছাড়বে না—পিছু নেবে। আর তুমি তো শেষ পর্যন্ত ধাওয়া করার জন্যেই যাচ্ছ। গার্ডদের স্পেশাল ট্রেনিং আছে, তোমার তা নেই। সুন্দরবনের কাদা, শূল, কাঁটা,

খানাখন্দ, ঝোপঝাড় ভয়ঙ্কর। তার ওপর পদে পদে বিপদ। হিংস্র জন্তু-জানোয়ার আর বিষাক্ত সাপে জঙ্গল ঠাসা।'

জবরদস্ত পুলিশ অফিসারের চোখে চোখ রেখে কৌশিক বলল, 'কিন্তু শ্রীকৃষ্ণদা, আমরা যাদের পিছু নেব—তারা যদি জঙ্গলে ঢোকে—তাদের জন্যেও তো ভয়ঙ্কর বিপদ অপেক্ষা করছে।'

'করছেই তো। কিন্তু যারা প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে মাঝরাত্তিরে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে ঢুকছে—তারা তো ফায়দা লোটার জন্যেই ঢুকছে। ফায়দা অবশ্য সব সময় লোটা যায় না। অনেক পোচারকে বাঘে ধরে, কেউ-কেউ মরে সাপের কামড়ে। ওরা মরা মানে অবশ্য দেশের শত্রু মরা। কিন্তু তুমি যদি সাঙ্ঘাতিক কোনও বিপদের মধ্যে পড়ে যাও। সুন্দরবনের জঙ্গল সম্পর্কে তোমার তো কোনও ধারণাই নেই।'

প্রতিবাদ করার গলায় জবাব দিল কৌশিক, 'একেবারে যে নেই, তা নয়। এই তো আজকেই টাইগার প্রজেক্টের কোর এরিয়া সজনেখালিতে গিয়েছিলাম।'

হেসে উঠলেন শ্রীকৃষ্ণদা। 'ওটা তো কাঁটাতারের বেড়া আর জাল দিয়ে ঘেরা। ট্যুরিস্টদের জন্যে বিশেষ ভাবে বানানো। ওখানে যাওয়া আর সত্যি-সত্যি কোর এরিয়ায় ঢোকার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত।'

কৌশিকের চোখমুখ এবার বুঝি একটু থমথমে হয়ে উঠেছিল। 'আপনি কি তা হলে আমাকে রহস্যের কিনারা করার কাজ বন্ধ করে বাড়ি ফিরে যেতে বলছেন?'

হা-হা করে হেসে উঠলেন ওর শ্রীকৃষ্ণদা। 'আমি কি এত বড় আহাম্মক! আমি বারণ করব, আর তুমি গুড বয়ের মতো তল্পিতল্পা গুটিয়ে বাড়ি ফিরে যাবে! এমনটা কি কখনও হয়েছে? না কি হবে? তুমি শখ করে যে পেশা বেছে নিয়েছ, সে পেশায় তো প্রাণের ঝুঁকি সব সময়ই আছে—। তবে এখানে পরিস্থিতিটা একেবারেই অন্য রকম। গার্ডদের বলা আছে, ওরা তোমাকে এসকর্ট করবে। তোমাকে আমার একটাই অনুরোধ—দলছাড়া হয়ো না কখনও। আর অযথা ঝুঁকি নেওয়ার মধ্যে যাবে না।'

আগের সেই ঝলমলে হাসিটা আবার ফিরে এসেছিল তরুণ গোয়েন্দার মুখে। 'শ্রীকৃষ্ণদা আপনার নতুন লেখা কয়েকটা ছড়া শোনান না—।'

শ্রীকৃষ্ণদাও হাসলেন। 'অপরাধীদের পিছু ধাওয়া শেষ করে ফিরে এসো, তার পর শোনাব।'

সুন্দরবনের গভীর নদীতে, বিশেষ করে বাঘদের খাস-তালুকে খাঁড়ির পাশে, সন্ধের পরেই বুঝি নিশুতি রাত নেমে আসে। কিন্তু হাসনাবাদের ফেরিঘাট এবং আশপাশের এলাকা মোটামুটি জমজমাট থাকে বেশ একটু রাত পর্যন্ত। আজ একটু বুঝি বেশিই জমজমাট, কারণ শীতটা হঠাৎই কমে গেছে।

কিন্তু রাত বারোটা নাগাদ হাসনাবাদ একেবারেই শান্ত হয়ে গিয়েছিল। ওই সময়েই ফেরিঘাটের কাছাকাছি এলাকা থেকে ফরেস্ট গার্ডদের একটা স্পিডবোট রওনা দিল মরিচঝাঁপির দিকে। অনেকটা পথ। চওড়া নদী মাঝরাতে বুঝি আরও চওড়া হয়ে গিয়েছিল।

নদীর কূলে কূলে কিছু দেশি নৌকো বাঁধা আছে। মাঝনদীতে কোনও নৌকো নেই। স্পিডবোট মাঝারি স্পিডে ছুটে চলেছিল লক্ষ্যপথে। কৌশিকের সঙ্গী চার ফরেস্ট গার্ডের

বয়েস ত্রিশের আশেপাশে। বয়েস কাছাকাছি হলে আলাপ-পরিচয় জমে ওঠে চট করে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে কৌশিকের বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল সহযাত্রীদের সঙ্গে।

চার গার্ডের মধ্যে যার বয়েস সবচেয়ে বেশি, তিনিই হেড। কৌশিককে নানা রকম প্রশ্ন করে রহস্যের ধরনধারণ বুঝবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু গোয়েন্দা এ ব্যাপারে যা জানে, ওব মুখ থেকে তার সিকি ভাগেরও বেশি বার হল না। শেষে হেসে বলল, 'কিছুই পরিষ্কার বুঝতে পারছি না। তবে এটা মনে হচ্ছে, একটা বড় রকমেব রহস্য দানা বেঁধে উঠেছে।'

রহস্য ভেদ করার জন্যে চারজন গার্ডই বেশ চনমনে হয়ে উঠেছিল, কিন্তু রাত আরও কিছুটা বাড়ার পরে ওরা ঝিমিয়ে পড়েছিল খানিকটা।

ঝিমিয়ে পড়াব জন্যে উৎসাহের অভাব নয়, দায়ী যদি কোনও কিছুকে করতে হয়—তা হল রাতের ঘুম। বিপজ্জনক এলাকায় যারা নিয়মিত পাহারা দেয়, বিপদের আশঙ্কা তাদের বেশিক্ষণ চেপে ধবে রাখতে পারে না। তা ছাড়া ডাঙার ওপরে শীত কমলেও নদীর ওপরে শীত তেমন কমেনি। কাঁপুনি ধরাবার মতো নয়, তবে একটু জড়সড় হয়ে বসার মতো শীত। কিছু-কিছু মানুষ আছেন যাঁরা গাঁক-গাঁক কবে কথা বলার ফাঁকে চড়া সুরে নাক ডাকতে পাবেন হঠাৎ। একজন উৎসাহী গার্ডেব নাক আচমকা ওই ভাবে ডাকতে শুরু করেছিল। ওকে অবশ্য দোষ দেওয়া যায় না। কারণ সময়টা শীতের মাঝবাত।

স্পিডবোট একঘেয়ে শব্দ তুলে জল কেটে এগিয়ে চলেছিল সামনের দিকে। দু দিকে শীতের জোরালো বাতাস। কৌশিকের অবশ্য দু চোখের ত্রিসীমানার মধ্যে ঘুমের কোনও ছায়াও ছিল না। মাথার মধ্যে শুধু অঙ্ক কষা চলছিল একটার পর একটা। সব অঙ্কই রহস্যের আসল চেহারাটা ধরার জন্যে।

মরিচঝাঁপির কাছেই নোঙর করেছে এম. জি. সদাগর। চাঁদনি রাত হলেও মাঝেমধ্যেই আলো-আঁধারি। দূবের কিছু-কিছু দৃশ্য দেখা যাচ্ছিল। লঞ্চটা চোখে পড়া মাত্তর স্পিডবোট থামিয়ে দিতে বলেছিল তরুণ গোয়েন্দা। একটু পরেই থেমে গিয়েছিল বোট।

ফরেস্ট গার্ডদের প্রধানের নাম অতনু বসু। উনি বললেন, 'আমার কাছে দূরবিন আছে, আর একটু পিছিয়ে এসেও নজর রাখতে পারি আমরা লঞ্চের ওপর। আপনি কী বলেন?'

উত্তরে কৌশিক বলল, 'আপনার দূরবিনটা একবার দিন তো।'

দূরবিন এগিয়ে দিলেন অতনু।

চোখে দূরবিন লাগিয়ে কৌশিক বলল, 'লঞ্চের গায়ে লাগানো বোটটাকে নদীর ওপরে নামানো হয়েছে। তার মানে আজকেও ওরা খাঁড়ির মধ্যে ঢুকবে। যদি ঢোকে তা হলে—।'

বাকি কথাটা বললেন অতনু। 'আপনি যে প্ল্যান নিয়েছেন, সেই ভাবেই এগুব। আমাদের ছোট নৌকোটাও নামিয়ে রাখা যেতে পারে জলের ওপর। ওটায় চেপে ওদের পিছু নেব আমরা। তবে আমি বলছিলাম কি—।'

'কী?'

'কোর-এরিয়ায় খাঁড়ির মধ্যে ওরা ঢুকলে আমরা স্পিডবোট চালিয়েই ওদের অ্যারেস্ট করতে পারি। কারণ কাজটা বেআইনি। অ্যারেস্ট করতে আমাদের কোনও অসুবিধা হবে না। ওদের উদ্দেশ্যটা তো আমাদের কাছে পরিষ্কার।'

'কী উদ্দেশ্য?'

'আপনাকে তো আগেই বলেছি। দে আর পোচার্স। লুকিয়ে বাঘ মারতে এসেছে। কাল যে বাঘটা মরেছে, সেটা তো চোরাশিকারিদের গুলিতেই। আমার ধারণা, এই সাহেবটাই মেরেছে। আপনি তো দেখেছিলেন সাহেব বন্দুক হাতে নৌকোয় চেপে খাঁড়ির মধ্যে ঢুকেছিল কাল। আমাদের গার্ডরা অ্যালার্ট ছিল বলে বাঘটাকে ওরা সরাতে পারেনি। বাঘের মাথা থেকে গুলিটা আমরা বার করে নিয়েছি। সাহেবের বন্দুকের গুলির সঙ্গে ওটা মিলে গেলেই আমাদের কাজটা খুব সহজ হয়ে যাবে। গত দু মাসের মধ্যে সুন্দরবনে এই নিয়ে চারটে বাঘ মেরেছে চোরাশিকারিরা। এই রেট অব কিলিং খুব অ্যালার্মিং। চারটের মধ্যে আবার তিনটে বাঘকে ওরা স্কিন করেছে—।'

'স্কিন করেছে মানে?'

'চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে পালিয়েছে। চামড়ার জন্যেই তো বাঘ মারা।'

'কিন্তু এই সাহেব-মেমরা তো সবে এসেছে এখানে।'

অনভিজ্ঞ লোকের অজ্ঞতায় হাসলেন অতনু। 'চোরাশিকারিরা অপারেশনের চাল পালটায় বারবার। আমার ধারণা, এই সাহেব-মেম গোটা অপারেশনটাই মাস্টারমাইন্ড করেছে দূর থেকে। এখন যখন ওরা ফিল্ডে এসেছে, মনে হয়—বিরাট কোনও অপারেশনে নামবে। আমাদের বড় সাহেব আপনাকে পুরো লিবার্টি দিয়েছেন। আপনি যা চান আমরা তাই করতে বাধ্য। তবে আপনাকে আমার অনুরোধ, সাহেব-মেমকে খাঁড়ির ভেতর থেকে অ্যারেস্ট করতে দিন আমাদের। জঙ্গলের নিয়মকানুন একেবারে আলাদা। এই কাজে আমার অভিজ্ঞতা বারো বছরের—।'

দূরবিন দিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কয়েকবার লঞ্চটাকে দেখার পর কৌশিক বলল, 'আপনাদের দূরবিনটা সত্যিই খুব শক্তিশালী। এটা যখন হাতে আছে, আমরা আমাদের বোটটাকে আরও কিছুটা পিছিয়ে নিয়ে গিয়ে নজর রাখতে পারি লঞ্চের ওপর। তবে—।'

'তবে কী?'

'ডেভিসের হাতেও একটা দূরবিন দেখেছিলাম। সজনেখালিতে ওটা হাতে নিয়েই নেমেছিল। ওয়াচ-টাওয়ারে উঠে চারদিক দেখেছিল খুব খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে।'

কৌশিকের কথা শুনে চঞ্চল হয়ে উঠলেন অতনু। 'আমার অনুমান তা হলে ঠিকই। ওয়াচ-টাওয়ারে উঠে চোখে দূরবিন লাগিয়ে সাহেব ছক পাকা করেছে। ওদের তা হলে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকতে দেওয়া কোনও মতেই উচিত হবে না। খাঁড়ির মধ্যে ঢুকলেই অ্যারেস্ট করব।'

উত্তেজিত ফরেস্ট গার্ডের কথা শুনে কৌশিক বোধহয় আরও ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। ঠাণ্ডা গলাতেই বলল, 'ওদের খাঁড়ির মধ্যে ঢুকতে দেখেছি রাত্তিরে। কিন্তু জঙ্গলে তো ঢুকতে দেখিনি। লঞ্চ থেকে অবশ্য দেখাও সম্ভব ছিল না। বাঁকের মুখে খাঁড়ি। নৌকোয় চেপে বাঁক ঘুরতেই ওরা চোখের আড়ালে চলে গিয়েছিল।'

অতনুর গলা এবার সামান্য কর্কশ উঠল। 'বিপজ্জনক খাঁড়ির মধ্যে ওরা নিশ্চয়ই প্রমোদ-ভ্রমণে যায়নি। সুন্দরবনের সঙ্গে আর কোনও জায়গাকে মেলাতে গেলে আপনি কিন্তু মস্ত ভুল করবেন।'

কথাটার কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না গোয়েন্দার মধ্যে। ও আরও ঠাণ্ডা গলায়

বলল, 'বোটম্যানকে তা হলে বোটটাকে আরও কিছুটা পিছিয়ে নিতে বলুন। আর, দূরবিনটা উপস্থিত আমার হাতেই থাক।'

কয়েক মুহূর্ত থম্ মেরে থাকার পরে সেই নির্দেশই দিলেন অতনু। বোট ধীরে ধীরে বেশ কিছুটা পিছিয়ে এসে থামল।

কৌশিকের হাতে দূরবিন। একটু পর-পর ও ওটা চোখে লাগিয়ে এম. জি. সদাগরকে দেখে নিচ্ছিল।

চারদিক আশ্চর্য রকমের চুপচাপ। আকাশের চাঁদ একটু ঢলে পড়েছে। মাঝেমধ্যে হালকা মেঘের সারি চাঁদের তলা দিয়ে ভেসে যাচ্ছিল। দূরের তীরভূমিতে শান্ত নদীর মৃদু ঢেউ ভাঙছিল। নির্জন নিশুতি রাতে সেই ঢেউ ভাঙার শব্দও ভেসে আসছিল পরিষ্কার। আর এক ধরনের শব্দ আসছিল মাঝেমধ্যে জলের গভীর থেকে। বড় মাছের ঘাই মারার শব্দ। কৌশিক জিজ্ঞেস করল, 'নদীতে খুব বড়-বড় মাছ আছে, না?'

প্রশ্নের কোনও উত্তর দিলেন না অতনু। গোয়েন্দা বুঝতে পারল, অভিজ্ঞ বনরক্ষীর বিরক্তির মাত্রা বেশ বেড়ে গেছে এখন।

আর যা বাড়ছিল তা হল রাত। একটু-একটু করে অনেকটা রাত বেড়ে গেল। দুজন ফরেস্ট গার্ড বোটের সিটে হেলান দিয়ে দিব্যি ঘুমোচ্ছিল। পালা করে নাক ডাকছিল ওদের। আশ্চর্য রকমের শান্ত এলাকায় নাক ডাকার শব্দই বিকট হয়ে উঠেছিল।

টর্চ জ্বেলে হাতঘড়ি দেখে নিল গোয়েন্দা। রাত আড়াইটে। সময় জানার জন্যেই বোধহয় মস্ত এক হাই উঠল ওর। সাহেব-মেম আজ তা হলে বোধহয় আর রাতের সফরে বেরুবে না। কিন্তু তাই যদি হয়, লঞ্চের গায়ে ঝোলানো বোট নদীর ওপরে নামানো হয়েছে কেন?

একটু পর-পর দূরবিন চোখে লাগিয়েই যাচ্ছিল গোয়েন্দা। আরও আধ ঘণ্টাটাক বাদে হঠাৎই ও টানটান হয়ে বসল। লঞ্চের গায়ে লাগানো নৌকোটার ওপরে কে যেন উঠেছে! পাশে বসে থাকা অতনুকে কনুই দিয়ে একটা ধাক্কা মেরে কৌশিক চাপা গলায় বলল, 'ওই নৌকোটায় একজন উঠেছে। বোটটাকে কিছুটা এগিয়ে নিয়ে যেতে বলুন এবার।'

অতনুর নির্দেশ পেয়েই বোট মাঝারি গতিতে এগোতে লাগল লঞ্চের দিকে। চলন্ত বোটের ঝাঁকুনিতে ঘুমন্ত দুই বনরক্ষীর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। চার ফরেস্ট গার্ডই এখন সজাগ। পাশের পাটাতনে রাখা বন্দুকগুলো ওদের হাতে উঠে এসেছে। কৌশিকের এক হাত দূরবিনে, অন্য হাত দিয়ে কোমরে গোঁজা পিস্তলটা স্পর্শ করে নিয়েছিল একবার।

স্পিডবোট আরও কিছুটা এগোবার পরে অতনু বোটম্যানকে বললেন, 'আর নয়, বোট এখানে থামাও।'

বোট থামতেই চারজন দক্ষ বনরক্ষী পাকা হাতে স্পিডবোটের গায়ে আটকানো নৌকোটাকে জলের ওপর নামিয়ে দিল। তার পর অতনু বোটম্যানকে বললেন, 'ফায়ারিংয়ের শব্দ শুনলেই তুমি বোট নিয়ে এগিয়ে যাবে। না হলে যেখানে আছ সেখানেই থাকবে।'

কৌশিক আর চার বনরক্ষী এখন ছোট নৌকোয়। হাতের বন্দুক কাঁধে ঝুলিয়ে দাঁড় টানছিল রক্ষীরা। প্রশিক্ষণ পাওয়া বনরক্ষীদের নৌকো বাওয়ার ধরনটাই এখন আলাদা।

যতটুকু শব্দ না উঠলে নয়, তার বেশি শব্দ উঠছিল না দাঁড় টানায়।

চাঁদ ঢলে পড়েছে জলের কাছাকাছি। আলো আর আঁধার এখন বুঝি সমান-সমান। কৌশিকের চোখে দূরবিন। নৌকোব লোকটা যে গণেশ, সেটা এখন বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু ও একা কেন?

গণেশের নৌকো ওদিকের ওই বাঁকের দিকে এগোচ্ছিল। ওর পিছু নিয়েছিল এই নৌকোটা। গণেশের মুখ সামনের দিকে, না হলে ওর পিছু নেওয়া সহজ হত না।

গণেশের নৌকো সোজা কিছুটা যাওয়ার পরে বাঁকেব আড়ালে ঢুকল। একটু বাদে ওই পথেই গেল পেছনের নৌকোটা।

বাঁক ঘোরার পরেই কৌশিকের ইঙ্গিতে নৌকো বাওযা থামাল চার বনরক্ষী। দূবে আর একটা লঞ্চ। লঞ্চের মাথায় ছোট্ট একটা লাল আলো। ওই দিকেই এগোচ্ছিল গণেশেব নৌকো।

কৌশিক ফিসফিসিয়ে সহযাত্রীদেব বলল, 'তীব ঘেঁষে চলুন। তীরেব কাছে নদী গাছেব ছায়ায় অন্ধকার হযে আছে। আমাদের আড়ালে থাকা সহজ হবে।'

সাবধানে নৌকো বাওয়া শুরু হল আবার। একটু পবেই এসে গেল অন্ধকাব নদীপথ। তীব জঙ্গলে ঠাসা। চাঁদ আকাশেব ধারে ঢলে পড়ায় গাছেব ছায়া এখন দ্বিগুণ লম্বা।

গণেশের নৌকো লঞ্চেব কাছাকাছি পৌঁছতেই লঞ্চেব একটা ঘরে আলো জ্বলে উঠেছিল। একটু বাদে লঞ্চের বেলিংয়ের সামনে এসে দাঁড়াল দুজন। চোখে দূরবিন এঁটেই চমকে উঠল কৌশিক। ওরা মারুতিব সেই দুজন—সাহেব আর ওর সঙ্গী। হাসনাবাদ আসার পথে গাড়ি থামিয়ে ডাব খেয়েছিল। কিন্তু গণেশ এদের কাছে যাচ্ছে কেন?

লঞ্চের শতখানেক হাত দূরে নদীতে ছড়িযে পড়া গাছের জমাট ছায়ার মধ্যে কৌশিকদের নৌকো থামল। চোখে দূরবিন এঁটে নজরদারির কাজ চালাচ্ছিল গোয়েন্দা। সাহেবের সঙ্গী ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়াল গণেশের দিকে।

লঞ্চের একটা আংটায় নৌকোর দড়ি জড়িয়ে দিয়ে ওই হাত ধরে লঞ্চে উঠে পড়ল গণেশ। তার পর আলো জ্বালানো ঘরটায় ঢুকল। দূরবিনে চোখ দিয়ে সব কিছু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল গোয়েন্দা। লঞ্চের নাম এম. জি. দিনমণি।

কোমরে বাঁধা থলি থেকে একটা কাগজের বান্ডিল বার করে সাহেবের দিকে এগিয়ে দিল গণেশ। খুব আগ্রহের সঙ্গে সেটা হাতে নিল সাহেব। তারপর বড় টেবিলের ওপর রোল করা কাগজটা ছড়িয়ে দিল। ম্যাপের মতো দেখতে কাগজের ওপরে ঝুঁকে পড়েছিল সাহেব আর ওর সঙ্গী।

তার পর যা ঘটল তার সঙ্গে আগের ঘটনার কোনও মিল নেই। সাহেব হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে কাগজটাকে দলা পাকিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল নদীর জলে।

মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিল গণেশ। উত্তেজিত সাহেব কী বলছিল এত দূর থেকে শুনতে পাচ্ছিল না কৌশিকরা। 'বোগাস', 'রাবিশ'—এই ধরনের দু-তিনটে শব্দ শুধু ভেসে এসেছিল বাতাসে।

গণেশকে টেনে বাইরে নিয়ে গেল সাহেবের সঙ্গী। একটু পরেই গণেশ আবার ওর নৌকোয় গিয়ে উঠল। তার পর যে পথে এসেছিল, সেই পথেই ফিরতে লাগল।

লঞ্চের ওই ঘরের আলো নিবে গিয়েছিল আবার। কিছুক্ষণ পরে কৌশিক ফিসফিস করে অতনুকে বলল, 'চলুন, গণেশের পেছনে। এবার একটু বেশি দূরত্ব রেখে যাবেন।'

চাঁদ বোধহয় জঙ্গলের ও পাশে নেমে গেছে। তবে আবছা একটা আলো আকাশে। বাঁকের মুখে পৌঁছে কৌশিক বলল, 'একটু থামুন।' ওর চোখে দূরবিন।

মিনিট-দশেক বাদে গোয়েন্দার চাপা গলা শোনা গেল আবার। 'গণেশ নৌকো ভিড়িয়ে ওদের লঞ্চের ভেতরে ঢুকে গেল। যে ভাবে ভিড়িয়েছে, তাতে মনে হয়, এখন আরও নৌকো চলবে না।'

বলার বেশ কিছুক্ষণ পবে বলল, 'চলুন আমরা স্পিডবোটে ফিরে যাই। একটু দূর দিয়ে চলুন। ভোর হয়ে আসছে, এখন মনে হয় আর কিছু ঘটবে না।'

॥ ১৬ ॥

স্পিডবোটের কাছে ফিবে এসে মুখ খুললেন বনরক্ষী অতনু, 'কী হল ব্যাপারটা! লোকটা শেষ রাতে নৌকো চালিয়ে সাহেবের কাছে গেল। সাহেব ওর দেওয়া কাগজটা দলা পাকিয়ে ছুড়ে ফেলে দিয়ে গালমন্দ করল। লোকটা আবাব চুপচাপ ফিরে এল লঞ্চে। কিছু বুঝতে পারলেন?'

দু দিকে মাথা নাড়িয়ে জবাব দিল কৌশিক, 'না।'

'এম. ভি. দিনমণির ওই সাহেবটাকে চেনেন?'

'না।'

'আগে দেখেছেন কখনও?'

'উহুঁ।'

শান্ত গলায় সংক্ষিপ্ত উত্তব শুনে একটু বুঝি বিরক্ত হলেন অতনু। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে বললেন, 'মরুকগে, যা খুশি করুক। ও সব আমাদের দেখার কথা নয়। কিন্তু কোর-এরিয়ায় আপনাদের লঞ্চের সাহেব-মেমের যাওয়ার কী হল?'

গোয়েন্দার কণ্ঠস্বরে হতাশা বা উত্তেজনা কিছুই ছিল না। আগেরই মতো ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'ওরা যে যাবেই, সে কথা বলিনি কিন্তু আমি। আমি অনুমান করেছিলাম, ওরা যেতে পারে।'

'স্রেফ অনুমান! আমি ভেবেছিলাম আপনার খবর পাকা। যাকগে, আপনি এখন কী করবেন? আপনাকে কি এম ভি সদাগরে পৌঁছে দেব?'

'না-না, এই শেষ রাতে গিয়ে আমি লঞ্চের লোকদের ঘুম ভাঙাতে চাই না। আপনারা এখন কোথায় যাবেন?'

'একবার হিঙ্গলগঞ্জে যেতে হবে। অল্প কিছু কাজ আছে আমাদের। তারপরেই আমরা হাসনাবাদে ফিরে যাব। রাতে কী হয়েছে—সকালেই বড় সাহেবকে রিপোর্ট করতে হবে।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর কৌশিক জিজ্ঞেস করল, 'হিঙ্গলগঞ্জ এখান থেকে কদ্দূর?'

'খুব একটা দূরে নয়।'

'তা হলে এক কাজ করা যাক। চলুন, আমি আপনাদের সঙ্গে হিঙ্গলগঞ্জে যাই। আপনারা আপনাদের কাজ সেরে নিন। তার পর আমাকে আমাদের লঞ্চে নামিয়ে দিয়ে ফিরে যাবেন। আপনাদের অসুবিধে হবে না তো?'

বড় সাহেবের নির্দেশ আছে বনরক্ষীদের ওপর—এই মানুষটির সব কথা শুনে চলবে। সুতরাং রাগ-বিরক্তি গোপন করে বনরক্ষীদের নেতা অতনু বললেন, 'না-না, কোনও অসুবিধে নেই।'

চার বনরক্ষী ছোট নৌকোটাকে তুলে নিল স্পিডবোটে। তার পর বোট ছুটল হিঙ্গলগঞ্জের দিকে। এবার বেশ জোরে। আশ্চর্য রকমের শান্ত ভোরকে ভেঙে যেন টুকরো টুকরো করতে করতে ছুটছিল স্পিডবোট। বিকট আওয়াজ। দু পাশের জল মস্ত-ঢেউয়ের মতো ফুলে উঠছিল। চাঁদ তো বেশ কিছুক্ষণ আগেই হারিয়ে গেছে সুন্দরবনের ঠাসা জঙ্গলের আড়ালে। আকাশের জ্বলজ্বলে তারাগুলো এখন মিটমিটে। আকাশে কুসুম-কুসুম আলো।

চার দক্ষ বনরক্ষী বোধহয় বেশ জোরদার একটা অপারেশনের অপেক্ষায় ছিল এতক্ষণ, কিন্তু কিছুই তেমন না ঘটার জন্যে ওরা বুঝি কিছুটা হতাশ হয়ে পড়েছে। তবে পেশাদার রক্ষীদের পক্ষে বেশিক্ষণ হতাশাগ্রস্ত হয়ে থাকাও সম্ভব নয়। স্পিডবোট ছোটার কিছুক্ষণের মধ্যেই চারজনের দুজন ঘুমিয়ে পড়েছিল আবার সিটে হেলান দিয়ে।

ওই দুজনের শরীরের ভাষা পড়ে গোয়েন্দা বুঝতে পেরেছিল ওদের নাক ডাকছে। কিন্তু স্পিডবোটের গর্জনে ওই ডাক চাপা পড়ে গিয়েছিল একদম। ওদের দিকে অবশ্য মনোযোগ ছিল না কৌশিকের। রহস্যের অভাবিত বাঁক নিয়েই ভেবে চলেছিল।

মারুতির ওই সাহেব আর তার সঙ্গী জড়িয়ে পড়েছে এখন এই রহস্যের জালে। কিন্তু জড়াবার কারণটা কী? দিন-তিনেক আগে গণেশ একটা লঞ্চের দিকে হাত তুলে কী-সব যেন ইঙ্গিত করছিল। নদীর বাঁকের আড়ালে ঢুকে গিয়েছিল লঞ্চ। এখন আর কোনও সন্দেহই নেই যে, ওই লঞ্চটাই এই লঞ্চ—এম ভি দিনমণি। তার মানে ডেভিস-জোসির সুন্দরবন সফর শুরু হওয়ার সময় থেকেই ওদের ওপর নজর রাখছে মারুতির ওই সাহেব আর তার সঙ্গী। কিন্তু কেন?

গণেশকে কি হাত করেছে ওরা? নাকি—! একটু নড়েচড়ে বসল গোয়েন্দা। গণেশ কি ওদেরই লোক! বিশেষ কোনও উদ্দেশ্যে এম ভি সদাগরে ওকে বোধহয় চালান করে দেওয়া হয়েছে। গণেশের কাজ এখন বুঝি এই লঞ্চের কাগজপত্র ওই লঞ্চে পৌঁছে দেওয়া। তাই যদি হয়, কী এমন মূল্যবান সেই কাগজপত্র!

গোয়েন্দার মাথার মধ্যে রহস্যের টুকরো-টুকরো বেশ কয়েকটা সুতো বিচ্ছিরি ভাবে জট পাকিয়ে গিয়েছিল। ঘুরে বসল ও। কোথাও কোনও আলোর রেখা নেই।

হিঙ্গলগঞ্জ এসে গেছে। ভোরের আলো এখন আগের তুলনায় পরিষ্কার। জেটির কাছে স্পিডবোট থামল।

বনরক্ষীদের প্রধান অতনু বুঝতে পেরেছিলেন, একটু রূঢ় ব্যবহার করে ফেলেছেন বড় সাহেবের সম্মানিত এই অতিথির সঙ্গে। সেটা ঢাকার জন্যে এবার অতিরিক্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'চলুন, নামা যাক। সাবধানে নামবেন। জেটির এদিকের তক্তাটা একটু উঁচু-নিচু

আছে।'

কোনও উত্তর না দিয়ে উঠে পড়লেন গোয়েন্দা। ওর মাথার মধ্যে রহস্যের নতুন বাঁকটা ঘোরাফেরা করছিল সমানে।

হিঙ্গলগঞ্জে নামার পরে অতনুর বিনয়ের মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল আরও। কোমল গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'একটু চা খাবেন স্যার?'

প্রশ্ন শুনে অবাক হয়ে কৌশিক বলল, 'এত ভোরে চা পাবেন কোথায়?'

'কাছেই একটা চায়ের দোকান আছে।'

'কিন্তু এখন কি দোকান খুলেছে?'

'ও নিয়ে আপনি ভাববেন না স্যার।'

এবার চার বনরক্ষীর মধ্যেই তৎপরতা বেড়ে গিয়েছিল।

চারদিকে চোখ ঘুরছিল কৌশিকের। বেশ জমজমাট গঞ্জ। সারি-সারি দোকানপাট। তবে সব দোকানেরই ঝাঁপ ফেলা। রাস্তায় মানুষজনের কোনও চিহ্ন নেই।

অতনু বললেন, 'পাশেই বাংলাদেশ বর্ডার তো। ওদিক থেকে অনেক লোক এদিকে আসে। এদিকের অনেক লোকও ওদিকে যায়। বিস্তর কারবারি আছে এদিকে। নানা ধরনের কারবারই হয়। এখানকার কিছু লোকের হাতে এখন প্রচুর পয়সা এসেছে।

নদীর ধারে একটা টালির ঘরের দিকে এগোচ্ছিল বনরক্ষীরা। কাছাকাছি যাওয়ার পরে কৌশিক বুঝতে পারল, ওটা একটা দোকানঘর। ঘরের সামনে খুব সরু তক্তার দুটো বেঞ্চি পাতা। কিন্তু দোকানঘরের টিনের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।

বনরক্ষীদের একজন এগিয়ে গিয়ে টিনের দরজায় দমাদ্দম ধাক্কা লাগাতে লাগাতে বলল, 'নগেন দরজা খোল্ রে। চা খাব।'

একটু বাদে দরজা খুলে বাইরে এল ছোটখাটো চেহারার একটা লোক। গায়ে চাদর জড়ানো, চোখে ঘুম। কিন্তু সামনে চার বনরক্ষীকে দেখে আপ্লুত হওয়ার গলায় বলল, 'বসেন স্যার, এক্ষুনি চা বানিয়ে দিচ্ছি।'

প্রায় ছুটে গিয়ে ঘরে ঢুকে একটা তোলা উনুন নিয়ে বেরিয়ে এল লোকটা।

অতনু ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোর উনুন ধরাতে তো একটু সময় লাগবে নগেন, তার মধ্যে আমরা চট করে আমাদের একটা কাজ সেরে আসছি। আর শোন্, আমাদের সঙ্গে বড় সাহেবের এক অতিথি আছেন। উনি এখানে থাকছেন। খুব নামী লোক, চা যেন এক্কেবারে এক নম্বরের হয়—।'

ভিতু-ভিতু চোখে বড় সাহেবের অতিথিকে একবার দেখে নিয়ে নগেন ছুটে এসে গায়ের চাদর দিয়ে একটা বেঞ্চি মুছে দিয়ে বলল, 'আপনি এখানে বসেন স্যার।'

'এক্ষুনি আসছি' বলে বনরক্ষীরা বাঁকানো মেঠোপথটা ধরে চোখের আড়ালে চলে গেল। নগেন দোকানঘরের পাশে উনুন জ্বালাবার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ভোরের আলো আর একটু ফুটেছে। আশেপাশের গাছপালার মাথায় পাখিদের কিচিরমিচির। আলো আর একটু বাড়লেই বাসা ছেড়ে আকাশে উড়বে পাখিগুলো। যত্ন করে মুছে দেওয়া বেঞ্চিতে না বসে পায়ে-পায়ে নদীর দিকে হাঁটতে শুরু করেছিল কৌশিক।

একটুখানি হাঁটতে না হাঁটতেই এসে গেল নদীতীর। এদিকে ছোট একটা ঘাটও আছে। ঘাটের মুখে একটা নৌকো বাঁধা। সুন্দরবনে আসার পরেই কৌশিক জেনে গেছে, এই

নৌকোগুলোর নাম ভটভটিয়া। দাঁড়ে নয়, যন্ত্রে চলে। আর চলার সময় ভটভট করে আওয়াজ তোলে বলেই এগুলোব সহজ নাম হয়ে গিয়েছে ভটভটিয়া।

কিছুক্ষণ নদী আর চারপাশের গাছগাছালি দেখার পরে আবার ওই চায়ের দোকানের দিকে হাঁটা দিল গোয়েন্দা। ভোবের আলো আর একটু উজ্জ্বল হয়েছে। দোকানের ঠিক উলটো দিকেই একটা ঝাঁকড়া গাছ। ওই গাছের নীচে পৌঁছবার পরেই কৌশিক দেখতে পেল, একটা লোক দোকানের সামনের সরু বেঞ্চিটার ওপরে বসে আছে। লোকটার পরনে পাজামা-পাঞ্জাবি। মুখে দাড়ি-গোঁফ। এখানকার কোনও কারবারি লোক হতে পারে। কিন্তু একটু খুঁটিয়ে দেখার পরেই চমকে উঠল গোয়েন্দা। তার পর কিছুটা ঘুরে পা টিপে এসে লোকটাব কাঁধ ধরে ঝাঁকিযে দিয়ে চাপা গলায় বলল, 'এখানে কী করা হচ্ছে?'

লোকটা চমকে উঠে পেছন ফিরল, তার পর আর একবার চমকে উঠে বলল, 'স্যার আপনি!'

গোয়েন্দা গলার স্বব আরও নামিয়ে বলল, 'আপনাব বাঁ দিকের গালের দাড়ি জুলপি থেকে দু-ইঞ্চি মতো খুলে গেছে।'

হাত দিয়ে দাড়ি ঠিক করতে করতে মুখার্জিবাবু বললেন, 'আজকাল দাড়িগোঁফ সাঁটার গাম্ খুব খারাপ হয়ে গেছে স্যার। আমরা যখন যাত্রা-থিয়েটার করতাম, তখন গাম্ ছিল এক নম্বরের। অভিনয়ের শেষে দাড়িগোঁফ তোলার সময় মনে হত, সত্যি-সত্যি নিজের দাড়িগোঁফ উপড়ে ফেলছি। ওহ! এখন বুঝতে পারছি ওরা কেন আমার দিকে অত ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছিল!'

'কারা?'

মুখার্জিবাবু উত্তর দেওয়ার মুখে আঙুল তুলে ওকে চুপ করতে বলল কৌশিক।

চায়ের দোকানদার নগেনের উনুন ধরানো হয়ে গেছে। ও এক হাতে জ্বলন্ত তোলা উনুন অন্য হাতে একটা পাখা নিয়ে দোকানের সামনের দিকে আসছিল। গোয়েন্দা ওর প্রবীণ সহকারী মুখার্জিবাবুর পাঞ্জাবিতে আলতো করে একটা টান মেরে সামনের ঝাঁকড়া গাছটার নীচে নিয়ে এসে বলল, 'কী হয়েছে পুরোটা বলুন তো।'

পুলিস ইন্সপেক্টর অবনী ঘোষরায়ের খুনের তদন্ত এবং সেই তদন্তে ওর ভূমিকা কী ছিল—সে কাহিনী গড়গড় করে শুনিয়ে দেওয়ার পরে মুখার্জিবাবু বললেন, 'বড়বাবু বললেন—পচন আর ভোলার পিছু নেওয়ার জন্যে শেয়ালদা স্টেশনে যাচ্ছ তো, তা দরকার হলে ট্রেনেও উঠে পড়বে। মোদ্দা কথা—ওরা কোথায় যায়, কী করে—এগুলো আমার সব জানা দরকার। সেই জন্যেই ওদের ফলো করে এখানে আসা।'

গম্ভীর হয়ে সব শোনার পরে গোয়েন্দা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি পচন আর ভোলার পিছু নিয়ে হাসনাবাদে এলেন। তার পর ভটভটিয়ায় চেপে এই হিঙ্গলগঞ্জে। তারপর?'

মুখার্জিবাবু বাঁ গালের দাড়ি আর একবার হাত দিয়ে চাপার পরে বললেন, 'কাল এখানে পৌঁছতে পৌঁছতে রাত্তির হয়ে গিয়েছিল। তা, ভটভটিয়ায় লোকজন নেমে যাওয়ার পরে ওরা ভটভটিয়ার মাঝির সঙ্গে কথা বলছিল। আমি নৌকো থেকে নেমে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে পরিষ্কার শুনতে পেলাম—ওরা আজ ভোরের জন্যে গোটা ভটভটিয়াটা ভাড়া নিচ্ছে। কিছু মালপত্তর নিয়ে হাসনাবাদে যাবে। ওরা আস্তেই কথা বলছিল, কিন্তু

মাঝিমাল্লারা তো একটু চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে কথাবার্তা চালায়—তাতেই ওদের ওই মতলবটার কথা টের পেয়ে গেলাম।'

'কী মালপত্তর নিয়ে যাবে, শুনতে পেয়েছেন?'

'ওরাও বলেনি, মাঝিও জিজ্ঞেস করেনি।'

'রাত্তিরে কোথায় ছিলেন আপনি?'

ঝলমলে মুখে জবাব দিলেন মুখার্জিবাবু, "কপালজোরে রাতটা ভালই কেটেছে স্যার। এখান থেকে আধমাইলটাক দূরে কাল রাত্তিরে একটা যাত্রাপালার আসর বসেছিল। হাতে হ্যারিকেন, বগলে মাদুর এক দঙ্গল লোক দেখেই বুঝতে পারলাম যাত্রাপালার দর্শক। ওদের পিছু নিয়ে আসরে পৌঁছে গিয়েছিলাম। পালার নাম 'গ্রহের ফেরে সতী নারী।' সামাজিক পালা স্যার। কিন্তু তার মধ্যে হিন্দি ছবি মার্কা নাচগান, অ্যাকশন। পালাটা সুবিধের নয়। সংলাপ দুর্বল। অভিনয়ও কয়েক জায়গায় বেশ কাঁচা। আমরা যে সব পালা নামিয়েছি তার ধারেকাছে আসার ক্ষমতা নেই এগুলোব। আপনি পুরনো দিনের বিখ্যাত পালাকার মনোহর সামন্তের নাম শুনেছেন তো স্যার?"

প্রশ্নের উত্তরের ধারকাছ দিয়ে গেল না গোয়েন্দা। গম্ভীর মুখে পালটা প্রশ্ন করল, 'আপনি তখন কাদের কথা বলছিলেন? কারা আপনার দিকে বারবার তাকাচ্ছিল?'

'তখন তো বুঝতে পারিনি স্যার, দাড়ি খুলে যাওয়াটাই তাকাবার কারণ। এখন আপনি বলায় বুঝতে পারছি। পচন আর ভোলা স্যার। হঠাৎ দেখি, ওরাও আসরে বসে আছে। একটু পরে দেখি, আমার দিকে ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছে। কলকাতায় আমাদের চেম্বারের পাশের বস্তিতেই থাকে। ভাবলাম, চেনা-চেনা ঠেকছে বলেই তাকাচ্ছে। নিজের মুখে বলা ঠিক নয় স্যার, তবু বলছি, আমার মেক-আপ নেওয়ার হাতটা দারুণ। দাড়িগোঁফ লাগালে আমাকে চিনে ফেলার সাধ্যি নেই কারও। সুতরাং ওরা বারবার তাকালেও আমি বেশ নিশ্চিন্তই ছিলাম। কিন্তু কী করে বুঝব যে, দাড়ির একদিকটা খুলে গেছে! দোষ আমার নয় স্যার, আঠার—।'

মুখার্জিবাবুকে থামিয়ে দিয়ে কৌশিক বলল, 'আজ ভোরে ওদের ভটভটিয়া কোন্ ঘাট থেকে ছাড়ার কথা?'

'এই তো স্যার, এখানেই একটা ঘাট আছে। মাঝি বলেছিল, ভোরেই এখানে ভটভটিয়া লাগিয়ে দেবে।'

খসখসে গলায় কৌশিক বলল, 'ঘাটে একটা ভটভটিয়া দেখে এলাম এইমাত্তর।'

'ওদের দেখলেন স্যার?'

'ওদের তো আমি চিনি না, তবে ভটভটিয়ায় মাঝি ছাড়া আর কেউ নেই।'

'তা হলে আসবে, এটাই তো আসা-যাওয়ার পথ। পালা শেষ হতেই আমি চলে এসেছি এখানে। এসে দেখলাম, এই চায়ের দোকানটা খুলে গেছে। দোকানদারকে বললাম, চা হবে ভাই? বলল, হবে। তবে বসতে হবে একটু। তাই ওখানে বসেছিলাম।'

কৌশিকের মুখ থমথম করছিল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে বলল, 'আমার তো এখন এখানে আসার কথা ছিল না। ঘটনাচক্রে এসে পড়েছি। আমি না এলে আপনি কী করতেন?'

ঝকঝকে মুখে জবাব দিলেন মুখার্জিবাবু। 'আমি সব ভেবে রেখেছিলাম স্যার। এত

ভোরে তো ওদের পিছু নেওয়ার জন্যে অন্য কোনও ভটভটিয়া পাব না। তাই ঠিক করেছিলাম, বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসা বানাব। ওদের ভটভটিয়া ছাড়ার মুখে ছুটে গিয়ে বলতাম—ভাই, আমার মেয়ের খুব অসুখ। ওষুধ আনার জন্যে একবার হাসনাবাদ যেতে হবে। আমাকে দয়া করে সঙ্গে নিয়ে চলো। আমি একটা সময় যাত্রা-থিয়েটারের লোক ছিলাম, এটুকু অভিনয় ঠিকই উতরে দিতে পাবতাম। ওবা কি আমাকে সঙ্গে নিত না?'

'নিত, নিশ্চয়ই নিত। এমন সুযোগ ওরা কিছুতেই হাতছাড়া করত না। তার পর মাঝনদীতে নিয়ে গিয়ে নকল গোঁফ-দাড়ি পরা পুলিশের চরকে খুন করে নদীতে ফেলে দিত।'

একটু আঁতকে উঠে মুখার্জিবাবু বললেন, 'কিন্তু আমি কী করে বুঝব স্যার, আমার দাড়ির একটা কোনা খুলে গেছে!'

চায়ের দোকানের নগেন হাঁক পাড়ল, 'বাবুরা আসেন, চা হয়ে গেছে।'

ওরা দোকানের দিকে এগোবাব মুখেই চাব বনরক্ষী ফিরে এল।

কৌশিক জিজ্ঞেস করল, 'কী, আপনাদেব কাজ মিটল?'

হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন বনবক্ষীদেব প্রধান অতনু, 'হ্যাঁ, মিটে গেছে। আজকের মতো আমাদের ছুটি। চা খেয়েছেন আপনি?'

'না, এবার খাব।'

একটু বাদে নগেন ধোঁয়া ওঠা চায়ের গ্লাস ধরিয়ে দিল সবার হাতে।

ভোরের আলো ইতিমধ্যে আরও পবিষ্কাব হয়ে গেছে। পাখিরা গাছ ছেড়ে আকাশে উড়ে গেছে বেশ কিছুক্ষণ। চারিদিকে গাছপালা ছড়ানো সবুজ একটা গঞ্জ।

গাঁ-গঞ্জের চা যেমন হয়, তেমন চা। তবে চা খেতে সবারই বেশ ভাল লাগছিল। কারণ, খদ্দেরদের প্রত্যেকেই কাল রাত জেগেছে। মুখার্জিবাবু একটা 'এস' বিস্কুট নিয়ে চায়ের গ্লাসে ডুবিয়ে ডুবিয়ে খেলেন। তাব পব গ্লাসে শেষ চুমুকটা দেওয়ার মুখেই দেখতে পেলেন মাঠের প্রান্তে বোঁচকাবুচকি মাথায় দুটো লোক। সঙ্গে সঙ্গে কৌশিকের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললেন, 'ওই যে স্যার, ভোলা আর পচন আসছে।'

কথাটা শুনেই কৌশিক কনুই দিয়ে মুখার্জিবাবুকে একটা খোঁচা মেরে বললেন, 'আপনি এক্ষুনি দোকানের আড়ালে চলে যান।'

মুখার্জিবাবু সরে যাওয়ার পরেই গোয়েন্দা অতনুকে টেনে নিয়ে সামনের ঝাঁকড়া গাছের নীচে চলে গেল। গাছের ডালপালা নেমে এসেছে অনেকটা নীচ পর্যন্ত। গুঁড়িটাও বেশ মোটা। মাঠের ওদিক থেকে যে লোক দুটো আসছে, তাদের চোখের আড়ালে থাকা একটুও কষ্টের নয়। অল্প কথার মধ্যেই কৌশিক অতনুকে বুঝিয়ে দিয়েছিল, একটু পরে কী করতে হবে বনরক্ষীদের।

দূরের লোক দুটো কাছে এসে গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। সামনের লোকটার মাথায় মস্ত বড় একটা টিনের স্যুটকেস। স্যুটকেসের ওপর একগাদা ঝাঁটার কাঠি আর পাকানো বেশ কিছুটা নারকেলের দড়ি। পেছনের লোকটার মাথায় বিশাল একটা গোলপাতার বোঝা। সুন্দরবনের এই গোলপাতাগুলো ঘর ছাওয়ার কাজে আসে। দৃশ্যটা এই হিঙ্গলগঞ্জের পক্ষে দিব্যি মানানসই। ছোটখাটো কারবারিরা এই ভাবেই মালপত্তর নিয়ে যায় এখান থেকে।

লোক দুটো কাছাকাছি এসে দোকানের সামনের বেঞ্চিতে চায়ের গ্লাস হাতে নিয়ে বসে-থাকা তিন বনরক্ষীর দিকে একবার তাকিয়েই ঘাটের পথে নেমে গেল। বনরক্ষীরা নিজেদের মধ্যে অলস ভঙ্গিতে গল্প করছিল। ওই লোক দুটোর দিকে তাকায়নি পর্যন্ত।

এখানকার উঁচু জমি নীচের দিকে ঢাল হয়ে নেমে গেছে। লোক দুটো ওই ঢালের আড়ালে অদৃশ্য হতেই অতনু আর কৌশিক দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এল গাছের পাশ থেকে।

বনরক্ষীরা ওদের প্রধানের নির্দেশ ইঙ্গিতেই ধরতে পারে। সুতরাং চটপট হাতের গ্লাস নীচে নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়িয়েছিল। ঢালের কাছে গিয়ে ওরা দেখতে পেল, লোক দুটো মালপত্তর তুলে দিয়েছে ভটভটিয়ায়। তার পর নিজেরাও উঠে পড়ল প্রায় লাফ মেরে।

ওরা উঠতেই চালু হয়ে গেল ভটভটিয়ার ইঞ্জিন। সঙ্গে সঙ্গে দৌড় লাগাল চার বনরক্ষী, সঙ্গে কৌশিক।

এইটুকু ছুটে আসতে ওদের কয়েক মুহূর্তের বেশি সময় লাগেনি। ভটভটিয়া নড়ে উঠতেই অতনু বাজখাই গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এই ভটভটিয়া, থামো।'

অদ্ভুত একটা কাণ্ড ঘটে গেল এবার। ভটভটিয়ার ওপর থেকে লাফ দিয়ে নামল ওই লোক দুটো, তার পর তীরগতিতে ছুট লাগাল মাঠের যে দিক থেকে এসেছিল সেই দিকে। দেখতে না দেখতেই বাঁকের আড়ালে মিলিয়ে গেল ওরা।

অতনুর নির্দেশের জন্যে কৌশিকের দিকে তাকতেই ও মাথা নাড়ল দু-দিকে। অর্থাৎ, ওদের পিছু ধাওয়া করার দরকার নেই।

দুজন বনরক্ষী উঠে পড়েছিল ভটভটিয়ায়। টিনের মস্ত বাক্সটায় পলকা একটা তালা লাগানো। কাঁধে ঝোলানো বন্দুকের বাঁট দিয়ে ওই তালায় একটা ধাক্কা মারতেই খুলে গেল তালা।

তখনও পর্যন্ত কেউ আন্দাজই করতে পারেনি কী বিশাল চমক অপেক্ষা করে আছে স্যুটকেসের মধ্যে। ডালা খুলতেই চমকে উঠল সবাই। স্যুটকেসের একেবারে ওপরেই আছে সদ্য ছাড়ানো একটা বাঘের ছাল। তার নীচে হরিণের চামড়া তিনটে। এগুলোও সদ্য-সদ্য ছাড়ানো।

চঞ্চল হয়ে উঠলেন অতনু। 'কী সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড! ওই লোক দুটো চোরাশিকারিদের লোক। ওদের পিছু নেওয়া উচিত ছিল।'

ইতিমধ্যে মুখার্জিবাবু ওখানে এসে গিয়েছিলেন। অতনুর কথা কানে যেতে বললেন, 'ওদের বাড়ির ঠিকানা আমি জানি স্যার। ওদের পক্ষে পালানো কঠিন।'

কথাটা শুনে অবাক হয়ে কৌশিকের দিকে তাকালেন বনরক্ষী-প্রধান। মৃদু হেসে কৌশিক বলল, 'হ্যাঁ, উনি ঠিকই বলছেন। কলকাতা থেকে উনি লোকদুটোর পিছু নিয়ে এসেছেন। কাজটা করেছেন পুলিশের নির্দেশেই।'

॥ ১৭ ॥

বড় খবর বোধহয় হাওয়ায় ভাসে। হিঙ্গলগঞ্জের ঘাটের কছে যে হাওয়া উঠেছিল, সেই হাওয়ায় জোর খবর মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল বহু দূর পর্যন্ত। বাঘ আর হরিণের চামড়া ধরা পড়ার আধ ঘন্টার মধ্যে ঘাটের কাছে পিলপিল করে জড় হয়ে গিয়েছিল গঞ্জের বহু লোক।

ভটভটিয়ার ওপরে বন্দুকধারী দুই বনরক্ষী। ওদের পাশেই ত্রিপল-ঢাকা ওই চামড়াগুলো। অতনু এবং আর একজন রক্ষী ভটভটিওয়ালাকে গ্রেফতার করে নিয়ে গিয়েছে। চারদিকে এখন ঝকঝকে ভোরের আলো। গাঁ-গঞ্জের লোক খুব ভোরে ওঠে। ওঠার পরেই জেনে গেছে ভয়ংকর এই খবরটার কথা। তার পরেই ছুটে এসেছে ঘাটের কাছে। নানা বয়সের শ'দেড়েক লোক। ওরা ফিসফিস করে কথা বলছিল নিজেদের মধ্যে, আর ওদের কৌতূহলী চোখ চামড়া ঢাকা দেওয়া ত্রিপলের ওপর।

ভটভটিয়ার মাঝিকে বনরক্ষীদের দফতরে জমা দিয়ে ফিরে আসার পথে ঘাটের মুখে ভিড় দেখে হুংকার ছাড়লেন অতনু, 'এই তোমরা এখানে কী করছ? যাও-যাও, নিজেদের কামকাজে যাও।'

ধমক খেয়ে ভিড়টা ছিটকে পিছিয়ে গিয়েছিল। তবে সরে যাওয়ার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না কারও মধ্যে। উল্টে আরও বুঝি জমাট হয়ে উঠেছিল। মুখে কোনও কথা নেই, কিন্তু প্রত্যেকের চোখেই অসম্ভব কৌতূহল। শেষ না দেখে কেউ বুঝি আর ওখান থেকে নড়বে না।

কাছে এসে অতনু চাপা গলায় কৌশিককে বললেন, 'ফোন করে বড় সাহেবকে সব জানালাম। উনি ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই চলে আসছেন এখানে। আপনি এখন কী করবেন বলুন? বোট তা হলে আপনাকে আপনাব লঞ্চে ছেড়ে আসুক।'

কৌশিকের কপালে বেশ কয়েকটা ভাঁজ পড়েছিল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে বলল, 'আপনাদের তো এখানে এখন অনেক কাজ। করুন, আপনারা আপনাদের কাজ করুন। আমার এখন একবার হাসনাবাদে যেতে পারলে ভাল হত। ফেরার ব্যবস্থা আমিই করে নেব। আপনাদের বোট কি আমাকে ওখানে ছেড়ে আসতে পারবে?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, কেন পারবে না? আমাদের তো এখন আর ঘরে ফেরার কোনও প্রশ্নই উঠছে না।'

অতনুর নির্দেশে এক রক্ষী কৌশিককে বোটে তুলে দিতে গেল। কৌশিকের পাশে মুখার্জিবাবু। ওরা বোটে ওঠার পরে বোট ছুটল হাসনাবাদের পথে। বোটে এখন বোটম্যান ছাড়া ওরা দুজন।

নৌকোর পেছন দিকে মুখার্জিবাবুকে টেনে নিয়ে এসে কৌশিক বলল, 'আপনার দাড়িগোঁফটা এবার খুলে ফেলুন তো—।'

বাঁ দিকের জুলফিতে সামান্য চাপ দিয়ে মুখার্জিবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন স্যার, দাড়ি কি আবার খুলে যাচ্ছে?'

উত্তরে কৌশিক একটু কেটে কেটে বলল, 'নজরদারির কাজ তো এখন শেষ। নকল দাড়িগোঁফ পরে থাকার আর কি কোনও দরকার আছে?'

একটু লাজুক-লাজুক মুখে উত্তর দিলেন মুখার্জিবাবু, 'না স্যার, ভাবছিলাম বাড়ি ফিরে আর একবার মেক-আপটা দেখব। আসলে কাল থেকে এগুলো পরে আছি তো—।'

'তাতে কী হয়েছে?'

'এক ধরনের ছেলেমানুষি বলতে পারেন স্যার। নকল হোক আর যাইহোক, অনেকক্ষণ সেঁটে আছে তো, একটু বোধহয় মায়া পড়ে গেছে। আমার এই রকম হয়—। বছর-পনেরো আগে আমার একবার পা ভেঙেছিল। মাস-দুয়েক পায়ে প্লাস্টার নিয়ে বাড়িতে পড়েছিলাম।

ওই প্লাস্টার কাটার সময় প্লাস্টারের জন্যে আমার কেমন যেন মায়া হচ্ছিল। অদ্ভুত ব্যাপার, এর কোনও যুক্তি নেই, কিন্তু আমার এই রকম হয়ে থাকে স্যার।'

কৌশিকের চৌকো মুখ, ওর চোয়াল হঠাৎই একটু বুঝি ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল। খসখসে গলায় বলল, 'দাড়িগোঁফ কি আমি উপড়ে দেব, নাকি আপনি নিজেই খুলবেন?'

'খুলছি স্যার।' আস্তে আস্তে দাড়িগোঁফ খুলে ফেললেন মুখার্জিবাবু, তারপর ওটা খুব যত্নের সঙ্গে ভাঁজ করে পাঞ্জাবির পকেটে রেখে দিলেন।

'ওটা আবার পকেটে রাখছেন কেন? পকেট থেকে রুমাল বার করার সময় পাঁচজনের সামনে পড়বে।'

'না স্যার, রুমাল তো আমি ডান পকেটে রাখি সব সময়। আসলে এই দাড়িগোঁফ আমার সেই যাত্রা-থিয়েটার করার আমলের। আমি বাজি ধরে বলতে পারি, এই কোয়ালিটি আপনি এখন আর কোথাও পাবেন না। আমার কাছে যা একটা পরচুলা আছে না, কী রকম -জানেন—।'

কৌশিকের কণ্ঠস্বর এবার সামান্য কঠিন হল। "আমার হাতে সময় বেশি নেই। এই ক' দিন অবনীদার কাজ কী-কী করেছেন, কোথায়-কোথায় গেছেন ; অবনীদাই বা কী করছেন—সব গুছিয়ে বলুন তো। একেবারে গোড়া থেকে বলবেন।"

'বলছি স্যার, আপনি তো সুন্দরবনে আসার আগে আমাকে বলেছিলেন, অবনীদা যদি কোনও ব্যাপারে আপনার সাহায্য চান—।'

'আমার কথা আমাকে আর বলার দরকার নেই। আমি চলে আসার পরে যা ঘটেছে তাই বলুন।'

'ঠিক আছে স্যার।'

মুখার্জিবাবুর স্মৃতিশক্তি ভাল, এবং উনি কথা বলতেও খুব ভালবাসেন। সুতরাং এ ক'দিন যা-যা ঘটেছে সব বলে গেলেন পর-পর। ওঁর কথা শেষ হওয়ার একটু বাদেই হাসনাবাদের ঘাটে এসে ভিড়ল স্পিডবোট।

কৌশিক ফিসফিস করে নির্দেশ দিল মুখার্জিবাবুকে। 'আপনি গায়ের চাদরটা দিয়ে মাথা-মুখ ভাল করে ঢেকে নিয়ে নামবেন।'

'কেন স্যার?'

'একটু বাড়তি সাবধানতা নেওয়ার জন্যে। এই স্পিডবোটের ড্রাইভার দাড়িগোঁফওয়ালা একটা লোককে বোটে উঠতে দেখেছে, আর নামার সময় দেখবে—লোকটার মুখে দাড়িগোঁফের কোনও চিহ্ন নেই। এ অবশ্য ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোক, কিন্তু এর কাছে এই রহস্য ফাঁস হোক—এটা আমি চাই না। অবশ্য বিপদে পড়ার ব্যবস্থা আপনি নিজেই সেরে রেখেছেন।'

'বিপদ! কী ভাবে স্যার?'

প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়ে গোয়েন্দা বলল, 'চলুন এবার নামা যাক।'

মুখার্জিবাবু গায়ের চাদর মাথায়-মুখে জড়িয়ে গোয়েন্দার পিছু-পিছু নেমে গেলেন বোট থেকে।

সকালের হাসনাবাদ ফেরিঘাট জমজমাট। বহু যাত্রী পারাপার করছে। যাত্রীদের মধ্যে বেশ কিছু ব্যাপারিও আছে। এদের সঙ্গে বড়-বড় ঝাঁকা আর ব্যাগ। বোধহয় প্রতিদিনের

কারবারি। ফেরিঘাটের সামনের দোকানগুলো খুলে গেছে। ট্রানজিস্টার আর ক্যাসেট প্লেয়ারে তিনজন গায়ক-গায়িকার গলায় চড়া গলার হিন্দি গান।

পুলিশের সার্কেল ইন্সপেক্টর শ্রীকৃষ্ণ মাইতির অফিস হাঁটাপথে মিনিট পাঁচ-সাতেকের বেশি নয়। লম্বা পা চালিয়ে মুখার্জিবাবুকে সঙ্গে নিয়ে ওই অফিসে এসে ঢুকল কৌশিক।

সাতসকালেই অফিসে এসে বসেছেন কৌশিকের শ্রীকৃষ্ণদা। পরনে অবশ্য বাড়ির পোশাক। উল্টো দিকের চেয়ারে মাঝারি চেহারার মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক। শ্রীকৃষ্ণদা অবাক হয়ে বললেন, 'আরে কৌশিক, তুমি আবার ফিরে এলে! কোনও ঝামেলা হয়েছে নাকি?'

'না কৃষ্ণদা, কোনও ঝামেলা-টামেলা হয়নি। তবে আমি ফরেস্ট গার্ডদের সঙ্গে ভোরবেলায় হিঙ্গলগঞ্জে গিয়েছিলাম। ওখানে তো ওরা বাঘের চামড়া সিজ করেছে—।'

থামিয়ে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণদা বললেন, 'আরে, ওই নিয়েই তো অমরেশবাবুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল এতক্ষণ। এঁর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই। অমরেশবাবু ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের একজন অফিসার, আর এ হল আমার ছোট ভাইয়ের মতো—কৌশিক, কৌশিক মিত্র। এর আর একটা মস্ত পরিচয় আছে—।'

পরিচয়টা গোপন রাখার জন্যে গোয়েন্দা সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ অফিসারকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'মুখার্জিবাবুর সঙ্গে আপনাদের আলাপ করিয়ে দিই—সনাতন মুখার্জি। আমরা এক অফিসে কাজ করি। হঠাৎ দেখা হয়ে গেল ওঁর সঙ্গে। কলকাতায় ফিরেছিলেন—। আমিই জোর করে নিয়ে এলাম। বললাম, পরের বাসে ফিরবেন। কিন্তু এত সকালে শ্রীকৃষ্ণদা আপনাকে অফিসে পাব, ভাবতে পারিনি।'

দেয়ালঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণদা বললেন, 'তেমন কোনও কাজ না পড়লে এত সকালে তো অফিসে আসি না। অমরেশবাবুর জরুরি তলবে এসেছি। তুমি যে খবরটা জেনে এসেছ হিঙ্গলগঞ্জ থেকে, তাই নিয়েই এতক্ষণ ধরে ওঁর সঙ্গে কথা হচ্ছিল আমার। সদ্য-ছাড়ানো একটা বাঘ আর তিনটে হরিণের চামড়া উদ্ধার করেছে বনরক্ষীরা। চোরাশিকারিদের এই বাঘ মারার রেটটা সুন্দরবনে এখন অ্যালার্মিং। পরশু দিনই পোচাররা একটা বাঘ মেরেছে।'

এ সব ঘটনা যেন এই প্রথম শুনল এমন ভাব করে কৌশিক জিজ্ঞেস করল, 'যে চামড়াটা বনরক্ষীরা উদ্ধার করেছে সেটা কি পরশু দিন মারা ওই বাঘটার?'

'না-না, সেটা নয়। ওই বাঘটা মারার পরেই বনরক্ষীদের নজরে পড়ে গিয়েছিল। চোরাশিকারিরা বাঘটা ফেলে রেখেই পালিয়েছে। এই যে বাঘটার চামড়া ধরা পড়েছে—এটা সবে মারা হয়েছে, হয়তো কাল রাতেই।'

ফরেস্ট অফিসার গম্ভীর মুখে বললেন, পরশুর ওই ঘটনাটা ঘটার পরেই আমরা আমাদের ভিজিলান্স আরও বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। তার ফলও পেয়েছি হাতেনাতে। একটা বাঘ আর তিনটে হরিণের চামড়া সিজ করা হয়েছে আজ ভোরেই। চোরাশিকারিদের কেউ অবশ্য ধরা পড়েনি এখনও। ধরবার জন্যে পুলিশ আর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে একসঙ্গে একটা অপারেশনের চেষ্টা করা হচ্ছে এখন।'

শ্রীকৃষ্ণদা বললেন, 'একটু আগেই টেলিফোনে পুরো ঘটনাটা আমি আমাদের এস পি-কে রিপোর্ট করেছি। এখন ওঁর নির্দেশের অপেক্ষায় আছি।'

ফরেস্ট অফিসার বললেন, 'আমাদের বড় সাহেব তো একটু আগেই সাইটে রওনা হয়ে গিয়েছেন। আমিও এখন ওঁর পরের ইনস্ট্রাকশনের অপেক্ষায়।'

সার্কেল ইন্সপেক্টরের ঘরে পর্দা খাটানো। পর্দা সরিয়ে একজন কনস্টেবল উঁকি মারতেই ইন্সপেক্টর বললেন, 'দেখ তো মধুর দোকানে জিলিপি ভাজা শুরু হয়েছে কি না হলে আমাদের জন্যে নিয়ে এসো।'

কনস্টেবল পর্দার ফাঁক দিয়ে মাথা আর একটু গলিয়ে সাহেবের অতিথির সংখ্যা গুনে নিয়ে চলে গেল। ফিরে এল মিনিট-পাঁচেকের মধ্যেই। হাতে মস্ত এক চ্যাঙারি গরম জিলিপি। চ্যাঙারির নীচে পুরু করে শালপাতা বেছানো। শ্রীকৃষ্ণদা কৌশিকের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'দুর্দান্ত জিলিপি বানায় মধু। এর জিলিপি একবার খেলে এই জিলিপির টানেই তোমাকে আবার হাসনাবাদে ছুটে আসতে হবে। কই খাও, হাত লাগাও। আপনারাও খান।'

পেল্লায় সাইজের গরম-গরম জিলিপিগুলো সত্যিই দারুণ খেতে। সবাই বেশ তৃপ্তি করে খেতে লাগল। মুখার্জিবাবু ঝলমলে মুখে বললেন, "জিলিপি হচ্ছে বাঙালির একেবারে নিজস্ব মিষ্টির একটা। ছেলেবেলায় জিলিপি ছাড়া আমাদের চলত না। কিন্তু এত ভাল মিষ্টিটা আজকাল ধরতে গেলে উঠেই গেছে। জিলিপির আমরা এতই ভক্ত ছিলাম যে, জিলিপি নিয়ে ওই প্রবাদটা আমাদের পছন্দ হত না। আমাদের ছেলেবেলায় স্কুলে 'জিলিপির প্যাঁচ' নিয়ে বাক্য রচনা করতে হত প্রায়ই। মতলব ভাঁজার সঙ্গে জিলিপির প্যাঁচের কী মিল আছে ভগবান জানেন! আচ্ছা, ওই প্রবাদটা এখন বোধহয় উঠে গেছে—। জিলিপিই নেই, প্রবাদ থাকবে কী করে?" কথা বলার শেষে রসে টইটম্বুর কড়া করে ভাজা আড়াই প্যাঁচের জিলিপির অর্ধেকটা মুখের মধ্যে চালান করে দিয়েছিলেন মুখার্জিবাবু।

আস্ত এক চ্যাঙারি জিলিপি দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল। কৌশিকের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে ওর শ্রীকৃষ্ণদা জিজ্ঞেস করলেন, 'আর কয়েকটা আনাই?'

দু-দিকে মাথা নাড়াল গোয়েন্দা। 'না-না, আর না। আমি আর খাব না?'

কৌশিকের কথাটা বাকি দুই জিলিপিরসিকও বললেন।

ওরা সবাই হাতটাত ধুয়ে আসার পরেই গরম-গরম চা এসে গেল কাচের গ্লাসে। চায়ে গোটা-দুয়েক চুমুক দেওয়ার পরেই ফোন বাজল। ফোনটা ধরেই শ্রীকৃষ্ণ মাইতি ওটা এগিয়ে দিলেন অমরেশবাবুর দিকে—'আপনার ফোন।'

অমরেশবাবু টেলিফোনে কান লাগিয়ে কেমন যেন সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে নির্দিষ্ট বিরতিতে বার কয়েক 'হ্যাঁ স্যার', 'ইয়েস স্যার', 'ঠিক আছে স্যার' বলার পরে টেলিফোন নামিয়ে রেখে বললেন, 'কনজারভেটর সাহেবের ফোন এসেছিল।'

'নতুন কোনও ডেভেলপমেন্ট হয়েছে নাকি?'

সার্কেল ইন্সপেক্টরের প্রশ্নের উত্তরে ফরেস্ট অফিসার বললেন, 'না, নতুন কিছু আর হয়নি। কয়েকটা ইনস্ট্রাকশন দিলেন আমাকে। আসলে অ্যানিম্যাল ট্রাফিকারদের দৌরাত্ম্য এত বেড়ে গিয়েছে যে, কী বলব! এদিকে চোরাশিকারি, ওদিকে পাচারকারী। মস্ত বড় একটা র‍্যাকেট। এদের সামলানো চাট্টিখানি কথা নয়। গত মাসেই এই নিয়ে আমাদের একটা মিটিং হয়েছিল। মিটিংয়ে ছিল ডবলিউ ডবলিউ এফ-ইন্ডিয়া, ট্রাফিক ; ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট আর ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ। হাই-লেভেল বডি তৈরি হল। মাথার ওপরে

পুলিশ কমিশনার। সব কটা উইং একসঙ্গে কাজ না করলে এই সব পাচার আটকানো যাবে না। ওদিকে পাচার, এদিকে পোচার। আগে এই উৎপাত এতটা ছিল না!'

'এখন বাড়ার কারণটা কী?'

কৌশিকের প্রশ্নের উত্তরে ফরেস্ট অফিসার বললেন, 'কারণ তো একটাই—টাকা। কোটি-কোটি টাকার কারবার চলছে। এ দেশে ড্রাগের চোরাচালানের মাথায় আছে নারকোটিকস্। হেরোইন, আফিম, গাঁজা ইত্যাদির চোরাচালানে কয়েক হাজার কোটি টাকার লেনদেন হয় নিয়মিত। দু-নম্বর চোরাচালান অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। আমাদের দেশে হালে তিন নম্বর চোরাচালান হয়ে উঠেছে অ্যানিম্যাল-ট্রাফিকিং। মনের সুখে জন্তু-জানোয়ার মারো আর পাচার করো। কোটি-কোটি টাকার লেনদেন। গোটা দেশ জুড়ে এই কাণ্ড চলছে। তবে ইদানীং দুর্ভোগ বেড়েছে আমাদের।'

'কেন?'

'আগে পাচার করার দুটো জায়গা ছিল ওদিকে—দিল্লি আর মুম্বই। ওপাশে বেশ কড়াকড়ি হওয়ার পরে বেশির ভাগই এখন চলে এসেছে কলকাতা আর শিলিগুড়িতে। এদিকে অনেক সুবিধে। মস্ত বড় সীমান্ত। ওদের আটকাবার মতো জোরদার ব্যবস্থাও নেই।'

মুখার্জিবাবু হাঁ করে সব শুনছিলেন। অমরেশবাবু থামতেই জিজ্ঞেস করলেন, 'চোরাচালান যায় কোথায়?'

'অবশ্যই বিদেশে। বিদেশেই তো মোটা টাকা। কতটুকুই বা পথ! টানা বর্ডার। ওদিকে ফেলতে পারলেই তো অন্য দেশ—বাংলাদেশ। নেপাল আর ভুটানেও মাল যায়। ওই সব দেশ থেকে সোজা ইউরোপ আর আমেরিকায়।'

'আচ্ছা এগুলোর দাম কী রকম? এই ধরুন—একটা বাঘের চামড়া, কত দাম?'

'বিদেশের বাজারে হেসেখেলে পঁচাত্তর হাজার থেকে লাখ টাকা। বড় মাপের অ্যাডাল্ট বাঘের চামড়ার দাম তো ফ্যান্সি প্রাইস। দাম উঠতে-উঠতে কোথায় গিয়ে ঠেকবে, কেউ জানে না। শুধু বাঘ নয়—হরিণ আছে, সাপ আছে, কুমির আছে। ওদিকে আবার বিস্তর হাতিও মারা হচ্ছে দাঁতের জন্যে—আইভরি। পূর্ব এশিয়াতে এক কেজি হাতির দাঁতের দাম কম পক্ষে বিশ হাজার টাকা। খড়গ পাচার করার জন্যে গণ্ডার মারা হচ্ছে বেধড়ক। ভাল বাজার আছে তাইওয়ান আর তাইল্যান্ডে। গণ্ডারের খড়্গের দাম কত জানেন? কম পক্ষে পাঁচ লাখ টাকা কেজি। তার মানে একটা খড়গ বেচতে পারলেই কোটি টাকা এসে যাবে হাতে।'

গ্লাসের চা শেষ হয়ে গিয়েছিল সবার। অমরেশবাবুর কথায় সার্কেল ইন্সপেক্টরের ঘরের পরিবেশ একটু যেন থমথমে হয়ে উঠেছিল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে কৌশিক বলল, 'শুধু পুলিশ, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট আর ওয়াইল্ড লাইফের লোকজন দিয়ে সব কাজ হবে না। সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে হবে। বুনো জন্তু-জানোয়ার যে আমাদের অমূল্য অরণ্যসম্পদ—এই বোধটা জাগানো দরকার সবার আগে।'

আপত্তি তোলার গলায় অমরশেবাবু বললেন, 'ও কাজটা কিন্তু হচ্ছে। বিভিন্ন দফতরই কাজে নেমেছে ওই নিয়ে। সুন্দরবনের কোর-এরিয়ার কাছাকাছি গ্রামে আমরা তো প্রায়ই ক্যাম্পেন চালাই। গাঁয়ের লোকদের ডেকে ডেকে বোঝানো হয়—কোনও বাঘ যদি

গাঁয়ে ঢুকে পড়ে, তোমরা কখনওই মারতে যেয়ো না। আমাদের খবর দেবে। আমরা ব্যবস্থা নেব। আমাদের প্রচারে কাজ হয় এখন। এলাকায় বাঘ ঢুকে পড়লে গাঁয়ের লোক খবর দেয় আমাদের। আগে সড়কি-বল্লম নিয়ে বাঘ মারতে যেত। মেরেও ফেলেছে কয়েকবার। এখন আর ও পথে যায় না, বনরক্ষীদের খবর দেয়। কয়েকটা ক্ষেত্রে ঘুমপাড়ানি গুলি ছুড়ে বাঘকে অজ্ঞান করে খাঁচাবন্দি করে কোর-এরিয়ায় নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।'

কৌশিক অমরেশবাবুকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'এটা আপনারা খুব ভাল কাজ করেছেন। আমি অবশ্য আরও অনেক বড় প্রচার-অভিযানের কথা বলছি। ড্রাগ্স নিয়ে যেমন হয়েছে। মজা করে ড্রাগের নেশা করতে গেলে কী ভয়ংকর পরিণতি হয়—এই নিয়ে তো প্রচুর অভিযান হয়েছে। বইপত্র লেখা, হোর্ডিং দেওয়া, কাগজপত্রে লেখালেখি, টিভিতে অনুষ্ঠান, শর্ট ফিল্ম বানানো, সেমিনার করা—কম হয়নি এ সব। এড্স কী, প্রতিরোধের উপায় কী?—তা নিয়েও বিস্তর প্রচার হয়েছে, এখনও হচ্ছে। এই ধরনের প্রচার-অভিযান তো বুনো জন্তু-জানোয়ার খতম করার বিরুদ্ধে হয়নি। এনডেন্জারড অ্যানিম্যাল্স বলতে ঠিক কী বোঝায়—সব লেখাপড়া জানা মানুষের কাছেও ব্যাপারটা পরিষ্কার নয়। বিরল প্রজাতির প্রাণী যে বাঁচিয়ে রাখা খুব দরকারি—সেই সচেতনতাই বা কোথায়?'

মুখার্জিবাবু এবার কৌশিককে থামিয়ে দিয়ে অমরেশবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সচেতনতা তেমন নেই—। আমার ছোট মুখ বড় কথা মানায় না, তবু বলছি—এই ব্যাপারে সরকারের যা করা উচিত, তা কি সরকার করেছে? এই যে কলকাতায় হাতিবাগানের দিকে—জায়গাটার কী নাম যেন—হ্যাঁ-হ্যাঁ, গ্রে স্ট্রিট—ওখানে তো জন্তু-জানোয়ার আর পাখির হাট বসে নিয়মিত। শুনেছি বিরল প্রজাতির পাখি, কচ্ছপ আর নানান জন্তু-জানোয়ার বিক্রি হয় ওখান থেকে। ওই সব হাটটাট এক্ষুনি বন্ধ করে দেওয়া দরকার। সেই সঙ্গে পশুপাখিদের ওপর ভালবাসা আর মায়া-মমতা জাগানো দরকার। তা না—।'

বেশ একটা আবেগ এসে গিয়েছিল মুখার্জিবাবুর, কিন্তু হাঁটুর ছোট্ট একটা ধাক্কায় ওঁকে থামিয়ে দিয়ে কৌশিক বলল, 'কথায় কথায় আপনাকে বোধহয় অনেকটা দেরি করিয়ে দিলাম মুখার্জিবাবু। আপনি বলছিলেন না—কলকাতায় ফেরার তাড়া আছে আপনার।'

ইঙ্গিতটা পরিষ্কার ধরতে পারলেন মুখার্জিবাবু। দেয়াল-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তড়াক করে উঠে পড়ে বললেন, 'মনে করিয়ে দিয়ে খুব ভাল করেছেন আপনি। কলকাতায় ফিরেই কয়েকটা দরকারি কাজ সারতে হবে আমাকে। যাক, এখানে এসে এঁদের সঙ্গে আলাপ হল—এটাই আমার লাভ। চলি এখন। নমস্কার।' জোর হাত দুই অফিসারের দিকে ঘুরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন মুখার্জিবাবু।

উনি চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ বাদে অমরেশবাবু খুব নিচু গলায় কথা জুড়লেন শ্রীকৃষ্ণ মাইতির সঙ্গে। কৌশিক বুঝল, তৃতীয় ব্যক্তির কানে যাতে কথাগুলো না যায় সেই জন্যই এই সতর্কতা। এটা বোঝার পরেই ও বলল, 'শ্রীকৃষ্ণদা আমি ওপরে যাচ্ছি, দু-একটা ফোন করতে হবে।'

ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন পুলিশ অফিসার। একতলায় ওঁর অফিস, দোতলায় কোয়ার্টার্স।

স্ত্রী এখন বাপের বাড়িতে, সঙ্গে ছেলেমেয়েরাও গেছে। দোতলায় এসেই টেলিফোন টেনে নিয়ে ডায়াল করল কৌশিক।

ও পাশে গুরুগম্ভীর গলা। 'ঘোষবায় স্পিকিং।'

'আমি কৌশিক, অবনীদা।'

প্রতিটি কথাই পরিষ্কাব শুনতে পেয়েছিলেন পুলিশ ইন্সপেক্টর অবনী ঘোষরায়, কিন্তু নিজের কানকে অবিশ্বাস কবে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে?'

আর একবার নিজের নামটা বলতেই ও পাশ থেকে বিস্ময় প্রকাশ করে ওর অবনীদা বললেন, 'কবে ফিরলে তুমি কলকাতায়?'

"আমি এখনও ফিবিনি। সুন্দববনেই আছি। আরও ক'টা দিন থাকতে হবে। মুখার্জিবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, ওঁর কাছেই সব শুনতে পাবেন।"

পরিষ্কার অভিমানের সুর ফুটে উঠল ইন্সপেক্টরের গলায়—'আর শোনাশুনির কোনও দরকাব নেই।'

গলার স্বর একপর্দা তুলে কৌশিক বলল, 'এখান থেকে কলকাতার লাইন চট করে পাওয়া যায় না। পেলেও হুটহাট কবে কেটে যায়। জাংশনে গোলমাল। আমাব যা বলার তাড়াতাড়ি বলে ফেলছি। যে হাড়গোড়গুলো আপনি সিজ করেছেন, সেগুলো ফেলে দেননি তো?'

'কাছকাছি হাড়গোড় ফেলাব জায়গা নেই বলেই ফেলা হয়ে ওঠেনি এখনও।'

'না-না, ফেলবেন না। যেমন আছে তেমনি থাক। আব একটা কথা—। মুখার্জিবাবুকে এখন কিছুদিন আর নজবদারির কাজে লাগাবেন না।'

'কেন?'

'পরে বলব। আর আপনি তদন্তেব কাজ যে ভাবে চালাচ্ছেন, ঠিক সেই ভাবেই চালিয়ে যান। খুব ভাল হচ্ছে কাজ।'

ফোঁস-ফোঁস করে গোটা-দুয়েক দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইন্সপেক্টব বললেন, 'কচু ভাল কাজ হচ্ছে! দুটো সাহেব একটা মেম খুন হল, অথচ আজ পর্যন্ত অপরাধীকে ধরার মতো একটা ক্লু পেলাম না! ও দিকে বড় সাহেব, মেজ সাহেব আর ছোট সাহেব আমাকে পালা করে ধাতাচ্ছে। আমার ব্লাডশ্যুগার এখন কত জানো?'

জানার সুযোগ পেল না গোয়েন্দা। ফোনের লাইনটা হঠাৎই কেটে গেল কট্ করে।

॥ ১৮ ॥

সকাল ন'টা। ঝকঝকে রোদ উঠেছে আকাশে। সঙ্গে জোরালো হাওয়া, তবে হাওয়ায় শীতের ভাব তেমন নেই। এম ভি সদাগর লঞ্চের ওপরে জোর আড্ডা বসিয়েছে জোসি, ডেভিস আর পূর্ণ চ্যাটার্জি। আড্ডা সাড়ে-তিনশো বছর আগের ভারতবর্ষের ব্যবসাপত্তর নিয়ে। পূর্ণদা বললেন, 'হ্যাঁ, সত্যিকাবের ধনী দেশ ছিল তখন ভারতবর্ষ। গোটা পৃথিবীর অনেকটা সোনা জড়ো হয়েছিল তখন হিন্দুস্থানে। শুধু সোনা নয়, হিরে আর মণিমুক্তোরও জোর ব্যবসা হত এখানে। গোয়ার এই সব দামি পাথর কেনাবেচার একটা বড় সেন্টার

ছিল। পর্তুগিজরা তখন আস্তানা গেড়েছিল ওখানে। পাথর কেনাবেচা হত ওদের এলাকাতেই মুক্তোর বেশ বড় একটা বাজার ছিল ওখানেই। তাভারনিয়েরের বইতে এইসব ব্যবসাপত্তরের খুঁটিনাটি বর্ণনা আছে অনেক।'

খুব আগ্রহ নিয়ে পূর্ণদার কথা শুনছিল ডেভিস আর জোসি। ডেভিস বলল, 'কিন্তু জোসির পূর্বপুরুষ বার্নিয়ের এই সব ব্যাপারে খুব একটা লেখেননি তো?'

পূর্ণদা টান হয়ে বসলেন। 'কেন লিখবেন? উনি তো প্রাইমারিলি একজন পর্যটক গোটা দেশের নানা দিকে চোখ গিয়েছিল ওঁর। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, লাইফস্টাইল, বিচিত্র সব রাজনীতি, ধর্ম, দর্শন—কী নয়! ব্যবসাপত্তর তার একটা পার্ট। আর, তাভারনিয়ের ছিলেন প্রধানত একজন ব্যবসাদার। ব্যবসার দিকেই ওঁর নজর ছিল বেশি, তবে অন্যান্য দিক নিয়েও লিখেছিলেন। মুঘল যুগকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখতে গেলে এই বই দুটো লাগবেই গোটা ইউরোপ আর এশিয়া চষে বেড়িয়েছিলেন তাভারনিয়ের। ভারতেই এসেছিলেন বার-পাঁচেক। চারশো বছর আগে জন্মেছেন, কিন্তু ওঁর দেখার চোখ ছিল অসাধারণ। প্রথম যখন এসেছিলেন তখন শাজাহানের আমল। বেশ শান্তি ছিল দেশে, তারপরেই সিংহাসন নিয়ে লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছিল বাদশাহের ছেলেদের মধ্যে। ঔরঙ্গজেব সম্রাট হওয়ার পরে একটা নতুন নিয়ম চালু করেছিলেন। আদেশ দিয়েছিলেন, বিদেশি ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করতে এলে প্রথমে সব মালপত্র দেখাতে হবে সম্রাটকে। সম্রাটের কেনাকাটা হয়ে যাওয়ার পরেই অন্য দিকে ব্যবসা করতে পারবে ব্যবসায়ীরা। তার আগে নয়। শায়েস্তা খান তখন আমাদের এই বাংলার নবাব। ঢাকায় থাকতেন। তাভারনিয়েরের নিয়মিত খদ্দেরদের মধ্যে উনিও ছিলেন একজন। মুক্তো কেনাবেচা হত খুব বেশি। সমুদ্র থেকে মুক্তো তোলার ভয়ংকর এক প্রথার কথা শুনিয়েছেন পর্যটক।'

'ভয়ংকর কেন?'

'ভয়ংকর এই কারণেই যে, হাতে প্রাণ নিয়ে মুক্তো তোলার চল ছিল তখন।'

'কী রকম?'

জোসির প্রশ্নের উত্তরে একটু ঘুরে বসে পূর্ণদা বললেন, 'সমুদ্র থেকে মুক্তো তোলার ব্যাপারে ওস্তাদ ছিল জেলেরা। উপকূল থেকে সমুদ্রের দশ-বারো মাইল ভেতরে ঢুকে যেত নৌকোয় চেপে। সাড়ে-তিনশো বছর আগেকার কথা। তখন তো আর কাঁধে অক্সিজেনের সিলিন্ডার নিয়ে, বিশেষ ধরনের পোশাক পরে, সমুদ্রে ডুব দিত না ডুবুরিরা। পুরো পদ্ধতিটাই ছিল আত্মহত্যা করার জন্যে জলে ঝাঁপ দেওয়ার মতো। খুব শক্ত একটা সুতো দিয়ে মস্ত এক টুকরো পাথর পায়ের বুড়ো আঙুলের সঙ্গে বাঁধত ডুবুরিরা। পাথর কেন? না, ওই পাথরের টুকরোসমেত সমুদ্রে ঝাঁপ দিলে খুব তাড়াতাড়ি ওরা সমুদ্রের তলায় পৌঁছে যাবে। পাথরের টুকরোটা লম্বা একটা দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকত, দড়ির একটা প্রান্ত থাকত নৌকোয়-বসা একজনের হাতে। ডুবুরির হাতেও বাঁধা থাকত লম্বা আর একটা দড়ি, সেই দড়ির অপর প্রান্ত ধরা থাকত নৌকোর আর একজনের হাতে। ডুবুরির হাতে থাকত জাল দিয়ে বানানো একটা থলি। থলির মুখে গোল আংটা পরানো, যাতে থলিটা সব সময় মুখ খোলা অবস্থায় থাকে। থলির মুখের সঙ্গে লাগানো থাকত আর একটা লম্বা দড়ি। সেই দড়ির অন্য প্রান্তটা বাঁধা থাকত নৌকোর সঙ্গে।'

জোসির চোখ বড়-বড় হয়ে গিয়েছিল। 'মাই গুডনেস। তারপর?'

'সমুদ্রের গভীরে ডুব দেওয়ার আগে এই ছিল ব্যবস্থা। দু হাতে মস্ত পাথরের টুকরোটা কোনও মতে তুলে নিয়ে জলে ঝাঁপ দিত ডুবুরিরা। তার পর ওই ভারী পাথরের টানে খুব দ্রুত পৌঁছে যেত জলের তলায়। জলের তলায় পৌঁছেই ডুবুরির প্রথম কাজ হত, পায়ের বুড়ো আঙুলে বাঁধা শক্ত সুতোটা খুলে দেওয়া। নৌকোর লোক সঙ্গে সঙ্গে ওই পাথরটা টেনে তুলে নিত ওপরে। ওদিকে ডুবুবি করত কি, পাথব খুলে দিয়েই খুব দ্রুত সমুদ্রের তলা থেকে শুক্তি কুড়িয়ে নিয়ে মুখখোলা জালের থলিতে ঢোকাত। তার পরে দম ফুরিয়ে আসার মুখে হাতের দড়িতে টান মেরে সঙ্কেত পাঠাত নৌকোব সঙ্গীকে। যার মানে; এবার শিগ্‌গির টেনে তোলো আমাকে। দড়ি টেনে সঙ্গী তখন খুব তাড়াতাড়ি ওপরে তুলে আনত ডুবুরিকে। অতক্ষণ সমুদ্রেব তলায় ওই ভাবে দম বন্ধ অবস্থায় থাকাব ফলে ডুবুবির অবস্থা তখন সঙ্গিন। জল থেকে ওপরে উঠে আট-দশ মিনিট নৌকোয় চিৎপাত হয়ে পড়ে থাকার পরে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস আবার সহজ-স্বাভাবিক হত ডুবুবিব, ডুবুরিকে তোলার পবে নৌকোর সঙ্গে বাঁধা শুক্তি বোঝাই থলিটা তোলা হত।'

সোজা হযে বসেছিল ডেভিস। 'হ্যাঁ, এটাকে অ্যাটেম্পটেড সুইসাইড ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।'

বিস্ময় ঠিকরে পড়ছিল জোসির ছোখ থেকে। 'অয়েস্টার কালেকশান এই ভাবে কি একবারই হত?'

দু দিকে মাথা নাড়তে নাড়তে পূর্ণদা বললেন, 'তাভাবনিয়ের লিখেছেন, প্রত্যেক ডুবুরি সারাদিনে দশ-বাবো ঘণ্টা এই ভাবে ডুব দিত সমুদ্রে।'

'ওহ্! নো। এই ভাবে বারবার ডুব দিলে তো অ্যাকসিডেন্ট হওয়াব কথা।'

'হত নিশ্চয়ই। অনেক ডুবুরিই জলে ডুবে মারা যেত নির্ঘাত। তবে তাভারনিয়ের ওদের মারা যাওয়ার কথা নিয়ে কিছু লেখেননি। আমার মনে হয, জলে ডুবে যারা মারা যেত না তাদেরও লাইফ স্প্যান খুব ছোট হয়ে যেত। ব্রিদিং ট্রাবলে ভুগতে ভুগতেই অকালে মারা যেত ওই ডুবুরিরা।'

'শুক্তি থেকে মুক্তো বার করে বড়লোক হওয়ার জন্য এত কষ্ট!'

দু-দিকে মাথা নাড়লেন আবার পূর্ণদা। 'তুমি ভুল করছ। ডুবুরিরা তো লেবার ছাড়া আর কিছুই নয়। কোনও মতে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার জন্যেই ভয়ংকর এই পেশা। ওদের এই ভাবে মৃত্যুর মুখে বারবার ঠেলে দিযে মুক্তো জোগাড় কবত ব্যবসাদাররা। তাভারনিয়ের লিখেছেন, ব্যবসাদারদের মধ্যে অনেক ডাচ ছিল।'

ডেভিস দর্শন আওড়াবার ভঙ্গিতে বলল, 'এক্সপ্লয়টেশন বরাবর ছিল, আজও আছে। এখন অবশ্য অন্য ফর্মে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হল, সেদিনের হিন্দুস্থানের অত মণি-মুক্তো-হিরে-সোনা গেল কোথায়?'

পূর্ণদা হাসতে হাসতে জবাব দিলেন, 'ওই সব সম্পদের বেশ কিছু হাত ঘুরে ঘুরে বিদেশে চলে গেছে, তবে অনেকটাই হয়তো এখনও—।'

'এ দেশেই রয়ে গেছে।'

চড়া গলায় হেসে উঠে পূর্ণদা বললেন, 'লেট আস হোপ সো। নিজেদের দেশকে তো সবাই ধনী ভাবতে চায়।'

ডেভিসও হাসল। আর তক্ষুনি লঞ্চের সারেং এসে জিজ্ঞেস করল, 'জোয়ার এসে গেছে, আমরা কি এবার নোঙর তুলব?'

'না-না, আমরা এখান থেকে চলে গেলে কাউশিক আমাদের খুঁজে পাবে কী করে! ওর জন্যে অপেক্ষা তো করতেই হবে।'

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে একটু উদ্বিগ্ন মুখে পূর্ণদা বললেন, 'স্ট্রেঞ্জ! ওর তো ভোরবেলাতেই আসার কথা ছিল। সাড়ে ন'টা বেজে গেছে, এখনও এল না!'

পূর্ণদা এই কথাটা বলার সময় কৌশিক রায়মঙ্গল নদীতে। লঞ্চের প্রায় কাছাকাছি এসে গিয়েছিল ওর স্পিডবোট। কিন্তু গোয়েন্দার মাথার মধ্যে তখন নানা ধরনের অঙ্ক কষা চলছিল। একটু আগেই লালবাজারে ফোন করে ধরেছিল ডিসিডিডি ওয়ান সন্দীপদাকে। সন্দীপদার কাছে ও বেশ কয়েকটা ব্যাপারে সাহায্য চেয়েছে। অভয় দিয়ে ওর সন্দীপদা বলেছেন : চিন্তার কোনও কারণ নেই। যা বলছ সব হয়ে যাবে। তুমি তোমার তদন্তের কাজটা চালিয়ে যাও।

স্পিডবোটে ওঠার মুখে হাসনাবাদের সার্কেল ইন্সপেক্টর ওর হাতে একটা মোবাইল ফোন ধরিয়ে দিয়েছেন। ওর কাজটা এখন ডেভিসদের গতিবিধির ওপরে সতর্ক দৃষ্টি রাখা। ও জানে, লঞ্চে পৌঁছবার পরেই নোঙর তুলে লঞ্চ আবাব ভেসে পড়বে নদীতে। রাতে নোঙর ফেলার পরে ওর প্রথম কাজই হবে মোবাইলে রেঞ্জারকে লঞ্চ নোঙর করার জায়গাটার কথা জানিয়ে দেওয়া। রেঞ্জার তখন নির্দেশ পাঠাবে ফরেস্ট গার্ড অতনুর কাছে। ওরা কাছাকাছি জায়গায় এসে চোখের আড়ালে থাকবে।

মাঝরাত্তিরে ডেভিসরা যদি নৌকো ভাসিয়ে খাঁড়ির দিকে রওনা দেয়, ও সঙ্গে সঙ্গে সে খবরটাও জানিয়ে দেবে অতনুকে। অতনুর কাজ হবে তখন ওদের পিছু নেওয়া। তবে কোর-এরিয়ায় ঢুকলেই ও যেন হুটহাট করে ওদের গ্রেফতার না করে বসে।

কনজারভেটরের সঙ্গে টেলিফোনে এই নিয়ে কৌশিকের অনেক কথাবার্তা হয়েছে। কনজারভেটব চক্রবর্তী ওর সঙ্গে একমত হয়েছেন। ওরা বাঘ মারার চেষ্টা করলে অবশ্য অতনুরা কড়া ব্যবস্থা নেবে। তেমন না হলে অতনুদের কাজ হবে গোপনে ওদের ওপরে নজরদারি চালিয়ে চুপচাপ ফিরে আসা। কী ঘটেছে সেটা জানার পরে গোয়েন্দা পরের কাজ ঠিক করবে পরে।

তদন্তের কাজে নেমে গেলে গোয়েন্দা পুরো ব্যাপারটাই নিজের মধ্যে রাখে। সাহায্যের জন্যে যেটুকু না জানালে নয়, ততটুকুই জানায়। এই গোপন রাখাটা একেবারেই তদন্তের স্বার্থে। কিন্তু এবার ও এখনও পর্যন্ত খুব বেশি জানতে পারেনি। অনুমানের অংশটাই বড়। ওই সব অনুমান আবার এখনও জোরদার হয়ে ওঠেনি।

অন্য লঞ্চে মারুতির ওই সাহেব আর তার সঙ্গী এবং গণেশের সঙ্গে ওদের গোপন যোগাযোগ পুরো বিষয়টাকে হঠাৎই বেশ জটিল করে ফেলেছে। একটা ব্যাপারে ও নিশ্চিত, মারুতি গাড়ির ওই সাহেবের লঞ্চ জোসি-ডেভিসের লঞ্চকে অনুসরণ করছে দূর থেকে। আজ রাতে এম ভি সদাগর যেখানে নোঙর ফেলবে, তার অল্প দূরেই কোনও একটা আড়ালে নোঙর করবে এম ভি দিনমণি। কিন্তু কেন? কী চায় দিনমণির সাহেব আর তার সঙ্গী?

শ্রীকৃষ্ণদার ওপরে ছোট একটা দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে এসেছে কৌশিক। এই দুটো

লঞ্চের লোকরা সুন্দরবনে ঘোরার কারণ হিসেবে ঠিক কী রেকর্ড করিয়েছে সরকারি খাতায়—সেটা জানতে হবে গোপনে। খোঁজখবর নেওয়ার ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে সতর্ক হয়ে যাবে ওরা। তাই যদি হয়, তদন্তের কাজে বাধা পড়বে।

স্পিডবোট এম ভি সদাগরের পাশে আসতেই অচেনা একটা গলা কৌশিকের কানে ভেসে এল। অচেনা গলাটা চেঁচিয়ে চেঁচিযে কী যেন বলে যাচ্ছিল। কে লোকটা?

স্পিডবোট ছেড়ে লঞ্চে উঠে পডল কৌশিক। সারেংয়ের ঘরের সামনে পূর্ণদা, জোসি আর ডেভিস বসে। চারপাশে লঞ্চেব সাত-আটজন লোক। ঠিক মধ্যিখানে অচেনা একটা লোক হাত নেড়ে উঁচু গলায় কথা বলছিল। বাকি সবাই সেই কথা মন দিয়ে শুনছে। লঞ্চের লোকরা একটু সবে গিয়ে কৌশিককে ভেতরে যাওয়াব জায়গা করে দিযেছিল।

পূর্ণদা হাসি মুখে বললেন, 'খুব ভাল সময়ে এসে গিয়েছে কৌশিক। এই লোকটি বাঘবন্দির মন্ত্র জানে। সুন্দরবনের মস্ত বড গুণিন। নাম—।'

লোকটা ঘুরে গিয়ে কৌশিককে নমস্কার করে বলল, 'আমার নাম হিরু মণ্ডল। থাকি নেতি ধোপানির ঘাটের কাছে। কেউ আমাকে গুণিন বলে, কেউ বলে ফকির, কেউ বলে সাধু। যে যা বলে ডাকুক না কেন, আমি সবার ডাকেই সাড়া দিই। তবে আমার একটাই পরিচয়—আমি মা বনবিবির ভক্ত। মা যেমন চালায় আমি তেমনি চলি। আমরা সাত পুরুষ ধরে বনবিবির সেবা করে আসছি।'

পূর্ণদা ওকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি বাঘবন্দির যে কথাটা বলছিলে, সেটা বলো।'

লোকটার পরনে রং-বেরঙের তালি মারা একটা আলখাল্লা আর পাজামা। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, কিন্তু গোটা মুখটাকে ঢেকে রেখেছে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল। গায়ের শ্যামলা রং রোদে পোড়া। গলার স্বর কর্কশ, কথা বলে উঁচু স্বরে। আলখাল্লার হাতা দিয়ে কপালের ঘাম মুছে নিয়ে দু-হাত কপালে ঠেকিয়ে হঠাৎই গান জুড়ল হিরু মণ্ডল। 'কহ মা বনবিবি/কোথা রইলে এই সময়ে/জলদি করে এসে দেখো/তোমার দুখে মারা যায়।'

চড়া গলায় সুর তুলে এই ক'টা লাইনই কিছুক্ষণ ধরে গাইল হিরু। তার পর বলল, 'আপনারা কি দুখের বেত্তান্ত জানেন?'

দু দিকে মাথা নাড়লেন পূর্ণদা। 'না, জানি না তো।'

'কী করে জানবেন? আপনারা তো শহরের বাবু, তবে ইদিকের সবাই জানে। মায়ের কথা অবিশ্যি পুরনো হয় না। এ সব কথা বললে পুন্যি, শুনলে পুন্যি। কত্তারা কি শুনবেন?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, কেন শুনব না? শোনাও তো।'

কথকতার ঢঙে বনবিবির উপাখ্যান শুরু করল হিরু। 'বরিজহাটিতে ধোনাই আর মোনাই নামে দুই ভাই থাকত। তারা একদিন ডিঙা সাজিয়ে সুন্দরবনে গেল মধু আনতে। তাদের সঙ্গে ছিল দুখিনি বিধবার একমাত্র ছেলে দুখে। ডিঙ্গা গড়খালি নদীতে পৌঁছলে বাঘদের দেব্‌তা দক্ষিণ রায় নরবলি দিতে বললেন। তখন ধোনাই ও মোনাই দুখেকে রেখে চলে গেল। খবর পেল দুখের মা—ছেলে দারুণ বিপদে পড়েছে। বিধবা তখন বনবিবির

কৃপা চাইল। বলল, মা আমার একটাই ছাওয়াল। ওরে তুমি বাঁচাও। মা বনবিবি সাড়া দিলেন বিধবার ডাকে। যুদ্ধু শুধু করলেন বাঘদের দেব্‌তা দক্ষিণ রায়ের সঙ্গে। যুদ্ধুতে হেরে দক্ষিণ রায় মেনে নিলেন মা বনবিবিকে। বেঁচে গেল দুখে। চোখে দেখতে পেত না দুখের মা। মায়ের কৃপায় সে আবার চোখ ফিরে পেল। মায়ের দয়ায় অনেক সম্পত্তির মালিক হল দুখে। তার পর তার সঙ্গে ধোনাইয়ের মেয়ে চম্পার বিয়ে হয়ে গেল। সুন্দরবনের সব মানুষই বনবিবি ও গাজির নামে দোহাই দেয়। পাঁঠা বলি দেয়। গাজির নামে সিন্নি মানত করে। এ সব কথা আর একবার বলে আমার পুন্যি বাড়ল, আর আপনাদের পুন্যি হল।'

গুনগুন করে সুর ভেঁজে আর একটা গান ধরতে যাচ্ছিল হিরু, কিন্তু হঠাৎই একটু অসহিষ্ণু গলায় ডেভিস বলে উঠল, 'তুমি কি সত্যি সত্যিই বাঘ বন্ধনের মন্ত্র জানো?'

জোড় হাত কপালে ঠেকিয়ে হিরু বলল, 'জানি বললে বড়াই করা হয়ে যাবে ছাহেব। তবে মা বনবিবির দয়ায় বড় মিয়াঁ, ছোট মিয়াঁ—দুজনারই মুখ বাঁধতে পারি আমি।'

'বড় মিয়াঁ! ছোট মিয়াঁ! তারা কারা?'

'আমাদের এখানে মৌলি, বাগদি, কাঠুরে, মাঝি সবাই ওনাদের ওই নামেই ডাকে। বড় মিয়াঁ হল গিয়ে বাঘ, ছোট মিয়াঁ মানে কুমির।'

'ভাল কথা। তুমি কি মন্ত্র পড়ে বাঘের মুখ বাঁধার প্রমাণ দিতে পারো আমাদের?'

ডেভিসের কথা শুনে হিরু মণ্ডল এমন ভাবে হাসল যেন এমন মজার কথা ও সাত জন্মেও শোনেনি। তার পর দু-হাত কপালে ঠেকিয়ে বলল, 'জয় মা বনবিবি, সবই তোমার কৃপা। ছাহেব, আপনারে একটা কথা বলি। এই যে এত লোক বনে ঢোকে মধু আনতে, মোম আনতে, কাঠ আনতে—তাদের কজনকে বাঘে ধরে? আমরা মন্তর পড়ে বাঘের মুখ বেঁধে রাখি বলেই তারা বাঘের পেটে যায় না। যাদের বাঘে ধরে, জেনে রাখবেন তারা মন্তরের বন্ধন না নিয়েই বনে ঢুকেছিল। নিজের মুখে এ সব কথা বললে বড়াই করার মতো মনে হবে। আমি বলছিও না। আপনি গাঁ-গঞ্জের লোকের কাছে হিরু মণ্ডলের খ্যামতার কথা জিজ্ঞেস করে দেখেন গিয়ে। একবার বনে গিয়ে অদ্ধেক মন্তর পড়েছি ঠিক সেই সময় বাঘ একটা হরিণ ধরেছিল। আমি ঝটপট বাকি মন্তরটা বলতেই বাঘের মুখে বন্ধন পড়ে যায়। বাঘ আর হরিণটা খেতে পারেনি। আমি গিয়ে তখন বাঘের মুখ থেকে এক কামড় খাওয়া হরিণটা ছাড়িয়ে নিই। বনে তখন কয়েকজন মৌলি ছিল, তারা নিজের চোখে দিশ্যটা দেখেছে। বলেন তো তাদের কাউকে-কাউকে আমি এখানে ডেকে আনতে পারি।'

গুণিনের কথা শুনে চমৎকৃত হয়ে গিয়েছিল ডেভিস। বলল, 'না, কোনও লোককে ডাকার দরকার নেই। আমি তোমার কথা বিশ্বাস করছি।'

জোসি হিরুর সব কথা বুঝতে পারেনি। যেটুকু আটকে ছিল সেটুকু বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ওর পূর্ণদা।

সব বুঝে জোসি ওর বড়-বড় চোখ দুটো আরও বড় করে বলল, 'ইনক্রেডিব্‌ল্'!

সারেং এবার ডেভিসের কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল, 'বাবু তো এসে গেছেন, এবার কি আমার নোঙর তুলে লঞ্চ ছেড়ে দেব?'

'রাইট। কাউশিক তো এসে গেছে, এবার আমরা যেতে পারি।'

সারেং আর ওর দলবলের মধ্যে হঠাৎই ব্যস্ততা পড়ে গিয়েছিল। খুব অল্প সময়ের মধ্যে নোঙর তুলে ছেড়ে দেওয়া হল লঞ্চ। যাত্রা শুরু হতেই কাপালে হাত ঠেকিয়ে হিরু সুর করে বলল, 'আমরা আছি পোলাপান/গাজি আছে নিঘাবান/শিরে গঙ্গা দরিয়া/পাঁচ পির, বদর বদর।'

হিরুর ঠিকপাশেই ছিল গণেশ। ও হিরু আলখাল্লায় একটা টান মেরে বলল, 'চলো, আমার এবার নীচে যাই। সাহেবরা এখন নিজেদের মধ্যে কথা বলবে। যখন আবার ডাকবে তখন আসবে।'

মাঝনদীর দিকে ছুটে চলেছিল লঞ্চ।

রাজ্যের দুষ্টুমি জোসির দুই চোখে যেন জড় হয়েছিল। কৌশিকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কাউশিক, তোমার গার্ল-ফ্রেন্ড খুব ভাল মেয়ে। সকালেই তোমাকে ছেড়ে দিয়েছে।'

নকল গাম্ভীর্য চোখে-মুখে ফুটিয়ে তুলে কৌশিক উত্তর দিল, 'কিছুতেই আমাকে ছাড়তে চাইছিল না, কিন্তু আমি যেই না বললাম—না গেলে জোসি খুব রাগ করবে—তখন ছেড়ে দিল।'

কৌশিকের জবাব শুনে তিনজনেই হেসে উঠেছিল। হাসি থামলে পূর্ণদা জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাল কথা, কেমন আছেন তোমার শ্রীকৃষ্ণদা?'

"এমনিতে ভাল, কিন্তু একটা হাঁটুর উপর থেকে নীচে পর্যন্ত প্লাস্টার করা। প্লাস্টার কাটা হবে দু'মাস বাদে। বললেন এ ভাবে বিছানায় পড়ে থাকাটা পানিশমেন্ট। কাঁহাতক বই পড়ে আর গান শুনে সময় কাটানো যায়।"

সহানুভূতির গলায় কথাটায় পূর্ণদা সায় দিয়ে বললেন, 'তা ঠিক। বিছানায় পড়ে থাকাটা বই কষ্টের। একটা হাত ভাঙলে প্লাস্টার নিয়ে একটু ঘুরে-ফিরে বেড়ানো বা দরকারি কাজকর্ম সারা যায়। কিন্তু পা ভাঙলে মুভমেন্ট একদম রেস্ট্রিক্টেড হয়ে পড়ে। তোমাকে পেয়ে উনি নিশ্চয়ই খুব খুশি হয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, ভীষণ। প্রচুর গল্প হল। বললেন, সময় পেলে এই ট্রিপের মধ্যে আর একবার এসো।'

পূর্ণদা একা থাকেন, তার উপর বয়েস হয়েছে ; একা-মানুষের দুঃখটা খুব ভালই বোঝেন উনি। একটু থেমে বললেন, 'অসুখ-বিসুখ হলে বেশি করে বোঝা যায়—মানুষের সঙ্গ কত জরুরি।'

শ্রীকৃষ্ণদার ভাঙা পায়ের মিথ্যে গল্পটাকে আর টানতে ইচ্ছে করছিল না কৌশিকের, প্রসঙ্গ ঘোরাবার জন্য ডেভিসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাঘ-কুমিরের মুখ বাঁধার এই লোকটাকে আপনারা কোত্থেকে পেলেন?'

গম্ভীর মুখ করে উত্তর দিল ডেভিস, 'দি আদার ডে গাণেশ ওয়াজ টেলিং মি আ লট অব স্টোরিজ অ্যাবাউট হিম। তখন আমি বলেছিলাম, পারলে লোকটাকে নিয়ে এসো তো। দিন-দুয়েক লঞ্চে থাকবে। গল্প শোনা যাবে ওর মুখ থেকে। আই বিলিভ ইন তন্ত্র-মন্ত্র। তবে এটাও সত্যি, দেয়ার আর মেনি ফেক ফকিরস। সত্যি-সত্যি তন্ত্র-মন্ত্র জানা লোক খুব কম আছে।'

সাহেবের হাতে কালনাগিনীর উল্কি আঁকা, ওই উল্কির কথা হঠাৎই মনে পড়ে গিয়েছিল কৌশিকের। হাতে যে ওই ধরনের উল্কি বানাতে পারে, তার তন্ত্রে-মন্ত্রে বিশ্বাস থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। পূর্ণদার দিকে তাকিয়ে কৌশিক জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা এই যে বনবিবি, দক্ষিণ রায়—এদের পুজো সুন্দরবনে চালু হল কী ভাবে?'

পূর্ণদা চেয়ারটাকে একটুখানি ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, "বেশির ভাগ দেবদেবীর পুজো যে কারণে চালু হয়েছে, সেই কারণেই। অর্থাৎ প্রাণ বাঁচাবার জন্যে। মধ্যযুগে সুন্দরবন এলাকা এখানকার চাইতে দশ গুণ বড় ছিল। নদী আর বন থিকথিক করত বাঘ আর কুমিরে। তার থেকেই 'জলে কুমির ডাঙায় বাঘ' প্রবাদটা চালু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন আর এই প্রবাদটা বোধহয় বলা যায় না। অনেক কাল আগে এই সুন্দরবনে বাঘ কুমিরের সংখ্যা ছিল হাজার হাজার। একটা রিপোর্টে দেখছিলাম, গত বছর এই সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা নেমে এসে দাঁড়িয়েছে দুশো সত্তরের কাছে। কিন্তু কুমির কোথায়? দেখছ না? নদীতে কত লোক বাগদার চারা ধরছে। ওই চারাগুলো ভেড়িতে ফেলে বাগদার চাষ হয়। আগের মতো কুমির থাকলে সেটা কি আর সম্ভব হত! চামড়ার লোভে চোরাশিকারিরা কুমির মেরে সব শেষ করে দিয়েছে। বাঘ মাবার চাইতে কুমিব মারা সহজ। এখন কিছু কুমির পাবে মোহনায়। তা, মধ্যযুগের চেহারাটা তো অন্য রকম ছিল। জলে থিকথিক করছে কুমির, ওদিকে ডাঙায় অসংখ্য বাঘ। তখন রুজি-রোজগারের জন্যে বনে ঢুকতেই হত, যারা ঢুকত তাদের সবাই ফিরত না। বেশ কিছু যেত বাঘের পেটে। অসহায় মানুষ তখন বাঘের দেবতা দক্ষিণ রায় আর বনের দেবী বনবিবির পুজো আরম্ভ করেছিল। সজনেখালিতেই বনবিবির থান আছে। দেখেছ?'

কৌশিকরা মাথা নাড়ল দু-দিকে। পূর্ণদা বললেন, "আমি গিয়ে দেখে এসেছি। প্রাণের ভয়ে তখন সুন্দরবনের হিন্দু-মুসলমানরা ওদের পুজো আরম্ভ করল। মধ্যযুগে দক্ষিণ রায়কে নিয়ে 'রায়মঙ্গল' কাব্য লেখা হয়েছিল। মুসলমানরা লিখেছিল, 'বনবিবি-জহুর'। তবে হিন্দু-মুসলমানের দক্ষিণ রায় আর বনবিবি কল্পনা অদ্ভুত ভাবে মিশে গেছে। বনবিবির নানারকম মূর্তি দেখা যায়। কোথাও তিনি সুশ্রী ও লাবণ্যময়ী। কোথাও দেবির পরনে অবাঙালি মুসলমানি পোশাক। মাথায় জরির টুপি, পিঠে বিনুনি, পরনে ঘাগরা-সালোয়ার। এক হাতে একটি শিশু, অন্য হাতে ফল। দেবী বসে আছেন বাঘ বা মুর্গির ওপরে। কোথাও বনবিবির পরনে হিন্দুর পোশাক। প্রাণের ভয়ে মৌলি, কাঠুরেরা দক্ষিণরায় আর বনবিবির পুজো চড়াত। কিছু ফকিরের তখন বেশ নামডাক ছিল। লোকের খুব বিশ্বাস ছিল ওদের ওপর। ওরা ভাবত, বাঘ ও কুমির ফকিরের আদেশ মেনে চলে। ফকিররা ইচ্ছে করলেই ওদের মুখ বন্ধ করে দিতে পারে। বাঘ-কুমিরের মুখই যদি বন্ধ হয়ে যায়, তা হলে তো আর আক্রমণের ভয় থাকে না।"

ডেভিস হঠাৎই তর্ক করার গলায় বলল, 'আমি কিন্তু তন্ত্রামন্ত্রায় বিশ্বাস করি। কিছু লোক তন্ত্রামন্ত্রার হেল্প নিয়ে অনেক কিছু করতে পারে। হিরু মণ্ডল পারে কি না তার প্রমাণ মনে হয় শিগ্গিরই পেয়ে যাব।'

॥ ১৯ ॥

লঞ্চ ছুটে চলেছে মাঝনদী দিয়ে। খুব একটা স্পিড নেই। শীতও বেশ কমে গেছে। হাওয়ায় একটা ফুরফুরে ভাব। নিজেদের ঘরে জানলার ধারে চেয়ারে একটু ছড়িয়ে বসে বাইরের দিকে তাকিয়েছিলেন পূর্ণ চ্যাটার্জি। নদী এদিকে বেশ চওড়া। জলে ঢেউ বিশেষ নেই, তবে স্রোত আছে। কচুরিপানার ঝাঁক ভেসে যাচ্ছিল। প্রায় প্রতিটি ঝাঁকের ওপরেই মাছরাঙা। মাঝে মাঝেই লাফিয়ে উঠে ছোঁ মেরে মাছ ধরছিল। দূরে বাঁশেব খুঁটি আর শূন্য ড্রাম। ওদিকে জাল পেতেছে জেলেরা। আরও দূরে সবুজ সুন্দরবন।

গাছের মাথাগুলো সমান। মনে হয়, কেউ বুঝি বিশাল একটা কাঁচি দিয়ে গাছগুলো ছেঁটে দিয়েছে। আকাশে মেঘ ভেসে যাচ্ছিল কখনও-কখনও। তার ছায়া পড়ছিল জলের ওপর। মুগ্ধ পূর্ণদা বলে উঠলেন, "আমার গোটা জীবনে এত ভাল ট্রিপ আর কখনও হয়নি! কী নিশ্চিন্ত আর নিরুদ্বিগ্ন সফর! আর, সুন্দরবনের তো তুলনা নেই! বেড়ানো আরও ভাল হয় মনের মতো সঙ্গী পেলে। জোসি আর ডেভিস অত্যন্ত ভাল মানুষ। ক'টা দিনেরই বা পরিচয়, কিন্তু মনে হচ্ছে ওরা আমাদের কত কালেব চেনা। তাই না?"

কাল রাত্তিবে এক ফোঁটাও ঘুম হয়নি কৌশিকের। তার ওপর আবার রহস্যের জাল অনেকখানি ছড়িয়ে গেছে। খাটের ওপরে চিৎপাত হয়ে শুয়ে ওই রহস্যের জালটাকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছিল ও। পূর্ণদার কথাব কোনও উত্তর দিল না।

পূর্ণদা এবার ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? বুঝতে পারছি তোমার শ্রীকৃষ্ণদার সঙ্গে কাল অনেক রাত্তির পর্যন্ত গল্পটল্প হযেছে। ঠিক আছে, তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও। ঘুমিয়ে নিয়ে স্নান কোরো ভাল কবে। দেখবে শরীর আবার তাজা হয়ে গেছে।'

কৌশিক এ কথাটারও কোনও জবাব দিল না। ওর চোখ বন্ধ, বুকের ওপর দুটো হাত জড়ো করা; দেখলে মনে হবে ঘুমিয়েই পড়েছে। কিন্তু ঘুম ওর চোখের ত্রিসীমানার মধ্যে ছিল না। মগজের মধ্যে অঙ্ক কষা চলছিল একটার পর একটা। সব ওই রহস্যের সমাধানের জন্যে। কিন্তু প্রতিটি অঙ্কই কিছুটা এগোবার পরে থেমে যাচ্ছিল হঠাৎ। বারবার মনে হচ্ছিল, আরও কিছু তথ্য পাওয়া দরকার। কিন্তু কী ভাবে পাবে? কোত্থেকে পাবে? একটা অঙ্কও মেলাতে না পেরে বেশ ছটফটানি বেড়ে গিয়েছিল গোয়েন্দার। কিন্তু শরীরে তার কোনও ছাপ পড়ছিল না।

পূর্ণদা ভাবলেন, ঘুমিয়ে পড়েছে ছেলেটা। আরও কিছুক্ষণ এক ভাবে বসে থাকার পরে ঘড়ি দেখলেন। বেলা সাড়ে-এগারোটা। এবার স্নান সেরে নেওয়া দরকার। সাহেব-মেম ঘড়ি ধরে লাঞ্চে আসে, সেই সময়টা বেলা একটা। স্নান সারার জন্যে বাথরুমে ঢুকে গেলেন পূর্ণদা। আর উনি ঘর ছাড়তেই লাফ দিয়ে উঠে বসল কৌশিক। একটা যেন আলোর আভাস দেখা যাচ্ছে রহস্যের জালে। মাথা ঠাণ্ডা করে ওই আলোটাকে আরও উজ্জ্বল করে তোলার জন্যে লঞ্চের ছাতের এক কোনায় এসে দাঁড়াল। চওড়া নদী, দূরে তীরভূমি, আকাশে অনেকগুলো পাখি উড়ছিল। লঞ্চের গতি বোধহয় আরও কমে গেছে। ইঞ্জিনের একঘেয়ে চাপা শব্দ, আর কোথাও কোনও আওয়াজ নেই। ওদিকের কেবিনে তারেং। আর সবাই নীচে নেমে গেছে। লঞ্চের পেছনদিকে রান্নাঘর। ওখানে এখন রান্নার তাড়জোড় চলছে। একদিন নীচে নেমে রান্নাঘরে উঁকি মেরেছিল কৌশিক। রান্নার সময় ওখানে বেশ বড় রকমের একটা আড্ডাও বসে।

লঞ্চের রেলিংয়ের ওপর দুটো হাত রেখে ঝুঁকে পড়েছিল গোয়েন্দা। ওব চোখ সামনের দিকে, কিন্তু দৃষ্টি কোথাও ছিল না। এ পর্যন্ত বহস্যজনক ঘটনা যা-যা ঘটেছে, সে সবের নতুন করে আর একটা হিসেব জুড়ে দিয়েছিল ও। আজ ভোরের আগে পর্যন্ত দু দিকে দুটো আলাদা ধবনের ঘটনা ঘটছিল। ওদিকে অবনীদার ওই খুনের তদন্ত, এদিকে লঞ্চের রহস্যজনক কাণ্ডকারখানা। ভোলা আর পচন নামের লোকদুটো দু দিকের দুটো ঘটনাকে কী ভাবে যেন জুড়ে দিয়েছে। ওরা চোরাশিকাবিদেব হয়ে কাজ করে। কিন্তু বাঘ আর হরিণের চামড়া কোথায় চালান করতে যাচ্ছিল?

নিজের তোলা প্রশ্নটার সামনে থমকে দাঁড়িয়েছিল গোয়েন্দা। বনরক্ষী অতনুর ধারণা, চোবাশিকারিদের মাথা এই সাহেব-মেম। কিন্তু এই যোগফলটাকে মেনে নেওয়া কঠিন। মুখার্জিবাবুর জন্যে আর একবাব উদ্বিগ্ন হল কৌশিক। লোকদুটো কি ছদ্মবেশের আড়ালের মানুষটাকে চিনে ফেলেছে?

আলোর যে আভাসটাকে সঙ্গে নিযে ঘব থেকে লঞ্চের ছাতে এসেছিল ও, সেটা হঠাৎই মিলিয়ে গেছে। ওই আলোটা জোবদার না হলে বহস্যের কিনারা করা শক্ত।

ছাতের রেলিংযে ভর দিয়ে আধঘণ্টাটাক কাটিয়ে ঘরে ফিরতেই হই-হই কবার ভঙ্গিতে পূর্ণদা বললেন, 'এই যে গোয়েন্দা, তুমি যদি তোমাব পেশার দাশ হয়ে যাও— তোমার ব্যক্তিগত জীবন কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'

কথাটার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারল না কৌশিক। 'মানে?'

পূর্ণদা বললেন, 'তোমরা আজকের ছেলেছোকরা, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের কথা কতটা কী জানো, জানি না। উনি বারবার জেল-খাটা একটা দাগি অপরাধীকে একবার নিজের বাড়িতে ঘরের কাজে লাগিয়েছিলেন। জানাশোনা অনেকেই ওকে থামাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পারেননি। দেশবন্ধু একটা কথা প্রায়ই বলতেন এবং নিজের জীবনেও তা মানতেন। মানুষকে অবিশ্বাস করার বদলে বিশ্বাস করে ঠকাও ভাল। কথাটা উনি বোধহয় পেয়েছিলেন বিবেকানন্দের কাছ থেকে। আবার ওঁর কাছ থেকে ওই নীতিটা গ্রহণ করেছিলেন সুভাষচন্দ্র। কথাটা কিন্তু লাখ কথার এক কথা। মানতে পারলে শান্তি পাবে জীবনে।'

পূর্ণদা একনাগাড়ে এতগুলো কথা বলে গেলেন, কিন্তু পুরো বিষয়টাই দুর্বোধ্য থেকে গিয়েছিল গোয়েন্দার কাছে। একটু হেসে বলল, 'আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না পূর্ণদা। কী জন্যে এই কথাগুলো শোনাচ্ছেন?'

একটু রহস্য করার ঝোঁক বোধহয় পূর্ণদাকে পেয়ে বসেছিল। বললেন, 'চান করে এসে আজ এই লুঙ্গিটা পরলাম। নতুন লুঙ্গি। বাড়িতে তো আমি লুঙ্গিই পরি। এ কদিন ওই সাহেব-মেমের জন্যে পাজামা-পাঞ্জাবি পরতে বাধ্য হচ্ছিলাম। এখন ওদের সঙ্গে দিব্যি ভাবসাব হয়ে গেছে, লুঙ্গি নিয়ে লজ্জা পাওয়ার আর কোনও কারণ নেই নিশ্চয়ই।'

কৌশিক ফিরে গেল আগের ধাঁধার মধ্যে। 'আপনি লোককে বিশ্বাস-অবিশ্বাস করার কথা কী যেন বলছিলেন—।'

'যা বলেছি, ঠিকই বলেছি। লোককে হুটহাট করে সন্দেহ করতে যেও না তো। কথায় বলে না—ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। আরে বাবা, যা সত্য তা একদিন নিজে-নিজেই প্রকাশ

পায়। লোককে সন্দেহ করে কষ্ট পাওয়ার চাইতে একটু অপেক্ষা করা ভাল। গণেশ লোকটা দিব্যি ভাল মানুষ, আর তুমি ওকে হঠাৎ সন্দেহ করে বসলে!'

কৌশিকের দৃষ্টি এবার তীক্ষ্ণ হল। 'মানে?'

'মানে তো জলের মতো সোজা। আমার স্যুটকেসটা সেদিন খোলার পরে কনুইয়ের ধাক্কা লেগে নীচেয় পড়ে গিয়েছিল। তার ফলে ভেতরের জিনিসপত্রগুলো অগোছালো হয়ে গিয়েছিল খানিকটা। আব তুমি ফট্ করে গণেশকে সন্দেহ কবে বসলে! তোমার ধারণা, ও আমার স্যুটকেস হাটকেছে কিছু হাতাবার জন্যে।'

কৌশিকের দৃষ্টি আরও ধারালো হয়ে উঠেছিল। 'কী বলছেন আপনি! রনির পাঠানো খামটা তো খুঁজেই পেলেন না—।'

'পেয়েছিরে বাবা, পেয়েছি। আমার নতুন-কেনা এই লুঙ্গিটার ভাঁজের মধ্যে ওটা ঢুকে গিয়েছিল। এখন লুঙ্গিটা খুলতেই খামটা মেঝের ওপর আছড়ে পড়ল ঠক করে। পরিষ্কাব মুখ-আঁটা খাম। যেমন রেখেছিলাম, ঠিক তেমনি আছে। সেই জন্যেই তো বলছি, গোয়েন্দাগরি করার একটা বাজে প্রভাব পড়েছে তোমার ওপর। অকারণে লোককে সন্দেহ কবা ঠিক নয়। গণেশ লোকটা সত্যিই খুব ভাল। সরল-সাদাসিধে। একটু গোঁয়ার্তুমি আছে ঠিকই, এখানকার সব মানুষেরই আছে কম-বেশি। কিন্তু আমাদের কাছে সেটা কখনও দেখায়নি। দেখাবেই বা কেন? যখন হাসে তখন ওকে দেখো, একেবারে শিশুর মতো হাসি। এরা চুরিটুরির লাইনে থাকে না কখনও।'

গোয়েন্দা গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। কপালে কয়েকটা ভাঁজ। জিজ্ঞেস করল, 'চিঠিতে কী লিখেছ রনি?'

'আমাদের সাহায্য করার জন্যে স্পেশাল ক্যুরিয়ার সার্ভিসে চিঠিটা পাঠিয়েছিল। পেলে আগে পড়ে নিতাম, ভালই হত। অকারণে উদ্বিগ্ন হতে হত না। ও লিখেছে, জোসির যাওয়ার দিনক্ষণ সব ঠিক আছে। মেয়েটির একটি ছবিও পাঠিয়েছে সঙ্গে, যাতে ওকে চিনতে আমাদের কোন অসুবিধে না হয়। আমাদের অবশ্য কোনও অসুবিধে হয়নি। নামবার একটু পরেই তো গণেশ গিয়ে হাজির হয়েছিল। তবে হ্যাঁ, চিঠিটা না পড়ার জন্যে আমার উদ্বেগ বেড়ে গিয়েছিল খানিকটা। বারবার মনে হচ্ছিল, জোসি ট্রিপ ক্যানসেল বা ডেফার করেছে—সে জন্যেই স্পেশাল ক্যুরিয়ারে চিঠি। অকারণে উল্টোপাল্টা ভেবেছি। জোসিদের ছবিটা কিন্তু চমৎকার।'

'জোসিদের!'

'হ্যাঁ, ছবিতে তিনজন আছে। মধ্যিখানে জোসি। এক পাশে রনি, আর এক পাশে ওর বয়ফ্রেন্ড। বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে ওর অবশ্য ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে হালে।'

'দেখি ছবিটা?'

পূর্ণদা খামের ভেতর থেকে বড়সড় ফোটোগ্রাফটা বার করে দিলেন।

হাত বাড়িয়ে ছবিটা নিল কৌশিক, তারপর বেশ কিছুক্ষণ ধরে দেখার পরে বলল, 'রনির চেহারাটা দেখছি মোটামুটি একই রকম আছে।'

'জোসির বাড়ির লনে তোলা ছবি। পেছনে ওদের বাড়ি, বাড়িটা ঠিক ছবির মতো দেখতে।'

'রনির চিঠিটা আমাকে একবার পড়তে দেবেন, যদি অবশ্য ব্যক্তিগত কথাবার্তা না থাকে—।'

পূর্ণদা হা-হা করে হেসে উঠে বললেন, 'তুমি আমাকে সত্যিই হাসালে। ওর সঙ্গে আমার এমন কি ব্যক্তিগত কথাবার্তা থাকতে পারে যেটা তুমি জানতে পারো না! দাঁড়াও, চিঠিটা তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি। ওর হাতের লেখা অখাদ্য, তোমার পক্ষে উদ্ধার করা কঠিন হবে। শোনো, পড়ছি।'

খাম থেকে ভাইপোর চিঠিটা বার করে রিডিং গ্লাস পরে নিলেন পূর্ণদা। তার পর গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, 'পড়ছি। শ্রদ্ধেয় কাকামণি, তোমার সুন্দরবন সফরের প্রস্তুতি নিশ্চয়ই নেওয়া হয়ে গিয়েছে। জোসির ওখানে যাওয়ার তারিখ-টারিখ সব ঠিখ আছে। তুমি নির্দিষ্ট দিন, নির্দিষ্ট সময়ে হাসনাবাদ ফেরিঘাটে পৌঁছে যেও। ঘাটে লোক থাকবে। তোমার আর কৌশিকদার চেহারার বর্ণনা জোসির মুখস্থ হয়ে গেছে—তোমাদের খুঁজে পেতে ওদের মনে হয় কোনও অসুবিধে হবে না। তোমাদের যাতে সুবিধে হয়, তার জন্য জোসির একটা ফোটোগ্রাফ পাঠাচ্ছি। তা হলে দু-তরফ থেকেই খোঁজাখুঁজি একসঙ্গে চালানো সম্ভব হবে। জোসির বাঁ দিকে ওর বয়ফ্রেন্ড ক্রিস্টি ক্যাম্পবেল। জোসিকে চেনাবার জন্যে এই গ্রুপ ফোটোগ্রাফটা পাঠিয়েছি—জোসিকে কিন্তু কক্ষনো বোলো না। বললে আমার ওপর ভীষণ চটে যাবে। ক্রিস্টিকে জোসি এখন আর একদম সহ্য করতে পরে না। কথা বলাও বন্ধ বেশ কিছু কাল। ঠিকই করেছে জোসি। ও আর জোসির বন্ধু হওয়ার উপযুক্ত নয়। মাফিয়াদের সঙ্গে ভিড়ে গিয়েছে ক্রিস্টি। ক্রিমিনাল অ্যাকটিভিটিজ চালাবার জন্যে পুলিশের খাতায় নাম উঠে গেছে ওর। নানা ধরনের অসামাজিক কাজকর্ম করে বেড়ায়। ইদানীং শুনেছি, পুরনো দল ভেঙে নিজেই একটা দল বানিয়েছে। আন্ডারওয়ার্ল্ডের ছোটখাটো একটা গ্যাং-লিডার বলতে যা বোঝায়, ক্রিস্টি এখন ঠিক তাই। জোসি আগে ওব কাণ্ডকারখানার কথা জানত না। জানত না বলেই একসময় ঠিক করেছিল, ক্রিস্টিকে সঙ্গে নিয়েই ওর স্বপ্নের সুন্দরবন দেখতে যাবে। কিন্তু যে মুহূর্তে বয়ফ্রেন্ডের আসল চরিত্র ওর কছে ফাঁস হয়ে যায়, ঠিক সেই মুহূর্তেই ও ওর সঙ্গে সব সম্পর্ক ছেদ করে দিয়েছে। জোসি এমনিতে খুব শান্তশিষ্ট, কিন্তু প্রয়োজন পড়লে অসম্ভব কড়া হতে পারে। ক্রিস্টি মাঝেমধ্যেই পুরনো সম্পর্ক জোড়া লাগাবার জন্যে ওর কাছে আসত, কিন্তু জোসি প্রতিবারই এক কথায় ওকে ভাগিয়ে দিয়েছে। ঠিকই করেছে, ক্রিমিনালের সঙ্গে কোনও রকম সম্পর্ক না রাখাই উচিত।'

চিঠিটা এই পর্যন্ত পড়ার পরে পূর্ণদা মুখ তুলে বললেন, 'বাবা, মেয়েটার তেজ আছে তো বেশ। ওর সঙ্গে এ কদিন মেলামেশা করার পরে আমার মনে হয়েছিল—অসম্ভব নরম মনের মেয়ে। ভেতরের ওই আগুনটার কথা টের পাইনি কখনও। তুমি পেয়েছ?'

দু দিকে মাথা নেড়ে কৌশিক বলল, 'না, আপনি পুরো চিঠিটা পড়ুন।'

পূর্ণদা আর একবার গলা খাঁকারি দিয়ে পড়তে শুরু করলেন। 'ডেভিসের সঙ্গে জোসির চিঠিপত্র চালাচালি হচ্ছে অনেক দিন ধরে। ওর কথা একবার বলতে শুরু করলে জোসি আর থামতে পারে না। জোসির মতে ভারতবর্ষের ব্যাপারে ডেভিস একজন অথরিটি' ভারতের তন্ত্রমন্ত্রের খবরাখবর পর্যন্ত রাখে। বিশ্বাস করে ওসব সত্যি। এতই বিশ্বাস যে ডান হাতে কালনাগিনীর ছবি উল্‌কি করিয়েছে ডেভিস। পরিষ্কার বোঝা যায়, লোকট খ্যাপা প্রকৃতির। কলকাতার ডেপুটি হাইকমিশনারের অফিসে কাজ করত। ওই সব তন্ত্রেমন্ত্রে এত মেতে গিয়েছিল যে, চাকরিটাই ছেড়ে দেয়। ডেভিসের পাগলামো ছাড়াবার

বহু চেষ্টা করেছিল ওর বউ লিজিয়া, কিন্তু পারেনি। ডেভিস প্রায়ই কাশী, মথুরা-বৃন্দাবনে সাধুদের আখড়ায় গিয়ে থাকত। বিরক্ত হয়ে লিজিয়া শেষ পর্যন্ত ডিভোর্স নিয়ে দেশে ফিরে আসে। লিজিয়ার সঙ্গে জোসির খুব ভাব ছিল। জুরিখের একটা অফিসে কাজও করেছে কিছুকাল। লিজিয়ার মুখেই ডেভিসের কথা শুনে ডেভিসের সঙ্গে করেসপন্ডেস শুরু করে। জোসিও তো ভারতবর্ষ, বিশেষ করে সুন্দরবন বলতে অজ্ঞান। পাগলও বলা যায়। পাগলে পাগল চেনে। জোসি তখনই ঠিক করে ফেলে, সুন্দরবন সফরে ডেভিসই ওর গাইড হবে। লিজিয়া ওকে থামাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি। জোসির একটাই কথা—সুন্দরবনে একবারই যাব, ওয়ন্সে ইন লাইফটাইম। পনেরো দিন কি এক মাস থাকব। এর জন্যে এত চিন্তা করার কী আছে! কিন্তু আমরা যারা জোসির বন্ধুমানুষ, আমাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ আছে যথেষ্ট। মেয়েটা কোন্ পাগলের খপ্পরে গিয়ে পড়বে কে জানে! ডেভিসের সঙ্গে জোসির চিঠিপত্র আব ই-মেল চালাচালি হয়েছে, কিন্তু ডেভিসকে জোসি কখনও-চোখে দেখেনি।'

চিঠি পড়া থামিয়ে দিয়ে অবাক-হওয়া মানুষের গলায় পূর্ণদা বললেন, 'তাজ্জব ব্যাপার! ডেভিসকে জোসি আগে কখনও দেখেনি! তার মানে আমরা দেখার মাত্র কযেক ঘণ্টা আগে জোসি ডেভিসকে প্রথম দেখেছে! কী রকম হল ব্যাপারটা!'

চেয়ার কাছে টেনে এনে খুব মন দিয়ে চিঠির কথাগুলো শুনছিল কৌশিক। এবার তীক্ষ্ণ চোখে পূর্ণদার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'রনির চিঠিটা আপনি আগে পড়েননি?'

আমতা-আমতা করে পূর্ণদা বললেন, 'না, মানে প্রথম কয়েকটা লাইন পড়েছি। ভেবেছিলাম, জোসির ছবি পাঠানোর জন্যেই এই চিঠি। আসলে রনি খুব ভাল কোনও জায়গায় উইক-এন্ড করে এলে এই রকম লম্বা-লম্বা চিঠি লেখে। চিঠি না বলে ভ্রমণকাহিনী বলাই ভাল। ভেবেছিলাম, দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে পুরোটা পড়ব। মেয়েটা তো দেখছি আচ্ছা পাগল! যাকে জীবনে আগে কখনও দেখেইনি তার সঙ্গে সুন্দরবন দেখতে এল সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে! এটা দেখে মনে হচ্ছে, জিনের ব্যাপারটা ঠিক। বংশের ধারা যাবে কোথায়! যার পূর্বপুরুষ বার্নিয়ের, সে অ্যাডভেঞ্চার করবে না তো কে করবে? তাই না?'

কৌশিকের কপালে বেশ কয়েকটা ভাঁজ ফুটে উঠেছিল, ও নিচু গলায় বলল, 'আপনি চিঠির বাকি অংশটা পড়ুন।'

আর একবার কেশে গলা পরিষ্কার করে পড়তে শুরু করলেন পূর্ণদা। 'ইতিমধ্যে আর একটা ছোটখাটো ঘটনা ঘটে গেছে। জোসি ভারতের পথে রওনা হয়ে যাওয়ার রাতেই জোসির বাড়িতে বার্গলারি হয়। ছিঁচকে চুরি বলা যাতে পারে। বন্ধ ঘরের তালা ভেঙে চোর ঢুকেছিল ঘরে। আনাড়ি চোর মনে হয়। ওর বইয়ের আলমারি, অফিসের কাগজপত্তর রাখার ডেস্ক ঘাঁটাঘাঁটি করেছে। সিকিউরিটির লোকজন টের পেয়ে যাওয়ায় চোর পালায়। পুলিশ ইনভেস্টিগেশন শুরু হয়েছে। কাছেই জোসির মাসি-মেসো থাকে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে পুলিশ। মাসিই আমাকে ফোন করে খবরটা দিয়েছেন। বলেছেন, সিকিউরিটির লোকরা টের না পেলে চুরিটা বড় রকমের হতে পারত। জোসিকে খবর দেওয়ার কথা মাসি আমাকে বলছিলেন। আমি বলেছি, ও যেখানে বেড়াতে গেছে সেখানে

নদী আর জঙ্গল ছাড়া আর কিছু নেই। জোসি নিজে যোগাযোগ না করলে ওকে খবর দেওয়া কঠিন। আমি তোমার কথা জোসির মাসিকে ইচ্ছে করেই জানাইনি। তুমি কিন্তু জোসিকে এই চুরির খবরটা জানিও না। জানালে ওর বেড়াবার আনন্দ মাটি হবে কিছুটা। তা ছাড়া চুরি তেমন কিছু হয়ওনি। চুরির পরদিন সকালেই ওর বাতিল করা বয়ফ্রেন্ড ক্রিস্টি আমার ফ্ল্যাটে এসে হাজির। বলল, জোসির খবর পাচ্ছি না। কোথায় গেছে জানো? আমি ইচ্ছে করেই ওর গায়ে জ্বালা ধরাবার জন্যে বলেছি : জোসি ওর নতুন এক বয়ফ্রেন্ড ডেভিসের সঙ্গে সুন্দরবনে বেড়াতে গেছে। শুনে ওর চোখ মুখের অবস্থা যা হয়েছিল না—দেখার মতো! যাই হোক এ চিঠি তুমি হয়তো সুন্দরবনে রওনা দেওয়ার দিনদুয়েক আগে পাবে। তোমাদের সুন্দরবন ট্রিপ উপভোগ্য হোক। জোসি তোমার সম্পর্কে খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে অনেক কিছু জেনে নিয়েছে আমার কাছ থেকে। প্রশ্নের ঠেলায় অস্থির হয়ে বলেছিলাম : এত প্রশ্ন করার কিছু নেই। আমি শুধু এটা বলতে পারি—একজন প্রোফেশনাল গাইডের চাইতে হাজার গুণ বেশি সার্ভিস আমার কাকা তোমাকে দেবেন। এই গেল এদিককার বৃত্তান্ত। কৌশিকদাকে আমার কথা বোলো। সাবধানে থাকবে তোমরা। সুন্দরবনে যাইনি কখনও। শুধু এটা জানি—গভীর সুন্দরবন মানেই বাঘ আর কুমির। সামনের ডিসেম্বরে মাসখানেকের ছুটিতে দেশে আসার ইচ্ছে আছে। যদি আসতে পারি, তোমাকে নিয়ে আমিও একবার সুন্দরবন থেকে ঘুরে আসব। প্রণাম নিও। ইতি রনি।'

চিঠিটা শেষ করার পরে দুটো ভুরু ওপর দিকে ঠেলে দিয়ে পূর্ণদা বললেন, 'এ তো দেখছি সপ্তকাণ্ড রামায়ণ! তবে জোসি মেয়েটাকে যতটা বুঝেছি—চিঠির কথাগুলো ওকে বলে দিলেও ওর কিচ্ছু এসে যাবে না। সাঙ্ঘাতিক প্রাণশক্তি মেয়েটার!'

'না-না, আপনি আবার সত্যি-সত্যি ওকে এ সব বলতে যাবেন না। রনি যখন বারণ করেছে, কী দরকার আপনার বলতে যাওয়ার?'

একটু বুঝি বিব্রত হলেন পূর্ণদা। 'আরে! এটা কথার কথা! আমি সত্যি-সত্যি ওকে আবার এ সব বলতে যাচ্ছি নাকি—। তবে এটাও সত্যি, রনি ছোটখাটো ব্যাপারগুলোকে অকারণে ভারী-ভারী করে দেখিয়েছে।'

পূর্ণদার হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে ছবিসমেত চিঠি খামে ঢোকাতে-ঢোকাতে তারিফ করার গলায় কৌশিক বলল, 'রনির চিঠি লেখার হাতটা তো বেশ।'

'কেন লিখবে না? ও তো স্কুল-কলেজে পড়ার সময় গপ্পোটপ্পো লিখত। তারপর চাকরিতে ঢুকে ওটা শিকেয় উঠেছে। এখন শুধু লম্বা-লম্বা চিঠি লেখার সময় ওর পুরনো প্রতিভাটাকে কাজে কাজ লাগায়।'

চিঠির খামটা সাইডব্যাগের পকেটে ঢোকাতে ঢোকাতে কৌশিক বলল, 'ওর লেখার বেশ বাঁধুনি আছে। এটা আমার কাছে থাক এখন। পরে একবার পড়ব।'

পূর্ণদা চশমা খুলে টেবিলের ওপরে রাখতে রাখতে বললেন, 'জোসির ওই ছাগলদাড়ি প্রাক্তন বয়ফ্রেন্ডের চেহারাটা কেমন যেন ক্যাবলা-গোছের। ওর পক্ষে কি মাফিয়া-ডন হওয়া সম্ভব! মনে হয় না। রনি বোধহয় কোনও কারণে ওর ওপরে চটা, সেই জন্যেই বাড়িয়ে বাড়িয়ে ও সব লিখেছে। এ কী, সড়ে-বারোটা বেজে গেছে! তোমার তো চানটান করা হয়নি। চট করে সেরে এসো। একটা বাজলেই তো লাঞ্চের ডাক পড়বে।'

লাফ দিয়ে উঠে পড়ল কৌশিক, তারপর তোয়ালে টেনে নিয়ে বাথরুমের দিকে পা বাড়াল।

ঠিক একটার সময় গণেশ এসে একগাল হেসে বলল, 'আপনাদের ভাত দিয়েছে খাবেন চলেন।'

লাঞ্চের টেবিলে আজ আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল পূর্ণদার লুঙ্গির অসাধারণ প্রিন্ট। জোসি প্রায় কথা আদায় করে ছাড়ল ওর 'পূর্ণাদা'র। কলকাতায় ফেরার পরে ওকে ঠিক এই ধরনের প্রিন্টের চারটে লুঙ্গি কিনে দিতে হবে। দেশে ফিরে দুটো ও লুঙ্গি হিসেবেই পরবে, বাকি দুটো কেটে স্কার্ট বানাবে। লুঙ্গির সূত্রে ভারতীয় টেক্সটাইলস নিয়ে কথা উঠেছিল।

সেই গল্প সন্ধের আড্ডাতেও আর একবার উঠল। সুতি থেকে রেশম—সব কিছুই ছিল গল্পের মধ্যে।

সন্ধের মুখেই নোঙর ফেলা হয়েছিল লঞ্চের। জায়গাটা ঠিক কোথায়—সারেংয়ের কাছ থেকে কৌশিক জেনে নিয়েছিল এক ফাঁকে। সাহেবের ড্রিংকসের আসর সাজিয়ে দিয়েছিল পারভেজ। গল্প করতে করতে গ্লাসে ছোট-ছোট চুমুক দিচ্ছিল ডেভিস। জোসির হাতে কোল্ড ড্রিংকসের গ্লাস। পূর্ণদা আর কৌশিকের জন্যে হট কফি।

পুরনো দিনের আশ্চর্য ঢাকাই মসলিনের গল্প পূর্ণদা ফাঁদতেই 'আসছি' বলে উঠে পড়েছিল কৌশিক। তার পর দ্রুত পায়ে নিজেদের কেবিনের পাশ দিয়ে লঞ্চের পেছন দিকের ছাতের নির্জন কোণে এসে দাঁড়াল। সতর্ক চোখে চারদিক একবার দেখে নিয়ে মোবাইলে ধরেছিল ফরেস্টের বেঞ্জারসাহেবকে। তার পর অসম্ভব নিচু গলায় মিনিট-তিনেক কথাবার্তা চালিয়ে ফিরে এসেছিল আবার গল্পের আসরে।

॥ ২০ ॥

সুন্দরবনের বৃত্তান্ত মুখার্জিবাবুর কাছ থেকে চোখ বড়-বড় করে শোনার পরে পুলিশ ইন্সপেক্টর অবনী ঘোষরায় বললেন, 'পোড়োবাড়ির সামনে একবার চোখের দেখা দেখার পরেই বুঝতে পেরেছিলাম লোক দুটো হার্ডকোর ক্রিমিনাল। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে ধরেছিলাম, ধরেই ঠ্যাঙানো। তার পরেই ভ্যানে তুলেছি। এই পেশায় বেশি দিন থাকলে কী হয় জানো, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়টা খুব তাজা হয়ে ওঠে। সবার অবশ্য হয় না। নিজের মুখে বলা ঠিক নয়, তুমি বলেই বলেছি—আমার এটা খুব প্রখর। আমি অপরাধীর গন্ধ পাই। আমার জীবনে বহুবার এটা হয়েছে। তদন্তে গিয়েছি সবে, কী বৃত্তান্ত কিছুই জানি না, কিন্তু স্পটের কাছে গিয়েই একটা-দুটো লোককে কেমন যেন সন্দেহজনক ঠেকল। তখন আমার প্রথম কাজই হল ওগুলোকে ধরা। তদন্তের কাজ শুরু করি তার পরে। অবাক কাণ্ড! পরে দেখেছি আমার সিক্স সেন্স ঠিক কথাই বলেছে। আগে অপরাধী ধরেছি, পরে জেনেছি অপরাধটা কী! এবারও ঠিক তাই। সেদিন রাতের অন্ধকারে ওই পোড়োবাড়িতে ঢোকা সম্ভব ছিল না। ক্রিমিনালদের থোড়াই পরোয়া করি আমি, কিন্তু ডরাই সাপখোপকে।

পোড়োবাড়ি মানেই সাপের আস্তানা। সুতরাং রাতের অন্ধকারে তেমন প্রয়োজন না থাকলে ও সব জায়গায় ঢোকা ঠিক নয়। দোনামোনা করে ফিরে আসার মুখেই দেখি, ভোলা আর পচন ওই বাড়ি থেকে বেরুচ্ছে। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় অমনি বলে উঠেছিল : ধর্ শালাদের! ব্যস, দৌড়ে গিয়ে ধরলাম। আমার ওই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ই বলে দিয়েছিল : ব্যাটাদের পেছনে লোক লাগাও। তোমাকে লাগিয়েছিলাম। এখন জানা গেল, দুই হারামজাদা চোরাশিকারিদের দলে আছে। কিন্তু তোমরা একটা মস্ত ভুল করে ফেলেছ, ওদের ছুটতে দেখেই তোমাদের ধাওয়া করা উচিত ছিল। চারজন আর্মড ফরেস্ট গার্ড ছিল, অথচ ওরা পালাল! চেজ করল না কেউ! কেন এটা হল বলো তো?'

মুখার্জিবাবু একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন?'

উত্তরে কাঁধ ঝাঁকিয়ে ইন্সপেক্টর বললেন, 'একটাই কারণ, বনরক্ষীদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কাজ করেনি। যা হয় আর পাঁচটা ক্ষেত্রে। ভেবেছে, গাঁয়ের লোক—বন্দুকওয়ালা বনরক্ষী দেখে ভয় পেয়ে পালিয়েছে। ওদের টনক নড়েছে ট্রাঙ্কের তালা ভেঙে বাঘ আর হরিণের চামড়া দেখার পরে। কিন্তু ততক্ষণে ওরা তো পগারপার। কিন্তু তোমাদের চ্যাম্পিয়ন গোয়েন্দা কৌশিক তো ওখানে ছিল, ও কেন পিছু ধাওয়া করার কথা বলল না বনরক্ষীদের?'

কৌশিকের হয়ে এবার একটু সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করলেন ওর ভক্ত প্রবীণ সহকারীটি। 'না, মানে, কৌশিকবাবু তো ততক্ষণে জেনে গেছেন আমার কাছ থেকে—আমি ভোলা আর পচনের বাড়ি চিনি, তাই হয়তো—।'

বেশ কড়া গোছের একটা ধমক লাগালেন বিশাল চেহারার ইন্সপেক্টর। 'বাজে কথা বোলো না! বাড়ি চিনলেই অপরাধীদের ধরা যায়? এই বুদ্ধি নিয়ে তোমরা গোয়েন্দাগিরি করছ! তোমাদের ধারণা, ওই লোক দুটো এখন বাড়ি ফিরে এসে তোমাদের হাতে ধরা পড়ার জন্য অপেক্ষা করবে? রাবিশ! ওরা এখন বহুকাল এই তল্লাট আর মাড়াবেই না। আসল কারণটা আমি বুঝতে পেরেছি। আমার কাছ থেকে এখন শুনে নাও। পরে একদিন তোমাদের সাহেবের কাছ থেকে শুনে মিলিয়ে নিও।'

আর একবার নতুন করে অবাক হলেন মুখার্জিবাবু 'কী?'

'কী আবার, গোয়েন্দাগরি ভুলে গিয়ে কৌশিক এখন সুন্দরবনের সৌন্দর্য নিয়ে মেতে আছে। আহা! কী সুন্দর সুন্দরবনের গাছপালা! আহা! কী ছলছল সুন্দরবনের নদী-খাল! আহা! কী ফুরফুরে হাওয়া! ও নির্ঘাত কবিতা-টবিতা লিখছে।'

ঠাট্টার ভঙ্গিতে কৌশিককে নিয়ে বলা কথাগুলো শুনতে ভাল লাগল না অনুরাগী সহকারীটির। মৃদু প্রতিবাদের গলায় বললেন, 'না, স্যার, উনি ও সব লেখেন না।'

'আলবত লেখে। কেন এত জোর দিয়ে বলছি জানো?'

'কেন?'

"আমার ছ'নম্বর ইন্দ্রিয় এই কথাটাই বলছে। এটা আমাকে কখনও ভুল খবর দেয় না।"

এই ধরনের উত্তর পেয়ে চুপ করে গিয়েছিলেন মুখার্জিবাবু। ইন্সপেক্টরের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়টাকে পেলে উনি হয়তো আলাদা ভাবে বোঝাপড়া করতেন, কিন্তু তার তো কোনও উপায় নেই। শরীরে অল্পস্বল্প জ্বালা ধরেছিল সহকারীর, সুতরাং একটু বাদে মিনমিন করে

উনি একটা খোঁচা দিলেন, 'ওই দুটো সাহেব আর মেমটার খুনের কোনও হদিশ এর মধ্যে পেয়েছেন স্যার?'

প্রশ্ন শুনে হঠাৎই কেমন যেন ভেঙে পড়লেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইন্সপেক্টর। চোখেমুখে কালচে একটা ছাপ ফুটে উঠল। গভীর কোনও তত্ত্বকথা শোনানোর গলায় বললেন, 'তথ্য-প্রমাণ জোগাড় করার ব্যাপারটাই খুব বাজে। চোখের সামনে কাউকে তুমি খুন করতে দেখলে কিন্তু তাকে দোষী প্রমাণ করাটা কঠিন। শুধুমাত্র প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষী নিয়েই সন্তুষ্ট হবে না আইন। সঙ্গে প্রমাণ চাই। এই প্রমাণ জিনিসটা সব সময় জোগাড় করা সম্ভব হয় না বলেই অপরাধীরা জেলের সামনের রাস্তায় বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কাউকে জঘন্য অপরাধ করতে দেখেছ তুমি, কিন্তু জেলের গরাদের মধ্যে যে ঢোকাবে—তার উপায় নেই। কী চাই, না প্রমাণ। আরে বাবা, কোনও প্রমাণ লোপাট হলেই অপরাধও কি লোপাট হয়ে যাবে! কাকে বলব বলো এ সব কথা! আমার কোনও সন্দেহ নেই যে, ওই পচন আর ভোলাই দুটো সাহেব আর মেমকে খুন করেছে। কী কারণ তাও বলে দিচ্ছি। ওই নেশাখোর সাহেব-মেম প্রথমে ছিল ওদের চোরাই ড্রাগের খদ্দের। টাকা-পয়সা, সোনাদানা নেশার খাতেই উড়ে গেল। যা উড়ল না তার নাম নেশা। নেশার দাস হয়ে পেড্‌লারের পেশা নিয়েছিল ওই সাহেব-মেম। ড্রাগ-পেড্‌লার কাদের বলে জানো? যাদের হাত দিয়ে মাদক বেচা হয়। বেচে যে টাকা পেত সেই টাকায় ওদের নেশার খরচ মিটে যেত। মুখ থ্যাতলানো যে সাহেবটাকে পাওয়া গেছে—সে ছিল পেড্‌লারদের নতুন খদ্দের। ওর সঙ্গে নির্ঘাত বিস্তর টাকা আর দামি জিনিসপত্র ছিল। পোড়োবাড়ির ঠেকে আসার পরে ভোলা আর পচনের হাতে পড়েছিল। দাগি অপরাধীদের কাছে টাকাপয়সা, সোনাদানা হাতানোর সবচেয়ে সোজা রাস্তা হল খুন করা। ভোলা আর পচন তাকে খুন করে। নেশাখোর রোগাপটকা সাহেব-মেম আর যাই হোক, খুনি নয়। ওরা হয় বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কিংবা পালাবার তাল করেছিল। খুনিরা খুনের সাক্ষী রাখতে চায় না, সুতরাং কোতল করো ওদের। ব্যস, একটা খুনের জায়গায় তিনটে খুন হয়ে গেল। এমনও হতে পারে, নেশাখোর সাহেব-মেমকে ওরা প্রথমে মারতে চায়নি, বুঝিয়ে-সুঝিয়ে খুনির দলে ভেড়াতে চেয়েছিল। কিন্তু পারেনি, একদিন পরে তাই ওদেরও জবাই করেছে। এই হচ্ছে ঘটনা। এক-আধবার নয়, বারবার আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় এই কথাগুলোই বলছে। কিন্তু আইন তো প্রমাণ চায়। সামান্য সেই প্রমাণটুকু আমার কপালদোষে এখনও জোগাড় করা হয়ে ওঠেনি। তবে মুখার্জি, একটা ভুল আমি করে ফেলেছি।'

'কী ভুল?'

দীর্ঘনিঃশ্বাস হওয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে অবনী ঘোষরায় বললেন, 'তুমি যে কালো ট্রাঙ্কের খবর এনেছিলে, সেই ট্রাঙ্কটাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করা উচিত হয়নি আমার।'

আরও একবার অবাক হলেন মুখার্জিবাবু। 'মানে?'

'মানেটা জলের মতো সোজা, কিন্তু আমি সেদিন ধরতে পারিনি। রঘুর চিলেকোঠায় হানা দিয়ে কালো ট্রাঙ্কটা দেখেই মনে হয়েছিল, যা চেয়েছি তা পেয়ে গিয়েছি। জন্তু-জানোয়ারের হাড়গোড়, কিন্তু আমি ওগুলো মানুষের ভেবে নিয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। অতটা উত্তেজিত না হলে আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় নিশ্চয়ই আমাকে পথ দেখাত।'

কথাগুলো ধাঁধার মতো ঠেকল মুখার্জির কাছে। 'যা করার তাই তো করেছেন আপনি। ট্রাঙ্ক-ভর্তি হাড়গোড় সিজ করা, রঘুকে অ্যারেস্ট করা--সবই তো করেছেন।'

'সেটাই তো সব নয়। আমার একবার অন্তত ভাবা উচিত ছিল—হাড়গোড়গুলো জন্তুর হতে পারে।'

'ভাবলে?'

'ভাবলে আসল কাজটা করতে পারতাম—।'

'আসল কাজ!'

'হ্যাঁ, আসল কাজ। চিলেঘরটা বিস্তর আজেবাজে জিনিসে ভর্তি ছিল। ছিল না?'

'হ্যাঁ, ছিল।'

'আমার উচিত ছিল ওই ঘরটাব ভাল ভাবে তল্লাশি নেওয়া। নিলে কী পেতাম তোমাকে বলে দিচ্ছি। ড্রাগের মস্ত কোনও চোরাচালান। ড্রাগের মস্ত চোরাচালান মানে পাঁচশো গ্রাম বা এক কেজির একটা ছোট্ট প্যাকেট। বাজারে যাব দাম কোটি টাকার ওপর। আর কী পেতাম জানো? খুন-হওয়া সাহেব-মেমের পাশপোর্ট, কাগজপত্তর, কিছু টাকাপয়সা—এমনকী খুন করার অস্ত্রও। এ সব কথাও আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের, কিন্তু পরে জেনেছি।'

'তা হলে ওই হাড়গোড়গুলো?'

ফকির-তান্ত্রিকের ভেক ধরে বদমাইশগুলো হাড়গোড়সমেত মাল পাচার করত। তুমি তো জানো, আমাদের দেশে কুসংস্কার কেমন চেপে বসে আছে। একে ফকির-তান্ত্রিক, তার ওপর আবার হাড়গোড়। ওদের কি কেউ ঘাঁটাতে সাহস পায়! ওই রঘুটা হচ্ছে দলের পাণ্ডা এ ব্যাপারে আমার আর কোনও সন্দেহ নেই। আমাদের রেডটাও হয়েছিল ঠিক সময়ে। কিন্তু মুখার্জি, কপালের মার কে খণ্ডাবে! পুরো নজরটাই আটকে গিয়েছিল হাড়গোড়ের ট্রাঙ্কে।'

'এখন আর একবার ওই চিলেকোঠায় তল্লাশি—।'

ইন্সপেক্টরের কঠিন দৃষ্টির ধাক্কায় সঙ্গে সঙ্গে কথাটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিলেন মুখার্জিবাবু, 'না, এখন আর ওখানে তল্লাশি চালিয়ে কোনও লাভ নেই। ওরা যা সরাবার অনেক আগেই সরিয়ে ফেলেছে, তাই না?'

ব্যর্থ মানুষের ভঙ্গিতে আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন ঘোষরায়।

এইরকম দাপটওয়ালা একটা মানুষ এমন মুখ চুন করে বসে আছেন—এটা ভাল লাগল না আর একজন ভাল মানুষ মুখার্জিবাবুর।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে একটু সান্ত্বনা দেওয়ার গলায় মুখার্জিবাবু বললেন, 'আপনি ভাববেন না স্যার। আপনি যে ভাবে এগোচ্ছেন, তার সুফল পাবেনই। ঠিকই ধরেছেন আপনি, এদের দলটা মস্ত বড় দল, নানা রকমের অপরাধ করে থাকে। আপনি যে ভাবে জাল ছড়িয়েছেন, ধরা ওড়া পড়বেই। একটু সময় লাগবে এই যা—।'

রাত সাড়ে ন'টা। ঘণ্টাখানেক আগেই বড়বাবু রাউন্ড সেরে থানায় ঢোকার মুখে মুখার্জিবাবু ওকে ধরেছেন। মুখার্জিবাবুকে পেয়েই ঝলমল করে উঠেছিলেন বড়বাবু। ওঁকে নিয়ে সোজা নিজের ঘরে গিয়ে বসেছিলেন। হাসনাবাদে আর হিঙ্গলগঞ্জে যা-যা ঘটেছে তার নিখুঁত বর্ণনা প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে দিয়ে গিয়েছেন মুখার্জিবাবু। বড়বাবু মনোযোগ

দিয়ে সব শুনেছিলেন। শুনতে শুনতে দু-তিনবার উত্তেজিতও হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু এখন ঝিমিয়ে গিয়েছেন একদম।

একটু আগেই বড়বাবুর কালো কফি আর মুখার্জিবাবুর চা-বিস্কুট এসে গেছে। অন্যান্য দিন বড়বাবুই তাগাদা লাগান চা খাওয়ার জন্যে, আজ ব্যাপারটা ঘুরে গিয়েছিল। চা-কফি আসার পরেও আনমনা থেকে গিয়েছেন ঘোষরায়। কিছুক্ষণ বাদে মুখার্জিবাবু একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, 'কফি খান স্যার। খাওয়ার পরে বলুন—আমাকে এবার কী করতে হবে।'

কফির কাপটা টেনে নিয়ে পর-পব দু-তিনটে চুমুক মারলেন ইন্সপেক্টর, তার পর আর একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলার পরে বললেন, 'তোমার সাহেব কৌশিক ফোন করেছিল আমাকে।'

ঝকঝকে হয়ে উঠেছিল মুখার্জিবাবুর মুখ। 'তাই। কবে ফিবছেন, বলেছেন?'

'হ্যাঁ। বলেছে, সুন্দরবনের মায়ায় মজে আছে। ফিবতে দেরি হবে।'

'আর? আর কিছু?'

চেয়ারটা একটু ঘুরিয়ে নিযে সামান্য ছড়িয়ে বসে ইন্সপেক্টব অন্য রকমেব গলায বললেন, 'আমি এককালে ফুটবল খেলতাম। বেশ ভালই খেলতাম। আপনি খেলতেন ফুটবল?'

দু-দিকে মাথা নাড়িয়ে একটু লাজুক হয়ে মুখার্জিবাবু বললেন, 'না স্যার, ফুটবলে কখনও লাথি মারিনি। তবে নাটকে একবার ফুটবল-খেলোযাড়ের একটা পার্ট করেছিলাম। নিজের মুখে বলতে লজ্জা কবছে, তবু বলছি—অভিনয় দেখে অনেক দর্শকের ধারণা হয়েছিল, আমাকে বোধহয় ফুটবলের মাঠ থেকে তুলে আনা হয়েছে।'

অত ভাল অভিনয়ের তারিফ করার লাইনেই গেলেন না ইন্সপেক্টর। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে বললেন, 'কয়েক দিন আগে টিভিতে ইউরোপিয়ান কাপের সেমিফাইনালের খেলা দেখছিলাম। হল্যান্ড ভার্সাস ইটালি। একটা প্লেয়ার—জেনডেন, দুর্ধর্ষ খেলছিল। কিন্তু কোচ হঠাৎ ওকে তুলে নিল ম্যাচ থেকে। তুলে নেওয়ার কোনও দরকারই ছিল না। কিন্তু এখন কোচরাই তো সর্বেসর্বা। সব ওরা বুঝে বসে আছে। আমি খেলাটা জানি। বুঝলাম, কোচ ওকে তুলে নিয়ে ভুল করেছে। যে অত ভাল খেলছে, তাকে তুলে নেওয়া ঠিক হয়নি। কোচের ওই ভুল সিদ্ধান্তের জন্যেই হেরে গেল হল্যান্ড। কিন্তু কোচের সিদ্ধান্তেব প্রতিবাদ করার কোনও রেওয়াজ নেই। আমার টিমের একটা ভাল খেলোয়াড়কে কোচ এখন বসিয়ে দিচ্ছে। একদম ভুল সিদ্ধান্ত, কিন্তু আমার প্রতিবাদ জানাবার কোনও রাস্তা নেই।'

আবার ধাঁধার মধ্যে জড়িয়ে গেলেন মুখার্জিবাবু। 'মানে?'

দু-দিকে বড় মাপের দুটো হাত ডানার মতো ছড়িয়ে দিয়ে ইন্সপেক্টর বললেন, 'আপনি এখন দারুণ ভাল খেলছেন। প্রচুর দম আছে। চোটফোট লাগেনি। কিন্তু কোচ আপনাকে খেলা থেকে তুলে নিচ্ছে।'

একই প্রশ্ন আর একবার করলেন মুখার্জিবাবু। 'মানে?'

'মানে খুব সোজা। কৌশিক আমাকে ফোন করে বলেছে, নজরদারি করার কাজে মুখার্জিবাবুকে এখন আপনি আর লাগাবেন না।'

'অ্যাঁ! আমার কাজে কি কোনও ভুল ছিল স্যার?'

'ভুল! আমি বলব তোমার সার্ভিস ফ্যান্টাস্টিক। তুমি ওই দুটো ক্রিমিনালের পিছু ধাওয়া করে হিঙ্গলগঞ্জ পর্যন্ত না ছুটলে চোরাই বাঘ আর হরিণের চামড়া কি ধরা পড়ত! ধরলে তুমি, কিন্তু এখন পুরো ক্রেডিট নিয়ে বসেছে ফরেস্ট গার্ডরা। যাকগে, আসল ব্যাপারটা তো আমরা জানি। কিন্তু কৌশিক তোমার নজরদারি করার কাজটা বন্ধ করে দিয়ে ভাল করল না। ওর এই কাজটা হল ঠিক ওই ফুটবল-টিমের কোচের মতো। ম্যাচের মাঝখানে সেরা খেলোয়াড়টাকে মাঠ থেকে তুলে নিল দুম করে! একটা কথা সত্যি করে বলো তো মুখার্জি। এই যে তুমি আমাকে যে সার্ভিসটা দিচ্ছ, তার জন্য কি তোমাদের নিজেদের কাজের কোনও ক্ষতি হচ্ছে?'

চুপসে-যাওয়া মুখটা দু দিকে নাড়তে নাড়তে উত্তর দিলেন মুখার্জিবাবু, 'না, আমাদের এখন তেমন কোনও কাজই নেই। কিছু অফিস-ওয়ার্ক ছিল, সেটা তো আমি অনেক আগেই সেরে বসে আছি। এখন কাজ বলতে একটাই। পুরনো ক্লায়েন্টরা বসের খোঁজখবর নিলে বলতে হচ্ছে—উনি এখন কলকাতাব বাইবে, কয়েক দিন পরে ফিরবেন। নতুন মক্কেল এলে কেস-হিস্ট্রি নিয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফিক্স-আপ করার কথা। কিন্তু আমাদের লাইনে দেখেছি বেশির ভাগ লোকই সরাসরি গোয়েন্দার সঙ্গে কথা বলতে চায়, সহকারীর কাছে মুখ খোলে না।'

'তার মানে তোমার এখন কোনও কাজই নেই। অথচ কৌশিক আমার কাজটাও তোমাকে কবতে দিতে চাইছে না। এটা কেন করল?'

কঠিন একটা প্রশ্নের সামনে মুখার্জিবাবুকে দাঁড় করিয়ে দিলেন ইন্সপেক্টর।

একটু আমতা-আমতা করে মুখার্জিবাবু বললেন, 'কিন্তু স্যার, উনি তো সুন্দরবনে যাওয়ার আগে নিজে থেকেই বলেছিলেন—অবনীদা যদি কোনও কাজকর্ম আপনাকে দেন, করে দেবেন।'

'আরে বাবা, সে তো আমাকেও বলেছিল—কোনও দরকার পড়লেই মুখার্জিবাবুকে ডেকে নেবেন। একটা ব্যাপার কি জানো—গোয়েন্দাগিরির কাজকর্ম ঠিকভাবে করতে গেলে একটু বয়েস হওয়া দরকার। বয়েস যত বাড়বে অভিজ্ঞতাও তত বাড়বে। সত্যিকারের শিক্ষা মানুষ নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই পায়। বয়েস কম হওয়ার দরুন এই শিক্ষার পুঁজিটা ওর খুব কম। এই অবস্থায় তোমাকে বসিয়ে দেওয়াটা যে কত ভুল—সেটা ও টের পাবে একদিন, তখন কিন্তু কিছুই আর করার থাকবে না। কী হল, চা-বিস্কুট খাচ্ছ না কেন?'

কথাটা বলেই মোটা একটা ফাইল টেনে নিয়ে গম্ভীর মুখে পাতা ওলটাতে শুরু করে দিলেন ইন্সপেক্টর।

শুকনো মুখে চা-বিস্কুট খাওয়ার পরে মুখার্জিবাবু বললেন, 'আমি তা হলে এখন আসি স্যার?'

চোখ না তুলেই মাথা নাড়লেন রাশভারী ইন্সপেক্টর।

পৌনে-দশটা নাগাদ থানা থেকে বেরিয়ে গেলেন মুখার্জিবাবু। শীত এখন একেবারেই কমে গেছে। শীত বাড়া-কমার সঙ্গে শহরের রাস্তায় লোক বাড়া-কমার সম্পর্ক বেশ গভীর। থানার সামনের তিনটে রাস্তাতেই অনেক মানুষজন। কিন্তু মহানগরীর সঙ্গে

সুন্দরবনের তফাত আকাশ-পাতাল। গভীর সুন্দরবন-এলাকায় সন্ধের পরেই নিশুতি রাত নেমে আসে।

ওই নিশুতি রাতকে অবশ্য সন্ধের পরেই ভেতরে ঢুকতে দেয়নি এম ভি সদাগর। লঞ্চের ছাতে ডেভিস-জোসি-পূর্ণদা-কৌশিকের জমজমাট আড্ডা বসেছিল। তারপর রাতের খাওয়া সারার জন্যে ওই আড্ডার লোকজনরাই নীচে নেমে গিয়েছিল এক সময়। খাওয়া-দাওয়া সারার পরে শুভ রাত্রি জানিয়ে ওপরে নিজেদের ঘরে উঠে এসেছিল কৌশিক আর পূর্ণদা। তারপর থেকেই শব্দহীন নিশুতি রাত জাঁকিয়ে বসেছে চারদিকে। সব কিছু নিয়মের মধ্যে, একটাই শুধু অনিয়মের ব্যাপার ঘটেছে। একটু আগে ডেভিস চড়া গলায় ধমকের সুরে কাকে যেন কী বলেছিল একবার। একবারই শুধু, তার পর আর ওর গলা শোনা যায়নি।

কিন্তু পূর্ণদা একটু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। কী এমন কাণ্ড ঘটেছে যে সাহেব অমন গলা তুলেছিল!

আসল ব্যাপারটা জানা গেল আরও মিনিট-পনেরো বাদে পারভেজ যখন জলের জাগ দিতে এসেছিল ওদের ঘরে।

ও ঘরে ঢুকতেই পূর্ণদা জিজ্ঞেস করলে, 'কী হয়েছে পারভেজ? সাহেবের চড়া গলার কথা শুনলাম যেন—।'

'ও কিছু না। সাহেব আমাদের একটু বকাবকি করছিল।'

'কিছু না, অথচ বকাবকি!'

'সাহেব সব সময় কাগজপত্তর বার করে ঘাঁটাঘাঁটি করে—কী একটা কাগজ খুঁজে পাচ্ছে না বলে আমাদের একুট বকাবকি করছিল। ওর কাগজ এখান থেকে কে নেবে? পরে ঠিক খুঁজে পাবে আবার।'

পূর্ণদার উদ্বিগ্ন ভাব মিলিয়ে গেল একদম। 'ওহ্! এই ব্যাপার!'

কৌশিক বলল, 'দরকারি কাগজপত্র সাহেব বাইরে ছড়িয়ে রাখে কেন?'

উত্তরে পারভেজ বলল, 'বাইরে রাখবে কেন? ওর একটা ছোট্ট সাদা স্যুটকেস আছে, তার মধ্যে রাখে। তালা-চাবি লাগানো স্যুটকেস। বারবার বার করে, খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে ওগুলো পড়ে, কী সব লেখে খাতায়, তারপর আবার বাক্সে ঢুকিয়ে তালা মারে।'

পূর্ণদা হেসে বললেন, 'পরে আবার খুঁজে পাবে। এখান থেকে কিছুই হারায় না।'

জাগভর্তি খাবার জল ছোট টেবিলটার ওপরে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল পারভেজ।

পূর্ণদা নিজের মনে একটু হেসে নিয়ে বললেন, 'আমি যেমন রনির চিঠি হারিয়েছিলাম, ওইরকম কেস হয়েছে বুঝতে পারছি।'

গম্ভীর গলায় গোয়েন্দা বলল, 'আমার মনে হয় হারানো কাগজটা সাহেব আর খুঁজে পাবে না।'

'তার মানে?'

পূর্ণদার প্রশ্নের কোনও উত্তর দিল না গোয়েন্দা।

॥ ২১ ॥

সাইড-টেবিলের ওপরে ছোট্ট একটা পেনসিল-টর্চ আছে। সেই টর্চটা জ্বালিয়ে হাতঘড়ি দেখল কৌশিক—রাত সওয়া-এগারোটা। কলকাতার সওয়া-এগারোটা আর এখানকার সওয়া-এগারোটার মধ্যে বিশাল ব্যবধান। কী নিঝুম রাত! সুন্দরবনের কোর-এরিয়ার আশেপাশে মাঝরাত নেমে আসে সূর্য ডুবলেই। এই লঞ্চের মধ্যে মধ্যরাতকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি রাত ন'টা পর্যন্ত। কিন্তু রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে ওই সময় ওরা দুজন লঞ্চেব ওপবে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই মাঝরাত যেন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল চারদিক থেকে।

পূর্ণদা পাশের খাটে অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। ওঁর নাক ডাকার শব্দ উঠছে গর্জনের মতো। আর কোথাও কোনও শব্দ নেই। নিশুতি রাত চতুর্দিকে। জোসি আর ডেভিসের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন পূর্ণদা। বারবার বলেছেন : এমন মানুষের সঙ্গে বেড়াতে আসার সুযোগ পাওয়া ভাগ্যের কথা! জোসিকে উনি কখনও নিজের ভাইঝির সঙ্গে, কখনও ভাগনির সঙ্গে, কখনও বা নিজের মেয়ের সঙ্গে তুলনা করে চলেছেন। ডেভিসের রকমসকম, কথাবার্তা, সংস্কার উনি সব সময় মানতে পারছেন না—স্নেহের গলায় কৌশিককে বেশ কয়েকবার বলেছেন—লোকটা একটু খ্যাপা, বাউন্ডুলে স্বভাবের ; কিন্তু মনটা দরাজ। মনে যা আসে, মুখে তাই হুড়মুড় করে বলে দেয়। কোথাও কোনও রাখঢাক নেই। নিপাট ভালমানুষের পক্ষেই এমন ব্যবহার করা সম্ভব।

পূর্ণদার প্রতিটি কথাতেই সায় দিয়ে গেছে কৌশিক। সায় না দিয়ে উপায় নেই। আপত্তি করতে গেলে ওদের চালচলনে খট্‌কা লাগার কথাগুলো বলতে হয়। কিন্তু সে সব বলার অর্থ—গোপন তদন্তের কাজ মাঝপথেই ফাঁসিয়ে দেওয়া।

মাথার মধ্যে সমস্যার জট, কিন্তু এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট কোনও আলোর নিশানা পায়নি কৌশিক। টর্চ জ্বেলে আর একবার ঘড়ি দেখল—সাড়ে-এগারোটা।

সেল-ফোনটা পকেটে পুরে আস্তে আস্তে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছিল কৌশিক। কিছুক্ষণ আগেই ও ফোনে রেঞ্জার সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওর পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে। রেঞ্জার বলেছেন, ফরেস্ট গার্ড অতনুকে টেলিফোনে উনি সব জানিয়ে দেবেন। এই সময় অতনুকে ওর ফোন করার কথা।

পা টিপে টিপে কেবিনের দরজা খুলে লঞ্চের ছাতে বেরিয়ে এল কৌশিক। চারদিকের সব কিছুই যেন অলৌকিক। আর একটা খাঁড়ির কাছেই নোঙর ফেলেছে এম ভি সদাগর। কাছেই সুন্দরবনের ঠাসা জঙ্গল। ও পাশের নদী বেশ চওড়া, দিগন্তরেখা ঢেকে আছে কুয়াশায়।

বোধহয় জোয়ার এসেছে। নদীর জল ফুলে উঠেছে কিছুটা। ছলাত্‌-ছল্‌ ছলাত্‌-ছল্‌ করে ছোট-ছোট ঢেউ এসে ভাঙছে লঞ্চের গায়ে। আকাশে মাঝারি মাপের চাঁদ। মেঘও আছে বেশ। তার ফলে কেমন যেন পালা করে আলো-আঁধারি নামছিল নদীর জলে আর সুন্দরবনের ঠাসা জঙ্গলের মাথায়। আর এক সারি মেঘের আড়ালে চাঁদের আলো ঝাপসা হতেই কৌশিক দ্রুত পায়ে ওদিকের ছাত ভেঙে রেলিং ধরে নীচের দিকে উঁকি মারল। যা ভেবেছিল ঠিক তাই, লঞ্চের গায়ে ঝোলানো ছোট বোটটাকে নদীতে ভাসানো হয়েছে। বোটে অবশ্য কেউ নেই।

গোয়েন্দা বুঝল, এটা হচ্ছে কাজ এগিয়ে রাখা। মাঝরাতে কিংবা শেষ রাতে গোপন একটি অভিযান চালানো হবে। কিন্তু বোটের যাত্রী হবে কে বা কারা? লঘু পায়ে পিছিয়ে এসে চিমনির পাশের অন্ধকার জায়গাটায় দাঁড়াল কৌশিক। তার পর সেলফোনের বোতাম টিপে ধরল ফরেস্ট-গার্ড অতনুকে।

এমন নিস্তব্ধ পরিবেশে ফিসফিস করে কথা বলাও বুঝি অসম্ভব ব্যাপার। তবু যতখানি সম্ভব গলা নামিয়ে কথা শুরু করল কৌশিক। অতনু বলল, 'আমরা তৈরি। আপনাদের লঞ্চ থেকে একটু দূরে আমাদের স্পিডবোট। আপনার ফোন পাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ওখানে পৌঁছে যাব। কী ঘটেছে সকালে ফোনে জানাব।'

কৌশিক জানাল, 'আমি যাব আপনাদের সঙ্গে। লঞ্চের নাম যেদিকে লেখা আছে—সেদিকেই নৌকো ভেড়াবেন। আমি দড়ি বেয়ে নেমে যাব।'

ফরেস্ট-গার্ড অতনুর গলা হঠাৎই কড়া একজন মাস্টারমশাইয়ের মতো হয়ে উঠল। 'আপনার তো যাওয়ার দরকার নেই। রেঞ্জার সাহেব শুধু আমাদেরই চেজ্ করার কথা বলেছেন।'

খুব মিহি গলায় উত্তর দিল গোয়েন্দা, 'রেঞ্জার সাহেবের সঙ্গে আমার একটু আগেই কথা হয়ে গেছে। উনি আমাকে পারমিশন দিয়েছেন। আপনি চাইলে ওঁর সঙ্গে কথা বলেও নিতে পারেন—।'

সাহেবের অনুমতির কথা শুনে গলার স্বর পালটে গিয়েছিল অতনুর। 'কী আশ্চর্য! আমি আবার ফোন করতে যাব কেন ওঁকে। আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন যখন, নিশ্চয়ই যেতে পারেন। তবে বন্ধু হিসেবে বলছি, সুন্দরবনের জল-জঙ্গল থেকে যে কত রকমের বিপদ আসতে পারে—আপনাদের পক্ষে আন্দাজ করাও সম্ভব নয়। আমাদের স্পেশাল ট্রেনিং আছে, তার ওপর এতকাল ধরে এখানে আছি ; কিন্তু এখনও কোনও অপারেশনে গেলে প্রাণ হাতে করে যাই। বিপদ যে কত দিক থেকে আসতে পারে—ভাবতেও পারবেন না!'

অতনুর কথা শুনে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল গোয়েন্দা, কিন্তু বিরক্তি গোপন করে খুব শান্ত ভঙ্গিতে আদেশ দেওয়ার গলায় বলল, 'আমার ফোন পাওয়ার পরে নৌকো ভেড়াবেন আমাদের লঞ্চের গায়ে। খেয়াল রাখবেন, যেদিকে লঞ্চের নাম লেখা আছে—সেদিকে। ছাড়ছি।' কথাটা বলেই ফোনের লাইন কেটে দিয়েছিল গোয়েন্দা।

দৃশ্যপটে কোথাও কোনও পরিবর্তন নেই। চারদিক আশ্চর্য রকমের নিস্তব্ধ। লঞ্চের গায়ে নির্দিষ্ট বিরতিতে নদীর জলের ঢেউ আছড়ে ভাঙার শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ ছিল না কোথাও। এমন নির্জন রাতে একা-একা সময় কাটানো খুব কঠিন ব্যাপার। কিন্তু সেই কঠিন কাজটাই অতিমাত্রায় সজাগ থেকে ঘণ্টাতিনেক ধরে করে যেতে হয়েছিল গোয়েন্দাকে।

ওর কাজ বলতে ছিল নজরদারি। কেবিনে নিজের খাটে কান খাড়া রেখে শুয়ে থাকা, আর একটু পর-পর ভাসমান ওই শূন্য বোটটাকে দেখে যাওয়া—এই-ই। রাত তিনটে নাগাদ বোটের ওপর গণেশকে দেখতে পেয়েই সারেংয়ের ঘরের লাগোয়া অন্ধকার কোণে হাঁটু মুড়ে বসে পড়েছিল গোয়েন্দা। তারপর হাঁটুতে হেঁটেই লঞ্চের অন্ধকার রেলিংয়ের পাশে চলে এসেছিল।

গণেশ ঠিক আগের দিনের কায়দাতেই খুব আস্তে আস্তে দাঁড় টেনে ডেভিসের কেবিনের জানলার কাছে নিয়ে এল বোটটাকে। জানলার পাশেই ইমার্জেন্সি একজিটের ছোট একটা দরজা আছে। সেই দরজাটা খুলে গেল নিঃশব্দে। দরজা থেকে ছোট্ট একটা দড়িব মই পড়ল নৌকোর ওপবে। গণেশ মইয়ের প্রান্ত বেঁধে দিল নৌকোর সঙ্গে।

মই দিযে নৌকোয় নেমে গেল জোসি। পরনে জিনসের ট্রাউজার্স, জ্যাকেট, মাথায় টুপি, কাঁধে ঝোলানো বন্দুক। হাতে টর্চ। ওর পরেই যে নামল তাকে দেখার জন্যে তৈরি ছিল না গোয়েন্দা—বাঘ-কুমির বন্ধনের মন্ত্রজানা সেই হিরু মণ্ডল। লোকটার পরনে আগের পোশাকটাই—রঙিন কাপড়ের টুকরো-জোড়া আলখাল্লা আব পাজামা। মাথায় এখন ঘোমটার মতো করে বেঁধে নিযেছে একটা গামছা। সবশেষে নামল ডেভিস। পরনে পুরোদস্তুর শিকারির পোশাক। কাঁধে বন্দুক, হাতে টর্চ।

গণেশ চটপট নৌকোয় বাঁধা দড়ির মইয়ের প্রান্তটা খুলে দিল। হিরু মণ্ডল বিড়বিড় করে কী-সব আওড়াবার পরে 'বদর বদর' বলতেই খাঁড়িব দিকে নৌকো বাইতে শুরু করল গণেশ।

ওরা রওনা হতেই নিচু হয়ে নিঃশব্দে লঞ্চের ওই চিমনির কাছে ছুটে এসে গোয়েন্দা মোবাইলে অতনুকে ধরে বলল, 'কুইক, এক্ষুনি চলে আসুন।'

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই লঞ্চের পাশে এসে গেল অতনুদেব বোট। লঞ্চের রেলিংয়ে আগেই একটা দড়ি বেঁধে রেখেছিল কৌশিক। ওর ছিপছিপে, নমনীয় আর মজবুত শরীরটা যে-কোনও কঠিন কাজ করার জন্যে তৈরি থাকে সব সময়। দোতলা লঞ্চের ছাত থেকে দড়ি বেয়ে অতনুদের নৌকোয় উঠতে ওর কয়েক মুহূর্তের বেশি লাগেনি। মুখে কোনও কথা না বলে আঙুল তুলে অতনুদের দেখাল কোন দিকে যেতে হবে।

বোটে সেই চারজন বনরক্ষী। প্রত্যেকেই সশস্ত্র। জলে শব্দ প্রায় না তুলে কী ভাবে দ্রুত দাঁড় টানতে হয়—তার শিক্ষা এদের আছে। খুব তাড়াতাড়ি ওদের নৌকো খাঁড়ির মুখে পৌঁছে গেল। চাপা গলায় গোয়েন্দা এবার অতনুকে বলল, 'ওদের নৌকোয চারজন। সঙ্গে দুটো বন্দুক।'

অতনুর গলাও চাপা। 'সাহেব-মেম দুজনেই কি বোটে আছে?'

একদিকে মাথা কাত করল কৌশিক।

'বাকি দুজন কি লঞ্চের?'

একজন লঞ্চের—সে দিনের সেই লোকটা। আর একজন গুণীন। বাঘ-কুমিরের মুখ বাঁধার মন্ত্র জানে।'

'নামটা জানেন?'

'হিরু মণ্ডল।'

'হিরু!'

'চেনেন নাকি?'

'খুব ভাল করেই চিনি। নেতি ধোপানির ঘাটের কাছে থাকে। ওকে তো আমরাও একবার সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম।'

'কোথায়?'

'গত বছরের আগের বছর কোর-এরিয়ায় বাঘের খোঁচ গুনতে গিয়েছিলাম আমরা। আমাদের সঙ্গে ছিল তখন।'

'খোঁচ কী?'

'পাগ-মার্ক, বাঘের পায়ের ছাপ। বাঘের সংখ্যা বাঘের পায়ের ছাপ গুনে জানা যায়।'

কৌতূহলী হয়ে অতনুর আর একটু কাছে এগিয়ে এসেছিল কৌশিক। 'হিরু কি সত্যিই বাঘ-কুমিরের মুখ বাঁধার মন্ত্র জানে?'

'একানকার লোকে তো বিশ্বাস করে। আমরা তাই আর্মড গার্ডদের সঙ্গে ওকেও নিয়ে গিয়েছিলাম। বাঘের পায়ের ছাপ গোনা হয়েছে অনেকগুলো, কিন্তু বাঘের মুখে তো পড়েনি কেউ। এ-ব্যাপারে ওর কোনও কেরামতি আছে কি না জানি না!'

খাঁড়ির মুখে ঢোকার মুখে অতনু বলল, 'মুখোশগুলো এবার পরে নাও।'

গার্ডরা মাথার পেছন দিকে গার্টার-লাগানো মানুষের মুখের মুখোশ এঁটে নিল। একটা মুখোশ কৌশিকের দিকে এগিয়ে দিয়েছিল এক বনরক্ষী। ও ওদের কায়দায় মুখোশ লাগিয়ে নিল মাথার পেছনে। মাথার পেছনে মানুষের মুখ আঁকা মুখোশ আঁটার রহস্য কৌশিক জানে। প্রত্যেকেরই এখন দুটো করে মুখ। সামনে একটা, আর একটা পেছনে। পেছনের মুখ বাঘকে বোকা বানাবার জন্যে। অসম্ভব ধূর্ত বাঘ ঘুরে এসে পেছন দিক থেকে লাফিয়ে পড়ে চোখের পলকে শিকার তুলে নিয়ে যায়। কিন্তু পেছনে এসেও মুখ দেখতে পেলে বাঘের নাকি বিভ্রম হয়। কিন্তু সুন্দরবনের ধুরন্ধর বাঘ কি মানুষের এই সহজ জালিয়াতিটা ধরতে পাবে না।

কপালে হাত ঠেকিয়ে বিড়বিড় করে বনরক্ষীরা বলল : জয় মা বনবিবি, জয় দক্ষিণ বায়। প্রার্থনার কথাগুলো কৌশিকের কানে আসেনি। আসার দরকারও নেই। বাঘদের খাস তালুকে ঢোকার মুখে বনের দেব-দেবীর কাছে প্রার্থনা তো একটাই।

খাঁড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছিল নৌকো। একটা প্রশ্ন করার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছিল কৌশিক, কিন্তু বনরক্ষী-প্রধান মুখে আঙুল তুলে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিল—না, এখানে আর একটাও কথা নয়।

সরু খাল এঁকেবেঁকে ঢুকে গেছে কোর-এরিয়ার গভীর বনের মধ্যে। দুদিকে ঠাসা জঙ্গল। জঙ্গলের ছায়ায় চাঁদের আলো ঢেকে গেছে প্রায়। এদিকটা বোধহয় নির্জনতার শেষ স্তর। নিজের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও কানে এসে লাগছিল কৌশিকের।

খাল ক্রমশই বাঁক নিয়ে নিয়ে ভেতরে, আরও ভেতরে ঢুকে গেছে। কোথাও-কোথাও খাল এত সরু যে, প্রকাণ্ড একটা লাফ দিয়ে কোনও বাঘের পক্ষে বুঝি গোটা খালটাই পেরিয়ে যাওয়া সম্ভব। দুজন বনরক্ষী দু দিকের জঙ্গলের দিকে বন্দুক তাক করে রেখেছিল। অন্য দুজন নৌকো বাইছিল।

সামনের বাঁকটা পেরুতেই একটু দূরে আর একটা নৌকো দেখা গেল। আবছা চাঁদের আলো। অতনুর ইঙ্গিতে এই নৌকোটা থেমে গেল। চোখে দূরবিন এঁটে বনরক্ষী-প্রধান বিড়বিড় করে বললেন, 'সর্বনাশ!'

কৌশিক প্রায় কানে-কানে কথা বলার গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী?'

মুখের ওপর তর্জনী তুললেন অতনু। তার মানে কোনও কথা নয় এখন। আবছা-

আলো-আঁধারে চোখ সইয়ে নেওয়ার পরে কৌশিক বুঝতে পারল, ওটাই জোসি-ডেভিসের নৌকো।

অতনুর চোখে দূরবিন। আতঙ্কগ্রস্ত মানুষের আওয়াজ বেরিয়ে এল ওঁর মুখ থেকে আবার। কৌতূহল মাত্রা ছাড়িয়ে বেড়ে উঠেছিল কৌশিকের, কিন্তু কথা বলা বারণ বলে ও কোনও প্রশ্ন করতে পারল না।

দুই বনরক্ষী জঙ্গলের দুদিকে বন্দুক তাক করে পাথরের মতো বসেছিল।

অপার্থিব এই পরিবেশে সময়ও বুঝি স্তব্ধ হয়ে যায়। একটু আগে পর্যন্ত ঝিঁঝির ডাক শোনা যাচ্ছিল, এখন সে ডাকও নেই। কৌশিকের বারবার মনে হচ্ছিল, এক্ষুনি ভয়ঙ্কর কোনও একটা কাণ্ড ঘটে যাবে!

অতনুও স্থির হয়ে আছে পাথরের মতো। ওর চোখে দূরবিন।

জমাট সময়ের সামনে আরও কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে থাকার পরে বনরক্ষী-প্রধান চাপা গলায় বললেন, 'ওরা চারজনেই বনের মধ্যে ঢুকে গেছে। ওই স্পটটা সাঙঘাতিক!'

'সাঙঘাতিক কেন?'

কৌশিকের নিচু গলার প্রশ্নের জবাবে আরও নিচু গলায় অতনু বললেন, 'ওই জায়গাটায় তিন-চারশো বছরের পুরনো একটা ভাঙা মন্দির আছে। এই ভাঙা মন্দিরগুলো বাঘদের ডেরা। ওরা যে হার্ডকোর পোচার, সে ব্যাপারে আর কোনও সন্দেহ নেই আমার। কিন্তু সবাই বেঁচে ফিরতে পারবে বলে মনে হয় না। ভয়ংকর ঝুঁকি নিয়েছে।'

অতনুর হাত থেকে দূরবিনটা নিয়ে চোখে লাগাল কৌশিক। জোসিদের শূন্য নৌকো মোটা একটা দড়ি দিয়ে তীরের গাছের সঙ্গে বাঁধা। লম্বা একটা কাঠের তক্তাও নেমে গেছে নৌকো থেকে ডাঙায়।

দূরবিন চোখে লাগিয়ে রেখেই চাপা গলায় আদেশের ভঙ্গিতে কৌশিক বলল, 'এই ফাঁকে চলুন আমরা ওদের নৌকো পেরিয়ে সামনের দিকে চলে যাই। নজরদারির সুবিধে হবে, ওরা তো ফিরবে এই পথ দিয়েই।'

এখন নৌকো বাওয়ার লোক দুজন। অতনু নিজে এবং আর একজন। দুজন বনরক্ষী খালের দুদিকে বন্দুক তাক করে পাহারাদারির কাজ চালাচ্ছে।

ওদিকের বনরক্ষীকে ইঙ্গিত করে দাঁড় তুলে নিলেন হাতে অতনু। শব্দ না করে দাঁড় টানার প্রশিক্ষণ আছে বনরক্ষীদের, কিন্তু এলাকাটা এত নির্জন যে শব্দ উঠছিল অল্পসল্প।

দেখতে দেখতে জোসি-ডেভিসের নৌকো পেরিয়ে গেল বনরক্ষীদের নৌকো। কৌশিকের হাতে দূরবিন, কিন্তু তীরের জঙ্গল এতই ঠাসা যে ভেতরের কিছুই দেখা গেল না।

পেছনের খাঁড়ির আর একটা বাঁকের মুখে এসে দাঁড়াল বনরক্ষীদের নৌকো। এখানে খাল কিছুটা চওড়া। নৌকো মাঝামাঝি জায়গায়। দুদিকে বিপজ্জনক ঘন জঙ্গল এখন আগের তুলনায় একটু দূরে দূরে।

বেশ কিছুটা তফাতে ডেভিসদের নৌকো। যদি ওরা বেঁচে ফেরে, ওদের পিছু নিতে এই নৌকোটার কোনও অসুবিধে হবে না।

চাঁদ বোধহয় দুদিকের কোনও একটা জঙ্গলের আড়ালে নেমে গেছে অনেকখানি। আকাশে বর্ণহীন ম্লান আলো। ওই আলো কখনও কখনও আরও কমে যাচ্ছিল। দূরবিন

পালা করে ঘুরছিল অতনু আর কৌশিকের হাতে। দুজনেই নজর রেখেছিল ডেভিসদের নৌকোর ওপরে। শূন্য নৌকো দুলছিল হাওয়ায়। এ এক অস্বাভাবিক প্রতীক্ষা। যারা ডাঙায় নেমেছে তাদের সবাই নাও ফিরতে পারে। যে-কোনও মুহূর্তে আর্ত চিৎকার উঠতে পারে জঙ্গলের ভেতর থেকে, কিংবা গুলির শব্দ। কিংবা, বিপদ ওদিকে নয় এদিকে। বনের অদৃশ্য কোনও এলাকা থেকে ভয়ংকর একটা প্রাণী লাফ দিয়ে পড়তে পারে এই নৌকোয়। থমথমে পরিবেশ। কে কাকে নজর করছে কে জানে।

এখানে একটা মিনিট কাটাতে বোধহয় বহু সময় লেগে যায়। এই ভাবে একটা ঘণ্টা কাটানো মানে বুঝি আস্ত একটা যুগ পার করে দেওয়া। ওই নিয়মেই একটি ঘণ্টা পার করার পরে ওই দলটা ফিরে এল ওদের নৌকোর কাছে। নড়েচড়ে উঠলেন বনরক্ষী-প্রধান। চোখ দূরবিনে এঁটে ফিসফিস করে বললেন, 'ফিরে এসেছে, চারজনেই। না, ওদের কাছে আর কিছুই নেই।'

ওর প্রায় কানের কাছে ঠোঁট লাগিয়ে কৌশিক জিজ্ঞেস করল, 'আর কিছু নেই মানে?'

আগের মতো গলাতেই উত্তর দিলেন বনরক্ষী-প্রধান, 'জঙ্গলের কিছু নেই। সব ওদেরই জিনিসপত্র।'

'কী জিনিস?'

'সাহেব-মেমের হাতে বন্দুক, হিরুর হাতে টাঙ্গি আর সেদিনের ওই লোকটার হাতে একটা শাবল।'

অতনুর এই কথাগুলো বলার একটু পরেই চলতে শুরু করল ওদের নৌকোটা।

দূরত্ব আর একটু বেড়ে যাওয়ার পরে দূরবিনটা কৌশিককে দিয়ে দাঁড়ে হাত লাগালেন অতনু। মধ্যিখানে দুই বনরক্ষী দু দিকের দুই জঙ্গলে বন্দুক তাক করে আগের মতোই বসেছিল। ওদের উদ্দেশে চাপা গলায় নির্দেশ দিলেন বনরক্ষী-প্রধান, 'জঙ্গলে নজর রাখবে ভাল করে। এই সময়টা বেশি ভয়ের।'

জলে খুব একটা শব্দ না তুলে বনরক্ষীদের বোট সামনের নৌকোটার পিছু নিল। দুটো নৌকোর মধ্যিখানের দূরত্ব আরেকটু বেড়েছে। ওদিকের বনরক্ষী নিজের মনে কথা বলার ভঙ্গিতে বলে উঠল, 'আজ হিরু সঙ্গে ছিল বলেই ওরা বেঁচে ফিরল।'

একটু বুঝি সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে অতনু বললেন, 'হতে পারে, কিন্তু ওদের সঙ্গে গিয়েছিল কেন?'

এই প্রশ্নের উত্তর কারও জানা নেই। সুতরাং চুপ করে থাকল সবাই।

বেশ কিছুটা যাওয়ার পরে চওড়া খাঁড়ি পাওয়া গেল আবার। দুদিকের জঙ্গল অনেকটা সরে গেছে। আগের মতো বিপদের আশঙ্কা আর নেই। মধ্যিখানের দুই বনরক্ষী বন্দুক কাঁধে ঝুলিয়ে দাঁড় তুলে নিয়েছিল হাতে। অতনুর ইঙ্গিতে মাথার পেছন দিকে বাঁধা মানুষের মুখ-আঁকা মুখোশগুলো খুলে নিয়েছিল সবাই। ভয়ংকর একটা বিপদ চারদিক থেকে এতক্ষণ ওদের ঘিরে রেখেছিল। সেটা কেটে যাওয়ার ফলেই বোধহয় চাপা উত্তেজনার সঙ্গে বনরক্ষী-প্রধান বললেন, 'পোচারদুটোকে এবার অ্যারেস্ট করব আমি।'

হাত তুলে জবাব দিল কৌশিক, 'না।'

'না কেন?'

'ওরা যে পোচার, তার কোনও প্রমাণ তো দাখিল করতে পারবেন না।'

বনরক্ষী-প্রধান অদ্ভুত চোখে তাকালেন কৌশিকের দিকে। ওঁর দৃষ্টিটাই বলে দিচ্ছিল— এমন আজগুবি কথা উনি বোধহয় জীবনেও শোনেননি। কয়েক মুহূর্ত থমকে থাকার পরে অতনু হুল ফোটানোর ভঙ্গিতে চাপা গলায় প্রশ্ন করলেন, 'কোর-এরিয়ার জঙ্গলে মাঝরাতে ওরা বন্দুক হাতে নিয়ে ঢুকেছিল কেন? কী মনে হয় আপনার?'

অসম্ভব ঠাণ্ডা গলায় নিচু স্বরে পাল্টা প্রশ্ন করল কৌশিক, 'আমি কী করে বলব?'

ঠাণ্ডা গলার অবিশ্বাস্য এই প্রশ্নটা বনরক্ষী-প্রধানকে ঠাণ্ডা করে দিয়েছিল একদম। কয়েক মুহূর্ত ঠাণ্ডা থাকার পরে আবার গরম হলেন। কিন্তু বড় সাহেবের প্রিয় পাত্র বিচিত্র এই অতিথিকে ঘাঁটাবার সাহস পেলেন না আর।

খাঁড়ি থেকে বেরিয়ে নদীতে পড়েছে ডেভিসদের নৌকো। নৌকোর মুখ এম ভি সদাগরের দিকে।

চারপাশে আবছা আলো-আঁধার। আকাশের নিজস্ব আলো বলে কিছুই আর নেই। শেষ রাতের এটা বুঝি শেষ সময়। আর একটু বাদেই হয়তো ভোরের প্রথম আলো ফুটবে।

বাঁ দিকে ডেভিসদের নৌকো, ডানদিকের প্রান্তে—দূরে, আর একটা যেন নৌকো। দূরবিনটা তুলে নিয়ে চোখে আঁটল কৌশিক। তারপর ওদিকে বাঁকের আড়ালে ওটা মিলিয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত দেখল।

একটু পরে থমথমে গলায় বনরক্ষী-প্রধান জিজ্ঞেস করলেন, 'এবার কোথায় যাবেন আপনি?'

নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে উত্তর দিল কৌশিক, 'একটু ঘুরে চলুন। লঞ্চের এপাশ দিয়ে ওরা উঠেছে, আমি ওপাশ দিয়ে উঠব।'

শেষ রাত আর প্রথম ভোর বোধহয় ঠিক মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে।

কারওরই নিজস্ব কোনও আলো নেই। পাতলা কুয়াশা ছড়িয়ে পড়ছে আস্তে আস্তে। চার হাতে দাঁড় বাওয়ায় নৌকোর গতি বেশ বেড়ে গিয়েছিল। নদীতে একটা বড় চক্কর মেরে এম ভি সদাগরের ঠিক উলটো দিকে এসে গেল বনরক্ষীদের নৌকো। আস্তে আস্তে লঞ্চের গায়ে সেটা ভিড়তেই ঝুলন্ত দড়ি বেয়ে কাঠবিড়ালির ভঙ্গিতে ওপরে উঠে গেল গোয়েন্দা। তারপর দ্রুত হাতে রেলিংয়ে-বাঁধা দড়িটা খুলে নিয়ে নিঃশব্দে কেবিনে ঢুকে দরজা টেনে দিল।

পূর্ণদা আগের মতোই অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। নিজের খাটে স্থির হয়ে বসে গোয়েন্দা একটু আগে দেখা তৃতীয় নৌকোর যাত্রী-দুজনের কথা ভাবছিল। এম ভি দিনমণির ওই সাহেব আর তার সঙ্গী কোথায় গিয়েছিল শেষ রাতে?

॥ ২২ ॥

বিকেল সাড়ে-পাঁচটা নাগাদ কৌশিক বিছানার ওপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়তেই ওর পূর্ণদা একটু ধমকে উঠলেন, 'না, আর এখন শোবে না। সারা দিনটা তো শুয়ে শুয়েই কাটিয়ে দিলে। বিছানা ছাড়লে বেলা এগারোটায়। দুপুরে খেয়েদেয়ে আবার ঘুম। এখন আবার শুয়ে পড়লে!'

মস্ত একটা হাই হাত দিয়ে আড়াল করে তুলে একটু লাজুক মুখে কৌশিক বলল, 'না, এখন আর শুচ্ছি না। কাল সারা রাত্তির বিছানায় পড়ে ছটফট করেছি। একফোঁটাও ঘুমোতে পারিনি। আজ দিনের বেলায় তাই একটু ঘুমিয়ে নিলাম।'

চোখ বড়-বড় করে পূর্ণদা বললেন, 'এর নাম একটু ঘুম! তুমি তো সারাদিন ধরে মড়ার মতো ঘুমিয়েছ। তোমার ঘুমের বহর দেখে মনে হচ্ছিল, কাল নাইট ডিউটি দিয়ে সকালে এসে শুয়েছ।'

কৌশিক হাসতে হাসতে বলল, 'রাত্তিরে একবিন্দু ঘুমোতে না পারলে তাকে তো নাইট ডিউটি দেওয়াই বলে। চোখের সামনে রাত ভোর হয়ে যেতে দেখলাম, তারপর ঘুমিয়েছি। এগারোটার সময় ঘুম ভাঙার পরেই কিন্তু ফিট।'

'কচু ফিট। দুপুরে খাওয়ার টেবিলেও তো ঝিমোচ্ছিলে। তোমাকে ওই রকম ঝিমোতে দেখে জোসি আর ডেভিসও চুপচাপ ছিল। অন্যান্য দিন কত গল্প করে।'

হাসতে হাসতে কৌশিক বলল, 'ওদেরও তাহলে হয়তো ঘুম হয়নি রাতে। আমার মতো বুঝি বিছানায় শুয়ে শুয়ে ছটফট করেছে সারা রাত্তির।'

আর একটা ছোট্ট করে ধমক লাগালেন পূর্ণদা। 'ওদের সঙ্গে আমাদের মেলাতে যেও না তো—। ওদের সব কিছুতেই শৃঙ্খলা। দেখছ না খাওয়াদাওয়া পর্যন্ত কেমন ঘড়ি ধবে সাবে। আমরা তো এখন যাঁকে বলে প্রমোদ-ভ্রমণে, কিন্তু একটা দিনের জন্যেও নিয়মের বাইরে যায়নি ওরা। সাহেবদের কাছ থেকে এখনও আমাদের অনেক-কিছু শেখার আছে।'

ভালোমানুষের মতো মুখ করে সায় দিল কৌশিক। 'তা ঠিক।'

বলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পারভেজ এসে বলল, 'সাহেব আর মেম ওপরে এসে বসেছেন, আপনাদের ডাকছেন।'

'যাও, আমরা যাচ্ছি।'

পারভেজ চলে গেলে আবার মুখ খুললেন পূর্ণদা। 'দেখেছ, ওদের আড্ডা মারার সময়টাও বাঁধা। প্রতিদিনই আমরা জমিয়ে আড্ডা মারি, কিন্তু আড্ডা ভাঙে সাড়ে-আটটা নাগাদ। তার পরেই আমরা রাতের খাবার খেতে যাই একসঙ্গে। আমি ঠিক করেছি, কলকাতায় ফিরে যাওয়ার পরে এখানকার খাওয়া-দাওয়ার নিয়মটাই মেনে চলব। আমাদের শরীর খারাপ হওয়ার বড় কারণটা কী জানো, আমরা সুযোগ পেলেই অবেলায় খাই। ওদিকে রাতের খাবার-দাবার খাই অনেক রাত্তিরে। তার পর আবার পেট পুরে অখাদ্য-কুখাদ্য খাওয়া তো আছেই—। নাও নাও, উঠে পড়ো। ওরা অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে।'

একটু আগেই নোঙর ফেলেছে এম ভি সদাগর। কাছেই আর একটা খাঁড়ির মুখ। নদীর জলে আর ওদিকের সুন্দরবনের ঠাসা জঙ্গলে দিনের শেষ আলো মিলিয়ে যাচ্ছিল।

জোসি আর ডেভিস হাসি মুখে সন্ধের আড্ডায় অভ্যর্থনা জানাল কৌশিক আর ওর পূর্ণদাকে।

সন্ধেয় এখানকার আড্ডার জায়গাটা চমৎকার। সারেংয়ের ঘরের সামনে নিচু মাপের গদি-আঁটা চৌকি। চৌকিতে দুজন। ওদিকের দুটো চেয়ারে জোসি আর ডেভিস। ডেভিসের পাশের টেবিলে টইটম্বুর হুইস্কির গ্লাস। কৌশিকরা আসার একটু বাদেই ওদের জন্যে এসে গেল গরম কফি আর কাজু বাদাম।

ডেভিস হুইস্কির গ্লাসটা তুলে নিয়ে 'চিয়ার্স' জানাল। জোসির পায়ের পাশে স্ট্র-লাগানো কোল্ড ড্রিংক্‌সের একটা বোতল ছিল, সেটা শূন্যে তুলে নিয়ে চিয়ার্স করল জোসি বাকি দুটো চিয়ার্স এল কফির কাপ হাতে-ধরা কৌশিক আর ওর পূর্ণদার কাছ থেকে।

একটা বড় চুমুকে টইটম্বুর হুইস্কির গ্লাসকে ইঞ্চিখানেক শূন্য করে দিল ডেভিস।

কোল্ড ড্রিংকসের বোতলের স্ট্রতে একবার ঠোঁট লাগিয়েই চারদিকে চোখ ঘোরাল জোসি, তার পর মুগ্ধ চোখে বলল, 'সুন্দরবনের বিউটিকে ডেসক্রাইব করা কঠিন। আই অ্যাম নো পোয়েট, পোয়েট হলে সুন্দরবনকে নিয়ে বেশ কয়েকটা পোয়েট্রি লিখে ফেলতাম! কাউশিক তুমি লিখেছ?'

কৌশিক হেসে বলল, 'আমি তো গিফ্‌টেড নই, কবিতা লিখব কী করে! তবে আমার মন বলছিল—তুমি আজ তোমার লেখা নতুন কয়েকটা পোয়েট্রি শোনাবে আমাদের।'

বড়-বড় চোখে বিস্ময় প্রকাশ করে জোসি বলল, 'আউ!'

পূর্ণদা গোড়া থেকেই গল্পের মেজাজে। হেসে বললেন, 'তোমার বন্ধু রনি আমাদের এই ট্রিপে থাকলে, আই অ্যাম সার্টেন, ও অনেকগুলো কবিতা লিখে ফেলত।'

কাঁধ পর্যন্ত ছাঁটা সোনালি চুল নাচিয়ে জোসি বলল, 'রাইট, ও একবার একটা উইক-এন্ডে আমাকে একটা স্টোরি শুনিয়েছিল, ভেরি বিউটিফুলি রিটেন।'

পূর্ণদা বললেন, 'আচ্ছা, তোমার পূর্বপুরুষ বার্নিয়ের কি কবিতা লিখতেন?'

দুদিকে মাথা নাড়িয়ে জবাব দিল জোসি, 'না, ওর পোয়েট্রি তো পাইনি, যা পেয়েছি সব ওর ট্রাভেল-স্টোরি।'

তারিফ করার ভঙ্গি ফুটে উঠেছিল পূর্ণদার চোখেমুখে। 'ট্রাভেল-স্টোরির কিছু-কিছু জায়গা ঠিক কবিতার মতো। পার্টিকুলারলি সুন্দরবনের বর্ণনা আছে যেখানে সেই অংশ-গুলো তো ভোলা যায় না। আমি কিছু দিন আগে আর একবার পড়লাম বইটা। অপূর্ব! একটা জায়গার কথা এখনই মনে পড়ে যাচ্ছে। সুন্দরবনে উনি একবার চাঁদের রামধনু দেখেছিলেন।'

অবাক হয়ে ডেভিস জিজ্ঞেস করল, 'চাঁদের রামধনু?'

'হ্যাঁ, চাঁদের রামধনু। এটা খুব রেয়ার দৃশ্য। বার্নিয়ের অ্যারিস্টটলকে কোট করে লিখেছেন—অ্যারিস্টটলের মতে, তাঁর আগের যুগে চাঁদের রামধনু কেউ দেখেনি।'

গ্লাসে আর একটা বড় চুমুক দিয়ে ডেভিস জিজ্ঞেস করল, 'কী রকম?'

পূর্ণদা সাড়ে-তিনশো বছর আগে লেখা বার্নিয়েরের ভ্রমণবৃত্তান্তের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন। একটু ঘুরে বসে শুরু করলেন সেদিনের সেই চাঁদের রামধনু দেখার কাহিনী। 'তখনকার সুন্দরবন তো এখনকার চাইতে দশ গুণ বড় ছিল। চারদিকে অসংখ্য খালবিল। চারপাশে ঘন সুন্দরবন। জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ। তাদের সংখ্যাও ছিল বিশাল। অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল এলাকা। এক রাত্তিরে সুন্দরবনের একটা খালের মধ্যে নৌকো বেঁধেছেন। তীরের একটা মোটা গাছের ডালে নৌকো বাঁধা হয়েছিল শক্ত করে। বার্নিয়ের লিখেছেন, তীর থেকে অনেকটা দূরে নৌকো সরিয়ে রাখা হয়েছিল বাঘের হাত থেকে বাঁচার জন্যে। মাঝরাত্তিরে উনি দেখতে পেলেন সেই আশ্চর্য দৃশ্য—চাঁদের রামধনু। নৌকোর সঙ্গীদের ঘুম থেকে ডেকে তুলেছিলেন বিরল ওই দৃশ্য দেখানোর জন্যে। ওঁর নৌকোয় দুজন পর্তুগিজ নাবিকও

ছিল। সবাই অবাক। প্রত্যেকেই বলেছিল : এমন রামধনু ওরা কখনও দেখেনি, শোনেওনি কারও কাছে।

জোসি পড়া ভালভাবে তৈরি না-হওয়া ছাত্রীর মতো মুখ করে বলল, 'আমি পড়েছি, কিন্তু পুরোটা, অ্যাট দ্য মোমেন্ট, মনে পড়ছে না পূর্ণদা। আপনার মুখে শুনি আর একবার।'

পূর্ণদা ভ্রমণকাহিনীর ওই পাতাগুলোর মধ্যেই বুঝি ঘোরাফেরা করছিলেন। বললেন, 'বার্নিয়ের লিখেছেন, আশ্চর্য ওই রামধনু কিন্তু চাঁদকে ঘিরে ছিল না। ওটা ছিল ঠিক চাঁদের বিপরীত দিকে। ঠিক দিনের আলোর রামধনুর মতো। চাঁদ ছিল পশ্চিম দিকে, আর ওই রামধনু পুবে। চাঁদ মনে হয় পূর্ণিমার চাঁদ। না হলে আলোর রেখায় অমন রামধনু তৈরি হত না। নানা রঙের ছটা তার মধ্যে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল।'

জোসি একটু হায়-হায় করা গলায় বলে উঠল, 'আমরাও তো একটা ফুল মুন পেয়েছিলাম, আগে খেয়াল থাকলে—।'

পূর্ণদা সস্নেহে একটা ধমক দিয়ে বললেন, 'বার্নিয়ের তো অ্যারিস্টটলকে কোট করেছেন। বলেছেন, ওই রকম বামধনু গোটা পৃথিবীতে বেশি লোক দেখেনি। ওই সঙ্গে রাতের সুন্দরবনের গা-ছমছমে একটা বর্ণনাও দিয়েছেন বার্নিয়ের।'

'কী রকম?' প্রশ্ন করল ডেভিস।

'বার্নিয়ের লিখেছেন, বনের মধ্যে অজস্র জোনাকি এমন ভাবে জ্বলছিল যে মনে হচ্ছিল—বনে আগুন লেগে গেছে। সত্যি-সত্যি আগুনের মতো কী যেন জ্বলেও উঠছিল মাঝেমধ্যে। দূরে আগুনের শিখা দাউ-দাউ করে জ্বলার পরে নিভে যাচ্ছিল। বার্নিয়ের জানিয়েছেন, ওই দৃশ্য দেখে ওঁর নৌকোর মাঝিমাল্লারা বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ওদের ধারণা—ও সব ভূতপ্রেতের কাণ্ড।'

'এমনও হতে পারে—ওগুলো ইলিউশন?'

জোসির প্রশ্নের উত্তরে পূর্ণদা বললেন, "চোখের ভুল নয় বোধহয়। আমাদের দেশে মনে হয় ওই ধরনের আলোকেই 'আলেয়ার আলো' বলা হয়ে থাকে। আমি বিজ্ঞানের লোক নই। ঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারছি কি না জানি না—। জলাজমিতে শুনেছি পচাপাতা থেকে মিথেন গ্যাস তৈরি হয়। হাইড্রোকার্বন—এর সঙ্গে আবার নাকি হাইড্রোজেন ফসফাইড মিশে থাকে। মিশ্রণটা অক্সিজেনের সঙ্গে মিশলেই নাকি আগুন জ্বলে ওঠে দপ করে। ওই রকম কিছু একটা হয়েছিল বোধহয়! বার্নিয়ের লিখেছেন, দুটো আগুন জ্বলার দৃশ্যের কথা ওর মনে আছে পরিষ্কার। একটা আগুনের চেহারা গোল বলের মতো, আর একটা ছিল লম্বা গাছের মতো। মিনিট-পনেরো জ্বলার পরে নিবে যায়।"

ডেভিস গ্লাসে আর একটা লম্বা চুমুক মেরে প্রশ্ন করল, 'টাইগার কখনও অ্যাটাক করেনি বার্নিয়েরকে?'

উত্তরে পূর্ণদা হাসতে হাসতে বললেন, 'আমাদের সবার কপাল ভাল' যে, বাঘের মুখে পড়তে হয়নি বার্নিয়েরকে। পড়লে অসাধারণ এক ভ্রমণকাহিনী থেকে গোটা পৃথিবী বঞ্চিত হত।'

এবার অদ্ভুত একটা প্রশ্ন করে বসল ডেভিস। 'কেন পড়েননি? তখন তো হাজার-হাজার বাঘ ছিল সুন্দরবনে।'

পূর্ণদা আর একবার হাসলেন। 'তা ছিল। তবে বার্নিয়েরের দলবলও খুব বড় ছিল। পাকা মাঝিমাল্লা ছিল সঙ্গে। তারা সুন্দরবনের সব খবরাখবর রাখত। বোঝা যায়, তাদেরই পরামর্শে খালের তীরে নৌকো কখনও বাঁধেননি বার্নিয়ের। তীরে নৌকো বাঁধা হলে কেউ-না-কেউ বাঘের পেটে যেত নির্ঘাত। বার্নিয়েরের নৌকো মোটা গাছের ডালে লম্বা দড়ি দিয়ে বাঁধার পরে সেই নৌকো রাখা হয়েছিল খালের মাঝামাঝি জায়গায়। তবে ওই রকম জায়গায় নৌকো রেখেও বাঘের হাত থেকে উদ্ধার পেত না সবাই। বাঘ অসম্ভব চালাক। মাঝরাত্তিরে নিঃশব্দে নদী-খাল সাঁতরে নৌকো থেকে মাঝিমাল্লা ধরে নিয়ে যেত।'

'এখনও যায় কি?'

'যায়। খবরের কাগজে ওই ধরনের রিপোর্ট তো চোখে পড়ে মাঝেমধ্যে। তবে ওই সব ঘটনা আগের তুলনায় অনেক কম। ঘটবেই বা কী করে? আগে সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা ছিল বেশ কয়েক হাজার, সেই সংখ্যা এখন কমতে কমতে পৌনে-তিনশোয় এসে দাঁড়িয়েছে।

'কেন, কমেছে কেন?'

এই ধরনের একটা প্রশ্ন ডেভিসের কাছ থেকে আশা করেননি পূর্ণদা। কয়েক মুহূর্ত থমকে থাকার পরে বললেন, 'কেন কমেছে সবাই জানে। চোরাশিকারিরা বাঘ মারে। এই তো গত দু মাসে সুন্দরবনে গোটা-চারেক বাঘ মেরেছে পোচাররা।'

গ্লাসের শেষ তরল পদার্থটুকু গলার মধ্যে চালান করে দিয়ে আর একটা অদ্ভুত কথা বলল ডেভিস। "মারবেই তো। এটা নেচার'স ল।"

অবাক হলেন পূর্ণদা। 'বাঘ মারছে চোরাশিকারিরা। সেটা প্রকৃতির নিয়ম হয় কী করে?'

গ্লাসে আর একটা লম্বা পেগ ঢেলে নেওয়ার পরে ডেভিস বলল, 'ফুড-চেনের একেবারে ওপরে আছে বাঘ। বাঘ হরিণ খায়, শুয়োর খায়, বাঁদরও খায়। কিন্তু জঙ্গলে বাঘকে খাওয়ার মতো কেউ নেই। এদিক থেকে দেখলে বলা যেতে পারে, বাঘ প্রিভিলেজড্ ক্লাস। পোচাররা বাঘ মারে ঠিকই, আবার কাউন্টার-অ্যাটাকে বাঘও পোচারদের মারে। এটা হচ্ছে জঙ্গলের নিয়ম। যে ফিটেস্ট, সেই সারভাইভ করে। আদার্স ডাই। বাঘ যদি শেষ হয়ে যায়, নিজের দোষেই হবে।' হুইস্কির গ্লাসে লম্বা একটা চুমুক মারল ডেভিস। ওর এই অদ্ভুত কথাটা শুনে পূর্ণদা এতই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন যে, কিছুই বলতে পারলেন না।

ডেভিসকে একটু খুঁটিয়ে দেখে নিল কৌশিক। সাহেবের বড়সড় মুখ হুইস্কির প্রভাবে একটু বেশি মাত্রায় লালচে হয়ে উঠেছিল। চেহারাটা এখন কেমন যেন অন্য রকম। হঠাৎ মনে হল, সুযোগ পেলে এই লোকটা বাঘ মারতে পারে একটার পর একটা।

আজ একটু বোধহয় বেশি নেশা হয়ে গিয়েছিল ডেভিসের। হঠাৎ ভারী গলায় ডেকে উঠল, 'গানেশ।'

গণেশ নীচে ছিল, ছুটে ওপরে আসতেই সাহেব বলল, 'কল দ্যাট ফাকির। হিরু মান্ডল্‌কে ডাকো এখানে। ও আমাদের বাঘের স্টোরি শোনাবে।' গণেশ লম্বা পায়ে নীচে নেমে গেল, একটু পরেই ফিরে এল হিরুকে সঙ্গে নিয়ে। হিরুর পরনে সেই রং-বেরংয়ের টুকরো-কাপড়-জোড়া ঢোলা আলখাল্লা আর পাজামা। লোকটার চলা-ফেরা, দাঁড়ানো,

কথা বল'র ভঙ্গি—সব কিছুর মধ্যেই অদ্ভুত একটা নাটকীয়তা। হিরু ঝুঁকে পড়ে হাত জোড় করে অর্ধবৃত্ত বানিয়ে সবাইকে নমস্কারের পাট সারল একসঙ্গে।

হিরুকে দেখে সাহেবের চোখেমুখে বেশ একটা ফূর্তির ভাব ফুটে উঠেছিল। গ্লাসে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে হিরুর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'তুমি সারা জীবনে কত বার বাঘের মুখ বেঁধেছ?'

হিরু একটু ঝুঁকে পড়ে বলল, 'আজ্ঞে, এগারো শত বার।'

ডেভিস ওর দুই ভুরু কপালের দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, 'সুন্দরবনে বাঘ আছে তিনশোরও কম, আর তুমি বাঘের মুখ বেঁধেছ এগারোশো বার! এটা কী করে হয়?

সাহেবের অজ্ঞতাকে ক্ষমা কবে দেওয়ার হাসি হেসে হিরু বলল, 'অনেক বাঘের মুখ আমি চার-পাঁচবারও বেঁধেছি। বড় মন্ত্র পড়ে বাঘের মুখে একটা বন্ধন দিলে সেই বন্ধন থাকে পাক্কা একচল্লিশ দিন। ওই বন্ধনকে বলে লিখন বন্ধন। মন্ত্র পড়লেই বাঘের দাঁতে খিল লেগে যায়। ওই খিল খোলে একচল্লিশ দিন পরে। তখন বাঘ আবার শিকার ধরে খেতে পারে। ছোট মন্ত্রে বন্ধন এক বেলার।'

চোখ বড়-বড় করে জোসি বলল, 'তুমি বাঘের মুখ বাঁধার একটা-দুটো মন্ত্রা শোনাও না আমাদের।'

কথাটা কানে যেতেই জিভ কেটে দু-কানে হাত ছোঁয়াল গুনিন। তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'জয় মা বনবিবি, জয় বাবা দক্ষিণ রায়, এনাদের দোষ নিও না। এনারা বিদেশি লোক।'

ডেভিসের গলার স্বর এমনিতেই বেশ ভারী, গলা হুইস্কিতে ভেজার দরুন আরও ভারী হয়ে উঠেছিল। জোসির কথায় একটু দেরিতে সায় দিয়ে সাহেব বলল, 'হ্যাঁ, শোনাও বাঘের মুখ বাঁধার মন্ত্রা একটা-দুটো।'

হিরু আসতেই এই লঞ্চের মাঝিমাল্লারা ভিড় করেছিল ওর চারপাশে।

সাহেবের আদেশ শুনে চোখ বন্ধ করে ঠোঁট নাড়াল হিরু, তারপর মাথা উলটে কপালে হাত ঠেকাবার পরে বলল, 'এই সব মন্তরতন্তর যখন তখন বলতে নেই। মন্তর বলার আগে সিন্নি চড়াতে হয়, মানত করতে হয়, মুর্গি দিতে হয়। হাতের কাছে মুর্গি না থাকলে মূল্য ধরে দিতে হয়। তারপর নিজেকে শুদ্ধি করে জলপড়া, ধুলোপড়া দিয়ে মন্তর পড়লে ফল ফলে।'

সাহেব পকেট থেকে ওয়ালেট বার করে একটা একশো টাকার নোট বার করে বলল, 'স্টপ টকিং ননসেন্স। এটা নিয়ে মন্ত্রা বলো।'

সাহেব নোটটা টেবিলের ওপরে রাখতে যাচ্ছিল, হাঁ-হাঁ করে উঠল হিরু। 'এটোকাঁটার মধ্যে দক্ষিণা রাখবেন না ছাহেব। দাঁড়ান।' পকেট থেকে সবুজ একটা রুমাল বার করল হিরু, তারপর দু-হাতের ওপরে বিছিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, এটার মধ্যে দেন এবার।'

হিরুর হাঁ-হাঁ শুনে সাহেব একটু ঘাবড়েই গিয়েছিল। গুনিনের নির্দেশে নোট ফেলল রুমালের ঠিক মধ্যিখানে।

ওই রুমাল ভাঁজ করার কায়দাটাও অভিনব। খুব ভারী কিছু একটা ধরে রেখেছে এমন ভঙ্গি করে রুমাল কপালে ঠেকাল হিরু, তার পর বিড়বিড় করে ঠোঁট নাড়াতে লাগল।

চারপাশে এতগুলো লোক, কিন্তু কোথাও কোনও রকম শব্দ নেই। কিছুক্ষণ আগে

দিনের আলো ফুরিয়ে গেছে। রাতের আলো ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে সবে। জোয়ার এসেছে বোধহয়। লঞ্চের গায়ে ঢেউ ভাঙার চাপা শব্দ উঠেছিল। হিরুর চারপাশে এই যে এতগুলো নিঃশব্দ লোক, এদের অনেকেরই মনে হচ্ছিল, এক্ষুনি অলৌকিক একটা কাণ্ড ঘটে যাবে।

আরও কয়েকটা মুহূর্ত একই ভাবে থাকার পরে এক ঝটকা মেরে বেঁকে দাঁড়াল হিরু, তারপর কর্কশ গলায় বলে উঠল, 'আকাশে তারা বন্ধন / পাতালে বারি বন্ধন / সাতষট্টি কোটি দেবতা বন্ধন / নদীতে কুমির বন্ধন / ডাঙায় বাঘ বন্ধন / আমার এই বন্ধন যদি নড়ে / বনবিবির মস্তক ছিঁড়ে জমিনেতে পড়ে।'

বলেই এক পাক ঘুরে গিয়েছিল হিরু। এবার ভঙ্গি অন্যরকম। পাঁচালি পড়ার ঢঙে আর এক রকম গলায় দুলে দুলে বলতে লাগল, 'মা তোর সন্তান গেল বনে / থাকে যেন মনে / বাঘ-ভাল্লুক বাঁধে সব / রাখবি বাদার কোণে / দোহাই মা বনবিবি।'

শরীরে খুব একটা কষ্ট হচ্ছে—এমন ভঙ্গি করে কুঁকড়ে গেল গুনিন হিরু মণ্ডল। তার পর ক্ষীণ গলায় বলল, 'সামনের এই জঙ্গলে যত বাঘ আছে, তাদের সবার দাঁতে খিল পড়ে গেল। রাত না ফুরলে কোনও বাঘ আর দাঁতের খিল খুলতে পারবে না। জয় মা বনবিবি।' বলার পরে আর একটু কুঁকড়ে নিয়ে ধপ্ করে বসে পড়ল গুনিন।

গণেশ ছুটে গিয়ে একটা জলের জাগ নিয়ে এসে জল ছিটিয়ে দিল হিরুর চোখেমুখে। পারভেজ গামছা ঘুরিয়ে হাওয়া দিতে লাগল ওর মাথায়।

উঠে দাঁড়িয়েছিল জোসি। "হোয়াট'স্ রং? মান্‌ডলের কি শরীর খারাপ লাগছে?"

ওকে আশ্বস্ত করার গলায় গণেশ বলল, 'মন্ত্র পড়ার পরে গুনিনদের এই রকম হয়ে থাকে। মন্ত্রের খুব জোর আছে তো—। আস্তে আস্তে আবার ঠিক হয়ে যাবে হিরু।'

মিনিট-পাঁচেকের মধ্যে আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল হিরু। সবুজ রুমালটা পকেটে ঢুকিয়ে আলখাল্লার হাতা দিয়ে মুখ-চোখের ঘাম, জল মুছে নিয়ে ক্লান্ত গলায় বলল, 'আপনারা মানী লোক। আমি মা বনবিবিকে বললাম : মা এনারা মন্তর শুনতে চান। মুর্গি, মানত করা টাকা ধরে দিয়েছে। তা এদের শোনাব এট্টুসখানি। মা বলল : শোনা। তবে একবারই শুধু। তারপর মন্তর বললাম। মন্তর বললে শরীলে ব্যথা হয়। তেরাত্তির না গেলে এই ব্যথা পুরো সারবে না।'

কষ্টের কথা শুনে ব্যস্ত হয়ে উঠে পূর্ণদা বললেন, 'তা হলে তুমি এখন নীচে গিয়ে একটু বিশ্রাম নাও, কাল আবার কথা হবে।'

কথাটায় সায় দিল ডেভিস। 'রাইট। কিন্তু হিরু তোমার মন্তরে সামনের বনের সব বাঘের মুখে যে বন্ধন পড়েছে, সেটা তুমি কী করে জানলে?'

'আমার সঙ্গে চলেন এখন বনে। মন্তরের জোরে সব বাঘ এখন বেড়ালের মতো হয়ে গেছে। আমারে তো ওরা সবাই চেনে, দেখবেন আমার পায়ে মুখ ঘষে লেজ নাড়ছে বাঘ।'

গম্ভীর মুখে ডেভিস বলল, 'ঠিক আছে, দেখা যাবে। যাও তুমি এখন নীচে যাও। টেক সাম রেস্ট।'

রাজ্য জয় করার ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়েছিল হিরু। ওর পিছু-পিছু লঞ্চের মাঝিমাল্লার ঝাঁকটাও নেমে গেল নীচে।

পূর্ণদা জোসির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই সব মন্তরটন্তরে সত্যি-সত্যি কী হয় জানি

না, তবে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেল—এখানকার লোকজন গুনিন, ফকিরদের খুব মানে। মানে যখন, বাঘের মুখে খিল পড়ার ব্যাপারটাও বিশ্বাস করে। বিশ্বাস করে ভালই করে। মনে জোর পায়। এখানকার লোকজন খুব গরিব। কাঠ কাটতে, গোলপাতা আনতে, মোম-মধু আনতে জঙ্গলে যেতেই হয়। মন্তর ওদের একটা মরাল বুস্টিংয়ের কাজ করে। সেটা তো কম নয়।'

ডেভিস গ্লাসে আর একটা চুমুক মেরে বলল, 'আমি কিন্তু মন্ত্রাতন্ত্রায় বিশ্বাস করি। কোনও সাধু বা ফাকির যদি ঠিক ভাবে মন্ত্রা পড়তে পারে, তাতে কাজ হয়।'

একদিকে ঝকঝকে যুক্তিবুদ্ধি, অন্য দিকে অন্ধ বিশ্বাস। দু দিকের দুটি প্রান্তে দাঁড়িয়ে মৃদু গলায় তর্ক জুড়ল পূর্ণদা আর ডেভিস। উৎসাহী শ্রোতা জোসি। মাঝে মাঝে ও-ও কিছু মন্তব্য করছিল।

'আসছি' বলে উঠে পড়েছিল কৌশিক। লম্বা পায়ে লঞ্চের পেছন দিকে এসে মোবাইলে দিনের তিন নম্বর ফোনটা সারল। কথা শেষ করতে মিনিট-চারেকের বেশি লাগেনি। তারপরেই ও আবার ফিরে গিয়েছিল জোসিদের আড্ডায়।

॥ ২৩ ॥

সকাল আটটা বাজে। পূর্ণদা উঠে পড়েছেন ভোরবেলায়। তার পর লঞ্চের ছাতে ভ্রমণ সারতে সারতে সুন্দরবনের অপরূপ সব প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখছেন দু-চোখ ভরে। যত দেখেছেন, ততই মনে হয়েছে, এ-দেখার কোনও শেষ নেই। প্রকৃতি মানুষের শরীর-মন শুধু স্নিগ্ধই করে না, মনকে উদারও করে—খুব খাঁটি কথা। কত গভীর সব কথা কী সহজে ওর মনের মধ্যে ভেসে উঠেছিল।

মনে মনে উনি আরও একবার কৃতজ্ঞ বোধ করলেন জোসি আর ডেভিসের কাছে। ওরা না থাকলে এমন একটা ভ্রমণের সুযোগ কখনওই আসত না। ঘরের কাছেই প্রকৃতির কী আশ্চর্য ভাণ্ডার! সুন্দরবন জঙ্গলে ঠাসা। নদী সামান্য আঁকাবাঁকা হয়ে বয়ে চলেছে নিজের খেয়ালে। সামনেই একটা খাল ঢুকে গেছে বনের মধ্যে। এক-আধটা নয়, এই রকম অসংখ্য খাল আছে এখানে।

সাড়ে-তিনশো বছর আগেকার বিখ্যাত পর্যটক বার্নিয়েরের বইয়ের পাতাগুলো ভেসে উঠছিল ওঁর চোখের সামনে। সাত সমুদ্র তেরো নদী চষে বেড়ানো সাহেব। তখনকার দিনে পথঘাট ছিল দুর্গম। যান বলতে জাহাজ আর নৌকো। সাহেব কিন্তু পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক ভূখণ্ডকে বেছে নিতে ভুল করেননি। তবে একটা বিষয়ে বিচিত্র এক সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেছিলেন।

অসংখ্য খাল, অপরূপ বনভূমি, অগুনতি দ্বীপ সুন্দরবনে। সাহেব এই সব দেখে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন যে, এখানকার লোকজন অসম্ভব পরিশ্রমী। এই যে এত খাল—সে সব তাদেরই কাটা। কিন্তু আরও কিছুদিন এখানে থাকলে নিজের ভুলটা উনি নির্ঘাত শুধরে নিতেন। মানুষ নয়, সব খাল প্রকৃতিরই তৈরি।

পূর্ণদা ঠিক করলেন, পরে এই নিয়ে জোসির সঙ্গে একটু কথা বলবেন। এমনও তো

হতে পারে, সাহেব ওঁর ভ্রমণ-কাহিনীতে পরে কোনও সংশোধনী এনেছিলেন। না আনলেও কিছু এসে যায় না। একশোটা আশ্চর্য পর্যবেক্ষণের মধ্যে একটা-দুটো সামান্য এদিক-ওদিক হতেই পারে।

সকালে একবার উঠেছিল কৌশিক, কিন্তু চা খেয়ে শুয়ে পড়েছে আবার। রাত্তিরে টানা ঘুম হয়নি। কিছুক্ষণ ঘুমিয়েছে, তারপর উঠে উঠে নজরদারি করে এসেছে। নৌকো কাল আর জলে নামানো হয়নি।

সাড়ে-আটটার সময় পূর্ণদা তাড়া লাগালেন কৌশিককে। 'উঠে পড়ো, ঠিক নটায় ব্রেকফাস্ট, তারপরেই শুনলাম ডাঙায় নেমে ভ্রমণ হবে কিছুটা।'

শেষ কথাটা শুনে তড়াক করে উঠে পড়েছিল গোয়েন্দা। 'ডাঙায় নেমে ভ্রমণ! কোথায়?'

'পারভেজ বলছিল। সাহেব সারেংয়ের সঙ্গে কথা বলেছে। আর একটা রিজার্ভ ফরেস্ট সুধন্যখালিতে নামা হবে ব্রেকফাস্টের পরে। ভাল, মাঝেমধ্যে পায়ের তলায় একটু মাটি পাওয়া দরকার। আমরা তো এখন জলের প্রাণী হয়ে গিয়েছি।'

ব্রেকফাস্টের টেবিলে সুধন্যখালির কথা উঠল আবার। সজনেখালির মতো এটিও একটি সংরক্ষিত এলাকা। জোসি বলল, 'পূর্ণদা, এখানে বাঘ দেখা যাবে?'

পূর্ণদা হাসতে হাসতে জবাব দিলেন, 'কপাল ভাল হলে যাবে। তোমরা কত দূর দেশ থেকে এসেছ—বাঘদের তো এটা বিবেচনা করা উচিত।'

লঞ্চ সুধন্যখালির ঘাটে নোঙর করতেই ব্যস্তত! পড়ে গিয়েছিল সবার মধ্যে। সবাই তৈরি। জোসির হাতে ক্যামেরা, ডেভিসের গলায় ঝোলানো দূরবিন। মাঝিমাল্লা লম্বা তক্তাটা নামিয়ে দিল ছোট্ট জেটির মুখে।

গণেশ ওই তক্তার ওপর দিয়ে তরতর করে নেমে গেল জেটিতে। ওর হাতে লম্বা একটা বাঁশ। জেটিতে নেমে বাঁশের অপর প্রান্ত বাড়িয়ে দিল লঞ্চে। সেটা ধরল সারেং। সরু তক্তা-সেতুর রেলিং হয়ে গেল বাঁশ। সেই রেলিং ধরে এক-এক করে সবাই নেমে পড়ল জেটিতে।

পারভেজও নেমেছিল। ও জেটির কাছে লাগানো ছোট্ট একটা নৌকোয় উঠে পড়েছিল লাফ মেরে। পূর্ণদা জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি আবার কোথায় চললে?'

হাসিমুখে জবাব দিল পারভেজ। 'জেলেদের কাছে যাচ্ছি, দেখি কী মাছ পাই।'

চারদিকে একটা ঝকঝকে সকাল। সব কিছুই তারিফ করার দৃষ্টি ছিল পূর্ণদা আর জোসির চোখে। সামনেই এত কিছু দেখার, কিন্তু ডেভিস শুরু থেকেই দূরের দৃশ্য দেখার জন্যে দূরবিন এঁটেছিল চোখে।

সজনেখালির কায়দায় সুধন্যখালিরও মস্ত একটা এলাকা দু-তিন মানুষ উঁচু শক্ত লোহার জাল দিয়ে ঘেরা। যাদের খাস তালুক এটা, পর্যটকদের তাদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যেই এই ব্যবস্থা। জোসি, পূর্ণদা আর কৌশিকের চোখ ঘুরছিল চারদিকে। কালো ডোরাকাটা হলুদ শরীরের মস্ত কোনও প্রাণী রাজকীয় ভঙ্গিতে একবার দেখা দিলেই তো পারে!

চারদিকের গাছে অসংখ্য লালমুখো বাঁদর। গাছের পাতা সরিয়ে, নদীর মাটি খুঁড়ে কী যেন খেয়েই যাচ্ছে। উৎসাহী দর্শকদের দিকে একবারের জন্যে কৃপা করেও তাকাচ্ছিল না। জোসি এর মধ্যেই পটাপট কয়েকটা ছবি তুলে ফেলেছে।

তারের জাল-ঘেরা অভয়ারণ্যের মধ্যে দলটা কিছুটা এগোতেই রং-বেরংয়ের টুকরো-টুকরো কাপড় দিয়ে বানানো আলখাল্লা-পরা গুনিন হিরু মণ্ডল এসে হাজির হল। ওকে দেখেই একটু আঁতকে ওঠার ভান করে পূর্ণদা বললেন, 'বাহ্! তুমি এসেছ, তা হলে আমাদের আর বাঘ দেখার কোনও আশা নেই।'

হিরু পূর্ণদার রসিকতাটা ধরতে না পেরে গম্ভীর মুখে জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

'কেন আবার, রাত্তিরে মন্তর পড়ে বাঘদের মুখে খিল এঁটে দিয়েছিলে, ওরা তো এখন দূর থেকে তোমাকে দেখেই পালাবে।' হিরু মুখ আরও গম্ভীর করে সায় দিয়ে বলল, 'এইটা আপনি ঠিক বলেছেন। ওরা আমাকে খুব ডরায়।'

'তা হলে আমাদের বাঘ দেখার কী হবে! তুমি মন্তব পড়ে বাঘদের একবার কাছে ডাকতে পারো না?'

জিভ কেটে জবাব দিল হিরু। 'এইটা আমাদের করতে নেই। আমরা বনবিবিকে নিবেদন করে বলি : বাঘকে দূরে সরায়ে রাখেন। বাঘের মুখ বাঁধেন। বনবিবি আমাদের নিবেদনে সাড়া দেন। বাঘরা আমারে চেনে। আমাবে ডরায়। আমার তিরিসীমানায় তাই আসে না। তবে হ্যাঁ, হঠাৎ সামনাসামনি পড়ে গেলে বেড়ালের মতো পায়ে মুখ ঘষে, গায়ে গা ঘষে।'

বড়-বড় চোখ করে হিরুর সব কথা শুনছিল জোসি। ও থামতেই একটু রাগ-রাগ গলায় বলল, 'দেন ইউ গো ব্যাক টু দ্য লঞ্চ।'

হিরু কিছুই বুঝতে পারল না, অবাক চোখে জিজ্ঞেস করল, 'কী বলছেন মেমছাহেব?'

পূর্ণদা হাসি গোপন করে বললেন, 'তুমি তো বাঘদের শত্রু। তুমি থাকলে বাঘ আমাদের দেখা দেবে না। তাই মেমসাহেব বলছেন, তুমি এখন লঞ্চে ফিরে যাও। ফিরে গেলে আমরা বাঘ দেখলেও দেখতে পারি।'

সম্পূর্ণ অজ্ঞলোকের কথা শুনলে সহানুভূতিশীল পণ্ডিতের মুখে যেমন হাসি ফুটে ওঠে, ঠিক তেমনি হাসি ফুটেছিল গুনিনের মুখে। হিরু মুখের দাড়িগোঁফের জঙ্গলে আঙুল চালাতে চালাতে বলল, 'তিন মাইলের মধ্যে যত বাঘ আছে, সবাই আমার কথা জেনে গেছে। সে আমি ডাঙায় থাকি আর নৌকোয় থাকি—একই কথা। তবে বনবিবির অপার মহিমা, তিনি তো জানেন আপনারা কত দূর দেশ থেকে তার থানে এসেছেন। তিনি আপনাদের কৃপা করে বাঘ একবার দেখালেও দেখাতে পারেন। মায়ের নাম করতে করতে মনে মনে মনের ইচ্ছে জানাতে জানাতে এট্টুস ধৈয্য ধরে ঘোরেন না। তবে হাঁ, মায়ের ডাকের মধ্যে যেন ফাঁকি না থাকে।'

পূর্ণদা আর কৌশিক বুঝল, হিরু মণ্ডলের এ আর এক বন্ধন। এর নাম 'জোসি-বন্ধন'ও বলা যায়।

হিরুর সব কথা বুঝতে পারেনি জোসি। পুরোটা সহজ ভাষায় ওকে বুঝিয়ে দিলেন পূর্ণদা।

শুনে আশ্বস্ত হল জোসি। আর জোসির মুখের ভাষা পড়ে নিতে দাঁত বার করে স্বস্তির হাসি হাসল গুনিন।

ঘেরা জায়গায় একটা পায়ে-চলা পথ গোল হয়ে ঘুরে গেছে। তারের জালের ওপাশে ঠাসা জঙ্গল। এপাশে একটা মিষ্টি জলের পুকুর। বনের জন্তুরা জল খেতে আসে ওখানে। তবে বাঘ যখন আসে তখন নির্ঘাত ধারেকাছে ছায়া পড়ে না আর কোনও প্রাণীর।

হাঁটতে হাঁটতে চারপাশে চোখ ঘোরানোর ফাঁকে ফাঁকে গল্প চলছিল। বেশ হাসিখুশি ছিলেন পূর্ণদা। এই ক'দিনে ওঁর বয়েস বোধহয় বছর-দশেক কমে গিয়েছে। হিরুর কথা শোনার জন্যেই পূর্ণদা প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা হিরু, কাল খিলন মন্তর পড়ার পরে সারা শরীরে ব্যথা হয়ে গিয়েছিল তোমার। সেই ব্যথা কি কমেছে এখন?'

হিরু উত্তর দেওয়ার আগে গণেশ স্থির বিশ্বাসীর গলায় বলল, 'ওই ব্যথা-বেদনা তো তেরাত্তির না পোহালে কমবে না।'

পূর্ণদা আর কৌশিক দুজনেই নতুন করে বুঝতে পারল—গুনিনের ওপর এই এলাকার মানুষজনের কী অগাধ আস্থা।

হিরু বলল, 'শরীরের বেদনা একটু অবিশ্যি মরেছে।'

মজা করার ঝোঁক পেয়ে বসেছিল পূর্ণদাকে। চোখমুখে একটু গাম্ভীর্য ফুটিয়ে তুলে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি তো ব্যাঘ্র-বন্ধনের মন্ত্র জানো হিরু, চোরাশিকারি-বন্ধনের মন্ত্র জানো না?'

প্রশ্নের সহজ-সরল উত্তর দিল হিরু, 'বনের ব্যাপার বনবিবির, এটা তো বাইরের ব্যাপার।'

কৌশিক হাসতে যাচ্ছিল, কিন্তু দূরবিন থেকে চোখ-ফেরানো ডেভিসের বিরক্ত মুখ দেখে ওর আর হাসা হল না। পূর্ণদার রসিকতাটা একেবারেই ভাল লাগেনি সাহেবের। কিন্তু কেন?

পূর্ণদা আর জোসি গল্প জুড়ে দিয়েছিল। গল্প করছিল গণেশ আর হিরু। ডেভিস মাঝেমধ্যে দূরবিন আঁটছিল চোখে। পুরো দলটাই তারের জালের পাশের পথটা ধরে হাঁটছিল। যে ভাবে থমকে থমকে ওরা হাঁটছে, তাতে মনে হয়—গোল পথ ঘুরে আগের জায়গায় ফিরে আসতে ওদের বেশ কিছুটা সময় লেগে যাবে। এটা ভাবার পরেই কৌশিক একটু পিছিয়ে পড়তে শুরু করেছিল।

পুরো দলটা সামনের বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হতেই উলটো পথ ধরে জোর পায়ে হাঁটা শুরু করে দিয়েছিল কৌশিক। লঞ্চ থেকে নামানো তক্তার দুটো ধারই দড়ি দিয়ে বাঁধা। এই তক্তার ওপর দিয়ে দ্রুত পায়ে লঞ্চে উঠে পড়েছিল ও।

লঞ্চের ওপরে কেউ নেই। সারেংয়ের ঘরের পাশের সিঁড়ি ধারে লঞ্চের একতলায় নেমে গিয়েছিল গোয়েন্দা। এদিকের কেবিন জোসির, ওদিকেরটা ডেভিসের। মধ্যিখানে খাবার-টেবিল। পার্টিশনের ওপাশে রান্নাঘর। টুকরো-টুকরো হাসি আর কথা ভেসে আসছিল রান্নাঘর থেকে। গোয়েন্দা বুঝতে পারল, ওদিকে জমাটি একটা আড্ডা বসেছে। এই আড্ডা ছেড়ে কেউ আর বোধহয় চট করে উঠবে না।

পরিষ্কার একটা ছক কষেই লঞ্চে এখন ফিরে এসেছে গোয়েন্দা। একটা মুহূর্তও নষ্ট করা ঠিক হবে না। নিঃশব্দে ও ডেভিসের ঘরে ঢুকে পড়ল। বিছানার ওপর দিকে কাচ বসানো সরু একফালি জানলা। ওখান দিয়ে আলো আসছিল ঘরে।

চারদিকে দ্রুত চোখ ঘোরাচ্ছিল গোয়েন্দা। কোণের দিকে টেবিলের ওপরে ছোট্ট একটা সাদা রঙের স্যুটকেস। পারভেজ তখন বোধহয় এই স্যুটকেসটার কথাই বলছিল। ডেভিস এটাই নাকি বারবার খোলে আর তালা লাগায়।

কেবিনে ঢুকেই স্লাইডিং ডোর টেনে দিয়েছিল গোয়েন্দা। সাদা স্যুটকেসটা বেশ

হালকা। একটুও শব্দ না করে ওটা তুলে এনে বিছানার ওপর রাখল। কিন্তু স্যুটকেসে তালা লাগানো। ঠিক এমনটাই ভেবে এসেছিল গোয়েন্দা। সুতবাং পকেট থেকে একটা মাস্টার-কি বার করল চটপট। অনেক জবরদস্ত তালাও এই চাবিটাব কাছে পোষ মানে। একটুখানি চেষ্টা করতেই খুট্ করে খুলে গেল তালা। ভেতরের একগাদা কাগজপত্র, ডেভিসের পাসপোর্ট আব বেশ কয়েকটা নক্‌শা। বিছানার ওপর পাসপোর্ট, কাগজ আর নক্‌শা একটার পর একটা বিছিয়ে রেখে গভীর মনোযোগের সঙ্গে ওগুলো পরীক্ষা করতে লাগল গোয়েন্দা। পকেট থেকে ছোট্ট একটা নোটবুক বার করে কিছু-কিছু টুকেও নিচ্ছিল।

তারপর কাগজগুলো আগের মতোই ভাঁজ করে স্যুটকেসে ঢুকিয়ে ঠিক আগের জায়গাতেই রেখে দিল ওটা। এবার যত তাড়তাড়ি সম্ভব সরে পড়তে হবে এখান থেকে।

কেবিনের দরজায় কান পাতল গোয়েন্দা। না, ধাবেকাছে কোথাও কোনও শব্দ শোনা যাচ্ছে না। আস্তে আস্তে বাইরে বেরিয়ে এসেই দরজা টেনে দিয়েছিল ও। তারপর দ্রুত অথচ নিঃশব্দ পায়ে সিঁড়ি ভেঙে লঞ্চের ওপরে উঠে এসেছিল। কেউ ছিল না ওখানে। লঞ্চের সবাই বোধহয় রান্নাঘরের আড্ডায় ভিড়ে গেছে। তক্তা-সেতুর ওপরে লম্বা লম্বা পা ফেলে জেটিতে নেমে এসেছিল ও।

গোয়েন্দা তারের জাল-ঘেরা মেঠো পথে পৌঁছবার একটু পরেই সুধন্যখালি পরিক্রমা শেষ হয়েছিল জোসিদের। ডেভিস ছাড়া বাকি চারজন আগের মতোই মেতে ছিল গল্পে। কৌশিক কেন ওদের সঙ্গে যায়নি, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলল না কেউ। এমনও হতে পারে— ওর অনুপস্থিতি কেউ আর আলাদা করে নজরই করেনি।

বাঘ দেখা যায়নি, কিন্তু তারের বেড়ার পাশের ভেজা মাটিতে বাঘের পায়ের ছাপ দেখা গেল পরিষ্কার। স্থানীয় ভাষায় পাগমার্ককে বলে 'খোঁচ'। গণেশ ওই খোঁচ পূর্ণদা আর জোসিকে দেখাবার পরে ওরা দুজনেই বেশ উত্তেজিত।

হিরু তারের জালের ফাঁক দিয়ে খোঁচটা পরীক্ষা করে জানাল—টাটকা ছাপ, বাঘ কাল শেষরাত্তিরে এখানে ছিল। গভীর ছাপ দুটো বাঘের সামনের পায়ের, তুলনায় হালকা ছাপ দুটো পেছনের পায়ের।

গণেশ চোখ বেশ বড়-বড় করে বলল, বড় বাঘ তার থাবায় সতেরোটা হাতির বল ধরে। শিকার, তা সে যত বড়ই হোক না কেন, বাঘের একটা থাবাতেই কাত। তারপর সেই শিকারে দাঁত ছোঁয়ায় বাঘ।'

পূর্ণদা দু দিকে মাথা নাড়াতে নাড়াতে বলল, 'না হে গণেশ, তুমি বোধহয় ঠিক বললে না। আমি মস্ত বড় এক শিকারির লেখায় পড়েছি—বাঘ সব সময় শিকার ধরে মুখ দিয়ে। ওই শিকারিই লিখেছেন, লোকের ধারণা, থাবা মেরে শিকারের ঘাড় ভাঙে বাঘ—এটা ঠিক নয়।'

জোসির চোখেমুখে ছেলেমানুষের মতো বিস্ময়। 'কোন্ হান্টার পূর্ণদা?'

"মস্ত বড় হান্টার। অল টাইম গ্রেটও বলা যেতে পারে। তুমি ওর নাম শুনেছ নিশ্চয়ই—জিম করবেট। এই কথাটা ওঁর 'ম্যানইটারস অব কুমায়ুন'-এ আছে। বোধহয় 'দি চউঘর টাইগার্স' চ্যাপটারেই। তুমি জানো তো জিম করবেটের কথা?"

মাথা নেড়ে সায় দিল জোসি, 'নাম শুনেছি, কিন্তু ওই হান্টারের কোনও বই আমার পড়া হয়ে ওঠেনি।'

ঝকঝক করছিল পূর্ণদার চোখমুখ। 'দেশে ফিরে গিয়ে পড়ে নিও। ফ্রান্সে পাবে কি না জানি না, তবে ইংল্যান্ডে পাবেই। সাহেব তো ব্রিটিশ। আজ থেকে সত্তর-আশি বছর আগে ইন্ডিয়ায়, তখন এখানে ব্রিটিশরাই রুলার, অনেক বাঘ শিকার করেছেন। তবে জিম করবেট নিছক একজন শিকারি ছিলেন না, অ্যানিম্যাল ওয়ার্ল্ড সম্পর্কে ওর অবজার্ভেশন দারুণ!'

শিকারের কথা শুনে ডেভিসও এগিয়ে এসেছিল। এসেই ধারালো ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, 'বাঘের সম্পর্কে আর কী-কী মিসকনসেপশনের কথা লিখেছে করবেট?'

পূর্ণদা হেসে বললেন, 'অনেক ভুল ধারণার কথাই উনি লিখেছেন। তবে সেগুলো পাঁচজনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে বলে মনে হয় না। এখনও অনেকে আগের ভুলগুলোই করে বসে। এই যেমন একটু আগেই গণেশ একটা কবল।'

'আপনি করবেট থেকে কিছু বলুন না এই ব্যাপারে—।'

ডেভিসের প্রশ্নের জবাবে আর একবার হাসলেন পূর্ণদা। 'আমি তো শিকারি নই। সব আমার মনে থাকবে কী করে?'

'একটু চেষ্টা করুন না—।'

টাইগার প্রজেক্টের কোর-এরিয়া সুধন্যখালির তারের জাল-ঘেরা এলাকায় বাঘের স্বভাব-চরিত্রের গোপন কথা জানার জন্যে সবাই কেমন যেন ঘিরে ধরেছিল পূর্ণ চ্যাটার্জিকে। পূর্ণদা বললেন, 'হ্যাঁ, আর একটা ভুল ধাবণার কথা মনে পড়েছে। করবেট লিখেছেন, লোকের ধারণা—বাঘ মানুষ মারলে সেই মানুষের মাথা, হাত আর পা খায় না। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। যদি বাধা না পড়ে, বাঘ মানুষের সব কিছুই খায়—কিচ্ছু বাদ দেয় না। করবেট একবার দেখেছিলেন, একটা বাঘ সব শেষে রক্তেভেজা জামাকাপড়ও খেয়ে ফেলেছিল।'

আঁতকে উঠে জোসি বলেছিল, 'মাই গড! আ রিয়েল ব্লাডথার্স্টি বিস্ট।'

পূর্ণদা সঙ্গে সঙ্গে দু দিকে হাত নেড়ে বললেন, "করবেট লিখেছেন, এটাও একটা ভুল ধারণা। বাঘের কথা বলতে গেলে অনেকেই 'ক্রুয়েল', 'ব্লাডথার্স্টি'—এই সব বলে থাকে। এগুলো ঠিক নয়। শিকারি তাঁর অথার'স নোটে লিখেছেন—স্বভাবের দিক থেকে বাঘ একেবারেই মানুষখেকো নয়। বাধ্য হলে ম্যানইটাব হয়। প্রতি দশটা মানুষখেকোর ন'টাই হচ্ছে আহত বাঘ। শিকার ধরার স্বাভাবিক ক্ষমতা নষ্ট হলে ম্যানইটার হয়। ওই দশটাব একটা আবার মানুষখেকো হয় বুড়ো হওয়ার জন্যে। এর কারণও একই। বুড়ো হওয়ার জন্যে প্রচণ্ড জোরে ছুটে গিয়ে অন্য শিকার আর ধবতে পারে না।"

ডেভিসের চোয়াল একটু শক্ত হয়ে উঠেছিল। জিজ্ঞাসাবাদ চালাবার ধাঁচে প্রশ্ন করল, 'ম্যানইটাররা আহত হয় কী ভাবে?'

'নানা কারণে হয়। শিকারির গুলি বাঘকে মারতে পারে না সব সময়, কিন্তু আহত করে দেয় বিচ্ছিরি ভাবে। ওই গুলি-খাওয়া বাঘ তখন স্বাভাবিক ক্ষমতা হারিয়ে মানুষখেকো হতে বাধ্য হয়। কেননা, অন্য শিকার ধরার বদলে মানুষ ধরে খাওয়াটা সোজা। বাঘ আহত হওয়ার আর একটা বড় কারণ শজারুর কাঁটা। বাঘ এমনিতে শজারু ধরতে যায় না। কিন্তু

খিদের জ্বালায় মাঝেমধ্যে ভুল করে ফেলে। আক্রান্ত হওয়ার উপক্রম হলেই শজারু দেহের কাঁটাগুলো খাড়া করে দেয়। ভয়ংকর এই কাঁটাগুলো বেশ লম্বা আর অসম্ভব মজবুত। ওই কাঁটা বাঘের মুখে থাবায় গেঁথে যায়। কাঁটা বার করার কোনও উপায় থাকে না। বাঘ তখন আস্তে আস্তে অসুস্থ হয়ে পড়ে। কোনও কারণে দাঁতটা ভেঙে গেলেও বাঘ শিকারের শর্টকাট রাস্তা ধরে। এই রকম গোটাকয়েক আহত বাঘ ছাড়া বাকি বাঘরা ম্যানইটার নয়।'

ডেভিসের প্রশ্নের ধরনটা এবার বেশ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল। 'করবেট মাস্ট বি রাইট। কিন্তু ও নিজে অত বাঘ মেরেছিল কেন?'

'এমনি-এমনি মারেননি। বাঘ ম্যানইটার ডিক্লেয়ার্ড হওয়ার পরে মেরেছিলেন।'

'অত ম্যানইটার! ও তো অনেক বাঘ মেরেছিল।'

'কেন মারবেন না? আপনি মনে হয় ব্যাপারটা আজকের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন। এখন ভারতে বাঘের সংখ্যা কত হবে? বড় জোর সাত-আট হাজার। আজ থেকে সত্তর-আশি বছর আগে বাঘের সংখ্যা ছিল লাখখানেক। জঙ্গল এখনকার তুলনায় বহু গুণ বড় ছিল। ট্রান্সপোর্টের সুবিধে তো তেমন ছিল না, লোকজন বনজঙ্গলের ভেতর দিয়ে যাতায়াত করত। গ্রামের চারপাশেও ছিল ঘন জঙ্গল। বাঘ তাই গ্রামের মধ্যে হানা দিত প্রায়ই। গাভমেন্ট তখন হান্টার অ্যাপয়েন্ট করত ম্যানইটার মারার জন্যে। দোজ ওয়্যার দ্য ডেজ। করবেট নৈনিতালে গিয়েছিলেন একটা মানুষখেকো মারার জন্যে। বিওয়ার্ডস অয়্যার অফার্ড। কিন্তু কোনও শিকারিই বাঘটাকে মারতে পারেনি। না-না, বাঘ নয়—বাঘিনী। নেপাল থেকে তাড়া খেয়ে ঢুকেছিল কুমায়ুনে। নেপালে ওই বাঘিনীটা দুশো মানুষ মেরেছিল। কুমায়ুনে ছিল চার বছর। ওই চার বছরে মানুষ মেরেছিল শ-আড়াই। একটা মাত্র বাঘিনীর হাতে মারা পড়েছিল সাড়ে-চারশো মানুষ। ভাবা যায়! অনেক কষ্ট করে ওই বাঘিনীটাকে মারেন করবেট। শিকারের পরে দেখেন, বাঘিনীর ওপর আর নীচের ক্যানাইন টিথ ভাঙা। এক শিকারির গুলিতে দাঁত ভেঙে গিয়েছিল বাঘিনীর। আহত বাঘিনী তখন শিকার ধরার স্বাভাবিক ক্ষমতা হারিয়ে ম্যানইটার হয়ে গিয়েছিল।'

যে বাঘিনী সাড়ে-চারশো মানুষ মেরেছে, তার ওপরে রাগ হওয়া স্বাভাবিক। কেমন যেন রাগ-রাগ মুখ করেই জোসি বলল, 'কিন্তু টাইগ্রেস অত মানুষ মারল কেন? ইট হ্যাজ বিন ডেলিবারেটলি ক্রুয়েল।'

আবার দ্রুত ভঙ্গিতে দুদিকে মাথা নাড়লেন পূর্ণদা। 'না-না, এটাও ঠিক নয়। করবেট বছর-তিরিশেক বাঘ শিকার করেছেন, কিন্তু বেশ জোর দিয়েই লিখেছেন—বাঘ প্রয়োজনের তুলনায় কখনওই বেশি শিকার করে না। শিকারিরা খোঁচাখুঁচি করলে অবশ্য আলাদা কথা। আদারওয়াইজ দে নেভার কিল ইন একসেস অব দেয়ার রিকয়ারমেন্টস।'

ডেভিসের চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল আবার। 'বাঘের রিকয়ারমেন্ট ঠিক কতটা? একটা বাঘ একটা মিল-এ কত মাংস খায়?'

'করবেট তারও একটা হিসেব দিয়েছেন। একটু অন্য ভাবে অবশ্য। লিখেছেন, একটা প্রাপ্তবয়স্ক বাঘ একটা বড়সড় সম্বর দু দিনে খায়। একটা আস্ত মোষ তিন দিনেই সাবাড় করে। আমাদের চিড়িয়াখানায় এখন শুনেছি অন্য হিসেব। বাঘপিছু মাংসের বরাদ্দ দিনে দশ

কেজি। সেটা যথেষ্ট কি না চিড়িয়াখানার লোকজনেই বলতে পারবে। কিন্তু বনের বাঘকে বিস্তর ছোটাছুটি করতে হয়। তার ফলে তাদের খিদেটা বেশি।'

কৌশিকের মনে হয়েছিল, ডেভিস যেন প্রশ্ন কবে করে কিছু টিপ্‌স জেনে নিচ্ছে। সেই ভঙ্গিতেই আবার ও প্রশ্ন করল, 'ম্যানইটাররা খুব ক্লেভার। মানুষকে চেজ করে অনেকক্ষণ ধরে, তাই না?'

পূর্ণদা হেসে বললেন, 'মানুষ বুদ্ধিমান প্রাণী, সুতরাং তাকে শিকার করার জন্যে বাঘকে চালাক হতেই হবে। তবে করবেট লিখেছেন, বাঘেরা মস্ত একটা ভুল করে থাকে। ওদের ধারণা—অন্যান্য জীবজন্তুর মতো মানুষের ঘ্রাণশক্তিও খুব প্রখর। বাতাসে বাঘের গন্ধ পেলেই অন্য জন্তুর মতো মানুষও সতর্ক হয়ে যায়। সুতরাং হাওয়া যেদিক থেকে বয়, বাঘ আক্রমণ করে ঠিক তার উলটো দিক থেকে। মানুষের ঘ্রাণশক্তি অন্য প্রাণীদের মতো প্রখর নয়, কিন্তু বাঘ তো সেটা আর জানে না। অন্য শিকার ধরার কায়দায় মানুষের ওপর লাফিয়ে পড়ে হাওয়ার উলটো দিক থেকে এসে।'

ডেভিস কথাগুলো খুব মনোযোগের সঙ্গে শুনে নিজের মনে কথা বলার ভঙ্গিতে বলল, 'এই পয়েন্টটা তো বেশ ইম্পরট্যান্ট!'

গুনিন হিরু মণ্ডল এতক্ষণ একটাও কথা বলেনি, হঠাৎ সব কিছু উড়িয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'সুন্দরবনের বাঘের সঙ্গে অন্য এলাকার বাঘের কোনও মিল নেই। এখানকার বাঘদের রকমসকম একেবারেই আলাদা। সবাই বনবিবির সন্তান। মা বনবিবিই ঠিক করেন—কখন কার কী করা উচিত। আহ্!'

গণেশ ওই আর্তনাদে বিচলিত হয়ে বলল, 'কী হল হিরু? শরীলের বেদ্‌না বেড়েছে।'

একটুখানি কুঁকড়ে গিয়ে হিরু বলল, 'না, তেমন না। এট্টুস। এ মন্তর পড়ার বেদ্‌না। পুরো সারতে আরও দুটো রাত লাগবে।'

জোসি ছটফটে গলায় বলল, 'চলো, আমরা তা হলে লঞ্চে ফিরে যাই। হি নিড্‌স সাম রেস্ট।'

জোসির পিছু-পিছু দলের সবাই লঞ্চের দিকে এগোতে শুরু করে দিয়েছিল।

॥ ২৪ ॥

আজকের লাঞ্চে দুটো স্পেশাল ডিশ ছিল—বাগদা চিংড়ি আর লাল কাঁকড়া। সুধন্যখালিতে বেশ কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করার জন্যে চারজনেরই বোধহয় খিদেটা একটু বেশি ছিল। মাছ আর কাঁকড়ার বাইরে ছিল সেদ্ধ করা সব্জি, রুটি আর ভাত। পূর্ণদা আর কৌশিক ভাতের দিকে, ডেভিস আর জোসির পছন্দ রুটি। বাঁ হাতি ডেভিস কাঁটা আর ছুরি চালিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে চিংড়ি আর কাঁকড়া খেয়ে যাচ্ছিল। পূর্ণদা নিরামিষেরও ভক্ত। বেশ কিছুটা সেদ্ধ সব্জি প্লেটে ঢেলে নিয়ে বললেন, 'সব্জির প্রিপেয়ারেশন এই রকমই হওয়া উচিত। মশলাপাতি নেই, কিন্তু খেতে কি খারাপ লাগছে?'

কৌশিক দুদিকে মাথা নাড়িয়ে উত্তর দিল, 'না।'

সমর্থন পেলে সবারই ভাল লাগে, পূর্ণদাও খুশি হলেন। কিন্তু উনি খেয়াল করেননি যে, উনি ছাড়া আর কেউই সব্জি ছোঁয়নি।

খিদের প্রথম ধাক্কাটা সামলাবার পরে ডেভিস কিছুক্ষণ আগের বলা কথার খেই ধরে প্রশ্ন করল, 'বাঘ তো ভীষণ ইনটেলিজেন্ট অ্যানিম্যাল, কিন্তু পর্কুপাইনকে অ্যাটাক করে তার কুইল্‌স্‌য়ে আহত হয় কেন?'

পূর্ণদা মুখের বাগদা চিংড়িটুকু দ্রুত শেষ করার পরে বললেন, "আরে! এটা তো জিম করবেটেরও প্রশ্ন। লিখেছেন, উনি যে মানুষখেকো বাঘগুলো গুলি করে মেরেছেন তাদের অনেকের মুখেই শজারুর কাঁটা বিঁধেছিল। এক-একটা কাঁটা ছিল লম্বায় প্রায় ন'ইঞ্চি, পেনসিলের মতো মোটা কাঁটা। গুলি-করা বাঘগুলোর মুখ থেকে করবেট প্রায় শ' দুয়েক শজারুর কাঁটা তুলেছেন আর অবাক হয়ে ভেবেছেন—এত বুদ্ধিমান প্রাণী কেন এমন ভুল কবল! খিদের জ্বালায় নির্ঘাত শজারু শিকার করতে গিয়েছিল বাঘ, কিন্তু বাঘের যা গতি শজারুর তো গায়ের কাঁটা খাড়া করার সময় পাওয়ার কথা নয়। করবেট লিখেছেন, লেপার্ডকেও উনি শজারু শিকার করতে দেখেছেন, কিন্তু লেপার্ড বাঘের মতো ভুল করে না।"

'কী করে পর্কুপাইন ধরে লেপার্ড?'

'দে ক্যাচ দেম বাই দ্য হেড। শজারুর তো গায়ে কাঁটা। কাঁটার দিকে যায় না লেপার্ড, ছুটে গিয়ে শজারুর মাথাটাকে ধরে। করবেট লিখেছেন, শজারু শিকারের এই সহজ পথটা বাঘের মতো বুদ্ধিমান প্রাণীর মাথায় খেলে না কেন—এটা তাঁর কাছে চিরকালই বিস্ময় রয়ে গেছে।'

'কোনও উত্তরই বার করতে পারেনি?'

'না। তবে উত্তরের একটা আভাস দিয়েছেন করবেট।'

'কী সেটা?' প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে ডেভিসের দৃষ্টি আবার ধারালো হয়ে উঠেছিল।'

"লেপার্ড অসম্ভব ধূর্ত আর সাবধানী। করবেট এক জায়গায় লিখেছেন—'বহুকাল ধরে জঙ্গলে একটা কথা চালু আছে—চামড়া পুরো ছাড়িয়ে নেওয়ার আগে পর্যন্ত কক্ষনো বিশ্বাস করবে না যে, লেপার্ড সত্যি-সত্যি মারা গেছে।' লেপার্ডরাও ম্যানইটার হয়, কিন্তু বাঘের সঙ্গে ওদের মানুষ মারার পদ্ধতির মস্ত একটা তফাত রয়েছে।"

সামনের প্লেটটাকে একটু সরিয়ে দিয়ে ডেভিস জিজ্ঞেস করল, 'কী রকম?'

পূর্ণদা বেশ গল্প বলার মেজাজে এসে গিয়েছিলেন। বললেন, 'করবেট মস্ত বড় শিকারি। ওঁর এই সব পর্যবেক্ষণ অসাধারণ। আজ পর্যন্ত কোনও শিকারি ওর পর্যবেক্ষণকে ভুল বলেনি। বলেছে বলে আমার অন্তত জানা নেই। করবেট লিখেছেন, বাঘ একবার মানুষখেকো হয়ে গেলে মানুষ সম্পর্কে ওর ভয় চলে যায়। মানুষ দিনের বেলায় বেশি ঘোরাফেরা করে, সুতরাং বাঘ দিনের বেলাটাকেই মানুষ শিকারের ভাল সময় বলে ধরে নেয়। বেশির ভাগ মানুষখেকো তাই দিনের বেলাতেই মানুষ মারে বেশি করে। কিন্তু মানুষখেকো লেপার্ড দিনের বেলায় মানুষ মারার সাহস পায় না। হয় তো কোনও লেপার্ড অসংখ্য মানুষ মেরেছে, কিন্তু পরেব মানুষটাকে সে শিকাব করার জন্যে রাতের অন্ধকারের

অপেক্ষা করবে। রাত্তিরে অনেক সময় গ্রামের বাড়িতে হানা দিয়েও মানুষ ধরে লেপার্ড, কিন্তু দিনের বেলায় মানুষকে ভয় পায় ভীষণ। মানুষখেকো বাঘ আর মানুষখেকো লেপার্ডের মধ্যে এটাই হল সব চাইতে বড় তফাত।'

জোসি চোখ বড়-বড় করে জিজ্ঞেস করল, 'পূর্ণদা, সুন্দরবনে কি লেপার্ড আছে?'

পূর্ণদা হাসতে হাসতে বললেন, 'আছে বলে তো শুনিনি।'

ডেভিসও হাসল, তবে অদ্ভুত একটা বাঁকা হাসি। ওই হাসি ঠোঁটে ঝুলিয়ে রেখেই বলল, 'সুন্দরবনের জঙ্গলে তা হলে তো রাতের বেলায় ঢোকাই সেফার। ম্যান-ইটিং টাইগারের দেখা পাওয়া যাবে না।'

পূর্ণদা খোলামেলা গলায় হেসে উঠে বললেন, 'খুব ভাল বলেছেন, কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? দিনের বেলাতেই বাঘের কোর-এরিয়ায় ঢোকার সাহস পায় না কেউ!'

ডেভিসও হাসল। 'তা ঠিক। কিন্তু করবেটের থিয়োরি শোনার পরে কারও-কারও সাহস তো বেড়ে যেতে পারে।'

হাসতে হাসতে আর এক টুকরো বাগদা চিংড়ি মুখের মধ্যে চালান করে দিলেন পূর্ণদা।

খাওয়ার যে ছন্দটা গল্পের চাপে একটু আগে থেমে গিয়েছিল, সেটা শুরু হল আবার।

জোসি কাঁকড়া খাচ্ছিল খুব ধীরেসুস্থে, ফাঁকে-ফাঁকে দু-এক টুকরো স্যালাড। বাকি তিনজনের নজর বাগদার দিকে। জেলেদের কাছ থেকে বাগদা কিনে আনার জন্য পূর্ণদা একটু আগেই বেশ ঘটা করে ধন্যবাদ জানিয়েছেন পারভেজকে।

সুখাদ্য এবং ভাল খিদে, সুতরাং আজকের লাঞ্চ চারজনেরই বেশ মনের মতো হয়ে উঠেছিল।

ডেভিসের প্লেট পরিষ্কার। আর একটা বাগদা চিংড়ি কাঁটা দিয়ে প্লেটের ওপর তুলে নিল। তার পর ন্যাপকিন দিয়ে ঠোঁটের দুটো কোনা মুছে নিয়ে বলল, 'মিস্টার চ্যাটার্জি, আমাদের ফকির হিরু মান্‌ডল্‌ তখন কিন্তু একটা ইম্পরট্যান্ট কথা বলেছে।'

চোখে প্রশ্ন ফুটিয়ে ডেভিসের দিকে তাকালেন পূর্ণদা।

'বলেছে, সুন্দরবনের টাইগারের সঙ্গে অন্য জায়গার টাইগারকে মেলানো ঠিক হবে না। এখানে বনবিবি আছে, ড্যাক্‌শিন্‌ রায় আছে, আর আছে অনেক ফকির, সাধু আর গুনিন। তান্ত্রামান্ত্রা চলে বলে টাইগারের চলাফেরাও পালটে যায় সুন্দরবনে।'

পূর্ণদা হাসলেন। "জঙ্গল আছে, অথচ তন্ত্রমন্ত্র নেই—এমন ব্যাপার বোধহয় পৃথিবীর কোথাও নেই। এই ব্যাপারে করবেট এক জায়গায় লিখেছেন—কুসংস্কার কমবেশি কোনও মানুষই বোধহয় এড়াতে পারে না. এই যেমন 'তেরো' সংখ্যাটা নিয়ে পৃথিবীতে বহু লোকের সংস্কার আছে। লিখেছেন, শিকারিরা মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কুসংস্কারগ্রস্ত কি না জানেন না, তবে শিকারিদের মধ্যে নানা ধরনের কুসংস্কার থাকে। এ সবের বাইরে যাওয়া তাদের পক্ষে বোধহয় সম্ভব নয়।"

'কী রকম?'

'করবেট লিখেছেন, ওর এক বন্ধু-শিকারি বড় শিকারে গেলে শুনে গুনে ঠিক পাঁচটা

কার্টিজ নিত। একটাও কম বা বেশি নয়। আর এক শিকারি সঙ্গে নিত ঠিক সাতটা। ওদের গভীর বিশ্বাস ছিল, কার্টিজের এই সংখ্যাই ওদের কপাল ফেরাবে।'

জোসি হাত গুটিয়ে গল্প শুনছিল, ওর পূর্ণাদা থামতেই একটু ছেলেমানুষের ঢঙে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, করবেটের নিজের ওই ধরনের কোনও সুপারস্টিশন ছিল না?'

'ছিল। করবেট নিজের কুসংস্কারের কথাও অকপটে লিখেছেন। লিখেছেন—মানুষখেকো বাঘ মারতে গেলেই তাঁর মনে হত, যতই চেষ্টা চালান না কেন, কিছুতেই বাঘ মারতে পারবেন না, যতক্ষণ না—।'

'যতক্ষণ না—।'

'যতক্ষণ না একটা সাপ মারতে পারছেন। বিশ্বাস কবতেন, শিকার শুরুর মুখে সাপ মারলে ওঁব কপাল খুলবে। সাপ মারলেই ধরে নিতেন—এবার মানুষখেকো মারা যাবে।'

'তাই হত কি?'

'ঘটনাচক্রে হত নিশ্চয়ই, না হলে ওর ওই সংস্কারের কথা জানাতেন না।'

পূর্ণদাব কথাটা ডেভিস প্রায় লুফে নিয়ে বলল, 'সুপারস্টিশন বলুন আর যাই বলুন, তার পেছনে তো অনেক দিনের অবজার্ভেশন থাকে। প্রায় তিবিশ বছব ধবে শিকার করেছে কববেট, বাঘ মারার আগে সাপ মারাটা নিশ্চয়ই ক্লিক করেছে। এটাকে কি তারপরে আর সুপারস্টিশন বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়?'

পূর্ণদা হেসে উঠে বললেন, 'আমি তো বলছি না, করবেট নিজেই বলেছেন।'

ডেভিস হাসল না. কেমন যেন আক্রমণ করার ভঙ্গিতে বলল, "আপনাদের মতো লেখাপড়া-জানা মানুষেরা বিশ্বাস করবে না বলেই করবেট, 'সুপারস্টিশন' শব্দটা ব্যবহার করেছে। আই বিলিভ দেয়ার ইজ ট্রুথ ইন ইট। তন্ত্রামন্ত্রা, রিচুয়ালস-এ কাজ হয়। মন্ত্রা দিয়ে বাঘের মুখ বাঁধাও সম্ভব।"

তর্কাতর্কির মধ্যে ঢুকতে চাইলেন না পূর্ণদা। সহজ ভাবে হেসে বললেন, 'মন্ত্র পড়ে বাঘের মখ আটকে দেওয়ার ঘটনা তো দেখিনি এখনও, তবে কেউ যদি দেখায়—আমার বিশ্বাস করতে আপত্তি নেই।?'

জোসি একজন কৌতূহলী ছাত্রীর ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, 'পূর্ণাদা, টাইগার তো ক্যাট ফ্যামিলির। ইন ক্যাপটিভিটি এদের ব্রিড করালেই এদের নাম্বার অনেক বেড়ে যাবে। জু অথরিটি এদিকে নজর দিলেই তো পারে।'

সায় দিয়ে পূর্ণদা বললেন, 'তা বোধহয় পারে। কিন্তু শুনেছি সেটা খুব বেশি করা হয় না খরচের কথা ভেবে। একবার একটা রিপোর্টে পড়েছিলাম, চিড়িয়াখানায় এক-একটা বাঘের পেছনে খরচ হয় বছরে এক থেকে দু লাখ। একটা বড় বাঘকে দিনে দশ কেজি মাংস খেতে দিতে হয়। তার ওপর অন্যান্য খরচ তো আছেই। কেউ-কেউ বলে থাকেন, আমাদের দেশের পক্ষে এই খরচটা বিরাট। পাঞ্জাবের একটা চিড়িখানায় শুনেছি বাঘ-সিংহকে স্টেরিলাইজ করে দেওয়া হয়। জন্মনিরোধের কারণ, বাঘ-সিংহের বাচ্চা মানেই বিরাট এক খরচের ধাক্কা। রিপোর্টটা কত দূর সত্যি জানি না, তবে সত্যি হলে তো ভয়ের কথা। আমার সাধারণ বুদ্ধি বলে, লুপ্তপ্রায় প্রাণীদের বাঁচিয়ে রাখার পথ নয় এটা।'

ডেভিস কেমন যেন তাল ঠুকে বলল, 'কমার্শিয়ালাইজেশন দরকার। শিকারিদের বাঘ শিকার করার অনুমতি দিতে হবে। টেক বিগ ফিজ অ্যান্ড অ্যালাউ দেম টু শ্যুট আ লিমিটেড নাম্বার।'

অবাক হয়ে পূর্ণদা বললেন, 'এ কী কথা বলছেন আপনি! বাঘের সংখ্যা কমতে কমতে এখন ভীষণ কমে গেছে। বাঘ শিকারের অনুমতি দিলে তো বাঘ একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।'

ডেভিস সোজা হয়ে বসলেন। 'না, ইকনোমিক প্রডাক্টস হিসেবে দেখলে সংখ্যা কমবে না। এই যে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ হাঁস-মুর্গি-ভেড়া মারা হচ্ছে, কিন্তু তাদের সংখ্যা কি কমছে? দে আর ব্রেড, সোল্ড অ্যান্ড কিল্‌ড। দে আর ইকনোমিক প্রোডাক্টস।'

একটু গম্ভীর হলেন পূর্ণদা। 'হাঁস-মুর্গি-ভেড়ার সঙ্গে কি বাঘকে মেলানো যায়?. তবে আমি আপনার সঙ্গে একমত। বাঘের ইকনোমিক পোটেনসিয়াল আছে। তার জন্যে অবশ্য অন্য রকম ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। এই যেমন সুন্দরবন, এই সব বনের এলাকা আরও বাড়ানো দরকার। নতুন-নতুন ওয়াইল্ডলাইফ পার্ক তৈরি করতে হবে। ওই সব জায়গায় বেশি ট্যুরিস্ট এলেই অর্থনৈতিক অবস্থা জোরদার হবে।'

ডেভিস কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'কিন্তু যারা বিগ গেম পছন্দ করে তাদের কী হবে? আজকের হান্টারদের তুলনায় করবেটের সময়ের হান্টাররা অনেক বেশি লাকি ছিল।'

কৌশিক খুব মন দিয়ে ডেভিসের কথা শুনছিল। একটু হেসে এবার ও বলল, 'আমার মনে হয় করবেটের যুগে জন্মালে আপনাদের বোধহয় খুব ভাল লাগত।'

ডেভিস হেসে উঠল। 'ওহ্ ইয়েস! খুবই খুশি হতাম আমি!'

'জোসি তুমি কি খুশি হতে তখন জন্মালে?'

পূর্ণদার কথাব উত্তরে জোসি চোখ বড়-বড় করে সোনালি চুল ঝাঁকিয়ে বলল, 'না, তখন জন্মালে তো আমি সুন্দরবনে আসার সময় পূর্ণাদার মতো গাইড পেতাম না।'

জোসির কথায় বাকি তিনজনেই গলা ছেড়ে হেসে উঠেছিল।

গল্পে গল্পে আজকের লাঞ্চ-আওয়ার বেশ লম্বা হয়ে গিয়েছিল। লাঞ্চ শেষ হওয়ার পরে নিজেদের কেবিনে ফিরে এসেছিল কৌশিক আর ওর পূর্ণদা। ঘরে ঢুকেই পূর্ণদা বললেন, 'আজ লোভে পড়ে বেশ কয়েকটা বাগদা খেয়ে ফেলেছি। এতটা খাওয়া বোধহয় ঠিক হয়নি।'

অভয় দেওয়ার গলায় বলে উঠল কৌশিক, 'মাঝেমধ্যে একটু গুরুভোজন করা দরকার। একে টাটকা বাগদা তার ওপর রান্নাটাও আজ জব্বর হয়েছিল, আমিও তো অনেকটা খেয়ে ফেলেছি।'

'তুমি তো খাবেই, তোমার তো এটা খাওয়ার বয়েস।'

"এই ক'দিনে আপনার বয়েস বেশ কয়েক বছর কমে গেছে পূর্ণদা। এখন রোজই আপনি বেশি পরিমাণে খেতে পারেন, কিচ্ছু অসুবিধে হবে না আপনার।"

মৃদু হেসে পূর্ণদা বললেন, 'সুবিধে-অসুবিধের কথা জানি না। তবে বেশি খেলে যা হয় তাই হচ্ছে। দু-চোখ জড়িয়ে আসছে, ছোট্ট একটা ঘুম মারতে পারলে মন্দ হত না।'

'তা ঘুমোন না, অসুবিধে কোথায়! আপনি ঘুমোন, আমি লঞ্চের ছাতে একটু ঘুরি।'

কেবিন থেকে বেরিয়ে ছাতে চলে এসেছিল কৌশিক। আকাশে সেই ঝকঝকে ভাবটা আর নেই। টুকরো-টুকরো মেঘ ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। নদীর জলে আলো আর ছায়ার জাফরি। এই জায়গাটায় নদী বেশ চওড়া। ওপাশে সুন্দরবনের ঠাসা জঙ্গল, এপাশে জনপদের অল্পস্বল্প চিহ্ন। নদীর জলে কচুরিপানার বড়-বড় ঝাঁক। কচুরিপানার ভেলায় বসে ছিল গোটাতিনেক মাছরাঙা। চারদিক আশ্চর্য রকমের শান্ত। জলের ছোট-ছোট ঢেউ ভাঙার মধ্যে আশ্চর্য একটা ছন্দ আছে। ওই ছন্দ থাকার জন্যেই বুঝি ঢেউ ভাঙার শব্দ আলাদা করে আর কানে লাগছিল না কৌশিকের।

লঞ্চ আস্তে আস্তেই যাচ্ছিল। সামনের একটা বাঁক পেরুবার পরেই অনেক পেছনে আর একটা লঞ্চ দেখতে পেল কৌশিক। লঞ্চটাকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে, কিন্তু ও ধরেই নিল—লঞ্চের নাম এম. ভি. দিনমণি। জমাট রহস্যের কুয়াশা কিছুটা বোধহয় সরেছে। কিন্তু আরও কিছুটা সরা দবকার। একটু ছটফটে ভঙ্গিতে কেবিনে ফিবে এসেছিল গোয়েন্দা। গুরুভোজনেব পরে বেশ একটা গাঢ় দিবানিদ্রা শুরু হয়েছিল পূর্ণদার। আস্তে আস্তে কেবিনের দরজাটা টেনে দিল গোযেন্দা, তাব পর কিটব্যাগের ভেতরেব পকেট থেকে একগাদা কাগজপত্র, নোটবই আব কলম নিয়ে পূর্ণদার দিকে পেছন ফিবে খাটে বসল।

একটু ঝুঁকে পড়ে নোটবইয়ের পাতায নিজস্ব সাঙ্কেতিক ভাষায় অনেক কিছু লেখালেখি শুরু কবে দিয়েছিল গোয়েন্দা। এ সব লেখাপত্তর বাইরের লোকের চোখে পডলেও কিছু এসে যায় না। কেউ কিছুই বুঝতে পারবে না। গোয়েন্দার প্রবীণ সহকারী মুখার্জিবাবু কাছাকাছি থাকলে এটুকু শুধু বুঝতে পারতেন যে, বহস্য সমাধানের জটিল এক অঙ্ক নিয়ে বসেছে গোয়েন্দা। সহকারী এটাও জানেন না যে, এই ধরনের লেখালিখি শুরু হওযার পবে দু-চাবটে দিন গোযেন্দার কথাবার্তা একদম কমে যায়। বিচিত্র এক অঙ্ক মেলাবার হিসেবটা শুধু কাগজেকলমে নয়, মাথার মধ্যেই চলতে থাকে সর্বক্ষণ। তার ফলে অনেক সময় ছোটখাটো কথা গোয়েন্দার কানে ঢোকে না। কানে ঢুকলেও উত্তর দেয় না সব কথার।

আজ বিকেল থেকেই কৌশিক একটু চুপচাপ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এখানে ওর অন্যমনস্ক হওয়া আলাদা করে চোখে পড়া কঠিন, বিশেষ করে সন্ধের আড্ডায় বা খাওয়ার টেবিলে। কথা বলার জন্যে ডেভিস আছে, জোসি আছে, আর পূর্ণদা তো একাই একশো। আড্ডায় গুনিন হিরু মণ্ডলের আবির্ভাব হয়েছে বার-চারেক। ও এলে সব আলো ওর দিকেই চলে যায়।

আজ সন্ধের আড্ডায় ডেভিস জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার চ্যাটার্জি, সুন্দরবনে অনেক পুরনো মন্দিরের রুইন্‌স আছে, না?'

'হ্যাঁ, তা আছে। বেশ কিছু ভাঙা মন্দির আছে বনের মধ্যে।' সায় দিয়ে বললেন পূর্ণদা।

'তার মানে সুন্দরবনে কয়েকশো বছর আগে অনেক সাধু, ফকির আর গুনিন ছিল। মন্ত্রাতন্ত্রা চলত খুব। তাই ওরা এত মন্দির বানিয়েছে।'

দুদিকে মাথা নাড়াতে নাড়াতে পূর্ণদা বললেন, 'না-না, সাধুরা মন্দির বানায়নি। মন্দির বানিয়েছিল তখনকার রাজারা। এই যেমন প্রত্যপাদিত্য। প্রতাপাদিত্য একাই তো অনেক মন্দির বানিয়েছেন। এ নিয়ে অনেক গল্প আছে।'

'কী রকম?'

"সিক্সটিন্থ সেঞ্চুরিতে গোটা যশোর রাজ্য নিজের দখলে আনেন প্রতাপাদিত্য। আগ্রা থেকে উনি মস্ত বড় একটা সৈন্যদল নিয়ে এসেছিলেন। সেই দলের সেনাপতি ছিল একজন পাঠান। যমুনা ও ইছামতী যেখানে মিশেছিল সেখানে মস্ত বড় একটা দুর্গ বানানো হয়। পাঠান সেনাপতি সেখান থেকেই নজর রাখত চারদিকে। পাশেই গভীর বন। অন্ধকার রাতে সেই বনের মধ্যে নাকি আগুন জ্বলত। দুর্গের অধিনায়ক এবং আরও অনেকে সেই আগুন দেখেছিল। কথাটা প্রতাপাদিত্যের কানে যায়। রাজার আদেশে সেই এলাকার জঙ্গল কাটা হল। এক জায়গায় ভাঙাচোরা ইট পড়ে ছিল অনেক। সেই সব ইটের নীচে কষ্টিপাথরের তৈরি অপূর্ব এক দেবীমূর্তি পাওয়া যায়। এই দেবীর নাম দেওয়া হয় যশোরেশ্বরী। মায়ের মূর্তি খুব জ্বালাময়ী বলে মূর্তির মাথার ওপরে ছাত রাখা হল না। চারদিকে প্রচারিত হল—প্রতাপাদিত্যের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে দেবী স্বয়ং দেখা দিয়েছেন। তার পরেই নাকি রাজার কপাল ফিরে গিয়েছিল। গোটা সুন্দরবন তখন প্রতাপের দখলে ছিল। প্রতাপের একটা নাম ছিল 'সুন্দরবনের বাঘ'। সুন্দরবনের মধ্যে ওই একটা নয়, অনেক মন্দির তৈরি হয়েছিল। শুনেছি, বনের মধ্যে একটা জায়গায় 'বিরিঞ্চির মন্দির' বলে একটা ইঁটের স্তূপ আছে। এই যে গুনিন হিরু মণ্ডল যেখানে থাকে সেই নেতিধোপানিতে একটা মন্দির আর কয়েকটা বাড়ির ধ্বংসাবশেষ আছে।"

কথাগুলো খুব মনোযোগের সঙ্গে শুনছিল ডেভিস। পূর্ণদা থামতেই জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা মিস্টার চ্যাটার্জি, এটা কি সত্যি যে তখন রাজা আর বড়লোকেরা সোনা, মণিমুক্তো লুকিয়ে রাখত মন্দিরের মধ্যে।'

একটু চিন্তা করে উত্তর দিলেন পূর্ণদা, 'অসম্ভব নয়। তখন তো মন্দিরগুলো খুব প্রোটেকটেড ছিল।'

দুদিকে মাথা নাড়িয়ে ডেভিস বলল, 'শুধু মানুষের প্রোটেকশন নয়, মন্দিরের দেবদেবীও নাকি ওই সব সোনাটোনা প্রোটেক্ট করত।'

একটু থেমে পূর্ণদা বললেন, 'তা জানি না। তবে তখনকার লোকদের মধ্যে এই রকম একটা বিশ্বাস থাকা অস্বাভাবিক নয়। নিরাপত্তার অভাব ছিল তো, লোকজন তাই হয়তো একটু বেশি মাত্রায় কুসংস্কারগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল।'

হঠাৎই কেমন যেন একটু বিরক্ত হয়ে ডেভিস বলে উঠল, 'লোকে যেগুলো ব্যাখ্যা করতে পারে না সেগুলোই সুপারস্টিশন বলে উড়িয়ে দেয়। আমার মনে হয়—এই উড়িয়ে দেওয়াটাও একটা সুপারস্টিশন।'

ডেভিসের কথা বলার অদ্ভুত ভঙ্গি আড্ডার সহজ সুরকে যেন ছিঁড়ে দিয়েছিল। কৌশিকের মনে হচ্ছিল, এক্ষুনি নতুন কোনও একটা প্রসঙ্গে কথা বলে আবহাওয়া পালটানো দরকার। কিন্তু তেমন কোনও কথা ও খুঁজে পেল না কিছুতেই।

আজ ডেভিসের বোধহয় একটু বেশিই ড্রিংক করা হয়ে গিয়েছে। ফর্সা মুখ লাল টুকটুকে হয়ে গিয়েছিল। মদের প্রভাবেই বোধহয় শেষের দিকে একটু বেশি জোর দিয়ে কথা বলছিল ও। আবার কী যেন বলতে যাচ্ছিল ডেভিস, কিন্তু তার আগেই জোসি উঠে পড়ে বলল, 'চলুন পূর্ণদা, বাকি গল্প আমাদের ডাইনিং টেবিলে বসেই হবে।'

এক-এক করে সবাই উঠে পড়ল। পূর্ণদা হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, সাড়ে-আটটা বাজে। এটাই এখন রাতে খেতে বসার সময়।

নীচে নেমে ডেভিস বলল, "ইট'স টেবিবিলি হট। আপনারা বসুন, আমি এক মিনিটের মধ্যে আসছি।"

কথাটা বলেই ও নিজেব কেবিনে ঢুকে গিয়েছিল। ফিরে এল একটু বাদে। পোশাক পালটে ফেলেছে ডেভিস। পবনে স্যান্ডো গেঞ্জি আর ছোট একটা প্যান্ট। ওর জন্যেই টেবিলে অপেক্ষা করছিল সবাই। ও আসার পরেই শুরু হল রাতের খাওয়া।

রাতেব মেনু দুপুরের মতো এলাহি নয। ভাত, চাপাটি, ডাল, স্যালাড আব মিট বল। খেতে খেতে আগের কথার খেই ধবেই গল্প চলছিল। তবে বেশি বকবক করছিল ডেভিসই।

কৌশিক আড়চোখে ডেভিসেব স্বাস্থ্য দেখছিল। চওডা কাঁধ, বডিবিল্ডারের বুক। পেশীবহুল প্রকাণ্ড দুটো হাত। কিন্তু ফুলহাতা শার্ট পরা থাকলে এই স্বাস্থ্যটা তেমন আন্দাজ করা যায় না। একটু চোয়াল-ভাঙা মুখ, মাথায পাতলা চুল, চোখে হাই-পাওয়ারের চশমা। মুখ দেখলে মনে হয় স্কলাব, কিন্তু ওব স্বাস্থ্য সে কথা বলে না।

বাঁ হাতি ডেভিস কাঁটা গেঁথে-গেঁথে স্যালাড খেয়ে যাচ্ছিল। ওর বাঁ হাতের মস্ত বাইসেপের পাশে পাঁচমুখো সাপেব বিশাল এক উল্‌কি। হাত নাড়াব সঙ্গে সঙ্গে কালনাগিনীর পাঁচটা মুখও নড়ছিল। ওদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎই ভীষণ ভাবে চমকে উঠেছিল কৌশিক। ঠিক দেখছে কি না জানার জন্যে চোরা চাউনি দিল বেশ কয়েকবার। হ্যাঁ, ঠিকই দেখছে। ওর দেখাব মধ্যে কোনও ভুল নেই। টেবিলের গল্পগুলো কৌশিকের আব কানেই গেল না তখন। এক সময় খাওয়া আর গল্প শেষ হল। 'শুভ রাত্রি' জানিয়ে ওরা ফিরে এসেছিল নিজেদের ঘরে।

ঘরে ঢুকে পোশাক ছাডছিলেন পূর্ণদা। সেই ফাঁকে গোয়েন্দা লঞ্চের চিমনির পাশে এসে মোবাইলে ধরল বনরক্ষী অতনুকে। অতনু বলল, 'আপনার ফোনের জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। কাল সকাল ছটার সময় একটা প্রাইভেট বোট নিয়ে আপনার লঞ্চে যাচ্ছি। সার্কেল ইন্সপেক্টর খবব পাঠিয়েছেন আমাদের বড় সাহেবের কাছে। খুব জরুরি প্রয়োজন, আপনাকে একবার যেতে হবে শ্রীকৃষ্ণবাবুর কাছে। রাতে কোনও খবর থাকলে জানাবেন। ছাড়ি তা হলে।'

খুব চাপা গলায় গোয়েন্দা জবাব দিয়েছিল, 'ঠিক আছে।'

॥ ২৫ ॥

রাতের অন্ধকারে লঞ্চের ছাতে চিমনির পাশে দাঁড়িয়ে বনরক্ষী অতনুর সঙ্গে মোবাইলে খুব নিচু গলায় দরকারি কথা সেরে নিয়ে কেবিনে ফিরে এসেছিল কৌশিক। পূর্ণদা বাইরের পোশাক ছেড়ে লুঙ্গি আর ফতুয়া পরলেন, তার পর বেশ আয়েশ করে খাটের ওপর বসে বললেন, 'আজ একটু গরমই পড়েছে, কী বলো? অবশ্য নীচের চাইতে ওপরে গরম কম।'

কৌশিক সায় দিয়ে চেয়ারে বসে বলল, 'ওহ্ পূর্ণদা, আপনাকে একটা জরুরি কথা বলতে ভুলেই গেছি।'

'কী কথা?'

'সকালে তো সুধন্যখালিতে নেমেছিলাম আমরা। তা, আমি এক ফাঁকে ফরেস্ট-গার্ডদের অফিসে গিয়েছিলাম—।'

'ও, সেই জন্যেই মাঝে তোমাকে কিছুক্ষণ দেখতে পাইনি! কী কথা হল ওখানে?'

'শ্রীকৃষ্ণদার একটা খবর নেওয়ার জন্যে গিয়েছিলাম। ফোন করলাম ওদের ওখান থেকে।'

'খুব ভাল করেছ। কেমন আছেন এখন তোমাব শ্রীকৃষ্ণদা?'

'ওঁর হঠাৎ একটা নতুন উপসর্গ দেখা দিয়েছে।'

'কী?'

'বলছেন, প্লাস্টার করা পায়ে মাঝেমাঝে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে।'

'ডাক্তার দেখাননি?'

'দেখিয়েছেন, স্থানীয় ডাক্তার। তিনি বলেছেন, এটা নার্ভের প্রবলেম হতে পারে। এখন শ্রীকৃষ্ণদা একজন বড় অর্থোপেডিক সার্জেনকে দেখাতে চান। ডাক্তারের নাম অরুণ পাঁজা। বারাসাতে ওঁব একটা চেম্বার আছে। তা, এই ডাক্তারকে আমি চিনি। উনি কলকাতার একটা বড় নার্সিংহোমের সঙ্গে অ্যাটাচ্‌ড। ডাক্তারকে আমি চিনি শুনেই শ্রীকৃষ্ণদা বললেন—তুমি কি একবার যেতে পারেব আমার সঙ্গে? আমি বললাম—কেন পারব না। আমার হাতে তো এখন কোনও কাজ নেই। শুয়ে-বসে দিন কাটাচ্ছি—।'

ব্যস্ত হয়ে উঠলেন পূর্ণদা। 'অবশ্যই তুমি যাবে। যাওয়া উচিত। কিন্তু কী ভাবে যাবে? হাসনাবাদ তো এখান থেকে অনেক দূরে। তোমাকে কি পৌঁছে দেওয়ার কথা বলব জোসি আর ডেভিসকে?'

'না-না, তার কোনও দরকার নেই। শ্রীকৃষ্ণদা হাসনাবাদে খুব সম্মানিত মানুষ। কানেকশনও খুব ভাল। ওঁর এক ছাত্রের বাবা এখানকার একজন বড় বিজনেসম্যান। ওঁর কাছ থেকেই একটা স্পিডবোট পাওয়া যাবে। সেই বোটটাই কাল সকালে আমাকে নিতে আসবে।'

'খুব ভাল। তোমার যখন চেনাশোনা ডাক্তার, তুমি গেলে একটু এক্সট্রা কেয়ার পেতে পারে পেশেন্ট। কখন আসবে বোট?'

"সকাল ছ'টা নাগাদ।"

'কিন্তু আমাদের লঞ্চ কোথায় নোঙর করেছে সেটা তো ওরা জানে না!'

'বলেছে খুঁজে পেতে অসুবিধে হবে না।'

পূর্ণদাকে একটু উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। 'কী কাণ্ড দেখো! পা ভেঙে পড়ে আছেন, তার ওপর আবার এই নতুন উপসর্গ। না-না, এ সব একেবারেই নেগলেক্ট করা উচিত নয়। একটা থরো চেক-আপ, ফুল কোর্স অব ট্রিটমেন্ট যাতে চলে সেদিকে নজর দিতে বলবে তোমার শ্রীকৃষ্ণদাকে।'

'বলব, আপনার কথা বলব ওঁকে। কিন্তু—।'

'এর মধ্যে আবার কিন্তুটিন্তু আনছ কেন?'

'না-না, আমি আনছি না। ডক্টর পাঁজা, যত দূর মনে পড়ছে, বারাসাতের চেম্বারে সপ্তাহে একদিন মাত্র বসেন। নামকরা অর্থোপেডিক সার্জেন তো, ওঁর চেম্বারে খুব ভিড়

হয় শুনেছি। এদিকে হাসনাবাদ থেকে বারাসাতের দূরত্ব অনেকটাই। শ্রীকৃষ্ণদাকে দেখিয়ে হাসনাবাদে ফিরতে বেশ রাত হয়ে যেতে পারে—।'

'রাত বেশি হয়ে গেলে তোমার শ্রীকৃষ্ণদার বাড়িতেই থেকে যেও। থাকলে উনি খুশিই হবেন।'

'আপনি তা হলে জোসি আর ডেভিসকে একটু বুঝিয়ে বলবেন। ওদের তো ঘুম থেকে উঠতে বেশ দেরি হয়, না হলে আমিই বলে যেতাম—।'

'আরে! ইমার্জেন্সি বলে কথা! যা বলার আমিই বুঝিয়ে বলব।'

'আর একটা কথা, ওরা সুন্দরবনের নদীনালায় যেমন ঘুরছে ঘুরুক, আমার জন্যে কোনও বিশেষ জায়গায় অপেক্ষা করার দরকার নেই।'

এবার পূর্ণদাকে একটু উদ্বিগ্ন দেখাল। 'কিন্তু আমবা এ ভাবে ঘুবে বেড়ালে তুমি আমাদের খুঁজে পাবে কী করে?'

'শ্রীকৃষ্ণদা বলছিলেন, 'ওর ছাত্রের বাবার একটা ব্যবসা—মাছ চালান দেওযা। সুতবাং সুন্দরবনের নদীতে ঠিক কোথায় এম. ভি. সদাগর আছে, সেটা ওঁর পক্ষে খুঁজে বার করা কঠিন হবে না।'

'বাহ্! তা হলে তো সব সমস্যার সমাধান। যাও, নিশ্চিন্তে একটু পরোপকার কবে এসো। অসুস্থ অবস্থায় তোমার সঙ্গ পেলে ওঁর খুব ভাল লাগবে।'

'ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি, আপনি কিন্তু একটু সাবধানে থাকবেন।'

খোলা গলায় হেসে উঠলেন পূর্ণদা। "তুমি দেখছি আমাব ভাইপো রনির মতো আমাকে সাবধান করতে শুরু করে দিয়েছ। সুন্দরবনের সেই প্রবাদ 'জলে কুমির ডাঙায় বাঘ' এখন তো আর আগের মতো জোরদার নয়। জলে কুমির কোথায়? ডাঙায় বাঘ আছে ঠিকই, কিন্তু এখন তো আমরা জলের প্রাণী হয়ে গিয়েছি। আর ডাঙায় নামলেও তো আমাদের দৌড় হচ্ছে লোহার জাল-ঘেরা প্রোটেকটেড এরিয়া। সুতরাং যাও, নিশ্চিন্তে ঘুরে এসো।"

পূর্ণদার হাসি, কথা কৌশিককে বোধহয় একেবারেই উদ্বেগশূন্য করতে পারেনি। ওর থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে তাই অন্তত মনে হয়েছিল পূর্ণদার। আর এক দফা হেসে নিয়ে উনি বললেন, 'শোনো কৌশিক, আমরা যখন সুন্দরবনের পথে রওনা দিয়েছিলাম, তখন তুমিই ছিলে আমার একমাত্র চেনাজানা সঙ্গী, কিন্তু এই লঞ্চে কয়েকটা দিন কাটাবার পরে তুমি ছাড়াও আমার আরও দুজন কাছের মানুষ হয়ে গেছে। জোসি, ডেভিস আর তোমার মধ্যে আমি এখন খুব একটা তফাত দেখতে পাই না। আমাকে নিয়ে অকারণ ভেবো না তো! তোমার এখন একমাত্র কাজ হল—ওই চেনা ডাক্তারবাবুকে দিয়ে অসুস্থ মানুষটার একটু ভালরকম চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। তেমন দরকার পড়লে বাড়তি আরও এক-আধটা দিন থেকে যেও ওখানে।'

পূর্ণদার আশ্বাসবাণী শুনেও কৌশিকের চোখমুখের চেহারার খুব একটা পরিবর্তন হল না। 'ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। আপনি যা বললেন, তাই করব। তবে আপনি কিন্তু একটু সাবধানে থাকবেন—।'

সঙ্গের ছোট কিটব্যাগটা টেনে নিয়ে কৌশিক ওর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে নিল চটপট। পূর্ণদা বললেন, 'তুমি আজ আর বেশি রাত পর্যন্ত জেগো না। কাল তো ভোরে উঠতে হবে। শুয়ে পড়ো তাড়াতাড়ি।'

দৃষ্টান্ত দেওয়ার জন্যেই বুঝি পূর্ণদা নিজের খাটে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়লেন, তার পর একটা হাই তুলে বললেন, 'আর একটা সুন্দর দিন কাটল আমাদের। আরামে থাকলে বোধহয় ঘুমও হয় বেশি করে। নাও, এবার জামাকাপড় পালটে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ো তো—।'

এম. ভি. সদাগর এবারও নোঙর করেছে একটা খাঁড়ির কাছে। কাছেই ঠাসা গাছপালাভর্তি সুন্দরবন। উলটো দিকে ঘুরে গেছে নদীর প্রবাহ। অখণ্ড নির্জনতা। মাঝেমধ্যে রাতপাখির ডাক গোটা এলাকাটাকেই কেমন যেন ঝাঁকিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল।

আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে কৌশিক। কিন্তু চোখের ধারেকাছে ঘুমের চিহ্ন ছিল না। রহস্য এদিকে রীতিমত ঘন হয়ে উঠেছে, ওদিকে এই সময় শ্রীকৃষ্ণদার এ ভাবে ডাক! শ্রীকৃষ্ণদাকে এখানকার ঘটনার অনেকটাই বলেছে ও। অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসার, উনি জানেন এই সময় ওর এখানে থাকা কতটা জরুরি। তা সত্ত্বেও এ ভাবে ডেকে পাঠালেন কেন? রহস্য সমাধানের নতুন কোনও সূত্র কি ওঁর হাতে এসেছে? আসতেও পারে। এম. ভি. সদাগর আর এম. ভি. দিনমণির বাসিন্দাদের সম্পর্কে সরকারি নথিপত্রের রেকর্ড জোগাড় করার দায়িত্ব ও চাপিয়ে দিয়ে এসেছিল শ্রীকৃষ্ণদার ওপরে।

রহস্যসন্ধানীর প্রথম কাজ রহস্যের ওপরে আলো ফেলা। তার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেই রহস্য সমাধানের পথ খুঁজে বার করা। নানা দিক থেকে রহস্যের ওপরে আলো ফেলেছে গোয়েন্দা। নানা সংশয়, নানা প্রশ্ন ভিড় করেছে মাথায়, কিন্তু এখনও সমাধানের সঠিক পথ খুঁজে বার করতে পারেনি। একটু বুঝি অস্থির হয়ে পড়েছিল গোয়েন্দা।

তখন থেকে এপাশ-ওপাশ করছে। পূর্ণদা ঘুমিয়ে পড়েছেন বেশ কিছুক্ষণ। ওঁর নাক ডাকার গম্ভীর শব্দ উঠছিল নির্দিষ্ট বিরতিতে। আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ বিছানায় পড়ে থাকার পরে উঠে পড়েছিল গোয়েন্দা। তারপর নিঃশব্দে কেবিনের দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছিল লঞ্চের ছাতে। আশ্চর্য রকমের নির্জন রাত। চাঁদের আলোয় খুব একটা জোর নেই। মাঝেমধ্যে মেঘে ঢেকে যাচ্ছিল চাঁদ। হালকা পায়ে হেঁটে ওদিকের রেলিং ধরে উঁকি মারল গোয়েন্দা। লঞ্চের গায়ে ঝোলানো বোট নীচে নামানো হয়েছে। তার মানে আজ রাতে আরও একটা অভিযান।

যাত্রী বলতে কি আগের দিনের ওই চারজন? আজও কি ওরা কোর-এরিয়ার গভীর জঙ্গলে ঢুকবে? কৌশিক জানে, দূর থেকে এই নৌকোর ওপর নজর রেখেছে বনরক্ষীদের বোট। সকালে যাওয়ার জন্যে শ্রীকৃষ্ণদার ওই ডাক না থাকলে আজ রাতেও ও বনরক্ষীদের সঙ্গী হত। তবে বনরক্ষীদের নির্দেশ দেওয়া আছে। গুরুতর কোনও ঘটনা না ঘটলে কোনও অবস্থাতেই যেন সাহেবদের গ্রেফতার করা না হয়। আর নজরদারির কাজ চালাতে হবে খুব সাবধানে। সাহেবরা যেন ঘুণাক্ষরেও টের না পায় ওদের ওপরে চোখ রেখেছে আর কেউ।

রেঞ্জারসাহেবকে কৌশিকের আসল পরিচয়টা জানিয়ে দিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণদা। ইচ্ছে করেই জানিয়েছেন, না হলে এ-ব্যাপারে কৌশিকের পরামর্শকে উনি কিছুতেই এত গুরুত্ব দিতেন না।

চাঁদের ওপর থেকে মেঘের মস্ত একটা ঝাঁক সরে যেতেই কৌশিক নিঃশব্দে পিছিয়ে

এসে চিমনির পাশের অন্ধকার জায়গাটায় দাঁড়িয়েছিল। মাথার সব জায়গায় ওর চিন্তাতরঙ্গ ছড়িয়ে পড়েছিল। ঘুরেফিরেই শ্রীকৃষ্ণদার নির্দেশের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। কী এমন কথা যে, সকালে ওকে এ ভাবে ডেকে পাঠিয়েছেন।

বারবার ইচ্ছে করছিল শ্রীকৃষ্ণদাকে মোবাইলে একবার ধরে। কিন্তু না, শুধু দেওয়ালেরই নয়, লঞ্চেরও কান আছে ; বিশেষ করে এই এম. ভি. সদাগরের। রহস্যজনক লঞ্চে গভীব রাতে মৃদু স্বরেও গোপন কথা বলা বিপজ্জনক।

গোয়েন্দা জানে, কখনও-কখনও তীব্র কৌতূহল দমন করা দরকার। প্রচণ্ড অস্থিরতার মধ্যেও শান্ত হয়ে থাকলে সুফল পাওয়া যায় পরে। নিজেকে যত দূর সম্ভব শান্ত, সংযত রেখে কেবিনে ফিরে এসেছিল গোয়েন্দা। পূর্ণদার ঘুম বোধহয় এখন আরও গাঢ়। নাক ডাকার শব্দ বুঝি আরও একটু জোরালো।

ছোট্ট টর্চটা জ্বেলে হাতঘড়ি দেখল গোয়েন্দা। বারোটা পাঁচ। আগের রাতের নিযমে যদি অভিযান শুরু হয়, তা হলে তা শুরু হতে হতে এখনও ঘণ্টা-তিনেক বাকি।

গোয়েন্দা শুয়ে পড়ল বিছানায়। তার পর সারা শরীর শিথিল করে দিয়ে ভাবল, ঘণ্টা-আড়াই তো ঘুমিয়ে নেওয়া যেতে পারে। ইচ্ছাশক্তি যদি তেমন তীব্র করা যায়—তা হলে আড়াই-ঘণ্টা ঘুমনো এবং তার পরেই উঠে পড়া অসম্ভব নয়।

ইচ্ছাশক্তি বাড়াবার কিছু প্রক্রিয়া গোয়েন্দার জানা আছে। তার জন্যে কল্পনায় শরীরেব সব সন্ধিকে আলগা করে দিতে হবে। চিন্তাতরঙ্গকে স্থির করতে হবে একটি বিন্দুতে। 'মনের ব্যায়াম' নিয়ে দু-তিনটে বই পড়া আছে গোয়েন্দাব। প্রক্রিয়াকে কাজে লাগিযে সুফলও পেয়েছে আগে। আজও পেতে হবে।

কল্পনায় শরীরের সব সন্ধি, গ্রন্থি শিথিল করে দিয়েছিল কৌশিক। এবং কিছুক্ষণ এই ভাবে থাকার পরে ঘুমিয়েও পড়েছিল এক সময়। ইচ্ছাশক্তি প্রথম দিকে কাজে এলেও, শেষে আসেনি একেবারেই। ঘুম ভেঙেছিল ওর ঠিক সাড়ে-পাঁচটায়।

ঘুম ভাঙতেই ঘড়ির দিকে চোখ গিয়েছিল ওর, তারপরেই লাফ মেরে উঠে পড়েছিল। দ্রুত পায়ে লঞ্চের ছাতে এসে ওদিকের রেলিং ধরে নীচে উঁকি মেরে দেখল লঞ্চের কোলের কাছে ছোট নৌকোটা ভাসছে। নৌকো লঞ্চের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা, তবে রাতে বাঁধনটা যেখানে দেখেছিল এখন তার থেকে কয়েক হাত দূরে। তার মানে খুব সম্ভবত একটা অভিযান সেরে আসা হয়েছে এই নৌকোয়। কারা ছিল, কী ধরনের অভিযান হয়েছে—তার কোনও চিহ্ন নেই কোথাও।

হাতঘড়ির দিকে আর একবার তাকাল গোয়েন্দা—পাঁচটা পঁয়ত্রিশ। অতনুর বোট নিয়ে আসার কথা ছ'টায়। চটপট তৈরি হয়ে নিতে হবে। কেবিনে ঢুকেই ব্রাশে টুথপেস্ট লাগিয়ে বাথরুমে ঢুকে পড়েছিল ও। বাথরুম থেকে বেরিয়ে পোশাক পালটে নেওয়ার পরে ঘড়ি দেখল আর একবার—ছ'টা বাজতে সাত।

পূর্ণদা ঘুমোচ্ছেন—সুখের ঘুম, প্রসন্নতার ঘুম। এখন আর নাক ডাকার শব্দ উঠছে না। ওঁর ঘুম ভাঙাবার ইচ্ছে করছিল না কৌশিকের। বরং একটা নোট লিখে টেবিলে চাপা দিয়ে রাখা যেতে পারে। ব্যাগ থেকে ছোট একটা রাইটিং-প্যাড বার করে কৌশিক লিখল—হাসনাবাদে চললাম। আপনার ঘুম ভাঙাতে ইচ্ছে করছে না এখন। ফিরে এসে কথা হবে।

কাগজটা টেবিলের ওপরে চাপা দিয়ে রাখার সময়েই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল পূর্ণদার। সব কিছু মনে করতে ওঁর বুঝি কয়েকটা মুহূর্ত লেগে গেল। তার পর ধড়মড় করে উঠে বসে বললেন, 'ক'টা বাজে? তোমাকে তো ছ'টার সময় নিতে আসার কথা—।'

'হ্যাঁ।'

'কী আশ্চর্য! আমাকে ডাকোনি কেন এতক্ষণ।'

'আপনি ঘুমোচ্ছিলেন, তাই—। আমি আপনার নামে ছোট্ট একটা চিঠি রেখে যাচ্ছিলাম। এই দেখুন—।'

পূর্ণদা চিঠিটার দিকে তাকালেন না পর্যন্ত। আগের ভঙ্গিতেই বললেন, "ছ'টার সময় যে-কাউকেই ডাকা যায়, তা ছাড়া কাল তো আমি একটু সকাল-সকালই শুয়ে পড়েছিলাম।"

হাতের চিঠিটা কুচি-কুচি করে ছিঁড়তে-ছিঁড়তে কৌশিক বলল, 'আপনি তো নিজে-নিজেই উঠে পড়েছেন—।'

খাটে বসেই রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে নদী দেখা যায়। বাইরের দিকে তাকিয়ে কৌশিক বলল, 'কেউ তো এল না এখনও।'

একটা প্রাইভেট বোটে চেপে সাদা পোশাকের অতনু এসেছিল ছ'টা দশে। পূর্ণদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ছোট ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে ওই বোটে উঠে পড়েছিল কৌশিক।

লঞ্চ থেকে স্পিডবোটের দূরত্ব বেশ কিছুটা বেড়ে যাওয়ার পরে কৌশিক অতনুকে জিজ্ঞেস করল, 'কাল রাতে ওরা আবার বোট নিয়ে বেরিয়েছিল, না?'

বনরক্ষীদের প্রধান অতনুকে প্রথম থেকেই বেশ গম্ভীর দেখাচ্ছিল। গম্ভীর মুখেই ও জবাব দিল, 'হ্যাঁ।'

"ক'জন? ওই চারজনই?"

'হ্যাঁ।'

'কোথায় গিয়েছিল? কী করল?'

অতনুর গাম্ভীর্য আরও বেড়ে গিয়েছিল। 'আগের রাতে যা করেছিল, ঠিক তাই।'

'কোর-এরিয়ার জঙ্গলে ঢুকেছিল?'

'হ্যাঁ।'

'আপনারা?'

'না, আমরা আর জঙ্গলে ঢুকিনি। প্রাণ হাতে নিয়ে পেছনের সরু খালের মধ্যিখানে ছিলাম। আমাদের নৌকোর দুজন গার্ড দু দিকের জঙ্গলের দিকে বন্দুক তাক করে বসেছিল। কাল চাঁদের আলো তেমন ছিল না। মাঝেমধ্যে তো রীতিমত অন্ধকার। তখন বাঘের টোপ হয়ে গিয়েছিলাম আমরা। সবাই বেঁচে ফিরেছি—এটা এখনও ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'সাহেবরা জঙ্গল থেকে ফিরেছিল কখন?'

এবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল বনরক্ষী-প্রধানের। বেশ একটু উঁচু গলায় বলে উঠল, "কেন ফিরেছিল সেটাই তো আপনার জিজ্ঞেস করার কথা? কপাল বটে চোরাশিকারিগুলোর। একদিন নয়, পর-পর দু দিনই সব ক'টা বেঁচে ফিরল। আমার এত দিনের চাকরিতে এমন দুঃসাহসী চোরাশিকারি আর কখনও দেখিনি। কালকের রাত তো বেশ অন্ধকারই ছিল। জঙ্গলের মধ্যে ওই অন্ধকার দ্বিগুণ। কালকেও ওরা বেছে-বেছে ভাঙাচোরা মন্দিরের

সামনে নেমেছিল। ভাঙাচোরা ওই মন্দিরগুলো বাঘের পছন্দের আস্তানা। কী করে ওরা বেঁচে ফিরল—ভগবানই জানেন! আস্ত শরীব নিয়ে সব ক'টাকে ফিরতে দেখে আমার মাথায় আগুন জ্বলে উঠেছিল। ইচ্ছে করছিল, গুলি চালিয়ে সব্বাইকে শেষ করে দিই। তাই করলে কাজটা উচিত আব আইনসঙ্গত হত। কিন্তু বড় সাহেবের অদ্ভুত হুকুম। গুলি চালানো যাবে না। গ্রেফতার করা যাবে না। শুধু নজবদারি করে ফয়দাটা কী?"

অতনুর রাগ, উত্তেজনা, উদ্বেগ পুরোমাত্রায় সঙ্গত। প্রাণ হাতে করে ওদের নজরদাবি করাব মধ্যে একবিন্দু অতিশয়োক্তি নেই। সেই বাতেব ছবিটা কৌশিকের চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল পরিষ্কার। সরু খাল। দু দিকে কোব-এবিযার ঠাসা জঙ্গল। গোটা খালটাই বোধহয় একটা বাঘ লাফ দিয়ে পেবিয়ে যেতে পাবে। নিবাপত্তার কাবণে খালের মধ্যিখানে নৌকো রাখা অর্থহীন। সেই বাতে তবু চাঁদেব আলো ছিল, কাল তাও ছিল না সব সময়। ওই জায়গায় অন্ধকারেব মধ্যে মৃত্যুব জন্যে মুহূর্ত গোনা ছাড়া আর কিছুই ওদের কবার ছিল না।

অতনুর রাগ-উত্তেজনা-ভর্তি কথাগুলো শোনাব পবে বলাব মতো একটা শব্দও খুঁজে পেল না কৌশিক।

কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে বসে থাকাব পবে বনবক্ষী-প্রধান বলল, 'ওই ব্যাটা গুনিন হিরু মণ্ডলকে তুলে এনে আচ্ছা কবে ঠেঙিয়ে লক-আপে ঢোকাবার ব্যবস্থা করব। বাঘের পায়ের ছাপ গোনার জন্যে আমবা যখন জঙ্গলে ঢুকি, তখন ওই হারামজাদা মন্ত্র পড়ে বাঘ তাড়াবার জন্যে আমাদের সঙ্গে থাকে। কিন্তু ও যে এই ভাবে চোরাশিকারিদের মদত দেয়—এটা আমার জানা ছিল না!'

কৌশিক এ-কথাটারও কোনও উত্তর দিল না।

স্পিডবোট রীতিমত স্পিড তুলে ছুটে চলেছিল হাসনাবাদের দিকে। চারদিকে ঝকঝকে সকাল। ঝলমলে রোদ নদী আর পাশের ঘন জঙ্গলের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে কী সুন্দর ভাবে। নদীর ওদিকে মাছ ধরছে জেলেরা। ডিঙিনৌকো ভাসছে জলে। দূরে নদীর ধারে ছোট-ছোট জনপদের চিহ্ন। রঙ-বাহারি পাখা মেলে জলে ছোঁ মারছে মাছরাঙা। কী শান্ত, সুন্দর জীবনের ছবি! এ সবের সঙ্গে কাল বাতের ওই ভয়ঙ্কর দৃশ্যকে কিছুতেই বুঝি মেলানো যায় না।

রাগ-বিরক্তি আর জ্বালা-ধরানো কথাগুলো উগরে দেওয়ার পরে অতনু এখন বুঝি কিছুটা শান্ত হয়েছে। গলার স্বর আর তেমন উপবে উঠছিল না। কিছুক্ষণ বাদে হতাশ মানুষের গলায় বলল, 'আমরা ছোটখাটো মানুষ। বড় সাহেবের বড়-বড় আইডিয়া তো আমাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। তবে আমবা আমাদের বিপদের ব্যাপারটা বুঝতে পারি। এর পরে কী হবে জানেন?'

কী হবে জানতে না চেয়ে অতনুর দিকে একবার তাকাল শুধু কৌশিক।

অতনু গলার স্বব আর একটু নামিয়ে বলল, 'সাহেবরা আবার রাতের বেলায় কোর-এরিয়ার জঙ্গলে ঢুকবে, আর আমাদের ওপর বড় সাহেবদের হুকুম হবে—ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে দূর থেকে পাহারাদারির কাজ চালিয়ে যাওয়া। আপনাকে আমি লিখে দিচ্ছি—আমাদের দু-একজন খুব শিগ্‌গিরই বাঘের পেটে যাবে।'

জবাবে এবারও বলার মতো কোনও কথা খুঁজে পেল না কৌশিক।

একটু বাদে এসে গেল হাসনাবাদ। গঞ্জ-এলাকার ফেরিঘাটে যাত্রী আর ব্যাপারিদের ভিড়। বড়-বড় ঝুড়িবোঝাই মালপত্র অনেকের মাথায়। গঞ্জ থেকে মাল চালান যাচ্ছে শহরে।

অতনুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কৌশিক লম্বা পায়ে হাঁটা শুরু করে দিল সার্কেল ইন্সপেক্টরের অফিসের দিকে।

ফেরিঘাট থেকে কাছেই অফিস। অফিসঘরের পর্দা সরাতেই শ্রীকৃষ্ণদা মৃদু হেসে বললেন, 'এসো।'

শ্রীকৃষ্ণদার টেবিলের উলটো দিকে বাইরের দুজন বসে ছিল। শ্রীকৃষ্ণদা একটা কাগজে খসখস করে দু-চার লাইন লিখে, সই করে তাবিখ বসিয়ে, ওদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এটা নিয়ে যাও, এতেই কাজ হবে।'

কাগজ হাতে নিয়ে নমস্কার করে লোকদুটো বেরিয়ে গেল।

কৌশিকের দিকে তাকিয়ে শ্রীকৃষ্ণদা বললেন, 'একটা দরকারি ব্যাপারে তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি। ওহ্! তার আগে এই কাগজটা নাও। তোমার লঞ্চ মানে এম. ভি. সদাগরের সাহেব একজন গুনী মানুষ, নাম রিচার্ড ডেভিস। একটা সময কলকাতার ব্রিটিশ ডেপুটি হাই-কমিশনারের অফিসে কাজ করতেন। এখন ওব পরিচয় প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ হিসাবে—বিরাট ব্যাপার! মহিলার নাম ফ্রাঁসোয়া জোসি—পরিচয় পর্যটক। এখন এসেছেন প্যারিস থেকে। এম. ভি. দিনমণির সাহেবও খুব তালেবর লোক। নাম গর্ডন এস. হার্ডি। সুন্দরবনের ইকোসিসটেম নিয়ে গবেষণা করতে এসেছেন। এই পরিমণ্ডল চর্চার জন্যে মাঝেমাঝে সাহেবরা এসে হাজির হয় এখানে। নাও, কাগজটা তোমার কাছেই রেখে দাও।'

কাগজটা হাতে নিয়ে কৌশিক জিজ্ঞেস করল, 'আর, দরকারি ব্যাপারটা কী?'

শ্রীকৃষ্ণদা বললেন, 'কাল সন্ধেয় তোমার কলকাতার অফিস থেকে তোমার অ্যাসিসট্যান্ট মুখার্জিকে কে বা কারা জোর করে তুলে নিয়ে গেছে। মুখার্জির কোনও ট্রেস পাওয়া যায়নি কাল রাত্তির পর্যন্ত। এটা তোমাকে জানাবার জন্যে আমাকে ফোন করেছিলেন ইন্সপেক্টর ঘোষরায়।

খবরটা শুনেই চমকে উঠেছিল কৌশিক। তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'আমি এই রকমই কিছু-একটা আশঙ্কা করেছিলাম!'

॥ ২৬ ॥

সর্কেল ইন্সপেক্টরকে তাঁর অফিসঘরে বেশিক্ষণ একা পাওয়া কঠিন। শ্রীকৃষ্ণদা কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন কৌশিককে, আর ঠিক তক্ষুনি জনা-চারেক লোক উদ্বিগ্ন মুখে ঢুকে পড়েছিল ওঁর ঘরে।

পুলিশ-মহলের কাজকর্মের রকমসকম সম্পর্কে কৌশিকের অভিজ্ঞতা কম নয়। ও বুঝতে পেরেছিল, এদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণদার কাজ চট করে মেটার নয়। ও উঠে পড়ে বলল, 'শ্রীকৃষ্ণদা, আমি ওপরে যাচ্ছি, দু-একটা ফোন কবতে হবে।' মাথা নেড়ে সায় দিয়েছিলেন উনি।

শ্রীকৃষ্ণদার কোয়ার্টার্স দোতলায়। ওপরে যে কনেস্টেবল ছিল আগের দিনই সে কৌশিককে দেখেছে—এক গাল হেসে বলল, 'আসেন। কখন এলেন আপনি?'

'এই একটু আগে।'

'সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, হয়েছে। বউদি কি ফিরেছেন বাপেব বাড়ি থেকে?'

'না, সামনের হপ্তায় ফিরবেন ওঁরা।'

কৌশিক আর একটাও কথা না বলে দেযালের কোণের ছোট্ট টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেল। টেবিলের ওপরে টেলিফোন, সামনে একটা মোড়া।

কনস্টেবল জিজ্ঞেস কবল, 'চা খাবেন তো স্যাব?'

এখন চা খেতে একেবারেই ইচ্ছে কবছিল না কৌশিকেব, কিন্তু লোকটিকে সরাবার জন্যে ও একপাশে মাথা নেড়ে বলে দিল, 'হ্যাঁ।'

কনস্টেবল সরে যেতেই টেলিফোন ডায়াল কবল কৌশিক। সেদিন এখান থেকেই ও ডি সি ডি ডি ওয়ান সন্দীপ দেবকে ফোন কবেছিল। এখন ওঁকে লালবাজারে পাওয়া যাবে না বলে বাড়িতেই ফোন করল। ফোন ধরেছিলেন ওর সন্দীপদাই। গলা শুনেই চিনতে পেরে বললেন, 'বলো, দি গ্রেট প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর, তোমার সুন্দরবন রহস্য সমাধানের কাজ কদ্দূর এগলো?' মৃদু হেসে গোয়েন্দা জবাব দিল, 'এগোচ্ছি তো ঠিকই, কিন্তু শুনলাম আমার অফিসে একটা ইনসিডেন্ট হয়ে গেছে—।' সন্দীপ দেব একটু চাপা গলায় বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি যা আশঙ্কা কবেছিলে—যা ঘটেছে, তা অনেকটা সেই বকমই।'

এর পর দুজনেরই গলার স্বর আরও চাপা হযে গিয়েছেল। কথাবার্তাও যা হয়েছিল, তা প্রায় সাঙ্কেতিক ভাষায়। সব শেষে কৌশিক পকেট থেকে কাগজ-কলম বার কবে একটা ঠিকানা লিখে নিয়েছিল দ্রুত।

কৌশিকের দু নম্বর ফোন ইন্সপেক্টব অবনী ঘোষরায়কে। অবনীদা ওব গলা শুনেই বললেন, 'খবরটা পেয়েছ তা হলে—। কী কাণ্ড বলো তো! মুখার্জি নির্ভেজাল ভালমানুষ। ও যে হঠাৎ এ ভাবে কিডন্যাপ্ড হবে ভাবাই যায় না! আমি খোঁজাখুঁজির কোনও ত্রুটি রাখছি না। আসল ব্যাপারটা আমি কিন্তু ধরতে পেরেছি—।'

আসল ব্যাপারটা এই মুহূর্তে জানার চেষ্টা না করে কৌশিক বলল, 'আমি আপনাব কাছে যাচ্ছি অবনীদা। বেলা একটা-দেড়টার মধ্যে পৌঁছে যাব।' কৌশিকের তৃতীয় ফোনটা ভেটারিনারি সার্জেন প্রতুল মহাপাত্রকে। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কৌশিকের চেনাশোনা আছে অল্পস্বল্প। মহাপাত্রকে বলল, 'আপনি যদি বেলা দুটো নাগাদ ইন্সপেক্টর অবনী ঘোষরায়ের কাছে একবার আসতে পারেন, খুব ভাল হয়। হ্যাঁ-হ্যাঁ, থানাতেই। আপনাকে দিয়ে কিছু জন্তুজানোয়ারেব হাড় পরীক্ষা করাব। হাড়গুলো কোন্-কোন্ প্রাণীর জানতে চাই। আপনি নিজে না করলেও কোনও এক্সপার্টকে দিয়ে করিয়ে দিন। দায়িত্বটা দয়া করে আপনাকেই নিতে হবে।' একটু না-না করেও শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে গেলেন মহাপাত্র।

তিন নম্বর ফোনটা শেষ হতেই কনস্টেবল এক ছোকরাকে নিয়ে হাজির হল ওখানে। ছেলেটার একহাতে কেটলি, অন্য হাতে কাপ। কাপটা টেবিলের ওপব ঠক্ করে রেখে চা

ঢালল কাপে। তার পর পকেট থেকে একটা ঠোঙা বার করল। ঠোঙার মধ্যে দুটো বিস্কুট। ঠোঙার মুখ খুলে চায়ের কাপের পাশে রেখে দিল ওটা।

কৌশিকের কপালে কয়েকটা ভাঁজ পড়েছিল। নানা ধরনের অঙ্ক শুরু হয়ে গিয়েছিল মাথার মধ্যে। অন্যমনস্ক ভাবে আধ কাপ চা আর আধখানা বিস্কুট খেয়ে নীচে নেমে শ্রীকৃষ্ণদার অফিস-ঘরে ঢুকল। উলটো দিকে বসা ওই চারজনের সঙ্গে কথা চলছিল সার্কেল ইন্সপেক্টরের। কৌশিক ঘরে ঢুকেই বলল, 'আমাকে এক্ষুনি একবার কলকাতায় যেতে হবে শ্রীকৃষ্ণদা। কাল ফিরতে পারি। ফিরে আপনার সঙ্গে কথা বলব।'

অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসার বুঝে গেলেন এখন কেন ও কলকাতায় যেতে চায়। জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু তুমি যাবে কী ভাবে?'

'এই সময় এখান থেকে একটা সরকারি বাস ছাড়ার কথা, ওটা পেলে—।'

'না-না, তার দরকার হবে না। আমাদের একটা গাড়ি যাচ্ছে এখন কলকাতায়, তুমি ওটাতেই চলে যাও।' কথাটা বলেই উনি দরজাব সামনে দাঁড়ানো কনস্টেবলকে ইঙ্গিত করলেন।

কনস্টেবল কৌশিককে সঙ্গে নিয়ে বাইরে দাঁড়ানো একটা অ্যাম্বাসাডরে বসিয়ে দিল। বসার কিছুক্ষণ পরেই গাড়ি রওনা দিল কলকাতার পথে।

জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল কৌশিক। এখানে আসার পথে ওর ভূমিকা ছিল নিছক এক পর্যটকের। কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ওই নিরুদ্বিগ্ন সফর পালটে গিয়েছিল রহস্যে-রোমাঞ্চে। পূর্ণদা কিছুই আঁচ করতে পারেননি যে, চারপাশের ঘটনার মধ্যে অস্বাভাবিক জটিলতা বেড়েই চলেছে। মাথার মধ্যে পরম্পরা মেনে ঘটনাগুলোকে সাজিয়ে ফেলেছিল গোয়েন্দা। তার পর চালাতে শুরু করেছিল বিশ্লেষণের কাজ। জানলার বাইরের দিকে ওর মুখ ফেরানো, কিন্তু খোলা চোখ দুটো পথের কোনও দৃশ্যই দেখছিল না। মাথার মধ্যে নানা ঘটনার দৃশ্য ভেসে উঠছিল একটার পর একটা, গোয়েন্দার দৃষ্টি এখন সেদিকেই।

অ্যাম্বাসাডরের ড্রাইভার অল্পবয়সী, ফাঁকা রাস্তা পেয়ে মনের সুখে গাড়ি ছুটিয়েছিল। গোটা রাস্তায় মাত্র দু-তিনটে জায়গায় ছোটখাটো জ্যাম আর অল্পস্বল্প ভিড়ে গাড়ির গতি সামান্য থমকে ছিল। এসপ্ল্যানেডে গাড়ি পৌঁছে গিয়েছিল বারোটা নাগাদ। ওখানেই নেমে পড়েছিল কৌশিক। তার পর একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা বাড়িতে।

তথ্যপ্রযুক্তির সুযোগসুবিধা যতটা সম্ভব বাড়িতেই তুলে এনেছে কৌশিক। হাতঘড়ির দিকে তাকাল ও। সময় এখন খুব মূল্যবান। প্রতিটি মুহূর্তকে যতখানি সম্ভব কাজে লাগাতে হবে। কাঁধের ব্যাগটা খুলে পূর্ণদাকে লেখা রনির চিঠিটা বার করল। চিঠির মাথায় ফোন নম্বর আর ই-মেল অ্যাড্রেস। রনিকে লম্বা একটা ই-মেল পাঠিয়ে দিল কৌশিক।

দ্বিতীয় কাজ হল ব্রিটিশ ডেপুটি হাই-কমিশনারের অফিসে ফোন করা। খুব বিনীত ভাবে কৌশিক ছোট্ট একটা মিথ্যে কথা বলল। বলল : ইদানীং যে সব বিদেশিরা ওরিয়েন্টাল স্ট্যাডিজ-এ ডিসটিংশন পেয়েছেন তাঁদের ওপর আমি একটা রিসার্চ পেপার তৈরি করছি। তা, আমার এই তালিকায় আপনাদের ফরমার এমপ্লয়ি রিচার্ড ডেভিসও আছেন। কলকাতার এই অফিসে উনি কত দিন কাজ করেছেন এবং ওঁর অ্যাভেলেবল বায়ো-ডেটা যদি অনুগ্রহ করে আমাকে জানান, আমি খুব উপকৃত হব।

ব্রিটিশ ভদ্রতা ও কর্তব্যবোধ সম্পর্কে অনেক গল্প শোনা আছে কৌশিকের, সেই গল্পগুলো যে অলীক নয়, তার একটা প্রমাণ পেল ও এবার। অনুরোধ কবার সঙ্গে সঙ্গে ডেপুটি হাই কমিশনারের অফিস থেকে জানতে চাইল · আপনার যদি ফ্যাক্স নম্বর থাকে সেটা দিন, আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অ্যাভেলেবল ইনফর্মেশন পাঠিয়ে দিচ্ছি।

কৌশিক ওর ফ্যাক্স নম্বর জানিয়ে দিয়েছিল।

আর একবার হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠে পড়ল গোয়েন্দা।

ইন্সপেক্টর অবনী ঘোষরায়ের কামরার সামনে পৌঁছে আরও একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়েছিল—একটা পঁচিশ।

বড়বাবু ওঁর ঘরে একাই ছিলেন। কৌশিক ঘরে ঢুকতেই উনি চওড়া কবে হেসে বললেন, 'এসো-এসো, সুন্দরবন ভ্রমণ শেষ হল তা হলে!'

মৃদু হেসে উলটো দিকের চেয়ারে বসল কৌশিক, তাবপর জিজ্ঞেস কবল, 'মুখার্জিবাবুর কোনও খোঁজখবর পেলেন অবনীদা?'

প্রশ্ন শুনে অবনীদার হাসি মুখ গম্ভীর হল। 'আমার তবফ থেকে চেষ্টার কোনও ত্রুটি বাখিনি, কিন্তু ইল লাক, এখনও ওকে ট্রেস করা যায়নি।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ কবে থাকার পরে কৌশিক জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে ঠিক ব্যাপারটা?'

'কাল বিকেলে খবব পেয়েই ছুটলাম আমি ওখানে।'

'কোথায়?'

'তোমার অফিসে। তোমার ওই অফিস থেকেই তো ওকে কিড্ন্যাপ করা হয়েছে। ঘটনাটা ঘটেছে চারটে সওয়া-চারটে নাগাদ। ওই সময় ওই জায়গাটা একটু ফাঁকাই থাকে। দুপুরে অফিসবাবুদের টিফিন খাওয়ার ভিড় থাকে রাস্তায়, পাঁচটার পর থেকে ওদের বাড়ি ফেরার ভিড়। আই-উইটনেস পেয়েছি একজনই, ওখানকার কফি শপেব এক ছোকরা-বেয়ারা। বিভিন্ন অফিসে কফিটফি সাপ্লাই দেয। ওই দেখে যে মুখার্জিকে ধরে নিয়ে গিযে গাড়িতে তুলছে—।'

'কজন ছিল?'

'দুজন।'

'কোনও চেঁচামেচি বা ধস্তাধস্তি—।'

'না-না, নিখুঁত অপাবেশন। দুজন দুদিক থেকে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তুলেছে। ওই সময় ওদের কেউ হঠাৎ দেখে ফেললেও বুঝতে পারত না—সত্যি-সত্যি কী ঘটছে!'

'তা হলে কফি শপের ওই ছেলেটা বুঝল কী করে?'

'ও কফির দাম আনতে যাচ্ছিল মুখার্জিব কাছে। মুখার্জিব চোখমুখ দেখে ওব খটকা লাগে প্রথমে, তারপরেই দেখতে পায--হাতেব ওপব খববেব কাগজ ফেলে মুখার্জির পাঁজরায় পিস্তল ঠেকিয়ে রেখেছে পাশেব একটা লোক। মুখার্জিকে গাড়িতে তুলে সরে পড়ার পরেই চেঁচিয়ে উঠেছিল ছেলেটা। তার পরেই সবাই সব জানতে পাবে।'

কিছুক্ষণ গুম হয়ে থাকার পবে কৌশিক জিজ্ঞেস কবল, 'কারা এটা কবেছে বলে মনে হয আপনাব?'

অবনীদা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, 'এটা তো খুব সহজ হিসেব। আমি তো তখন তামাকে টেলিফোনেই বলতে যাচ্ছিলাম—।'

'কী কথা?'

'প্রথম কথা মুখার্জি গোবেচারা। তোমার অফিসের ক্ল্যারিকাল কাজকর্ম সামলায় বেশির ভাগ সময়। গুন্ডা-বদমাইশদের টার্গেট হওয়ার কোনও কারণ নেই ওর। ওকে ধরেছে তোমাকে একটু শিক্ষা দেওয়ার জন্য—।'

'আমাকে শিক্ষা! কী শিক্ষা?'

'অপরাধীদের ধরে জেলে পোরার শিক্ষা।'

কথাটার মাথামুণ্ডু কিছুই পরিষ্কার হল না কৌশিকের কাছে।

সেটা বোঝার পরেই অবনীদা রহস্যপূর্ণ একটা হাসি হেসে বললেন, 'তোমার ধরা অপরাধীদের কার-কার জেলের মেয়াদ এই সময় শেষ হয়েছে—খবর নাও তো। মনে হয়, দু-চারটেব বেশি নয়। তুমি ওদের নাম বলো আমাকে। আমি খোঁজাখুঁজি করে ওদের তুলে এনে ঠ্যাঙালেই মুখার্জির হদিস পাওয়া যাবে। এই ধরনের রিভেন্‌জ ওদের ভাষায় হল—বদ্‌লা নেওয়া।'

গোয়েন্দার কপালে কয়েকটা ভাঁজ পড়েছিল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে বলল, 'আমি যাদের ধরেছি, মানে যারা পানিশমেন্ট পেয়েছে, তাদের কারও তো জেল-টার্ম এই সময় শেষ হওয়ার কথা নয়।'

অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসার হেসে বললেন, 'আরে! এ সব হিসেব কি আর মনে থাকা সম্ভব! তুমি তোমার ডায়েরিটায়েরিগুলো একটু উলটেপালটে দেখো তো। তা ছাড়া, এটা তোমার নিশ্চয়ই জানা আছে—কোনও কোনও কয়েদির জেল-টার্ম একটু ওয়েভ করে দেওয়া হয়। ছাড়া পাওয়ার কথা ছিল হয়তো ছ' মাস পরে, কিন্তু ছ' মাস আগেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ডায়েরিতে একবার চোখ বোলাবার পরে তুমি একটু খোঁজখবর নাও। খোঁজ নিতে তো আর পরিশ্রম নেই। আমাব কথাটা একটু শুনেই দেখো না। ছাড়া-পাওয়া অপরাধীদের মধ্যে প্রতিশোধ নেওয়ার ঝোঁকটা খুব বেশি থাকে।'

অবনীদা আরও অনেক কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ওঁকে থামিয়ে দেওয়ার জন্যেই কৌশিক বলল, 'ঠিক আছে, আমি খোঁজ নেব।'

জাঁদরেল পুলিশ অফিসার অবনী ঘোষরায়ের চোখমুখ এবার হঠাৎ অভিমানী বালকের মতো হয়ে উঠল। 'মুখার্জি কাজের ব্যাপারে খুব সিনসিয়ার। আমাকে চমৎকার সার্ভিস দিচ্ছিল, কিন্তু তুমি হঠাৎ ওটা বন্ধ করে দিলে কেন বলো তো? আমার কাজ বন্ধ করে ও যে অন্য কোনও কাজ করেছে—তা তো নয়। তুমি এখানে না-থাকা মানে ও কাঠ-বেকার। বরং আমার কাছে থাকলে বিচ্ছিরি এই কিডন্যাপিংয়ের ব্যাপারটা হয়তো এড়ানো যেত! আমি ওকে স্পাইংয়ের কাজে লাগিয়েছিলাম। ঘরে বসে থাকার কাজ নয়, বাইরে-বাইরে ঘোরা। ও আমাকে বেশ কিছুটা হেল্‌প করেছে। আচ্ছা, তুমি এটা তো মানবে—ওকে ওই দুটো ক্রিমিনালকে চেজ করতে না বললে ও ওদের পিছু ধাওয়া করতে করতে হাসনাবাদে পৌঁছত না। আর ও না পৌঁছলে বাঘ-হরিণের ওই চামড়াগুলো উদ্ধার করা সম্ভব হত না বনরক্ষীদের পক্ষে।'

কৌশিক লম্বা করে সায় দিয়ে বলল, 'হাঁ, এটা মুখার্জিবাবু দারুণ একটা কাজ করেছেন।'

টেবিলে ছোট্ট একটা চড় মেরে দুঁদে ইন্সপেক্টর বললেন, 'এই রকম আরও কিছু কিছু কাজ ওকে দিয়ে আমি করাতে পারতাম, কিন্তু কী তোমার মাথায় চেপেছিল কে জানে—দুম করে ওকে বসিয়ে দিলে!'

কথাটার কোনও উত্তর দিল না কৌশিক। চুপ করে কয়েক মুহূর্ত বসে থাকার পরে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার ওই খুনের তদন্তের কাজ নিশ্চয়ই শেষ?'

ম্লান হেসে ইন্সপেক্টর উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, তদন্ত শুরু কবলে একটা জায়গায় তো থামতে হবেই। আমিও থেমে গিয়েছি। কিন্তু তুমি খুব কাছের লোক বলেই বলছি—ওই দুটো সাহেব আর মেমের খুন হওয়ার দিন রহস্য যেখানে ছিল আজও ঠিক সেখানেই আছে। কাজের কাজ একচুলও এগোযনি।'

জবাব শুনে একটু বুঝি অবাক হল কৌশিক। 'কিন্তু আপনি যে সেদিন বলছিলেন—।'

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ইন্সপেক্টর বললেন, 'আমার কথা আব কাজের মধ্যে অমিল থাকে না কখনও। কী বলেছি তোমাকে এক্ষুনি আমি মনে কবতে পাবছি না, তবে যা বলেছি ঠিকই বলেছি। আমার ইনভেস্টিগেশনে কোনও ফাঁকি নেই, ভুল নেই। এখনও আমি জোর দিযে বলছি ওই সাহেব-মেম খুনের আসামি হচ্ছে ভোলা আর পচন। স্পট ইনকুযাবি করতে গিয়েই ওই দুটোকে আমি ধরেছিলাম। অপরাধের জায়গা মানে পোড়ো বাড়িটা থেকে বেরুবার মুখেই ওদের ধরেছি। কিন্তু জেলে পুরতে পারলাম না। দোষটা অবশ্য আমারই।'

'আপনার দোষ!'

'হ্যাঁ। এক রকমের দোষই বলা যেতে পারে। ওরাই যে খুনি—এ-ব্যাপারে আমার কোনও রকম সংশয় নেই। কিন্তু ওদের খুন করার প্রমাণ-ট্রমানগুলো আমি এখনও ঠিক জোগাড় করে উঠতে পারিনি। আমি ভাই কপালে বিশ্বাস করি। আমার কপাল বেগড়বাই করে শেষের দিকে। আমার বেশ কিছু পাকা ঘুঁটি শেষের দিকে কেঁচে গেছে—এ অভিজ্ঞতা বেশ কয়েকবার হয়েছে আমার।'

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে হঠাৎই ব্যস্ত হয়ে উঠে কৌশিক জিজ্ঞেস করল, 'আপনার সেই সিজ-করা হাড়গোড়গুলো থানাতেই আছে তো অবনীদা?'

বিরক্তিতে মুখ বাঁকালেন ইন্সপেক্টর। 'আর বোলো না। ধাপার মাঠে পড়ে-থাকা জন্তুজানোয়ারের হাড়গোড় ট্রাঙ্ক ভর্তি করে থানায় রেখে দিযেছি। ধাবেকাছে ফেলার জায়গা নেই, না হলে কবে এগুলো বিদেয় করে দিতাম।'

উত্তর শুনে আশ্বস্ত হয়ে কৌশিক বলল, 'আমি একজন ডাক্তারকে আপনার এখানে আসতে বলে দিয়েছি। এসে পড়বে এক্ষুনি।'

অসন্তুষ্ট মুখে ইন্সপেক্টর জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন?'

'হাড়গোড়গুলো পরীক্ষা করাব।'

হতাশ মানুষের ভঙ্গিতে দু দিকে মাথা নাড়াতে নাড়াতে ইন্সপেক্টর বললেন, 'তোমার দেখছি আঠারো, না-না—ছত্রিশ মাসে বছর। হাড়গোড় সিজ করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওগুলো আমার পরীক্ষা করানো হয়ে গিয়েছে। কাকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়েছি জানো?

মেডিক্যাল কলেজে অ্যানাটমি পড়ান এমন এক সিনিয়র অধ্যাপক-ডাক্তারকে দিয়ে। তিনি পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, ওগুলো মানুষের নয়, জন্তুজানোয়ারের হাড়।'

'আপনি কি ডক্টর প্রতুল মহাপাত্রকে চেনেন? উনি কিন্তু চেনেন আপনাকে।'

অসন্তুষ্ট ইন্সপেক্টর কথাটার কোনও জবাবই দিলেন না।

একটু পরেই এসে গেলেন ডক্টর মহাপাত্র। অল্পবয়সী ডাক্তারবাবুর চোখেমুখে বাড়তি উৎসাহের চিহ্ন। ঘরে ঢুকেই নমস্কার করে প্রশ্নকরলেন, 'কই, হাড়গুলো কোথায়?'

কৌশিক কোনও জবাব দেওয়ার আগেই গম্ভীর মুখে ইন্সপেক্টর টেবিলের বেল বাজালেন। একজন কনস্টেবল ঘরে ঢুকতেই ভারী গলায় বললেন, 'একদম কোণের ঘরটায় একটা ট্রাঙ্কভর্তি হাড়গোড় আছে, ডাক্তারবাবু ওগুলো দেখতে চান। যদি পুরোটা নিয়ে যেতে চান, ট্রাঙ্ক ওর গাড়িতে তুলে দেবে।' তার পর তরুণ চিকিৎসকের দিকে তাকিয়ে প্রায় আদেশ দেওয়ার গলায় বললেন, 'যান, আপনি ওর সঙ্গে যান।'

ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কৌশিকও গেল থানার ওই কোণের ঘরটায়। মস্ত ট্রাঙ্কের ডালা খুলতেই দেখা গেল নানা আকারের হাড় থরে থরে সাজানো। হাড়গুলো একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখার পরে মহাপাত্র বললেন, 'আমি স্পেসিমেন হিসেবে কয়েকটা হাড়ের টুকরো সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। মনে হয়, ফাইন্ডিং-রিপোর্ট কালকেই আপনাকে দিয়ে দিতে পারব।'

মহাপাত্রের হাতে একটা পেটমোটা ফোলিওব্যাগ ছিল। উনি ব্যাগ থেকে একটা প্লাস্টিকের থলি বার করে ট্র্যাঙ্কের বিভিন্ন দিক থেকে কয়েকটা হাড় তুলে নিয়ে থলিতে পুরলেন। তার পর থলিটা ফোলিওব্যাগের মধ্যে চালান করে দিয়ে বললেন, 'আমার একটা আর্জেন্ট কল আছে, এক্ষুনি যেতে হবে।'

যাওয়ার আগে উনি ইন্সপেক্টরের সুইংডোর ঠেলে উঁকি মেরে বিদায় নিলেন। ইন্সপেক্টর ওঁর গম্ভীর মুখে একটুখানি হাসি ফোটাবার চেষ্টা করে হাত নেড়েছিলেন।

ডাক্তারবাবু চলে যাওয়ার পরে কৌশিক ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করল, 'অবনীদা, কফিশপের ওই ছেলেটার নাম কী?'

'নাম? কী যেন বলল—হ্যাঁ-হ্যাঁ, রাজু।'

'আমার অফিসের কাছাকাছি কফিশপের বয় যখন, দেখলে ঠিক চিনতে পারব। আচ্ছা, কিডন্যাপারদের চেহারার কোনও বর্ণনা দিয়েছে আপনাকে?'

'দিয়েছে।'

'কী রকম দেখতে ওদের?'

'রাজু ওদের চেহারার যে বর্ণনা দিয়েছে অনেকক্ষণ ধরে, তাতে দাঁড়ায়—লোকগুলো *না বেঁটে না লম্বা, না রোগা না মোটা, না ফর্সা না কালো, না সুশ্রী না বিচ্ছিরি—। কী বুঝলে?'*

মৃদু হেসে কৌশিক বলল, 'ঠিক আছে, আমি একবার কথা বলে নেব ছেলেটার সঙ্গে।'

'আরে, তুমি দাঁড়িয়ে কেন? বোসো।'

সামনের চেয়ারটায় বসতে বসতেই কৌশিক বলল, 'অবনীদা, খুন-হওয়া ওই দুই সাহেব আর মেমের অনেকগুলো ছবি তুলিয়েছিলেন না?'

হতাশ মানুষের গলায় ইন্সপেক্টর জবাব দিলেন, 'প্রতিটি কাজই আমি খুব মন দিয়ে

করি। আর, রুটিন জব নেগ্‌লেক্‌ট করার তো কোনও প্রশ্নই ওঠে না। বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে ডেডবডিগুলোর অনেকগুলো ছবি তুলিয়েছি।'

'ছবিগুলো আমাকে একবার দেখাবেন?'

হঠাৎই আবার একটুখানি অভিমানী হয়ে উঠলেন ইন্সপেক্টর। 'আমার কাজ দেখার কি তোমার সময় হবে? ঠিক আছে, চাইছ যখন দেখো—।'

ছবিগুলো দেখতে দেখতে গম্ভীর হয়ে কৌশিক বলল, 'এগুলো কি আমি আমার কাছে রাখতে পারি?'

'স্বচ্ছন্দে। এই ধরনের ব্যাপার ঘটলেই আমি প্রতিটি ছবির দুটো করে প্রিন্ট নিয়ে নিই। আমার কাছে আরও একটা সেট আছে।'

'ঠিক আছে, আমি এখন চলি তা হলে।'

কৌশিকের কথা শুনে অবাক হয়ে ওর অবনীদা বললেন, 'কদ্দিন বাদে দেখা হল—। তেমন কোনও কথাই হল না, আর এর মধ্যেই চলি বলে কেটে পড়ছ!'

একটু বিব্রত হয়ে গোয়েন্দা বললে, 'কফিশপের ওই রাজুর সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলতে হবে।'

'বলবে, ও তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না! তোমার অফিসের দু-চারটে বাড়ির পরেই তো ওই কফির দোকানটা।'

'এদিকে আরও কয়েকটা দরকারি কাজ আছে যে—।'

'বেশ, সেগুলো সারো। ওই ছোকরার সঙ্গে কথা বলা মানে কিন্তু সময় নষ্ট করা। তবে বলতে তোমার যখন ইচ্ছে হয়েছে, বোলো। কাল বোলো।'

'কাল সময় পাব বলে মনে হচ্ছে না—।'

এবার একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন ইন্সপেক্টর। 'তুমি কি আবার কোথাও দৌড়বার তাল করছ নাকি। অ্যাদ্দিন বাদে তো ফিরলে সুন্দরবন থেকে—।'

'আমি এখনও পুরোপুরি ফিরে আসিনি অবনীদা। এক-দেড় দিনের জন্যে এসেছি, আবার যেতে হবে সুন্দরবনে।'

কৌশিকের কথা শুনে ইন্সপেক্টর এতই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন যে, ওঁর মুখ দিয়ে কোনও শব্দই বার হল না। আর একবার 'চলি' বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল গোয়েন্দা।

॥ ২৭ ॥

থানা থেকে বেরিয়ে কিছুটা হাঁটার পরেই একটা ট্যাক্সি পেয়ে গিয়েছিল কৌশিক। কোথায় যেতে হবে ট্যাক্সিওয়ালাকে বলে দেওয়ার পরে ছবির খাম থেকে ছবিগুলো বার করেছিল। খান-দশেক এনলার্জড ফোটোগ্রাফ। মৃত দুই সাহেব আর এক মেমের ছবিগুলো বিভিন্ন দিক থেকে তোলা হয়েছে। পেশাদার ক্যামেরাম্যানের তোলা ছবি। প্রতিটি ছবিই স্পষ্ট। বিচ্ছিরি ভাবে মাথা থ্যাঁতলানো সাহেবের ছবিটা বীভৎস। এই মৃতদেহটা

কার—এখনও অশনাক্ত রয়ে গেছে। বাকি দুই সাহেব-মেমকে শনাক্ত করা গেছে। কিন্তু এই তিনটে খুনের কারণ এখনও জানা যায়নি। খুনি বা খুনিরা আজও আড়ালে। প্রতিটি ছবিই আর একবার খুব মনোযোগের সঙ্গে দেখার পরে ওগুলো খামের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছিল কৌশিক।

বাড়িতে ফিরেই ছুটেছিল ওর তথ্যপ্রযুক্তির ঘরে। রনির ই-মেল এসে গিয়েছিল। চিঠির একটা প্রিন্ট-আউট নিয়ে এল ও। তার পর চিঠিটা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়ল বেশ কয়েক বার। পড়ার পরে চিঠি হাতে নিয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করল অনেকক্ষণ ধরে।

এই ভাবে পায়চারি করার অর্থটা ওর প্রবীণ সহকারী মুখার্জিবাবু খুব ভাল করেই জানেন। রহস্য সমাধানের কাজ একটা বিশেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেলে এই রকম পায়চারি শুরু হয়ে যায় গোয়েন্দার। মুখে তখন কোনও কথা থাকে না, কানে কোনও কথাও ঢোকে না, নিঃশব্দ পায়চারি বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলতেই থাকে।

আরও কিছুক্ষণ হয়তো পায়চারি চলত, কিন্তু হঠাৎ হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে থমকে গিয়েছিল গোয়েন্দা। তার পরেই লম্বা পায়ে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এসে তালা লাগিয়েছিল দরজায়। তরতর করে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে আবার একটা ট্যাক্সিতে উঠে পড়েছিল।

বাড়ি থেকে অফিস খুব একটা দূরের পথ নয়। রাস্তাঘাট ফাঁকাই ছিল, অল্প সময়ের মধ্যে পৌঁছে গিয়েছিল অফিসে। দরজায় স্প্রিং-লক লাগানো, বাইরে থেকে টানলেই তালা পড়ে যায় দরজায়। দুটো ল্যাচ-কির একটা থাকে মুখার্জিবাবুর কাছে, অন্যটা গোয়েন্দার ওয়ালেটে।

অফিস-ঘরের দরজা বন্ধ। এই দরজা টেনে দেওয়ার কাজটা করেছে হয় পুলিশ, নয় বাড়িওয়ালা। চাবি লাগিয়ে দরজা খুলে অফিস-ঘরে ঢুকল গোয়েন্দা। ঢুকেই আলো জ্বেলে সতর্ক চোখে তাকাল চারদিকে। মুখার্জিবাবুর টেবিলের ওপর অফিসের একটা খাতা খোলা অবস্থায় পড়ে আছে। পাশেই একটা কফির কাপ। বেশ কিছুটা কফি পড়ে আছে কাপে। চেয়ারটা টেবিল থেকে হাত-তিনেক দূরে। ঘরের বাকি জিনিসপত্র যেমন ছিল, ঠিক তেমনি আছে। অপহরণকারীদের উদ্দেশ্য খুব স্পষ্ট, মুখার্জিবাবুকে ওরা ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্যেই হানা দিয়েছিল এখানে।

এই এলাকায় ছোট-বড় মিলিয়ে অফিস আছে বেশ কয়েকটা। সকাল নটা সাড়ে-নটা থেকেই পথে-ঘাটে লোক চলাচল বেড়ে যায়, ওদিকে কিন্তু সন্ধে ছটার পরে রাস্তা ফাঁকাই। তখন পথচারী বলতে স্থানীয় বাসিন্দারা, তাদের সংখ্যা খুব একটা বেশি নয়।

কৌশিকের চেয়ারের পাশেই একটা কাবার্ড। জরুরি প্রয়োজনের জন্যে কিছু টাকা রাখা থাকে ওখানে। টেনে দেখল কাবার্ডে তালা লাগানোই আছে। দৃষ্টি ধারালো করে গোটা ঘর আর একবার পরীক্ষা করে নিল গোয়েন্দা। তার পর অফিস থেকে বেরিয়ে ওদিকের স্টেশনারি দোকান থেকে একটা চকোলেট স্ল্যাব কিনে পকেটে পুরে রাস্তার বাঁকের পাশে কফি-শপে গিয়ে হাজির হল। কফির দোকানের মালিক দক্ষিণী। কৌশিকের চেনা। হেসে বলল, "গুড আফটারনুন স্যর। খবর বালু? আল্'স ওয়েল?"

হেসে জবাব দিল কৌশিক, "গুড আফটারনুন। খবর ভাল। অল্'স ওয়েল। আপনি ভাল আছেন?"

দুদিকে মাথা নাড়লেন দক্ষিণী ভদ্রলোক। 'বালু আছে।'

'একটা কফি পাঠাতে হবে আমার অফিসে। আর ওখানে আপনাদের একটা কাপ পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি পাঠাবেন, আমি একটু পবেই বেরিয়ে যাব।'

'ও. কে. স্যর।'

মিনিট-পাঁচেকের মধ্যেই এক কাপ কফি নিযে কৌশিকেব অফিসে পৌঁছে গেল কফিশপেব ওই ছোকরা বেযাবা। ছেলেটাকে ও চেনে, কিন্তু এর নাম যে রাজু তা জানত না।

ছেলেটা বাঙালি। কফি-শপেব ছোকরা বেযাবা বলতে এই একজনই, কিন্তু এর নামই বাজু তো? নিশ্চিত হওযাব জন্যে স্নেহমাখানো হাসি ফুটিযে তুলে কৌশিক বলল, 'কফি ভাল কবে বানিয়েছো তো বাজু?'

একপাশে অল্প একটু মাথা কাত কবল ছেলেটা।

কফিতে ছোট্ট একটা চুমুক মেবে কৌশিক বলল, 'বাহ্! সত্যিই ভাল হযেছে। দাঁড়া, তোকে একটা জিনিস দিই। আমাকে একজন দিযেছে, কিন্তু আমি তো এ সব খাই না। তুই নে।'

পকেট থেকে সুদৃশ্য মোড়কে ভরা চকোলেট-স্ল্যাবটা এগিযে দিল ছেলেটার দিকে। এমন একটা উপহার পাওযাব কথা ও বোধহয কল্পনাও কবতে পাবেনি কখনও। চোখ চকচক কবছিল, কিন্তু হাত বাড়াবার সাহস পাচ্ছিল না।

'নে ধর, নাকি তুইও চকোলেট খাস না?'

কথার শেষ অংশটা কানে যাওয়াব জন্যেই বোধহয তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে চকোলেটটা নিয়ে নিয়েছিল ছেলেটা।

'তোর দেশ কোথায় রে রাজু?'

'মালদা।'

'মালদায় খুব আম হয়, না?'

'হ্যাঁ।'

'তুই আম খেতে ভালবাসিস?'

একই সঙ্গে বোধহয় আম আর দেশের স্মৃতি জেগে উঠেছিল ছেলেটার মনে। লাজুক মুখে হেসে মাথা নাড়াল একটুখানি।

'তোর ভাল নাম কী রে রাজু?'

'রাজেন।'

'বাহ্! ভারী সুন্দর নাম তো। তা রাজেন, তোদের দোকানের একটা কাপ পড়ে আছে তো আমাদের অফিসে। নিয়ে যাসনি কেন?'

'নিতে তো এসেছিলাম—।'

'নিলি না কেন?'

'অফিস তো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তখন।'

'ও, তাও তো বটে। মুখার্জিবাবুর কাছ থেকে কফির দাম নিয়েছিস?'

'না, ওকে তো ওরা নিয়ে গেল।'

'কারা?'

'ওই লোকদুটো।'

'তুই দেখেছিস পাজি লোকদুটোকে? তাহলে তো একজনের হাতে পিস্তলও দেখেছিস। দেখিসনি?'

উত্তেজিত মুখে রাজু বলল, 'মেশিনটা কাকুর বগলের নীচের দিকে ঠেকিয়ে রেখেছিল।'

'তাই! তুই চেঁচিয়ে উঠলি না কেন? চেঁচালে ওরা মুখার্জিবাবুকে ধরে নিয়ে যেতে পারত না।'

'চেঁচিয়েছিলাম। একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল আমার। ওরা তখন কাকুকে ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে পালাচ্ছিল—।'

'ইশ্! কী সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার! লোকদুটোকে দেখতে কেমন রে রাজু?'

প্রশ্ন শুনে হঠাৎই এক টুকরো কাঠের মতো হয়ে গিয়েছিল ছেলেটা। খসখসে গলায় বলল, 'আমি জানি না। আমি ওদের ভাল করে দেখিনি।'

কৌশিক পরিষ্কার বুঝতে পারল অবনীদা ধমকেধামকে এই প্রশ্নটাই বেশ কয়েকবার করেছে রাজুকে। প্রশ্নটা এখন অন্য কারও মুখে শুনলেও প্রকাণ্ড চেহারার পুলিশ অফিসারের চেহারাটা ঠিক ভেসে উঠবে ওর চোখের সামনে।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে কেমন যেন সহানুভূতি জানাবার গলায় কৌশিক বলল, 'রাস্তাঘাটে সব সময় তো কত লোক দেখে থাকি আমরা, সবার চেহারা কি আমাদের আর মনে থাকে! তুই তো তবু অনেকটা মনে রেখেছিস। একটু দাঁড়া, আমার আর মুখার্জিবাবুর—দুটো কাপই তুই নিয়ে যাবি একসঙ্গে।'

কফির কাপে দু-তিনটে চুমুক দিল কৌশিক, তার পর হঠাৎই জিজ্ঞেস করে বসল, 'মুখে একগাদা দাড়িগোঁফ—ওই লোকটাই কি মুখার্জিবাবুর গায়ে মেশিন ঠেকিয়েছিল?'

প্রশ্নের ধাক্কাতেই রাজু বলে ফেলল, 'না-না, টাকমাথা লোকটা।'

'আর দাড়িগোঁফওয়ালাটা?'

'একটা হাত ধরে রেখেছিল কাকুর।'

কফি এর মধ্যে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল খানিকটা। বড় এক চুমুকে অনেকটা কফি গলার মধ্যে নামিয়ে দিয়ে কৌশিক বলল, 'নিয়ে যা এবার তোর কাপ। আর এই নে দুটো কফির দাম।'

রাজু কফির দাম পকেটে ঢুকিয়ে কাপদুটো নিয়ে বেরিয়ে গেল।

ও চলে যাওয়ার পরেই কয়েক মুহূর্ত চোখ বন্ধ করে বসে পরবর্তী কার্যসূচি ঠিক করে নিয়েছিল গোয়েন্দা। তার পর হাতঘড়ির দিকে একবার তাকিয়েই উঠে পড়ে অফিসঘরের দরজা বন্ধ করে হাঁটা দিয়েছিল রাস্তায়। একটা ফাঁকা মিনিবাস আসছিল, হাত তুলে সেটাকে দাঁড় করিয়ে উঠে পড়েছিল ও।

শেষ দুপুরের রাস্তায় ভিড় ছিল না তেমন, অল্প সময়ের মধ্যে বেলেঘাটায় পৌঁছে গিয়েছিল। মিনিবাস থেকে একটা স্টপে নেমে পাশের বস্তির মধ্যে ঢুকে পড়েছিল গোয়েন্দা। সাপের মতো আঁকাবাঁকা গলি। কর্পোরেশনের একটা জলের কলের সামনে নানা আকারের বালতি আর হাঁড়ির লাইন। জল এখনও আসেনি কলে, তবে আসার সময় হয়ে গেছে। লাইনের পাশে বস্তির মেয়ে-বউদের ছোট একটা লাইন।

গলির তিনটে বাঁক ঘোরার পরে একটা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে দরজার কড়া নাড়ল

কৌশিক। দরজা খুলল রোগা, কালো, মাঝবয়সী নিরীহ চেহারার একটা লোক। তারপর গোয়েন্দাকে দেখেই বলে উঠল, 'আসুন-আসুন, ভেতরে আসুন।'

ছোট্ট একটা ঘর। ঘরের অর্ধেকের বেশি জুড়ে আছে খাট। ধারে একটা কাঠের চেয়ার। চেয়ারটা টেনে এনে গৃহস্বামী আপ্যায়নের ভঙ্গিতে অতিথির দিকে তাকিয়ে বলল, 'এখানে বসুন স্যার।'

কৌশিক জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছ গগন?'

'এই আছি স্যার, আপনি?'

'একরকম। এই সময় তোমাকে পাব আশা করিনি।'

'ছিলাম না তো স্যার। ঘণ্টাখানেক আগে ফিরেছি। একটু চা খাবেন তো?'

'না-না, খানিক আগেই কফি খেয়েছি। তোমার কাছে একটা কাজে এসেছি গগন।'

কাজ ছাড়া ইনফরমার গগন বেরার কাছে ব্যস্ত প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর কৌশিক মিত্র কখনওই আসে না, গগন এটা খুব ভাল করেই জানে। সুতরাং কথার উত্তরে বিনীত একটা হাসি ফুটিয়ে তুলেছিল ঠোঁটে।

গোয়েন্দা চেয়ারে বসার পরে ইনফরমার খাটের তলা থেকে মোড়া টেনে নিয়ে বসল।

চারদিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে গোয়েন্দা নিচু গলায় বলল, 'দু-তিনবার তুমি আমাকে দারুণ সাহায্য করেছ গগন। তোমার সাহায্য না পেলে ওই কাজগুলো কিছুতেই আমি শেষ করতে পারতাম না।'

অপরাধীদের সম্পর্কে নানা পাকা খবর পুলিশ-মহলকে জোগান দেওয়ার ব্যাপারে গগনের দারুণ সুনাম। ও সেটা নিজেও জানে, কিন্তু এখন বিনীত ভাবে প্রতিবাদ জানাবার ভঙ্গিতে বলল, 'কী যে বলেন স্যার! কী করতে হবে আপনারা বলে দেন, আমরা করি। ব্যস, এর বেশি আর কিছুই নয়।'

হাতঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে নিয়েছিল গোয়েন্দা। 'তুমি তো এই এলাকার খুব পুরনো লোক। কাছাকাছি জায়গাগুলোও তোমার খুব জানাশোনা। আমাকে একটা কাজ করে দিতে হবে। হাতে কিন্তু আমাদের একেবারেই সময় নেই।'

'কী কাজ স্যার?'

গলা আরও একটু নীচে নামিয়ে গোয়েন্দা প্রশ্ন করল, 'তুমি ভোলা আর পচনকে চেনো?'

মাথা এক পাশে সামান্য কাত করে জবাব দিল গগন, "চিনি স্যার। ওরা আগে ড্রাগের চোরাচালান করত, এখন শুনেছি অন্য কারবারে নেমেছে। এই তো ক'দিন আগে পুলিশ ওদের ধরেছিল, কিন্তু তেমন প্রমাণ জোগাড় করতে পারেনি বলে ছেড়ে দিয়েছে।"

উত্তর শুনে খুশি হয়ে গোয়েন্দা বলল, 'বাহ্! তোমার খবর দেখছি একেবারে আপ-টু-ডেট। ঠিকই বলেছ তুমি। ওরা এখন শুনেছি অন্য জিনিসের চোরাচালানে নেমেছে। কী মাল, কোত্থেকে তোলে, কোথায় চালান দেয়—এই খবরগুলো জোগাড় করতে হবে তোমাকে। আমি একটা ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি তোমাকে—প্রিন্সেপ স্ট্রিটের একটা দোকানের ঠিকানা, মনে হয় মালপত্তর চালান যাওয়ার এটা জায়গা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খবর চাই আমার।'

পকেট থেকে একটা কাগজের টুকরো বার করল গোয়েন্দা। 'প্রিন্সেপ স্ট্রিটের দোকানের নাম-ঠিকানা এই কাগজে লেখা আছে। নীচের ফোনের নম্বরে আমাকে কাল সারাদিন পাবে। পরশু থেকে খবর দেওয়ার সময় সকাল ছটা থেকে সাতটা, ওদিকে রাত এগারোটা থেকে বারোটা। খুব সম্ভবত কাল বিকেলে আমি কলকাতা ছাড়ব, ফিরতে-ফিরতে হয়তো পাঁচ-সাতটা দিন লেগে যাবে। ফেরার পরে আমিই তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করে নেব। তার পরে ফোনের দরকার হলে বাড়িতে কিংবা অফিসে করবে।'

সব কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার পরে কাগজের টুকরোটা হাতে নিল গগন, তারপর ঠিকানা আর ফোন নাম্বারে চোখ বুলিয়ে ওটা হাতেই রেখে দিল।

গোয়েন্দা এবার উঠে পড়ল। 'এখন আমাকে যেতে হবে গগন। যে কাজটা হাতে নিয়েছি সেটা এখন মাঝপথে, জানি না কোথায় গিয়ে থামবে। তোমাকে কিন্তু খোঁজখবর নেওয়া এখনই শুরু করে দিতে হবে। হাতে কিন্তু একেবারেই সময় নেই।'

পকেট থেকে পাঁচশো টাকার একটা নোট বার করে গগনের দিকে এগিয়ে দিল গোয়েন্দা। 'এটা রেখে দাও।'

দুদিকে হাত নেড়ে গগন বলল, 'এখন থাক স্যার, পরে দেবেন।'

'পরে তো দেবই। কিন্তু এটা তোমার এখন লাগবে। খবর নেওয়ার জন্যে ছোটাছুটি করতে হবে পাঁচ জায়গায়। পিছু নেওয়ার জন্যে গাড়িঘোড়ার খরচা আছে। এমনও হতে পারে, পিছু নিতে গিয়ে লোকাল ট্রেনে চেপে কোথাও যেতে হল তোমাকে।'

গগন এবার আর আপত্তি করল না, হাত বাড়িয়ে নিয়ে নিল টাকাটা।

ওখান থেকে বেরিয়ে আর একবার হাতঘড়ির দিকে তাকাল গোয়েন্দা, তারপর লম্বা পায়ে ফেরার পথ ধরল।

কর্পোরেশনের কলে বিকেলের জল এসে গিয়েছে। কলের সামনে বালতি-হাঁড়ির একটা লাইন পড়েছে। পাশের মেয়ে-বউরা গল্প করছে উঁচু গলায়। দ্রুত পায়ে ওদের পেরিয়ে যাওয়ার পরেই মুখার্জিবাবুর কথা মনে পড়ে গেল কৌশিকের। মানুষটি একটানা অনর্গল গল্প করে যেতে পারেন। কোনও কিছুর বিবরণ দিতে গেলে বোধহয় দাঁড়ি, কমাও বাদ দেন না। অবনীদার হয়ে নজরদারি করতে গিয়ে যা-যা ঘটেছে, সব কিছুরই খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়েছেন। ঠিকানাপত্তরও দিয়ে দিয়েছেন যেখানে যা পেয়েছেন। প্রিন্সেপ স্ট্রিটের ওই ঠিকানা মুখার্জিবাবুরই সংগ্রহ। কিন্তু কেমন আছেন এখন উনি? ভাল তো!

মানুষটির জন্যে একটু উদ্বিগ্ন বোধ করছিল কৌশিক। বড় রকমের কোনও দুর্ঘটনা ঘটার কথা নয়। কিন্তু শুধুমাত্র অনুমানের ওপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। উদ্বেগ হঠাৎই একটু বেড়ে যাওয়ার জন্যেই বুঝি হাঁটার গতি কিছুটা বেড়ে গিয়েছিল গোয়েন্দার।

বড় রাস্তায় পৌঁছবার একটু পরেই একটা ট্যাক্সি পেয়ে গিয়েছিল। ট্যাক্সি নিয়ে ফিরে এসেছিল নিজের ফ্ল্যাটে। ফ্ল্যাটে ঢুকেই গেল ওর তথ্যপ্রযুক্তির ঘরে। ব্রিটিশ ডেপুটি হাই-কমিশনারের অফিস থেকে রিচার্ড ডেভিসের অ্যাভেলেবল বায়ো-ডাটা এসে গিয়েছে ফ্যাক্সে।

ঝুঁকে পড়ে ফ্যাক্সে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে টান হয়ে দাঁড়াল গোয়েন্দা। তারপর ওটা হাতে নিয়ে খুঁটিয়ে আরও দু-তিনবার পড়ার পরে পায়চারি শুরু করে দিয়েছিল ঘরের মধ্যে।

কাজ এগোচ্ছে, দ্রুত এগোচ্ছে ; কিন্তু আর ঠিক কতটা এগোতে হবে—এই মুহূর্তে আন্দাজ করা কঠিন।

ড্রয়ারের মধ্যে রনির ই-মেল রেখেছে, সেই ই-মেলের সঙ্গে ফ্যাক্সটা পিন করে ড্রয়ারে চাবি লাগিয়ে টেলিফোন ডাইরেক্টরি নিয়ে বসল কৌশিক। এবার ওঁর দরকার সায়ন্তন চক্রবর্তীকে।

যাকে বলে তরুণ শিল্পোদ্যোগী—সায়ন্তন ঠিক তাই। ছোট একটা কারখানায় লেদার শেভিং ব্লেড বানায়। ভারতের নানা জায়গায় পাঠায় সেগুলো, তবে কলকাতার মধ্যে ওর ব্যবসার সব চাইতে বড় জায়গা ট্যাংরা। ওখানকার অনেক ট্যানার ওর নিয়মিত খদ্দের। কাঁচা চামড়াকে পাকা বানাতে গেলে ওর ব্লেড নাকি অব্যর্থ।

বছর-তিনেক আগে একটা কাজের সুবাদে বেশ কয়েক বার ওর সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল কৌশিকের। মোটামুটি কাছাকাছি বয়সের ওরা, তার ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল ওদের মধ্যে। তরুণ এবং সফল শিল্পোদ্যোগীরা একটু বোধহয় বেশি মাত্রায় জীবনীশক্তিসম্পন্ন হয়, অল্প সময়ের মধ্যে সম্পর্ক কাছাকাছি আসাব পেছনে সেটাও একটা বড় কারণ। তার পর যা হয়, তাই হয়েছে। দু-ধবনের কাজে ব্যস্ত দুজন মানুষ। ছিটকে পড়েছে দুদিকে।

টেলিফোন ডাইরেক্টরির পাতা ওলটাতে ওলটাতে বছর তিন আগের অনেক ঘটনাব কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল কৌশিকের।

এই তো সায়ন্তনের ফোন নম্বর। নম্বরের লাগোয়া ঠিকানাটা দেখে নিশ্চিত হল কৌশিক।

ডায়াল করে পেয়েও গেল সায়ন্তনকে। কিন্তু ব্যবসার সূত্রে হাজারটা লোকের সঙ্গে জড়ানো শিল্পোদ্যোগীর কয়েকটা মুহূর্ত লেগে গিয়েছিল কৌশিককে চিনে উঠতে, তার পরেই উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠেছিল, 'দোষ মশাই আপনার। সেই যে ফোন করব বলে গা ঢাকা দিলেন, তার পর একেবারেই বেপাত্তা। নিজেকে অচেনা তো আপনি বানিয়েছেন। বুঝতে পারছি, কাজের ব্যাপারে নানা জায়গায় আপনাকে ছোটাছুটি করতে হয়। এনিওয়ে, এতকাল বাদে ফোন করেছেন—এটাই আমার পরম সৌভাগ্য। বলুন, কী করতে পারি আপনার জন্যে?'

হেসে উঠে কৌশিক বলল, 'কী আবার করবেন? কিচ্ছু না। অ্যাদ্দিন পরে আপনাকে ফোন করেই পেয়ে গেলাম—এটাই আমার ভাল লাগছে। আসলে ব্যাপারটা কী জানেন? আজকের সন্ধেটা আচমকা ফ্রি হয়ে গিয়েছি। তা ভাবলাম, তরুণ শিল্পোদ্যোগীকে একটা ফোন করা যাক—।'

টেলিফোনে লাফিয়ে ওঠার ব্যাপারটা গলা শুনে আন্দাজ করা যায় খানিকটা। ঠিক যেন লাফিয়ে উঠে সায়ন্তন বলল, 'সত্যিই আপনি ফ্রি! তা হলে কাইন্ডলি বাড়ি থেকে এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা চলে আসুন আমার কারখানায়।'

'আপনিও কি ফ্রি?'

'হ্যাঁ, এ-রকম ফ্রি আমি কলকাতায় থাকলে প্রায় প্রতি সন্ধেবেলাতেই। আপনার বোধহয় খেয়াল নেই, আমাকে রোজ সন্ধেবেলায় একবার ছুটতে হয় ট্যাংরাতে। কাজ কিন্তু খুব কম সময়ের। গাড়ির ডিকিতে কিছু মালপত্তর থাকে, আমার ড্রাইভারই ওগুলো নামিয়ে দেয় আমাদের এজেন্টের কাছে। ব্যস, তার পরেই আই অ্যাম এ ফ্রি ম্যান। ওখানে

আড্ডা মারার কতগুলো ভাল জায়গা আছে। সত্যিকারের ভাল ফুড আর ড্রিংকস পাওয়া যায়।'

'হ্যাঁ শুনেছি, ট্যাংরায় এখন বেশ কয়েকটা ভাল খাওয়ার জায়গা হয়েছে।'

'আপনাকে আমি একটা এক্সক্লুসিভ জায়গায় নিয়ে যাব। ট্যাংরা আমার সেকেন্ড পাড়া বলতে পারেন। আপনাকে রাত্তিরে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বও আমার। প্লিজ চলে আসুন।'

'ঠিক আছে, আসছি' বলে লাইন কেটে দিয়েই আর একটা নম্বরে ডায়াল করল কৌশিক। এই নম্বরটা ডি সি ডি ডি ওয়ানের ডিরেক্ট লাইন। আত্মপরিচয় দিয়ে কৌশিক বলল, 'আমি এখন কলকাতায় সন্দীপদা, কাল সন্ধেয় আবার ওখানে ফিরে যেতে পারি। এদিককার খবর কী? নতুন কোনও ডেভেলপমেন্ট—।'

এর পর কৌশিককে আর কিছু বলতে হল না। হুঁ-হ্যাঁ করতে করতে ওদিকের কথা বেশ কিছুক্ষণ শোনার পরে বলল, 'আপনি আছেন বলেই ভরসা পাচ্ছি সন্দীপদা। ঠিক আছে, পরে আবার ফোন করব।'

টেলিফোন নামিয়ে রেখেই মেক-আপ বক্স নিয়ে আয়নার সামনে বসে পড়েছিল গোয়েন্দা। তার পর পাকা হাতে চটপট একটা ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি বানিয়ে ফেলেছিল থুতনিতে। চোখে লাগিয়েছিল টিন্টেড গ্লাসের পাওয়ারলেস চশমা। আয়নার সামনে মুখ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কঠিন বিচারকের চোখে নিজের দাড়িগোঁফ দেখে নিয়ে নিশ্চিত হল— যথেষ্ট অচেনা দেখাচ্ছে ওকে।

আধ ঘণ্টা বাদে দাড়িওয়ালা কৌশিককে দেখে প্রথমে চিনতে পারেনি সায়ন্তন, তার পর অট্টহাস্য করে বলে উঠল, 'এইটুকু একটা দাড়ি কিন্তু আপনার চেহারাটাকেই পালটে দিয়েছে। কদ্দিন রেখেছেন দাড়ি?'

লাজুক হাসি হেসে জবাব দিল কৌশিক, 'মাস-ছয়েক।'

'বেশ লাগছে কিন্তু আপনাকে। চলুন, এবার তাহলে যাওয়া যাক।'

একটু বাদেই ওদের নিয়ে গাড়ি ছুটেছিল ট্যাংরার দিকে।

॥ ২৮ ॥

তরুণ শিল্পোদ্যোগী সায়ন্তন চক্রবর্তীর গাড়ির ড্রাইভারও তরুণ। রাস্তায় মোটামুটি ভিড় ছিল। সামনে নানা আকারের গাড়ি আর বাস, কিন্তু ফাঁকফোকর দিয়ে গাড়ি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল ড্রাইভার। দু-তিনটে জায়গায় একটু বিপজ্জনক ভাবেই সামনের গাড়িকে ওভারটেক করেছিল।

প্রাইভেট গাড়ির মালিকরা পেছনের সিটে থাকলে ড্রাইভাররা সাধারণত এই সব কাণ্ড করার সাহস পায় না। কিন্তু সায়ন্তন উদ্যোগী ব্যবসায়ী, গাড়ি চালানোর ব্যাপারে ড্রাইভারের বাড়তি উদ্যোগকে বরাবরই বোধহয় একটু প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। ওর চোখেমুখে একই সঙ্গে কিছুটা নির্লিপ্ত আর নিশ্চিন্ত ভাব।

মিনিট পনেরো-কুড়ি এই ধকলটা নেওয়ার পরে একটা ফাঁকা রাস্তায় উঠে এল গাড়ি।

সায়ন্তন হাসি মুখে পাশে-বসা কৌশিকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ব্যস, আর জ্যাম পাবেন না।'

গাড়ি ছুটে চলেছিল সায়ন্তনের অন্যতম বাণিজ্যকেন্দ্র ট্যাংরার দিকে।

সন্ধের আরামপ্রদ হাওয়া ঢুকছিল গাড়ির জানলা দিয়ে।

কৌশিক সায়ন্তনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তারপর বলুন, এই তিন বছরে আপনার ব্যবসা কত গুণ বেড়েছে?'

একজন সফল ব্যবসায়ী তাঁর সাফল্যের গল্প শুনিয়ে সব সময়ই আরাম পায়। সায়ন্তন বলল, 'আমাদের এই ব্যবসা বাড়াবার সুযোগ আছে বিরাট। তবে ব্যবসার চেহারাটা মান্ধাতা আমলের। মডার্নাইজেশনের দিকে কেউ চট করে যেতে চায় না। কিছু এক্সেপশন আছে, কিন্তু তাদের পক্ষে তো আর গোটা ব্যবসার হাল বদলে দেওয়া সম্ভব নয়।'

'আপনার তো ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট। সেলিং আইটেম ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই বেশ কিছু বেড়ে গেছে?'

'বেড়েছে, তবে এখনও আমার প্রধান আইটেম লেদার-শেভিং ব্লেড। আমি অবশ্য নানা ধরনের এক্সপেরিমেন্টেশনের মধ্যে আছি। তার ফলে আমার ব্লেডের চাহিদা এখন খুব বেড়ে গেছে। আমি ভাল কোয়ালিটির স্টিল ছাড়া প্রোডাকশনে যাই-ই না। ভাল স্টিলের সাপ্লাই কম হলে প্রোডাকশনও কমিয়ে দিই। বাজারে ক্লাস ওয়ান ব্র্যান্ডনেম তৈরি করা খুব কঠিন ব্যাপার। তারপর ধরুন, হিট ট্রিটমেন্ট—।'

পণ্য উৎপাদনের নানা রকম জটিল ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতির মধ্যে ঢুকে পড়েছিল সায়ন্তন। কথাগুলো মাথার দু-হাত ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার পরে কৌশিক বলল, 'এই কঠিন-কঠিন ব্যাপারগুলো বোঝার মতো বিদ্যে তো আমার নেই। আপনি একটু সহজ ভাবে বলুন, আপনার এই লেদার-শেভিং ব্লেড চামড়া প্রসেসিংয়ে ঠিক কী কাজে আসে?'

সায়ন্তন একটু ঘুরে বসে বলল, 'ব্লেডগুলো কাঁচা চামড়া প্রসেসিংয়ের প্রাইমারি এবং ভাইটাল স্টেজে লাগে। ট্যানাররা জন্তুজানোয়ারের কাঁচা চামড়া নিয়ে এল। ওই চামড়াগুলো প্রথমেই খুব ভাল ভাবে পরিষ্কার করা দরকার। এই পরিষ্কার করার কাজে ভাল কোয়ালিটি ব্লেডের দরকার। ব্লেড খারাপ হলে চামড়া ভাল ভাবে পরিষ্কার হবে না, ড্যামেজড্‌ও হয়ে যেতে পারে। দাড়ি কামাবার জন্যে তো বাজারে অনেক ধরনের ব্লেড আছে, কিন্তু সব কোম্পানির ব্লেডে কি ঠিকভাবে দাড়ি কাটে? বাজে ব্লেড হলে দাড়ির বদলে গালই কেটে যায়। তাই না?'

নিজের নকল দাড়িতে আলতো করে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে সায় দিল কৌশিক। "তা ঠিক। আচ্ছা, ট্যাংরায় কি 'ছোটা জলিল' বলে কোনও ট্যানার আছে?"

'আছে। ও তো ট্যাংরায় আমার বড় খদ্দেরদের একজন। কিন্তু আপনি ওকে চিনলেন কী করে?'

'চিনি না তো। কয়েক দিন আগে এক বিজনেসম্যানের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। ট্যাংরায় কেমিক্যালস সাপ্লাই দেন। কথায় কথায় উনিই বললেন, ছোটা জলিল ওঁর কাছ থেকে প্রচুর মাল কেনে। আপনার কথাও জিজ্ঞেস করেছিলাম ওঁকে। তা বললেন—ওঁদের ব্যবসা শুধুমাত্র ট্যানারদের সঙ্গে। ছোটা জলিল নামটা কী ভাবে যেন আমার মাথায় থেকে গেছে। ট্যাংরার অ্যাসোসিয়েশন না হলে অবশ্য মনে পড়ত না।'

সায়ন্তন একটু হেসে বলল, "ট্যানারদের মধ্যে দুজন জলিল আছে। চেনার সুবিধের জন্যে যার বয়েস বেশি, সে 'বড়া জলিল'—যার কম, সে 'ছোটা জলিল'। দু-তিন বছরের মধ্যে এই ছোটা জলিলের কপাল ফিরে গিয়েছে দারুণ ভাবে। ও যে ওর কাজকর্ম খুব একটা বাড়িয়েছে—তা নয়। তবে বরাবরই খুব চয়েসেস্ট মাল বানায়। আমাকে পরিষ্কার বলে দিয়েছে—আপনি আমার কাছ থেকে দুগুণ বেশি দাম নিন ব্লেডের, কিচ্ছু এসে যায় না। তবে আমি ব্লেড চাই এক নম্বরের। যাব আজকে ওর ঘরে একবার। ছোটা জলিল হালে একটা পেট্রল ফিলিং স্টেশনও কিনেছে। একেবারে হার্ট অব দ্য সিটিতে। ওই যে বিখ্যাত 'কাবাব প্যালেস', তার ঠিক পাশেই। শুনেছি পেট্রল পাম্পের ব্যবসায় ওর একজন মারোয়াড়ি পার্টনার আছে। ওদের অয়েল ট্যাংকারও আছে নাকি গোটাকয়েক। ছোটা জলিলের একটা বড় ব্যাপার হল—অসম্ভব বিনয়ী। দেখে আপনি আন্দাজই করতে পারবেন না যে, লোকটা কী বিশাল টাকার মালিক! আর সন্ধের পরে ওর ওখানে পার্টি গেলেই মেহমান। বেশ কিছু দিন যাওয়া হয়নি ওর ঘরে, আজ আপনাকে নিয়ে যাব।"

ট্যাংরার কাছাকাছি যেতেই চামড়ার গন্ধ ভেসে এল বাতাসে। উৎকট গন্ধ। কৌশিক জিজ্ঞেস করল, 'এই গন্ধটা আপনাদের নাকে আর লাগে না বোধহয়?'

হেসে উঠল সায়ন্তন। 'আপনি আমার সঙ্গে কিছুদিন আসুন এখানে, আপনারও লাগবে না।'

'তা ঠিক, অভ্যাস এমনই ব্যাপার—।'

একটু প্রতিবাদ করার গলায় সায়ন্তন বলল, 'না-না, বিষয়টাকে আপনি ও ভাবে দেখবেন না। আপনি একবার চৌরঙ্গি, লিন্ডসে স্ট্রিটের ঝকঝকে জুতোর দোকানগুলোর কথা ভাবুন তো। কিংবা স্যুটকেস বা লেদার জ্যাকেটের কথা। লেদার গুড্‌স্ নিয়ে প্রতি বছর চোখ-ধাঁধানো একটা মেলাও হয় কলকাতায়। সেগুলোর কথা ভাবলে এই বিচ্ছিরি গন্ধটাকে মানিয়ে নেওয়া আপনার পক্ষে সহজ হবে। ওই যে ঝলমলে সব পোশাকআশাক আর বাহারি ব্যাগ আর জুতো—ওগুলোর একটা বড় নার্সারি হচ্ছে ট্যাংরা। বাঙালিরা আগে এই গন্দা ব্যবসায় আসত না, এখন এই বাতিকটা দূর হয়েছে কিছুটা। আমাদের দেশে লাভজনক ব্যবসা আছে অনেকগুলো। কিন্তু শৌখিন, খুঁতখুঁতে বাঙালি একশোটার মধ্যে নব্বইটাই বাতিল করে দেয়। আপনার কি মনে হয় না—এই ধারণাটা এবার পালটানো দরকার?'

একটু অপরাধী-অপরাধী মুখ করে জবাব দিল কৌশিক, 'অবশ্যই।'

ট্যাংরার রাস্তা ক্রমশই সরু হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। সরু আর বাঁকা, রাস্তা কোথাও কোথাও গোল হয়ে ঘুরে গেছে। রাস্তার এক পাশে মস্ত উঁচু পাঁচিলের ট্যানারি। চিনে-অধ্যুষিত এলাকা। তাদের অনেকটাই দেখা যাচ্ছিল পথের বাঁকে বাঁকে। একটা আলো-ঝলমলে বাংলো-ধাঁচের বাড়ির দিকে আঙুল তুলে সায়ন্তন বলল, 'এটা স্থানীয় চিনেদের একটা ক্লাব।'

ক্লাবঘর থেকে ওয়েস্টার্ন পপ মিউজিক ভেসে আসছিল।

কৌশিক হাসতে হাসতে বলল, 'ওরা হয়তো সিডনি অলিম্পিকের পারফরম্যান্স সেলিব্রেট করছে এখন। রাশিয়া শেষের দিকে উঠে না এলে মেডাল লিস্টে চিনই হত

সেকেন্ড। অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, রোমানিয়া, ব্রিটেন—কত পেছনে। মালেশ্বরীর সুবাদে একটামাত্র ব্রোঞ্জ জুটেছে একশো কোটির দেশ ভারতের, কিন্তু কিচ্ছু এসে যায় না—অলিম্পিকে এশিয়ার জয় নিয়ে মাতামাতি করব আমরা।'

সায়ন্তন হাসতে হাসতে বলল, 'ঠিকই বলেছেন। ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবলে সাপোর্টার হয়ে যাব ব্রাজিল কিংবা আর্জেন্টিনার, আর অলিম্পিকে চায়নার। আচ্ছা, গণতন্ত্রের লাইন থেকে এগোলে তো আমেরিকাকেও সাপোর্ট করা যায়। আটত্রিশটা সোনা পেয়ে পদকতালিকার মাথায় আছে আমেরিকা। বলুন এবার—ফার্স্ট হতে চান, না থার্ড?'

কৌশিক হেসে উঠে কিছু বলার আগেই গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল একটা সরু দুমুখো রাস্তার সামনে।

সায়ন্তন বলল, 'পাশের ওই বাড়িটাই হল আমার সোল এজেন্ট চ্যাংয়ের বাড়ি।'

ড্রাইভার ছোট্ট করে একবার হর্ন বাজিয়ে নেমে পড়েছিল গাড়ি থেকে।

একটু বাদেই পাশের বাড়ি থেকে একজন চিনেম্যান বেবিযে এল। মাঝবয়সী। পরনে হাতাওয়ালা সাদা গেঞ্জি আর হাফপ্যান্ট। ওকে দেখেই গাড়ি থেকে নেমে পড়েছিল সায়ন্তন। এগিয়ে গিয়ে হাতে হাত মিলিযে নেওয়াব পবে একটু নিচু গলায শুরু করেছিল ব্যবসার কথাবার্তা। চটপটে ড্রাইভার গাড়ির ডিকি খুলে দু হাতে দুটো প্যাকেট তুলে নিয়ে খোলা দরজা দিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল। ফিরল বড়সড় চেহারার একটা চিনে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে, তারপর দুজনে মিলে বেশ কয়েকবাব যাতায়াত করে ডিকির সব মাল ঢুকিয়ে দিল এজেন্টের ঘরে।

মাল সাপ্লাই হয়ে যাওয়ার পরেও এজেন্টের সঙ্গে দু-তিন মিনিট কথা চালিয়েছিল সায়ন্তন, তারপর গাড়িতে ফিরে এসে ড্রাইভারকে বলল, 'চলো, এবার ছোটা জলিলেব কারখানায়।'

একটু বাদেই এসে গেল কারখানা। বিশাল উঁচু পাঁচিল-ঘেরা কারখানা। সামনে মস্ত গেট। দেয়াল ঘেঁষে গাড়ি পার্ক করেছিল ড্রাইভার।

কৌশিককে সঙ্গে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পডল সায়ন্তন। লোহার চাদরে মোড়া বিশাল গেটের ধারে একটা ছোট দরজা। সায়ন্তন দরজার কাছাকাছি আসতেই খুলে গিয়েছিল দরজা। ভেতরে ঢোকার পরে দারোয়ানকে দেখতে পেয়েছিল কৌশিক।

দারোয়ান দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল আবার। পেছন ফিরে কৌশিক দেখে নিল, দরজায় ছোট্ট একটা ফুটো আছে আগন্তুকদের দেখার জন্য।

গেটের এ পাশে মস্ত বড় একটা উঠোন। উঠোনের একধারে সার দিয়ে রাখা অনেকগুলো তেলের ড্রাম। ওদিকে কারখানার বিরাট শেড। বাতাসে কাঁচা চামড়ার উৎকট গন্ধ। তবে ছোটা জলিলের অফিসঘরটা দেখে বাইরের এই দৃশ্য কল্পনা করা যায় না। ঝকঝকে-তকতকে বিশাল অফিসঘর। একদিকে ঘোড়ার খুরের ধাঁচে মস্ত টেবিল, উলটো দিকে দুসারি চেয়ার। দেয়াল ঘেঁষে দামি সোফা সেট। সোফা সেটের দুদিকে ফুল গাছের বাহারি টব। ছোটা জলিল ভেতরের কারখানায় গেছে। বেয়ারাগোছের লোকটা সায়ন্তনের চেনা। বেশ আপ্যায়ন করে ওদের বসিয়ে মালিককে খবর দিতে গেল।

একটু বাদেই এসে গেল ছোটা জলিল। মানুষটির চেহারা বিশাল। গায়ে কাজ-করা সাদা পাঞ্জাবি, পরনে চেক কাটা লুঙ্গি। মুখে চাপদাড়ি। চেহারাই বলে দিচ্ছিল লোকটির

পয়সা, ক্ষমতা এবং আত্মবিশ্বাস—তিনটেই বিরাট মাপের। এমন একটি লোকের গলা থেকে গাঁক-গাঁক করা কণ্ঠস্বর বার হওয়ার কথা। কিন্তু কৌশিককে অবাক করে দিয়ে অসম্ভব বিনীত ভঙ্গিতে বাধো-বাধো গলায় হাত জোড় করে ছোটা জলিল বলল, 'নোমোস্কার সান্তনবাবু, বোসেন। আমার মাল এনেছেন তো?'

সায়ন্তন হেসে বেশ সহজ গলায় বলল, 'আজকের মালগুলোর মধ্যে একটাও আপনাকে দেওয়ার মতো ছিল না। খুব ভাল স্টিল পাব দু-তিন দিনের মধ্যে। পেলেই আপনার মাল বানাব।'

বুকের ওপব জোড়া হাত জলিল এখনও খোলেনি। আরও বিনীত ভঙ্গিতে বলল, 'সামনের হপ্তায় আপনার মাল না পেলে কিন্তু আমার কাম রুখে যাবে। ফেন্সি প্রোডাক্টের চামড়া আছে, ওই চামড়ায় আমি দুসরা কোনও কোম্পানির ব্লেড লাগাব না।'

সায়ন্তন আবার হাসল। 'আপনি একদম চিন্তা করবেন না, মাল ঠিক সময় আপনার ঘরে পৌঁছে যাবে। এখন এর সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিই। আমার পুরানা দোস্ত—মিস্টার মিত্র।'

খুলে আসা হাত আবার জোড়া করে বিনীত ভাবে জলিল বলল, 'বোসেন মিত্‌রা সাহাব।'

পালটা নমস্কার করে কৌশিক বলল, 'আপনার কথা সায়ন্তনের কাছে অনেক শুনেছি।'

'কী শুনেছেন? বুরা কুছু?'

সায়ন্তন গলা ছেড়ে হেসে উঠে বলল, 'হ্যাঁ, সব খারাপ। ফিরে যাওয়ার সময় আপনার নামে আরও খারাপ-খারাপ কথা বলব।'

জলিলও হাসল। 'আমি ভি বলতে পারে আমার নামে অনেক খারাব কথা। আখুন আপনারা মেহেরবানি করে বোসেন। কী খাবেন বোলেন? মাটন বিরিয়ানি বলব?'

"যদি 'না' বলি আপনি আর একটা খাবারের কথা বলবেন। সেটাও 'না' বললে আরও একটা। 'হ্যাঁ' না বলা পর্যন্ত আপনি তো থামবেন না। আপনার এই খারাপ হ্যাবিটটার কথা আমি আমার দোস্তকে এখানে আসার সময় বলেছি।"

'বহোত্ আচ্ছা, কিন্তু আপনারা আগে তো বসবেন।'

সোফায় দুই প্রান্তে বসে পড়ল সায়ন্তন আর কৌশিক। উলটো দিকের চেয়ারে জলিল।

গল্প শুরু হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গই চলে এল ড্রিংক্‌স। হার্ড ড্রিংক্‌স কৌশিকের চলে না, কিন্তু সেটা ও জানাল না। দুজন ড্রিংকারের পাশে একজন নন-ড্রিংকার থাকলে গল্প চট করে জমে ওঠে না। তা ছাড়া কৌশিক চাইছিল না যে, ওর দিকে ওদের আলাদা করে নজর পড়ুক।

ঘরের চড়া আলো নিভিয়ে নরম একটা আলো জ্বেলে দেওয়া হয়েছিল। নরম আলোর মধ্যে তিনটে হুইস্কির গ্লাস শূন্যে তুলে 'চিয়ার্স' করার পরে দুটো চুমুক পড়ল গ্লাসে। তৃতীয়টা চুমুকের ভঙ্গি। গ্লাস একবার ঠোঁটে ঠেকিয়ে হাতে ধরে রেখেছিল কৌশিক। ওর ছক কষা হয়ে গিয়েছিল। ঠিক পাশেই আছে বাহারি টবে পাতাবাহারের গাছ। খুব সাবধানে ওদের নজর বাঁচিয়ে গাছের গোড়ায় জলমেশানো অ্যালকোহল ঢালতে হবে।

এই কাজটা করতে খুব একটা অসুবিধের মধ্যে পড়তে হয়নি কৌশিককে। কেননা ওদের কথা হঠাৎই গম্ভীর একটা বিষয়ের দিকে ঘুরে গিয়েছিল। কোর্ট রায় দিয়েছে,

জনস্বাস্থ্যের কারণে শহরের প্রান্ত থেকে এই ট্যানারিগুলো অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

কিন্তু সরাও বললেই তো আর সরানো যায় না। এতগুলো ট্যানারি, চটপট এগুলো সরিয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। প্রচুর জায়গা দরকার, ভাল শেড দরকার। যথেষ্ট পরিমাণ বিদ্যুৎ আর জলেরও প্রয়োজন। দূরে যাওয়া মানে এক ধাক্কায় ট্রান্সপোর্টেশনের খরচও বেড়ে যাওয়া অনেকখানি।

আলোচনা গভীর আর একটু উত্তপ্ত হলে বুঝি গ্লাস ফুরোয় তাড়াতাড়ি। অল্প সময়ের মধ্যেই তিন নম্বর গ্লাসে চলে এসেছিল ওরা। কৌশিক একটু-একটু করে দুটো গ্লাসই ঢেলে দিয়েছে টবের মধ্যে। গাছের প্রাণ আছে—বিজ্ঞানী জানিয়েছেন। কিন্তু হুইস্কি ঢাললে গাছ মাতাল হয় কি না—সে খবর আজ পর্যন্ত কেউ দেয়নি। উদ্ভট চিন্তাটা মাথায় খেলে যেতেই কৌশিক মাঝেমধ্যে আড়চোখে পাতাবাহারের গাছটাকে দেখে নিচ্ছিল।

তিন নম্বর গ্লাসের মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছবার পরে কৌশিক উঠে পড়ে বলল, 'আপনার টয়লেটটা তো বাইরে?'

'হাঁ-হাঁ, সিধা চোলে গিয়ে ডাহিনা।'

কৌশিক বেরিয়ে এসে নির্দেশ মতো ডান দিকের পথ ধরল। ডানদিকে ঘুরেই টয়লেট। তার পাশে আরও তিনটে নিস্তব্ধ ঘর। কেউ কোথাও নেই। কৌশিক দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসে টয়লেটের পাশের ঘরে উঁকি মারল। ওদিকের কারখানার খানিকটা আলো এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে। ঘরে বেশ কিছু প্যাকিং বক্স।

তার পরের ঘরে উঁকি মেরেই চমকে উঠেছিল ও। ভোলা আর পচন গোলপাতার একটা ঝুড়ি তুলেছিল নৌকোয়। ঠিক সেই ধরনের চারটে ঝুড়ি এখানে। শেষের ঘরটা তালা দেওয়া। ঘর বন্ধ, কিন্তু ভেতরে মৃদু শব্দ। গোয়েন্দা দরজায় দুবার টোকা মারতেই ভেতর থেকে জড়ানো চাপা আওয়াজ ভেসে এল।

ঘরটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে প্রায় দেড়-মানুষ উঁচু একটা পাঁচিল। গোয়েন্দার মজবুত ও নমনীয় শরীরটা খুব দ্রুত অনেক অসাধ্যসাধন করতে পারে। ওই পাঁচিল বেয়ে একটু উঠে বাইরে উঁকি মারা ওর কাছে কিছুই নয়। পাঁচিলের ওপাশে উঁকি মেরে কৌশিক দেখল, দু-দেয়ালের মাঝখানে খুব সরু একটা গলিপথ। পথটা পৌঁছেছে বড় রাস্তায়।

যা-কিছু দেখার সব দেখে নিয়ে কৌশিক ফিরে এসেছিল ছোটা জলিলের ঘরে।

ওদের তিন নম্বর গ্লাস শেষের দিকে। জলিলের চোখে আবছা লাল রং ধরেছে। কৌশিকের দিকে তাকিয়ে ও বলল, 'মিত্রা সাহেব, আপনার গিলাসটা শেষ করেন, আমরা আর একটা করে নিই।'

কৌশিক হাত জোড় করে একটু জড়ানো গলায় বলল, 'মাপ করবেন জলিল সাহেব আমি তিনটের বেশি খাই না।'

'ঠিক আছে, কোই বাত নেহি। এই বেপারে আমি কারও ওপর জবরদস্তি করি না। তো, খানা লাগাতে বলি?'

'আপনারা আপনাদের সুবিধে মতো বলুন।'

জলিল নিজের আর সায়ন্তনের গ্লাসে দুটো পেগ ঢেলে নিয়ে হাঁক পাড়ল—'এ করিম, খানা লাগা।'

কৌশিক অবাক হয়ে লক্ষ্য করল, জলিলের এই গলাটা বেশ ভারী আর কর্কশ। এখানে যে গলায় ও কথা বলছে সেই গলাটার সঙ্গে ওই গলার কোনও মিল নেই।

হাঁক পাড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই খানা এসে গিয়েছিল। মাটন বিরিয়ানি আর চাঁপ। সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল ঘরের মধ্যে। দুর্ধর্ষ রান্না। কৌশিক যতটা তৃপ্তি করে খেল, চার-পাত্তর-খাওয়া ওই দুজনের তৃপ্তি বোধহয় ততটা ছিল না।

খাওয়া শেষ হওয়ার একটু পরে উঠে পড়েছিল ওরা।

ছোটা জলিলের মুখে সায়ন্তনের নাম 'সান্তন'। বিদায় দেওয়ার মুখে জলিল বলল, 'সান্তনবাবু, আপনি হামার মাল বহোত জলদি ভেজবেন, দেরি হলে কারখানার কাম পুরা রুখে যাবে।' তারপর কৌশিকের হাত ঝাঁকিয়ে বলল, 'ফির আসবেন মিত্রা সাহাব।'

হাত নাড়িয়ে বিদায় নেওয়ার পরে গাড়িতে গিয়ে বসল সায়ন্তন আর কৌশিক। গাড়ি ছোটার সময় কৌশিক ছোটা জলিলের কারখানার পাশের সরু গলিপথটা খুব ভাল করে দেখে নিয়েছিল আর একবার।

ফেরার পথে কৌশিককে ওর বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়েছিল সায়ন্তন। গোটা পথটা ও শুধু একটা কথারই ভাব সম্প্রসারণ করে গিয়েছিল নানা ভাবে। সায়ন্তনের মূল কথাটা ছিল : সকাল সাতটায় আমার দিন শুরু হয়। দিনভর খাটি। সন্ধেবেলায় একটু রিল্যাক্স করি। এটা কি অন্যায়? কী, অন্যায়?

প্রশ্নের উত্তরে গোটা পথে কৌশিককে কমপক্ষে পঁচিশবার 'না' বলতে হয়েছিল।

বাড়ি ফেরার পরেই ওর তথ্যপ্রযুক্তির ঘরে ঢুকেছিল কৌশিক। না, আর কোনও ই-মেল আসেনি। পকেট থেকে নোটবুক আর কলম বার করে খুদে-খুদে হরফে অনেক কিছু লিখে ফেলল কৌশিক। ভাষাটা সাঙ্কেতিক, কারও হাতে পড়লেও কিছুই বুঝতে পারবে না। রহস্য সমাধানের এ এক জটিল অঙ্ক। সিঁড়ি-ভাঙা অঙ্কের মতো অঙ্কটা তিন-চার পাতা এগোবার পরে থেমেছিল।

নোটবই টেবিলের ওপরে রেখে দিয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু করে দিয়েছিল গোয়েন্দা। কপালে ভাঁজ ফুটে উঠছিল মাঝেমধ্যে। অনেকক্ষণ পায়চারি করার পরে মস্ত একটা ই-মেল পাঠাল রনিকে। তারপর ফোন করল কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা-প্রধানকে। অসম্ভব নিচু গলায় কিছুক্ষণ কথা চালাল ওর সন্দীপদার সঙ্গে। কথা শেষ হওয়ার পরে থুতনিতে হাত ঠেকতেই মনে পড়ে গিয়েছিল নকল দাড়ি-গোঁফের কথা। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাড়ি-গোঁফ খুলে রেখে দিল মেক-আপ বক্সে।

ঘরের মধ্যে আরও কয়েকবার পায়চারি করার পরে ডিভানের ওপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়েছিল কৌশিক। মনে মনে শরীরের সব গ্রন্থিই ও শিথিল করে দিয়েছিল। তবে ঘুমোবার জন্যে নয়, এ ভাবে শুয়ে থাকলে চমৎকার বিশ্রাম পায় শরীর। দেহের কোথাও ওর কোনও রকম নড়াচড়া ছিল না।

এক সময় উঠে পড়ে ঘড়ি দেখল। দেড়টা বাজে। আর একবার মেক-আপ বক্স হাতে নিয়ে আয়নার সামনে বসে পড়ল। দক্ষ হাতে নাকের নীচে পুরু একটা গোঁফ বানিয়ে ফেলল। গোঁফের দুটো কোনা মুখের দু দিকে একটুখানি ঝুঁকে পড়েছিল। এই গোঁফটার নাম নাকি হ্যান্ডেলবার গোঁফ। গালে একটা আঁচিলও বানিয়ে ফেলল। কৌশিক সিঁথি কাটে চুলের এক ধারে। এবার চুল আঁচড়াল অন্য ভঙ্গিতে। মধ্যিখানে সিঁথি। চুলের

দু পাশে একটুখানি ল্যাকার লাগিয়ে লম্বা চুল চেপে ধরতেই চুলটা বেশ সেট হয়ে গিয়েছিল।

একটু ঘুরেফিরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আয়নার দিকে তাকিয়ে গোয়েন্দা যাকে দেখল তার সঙ্গে কৌশিক মিত্রের খুব একটা মিল নেই। চটপট জিনসের ট্রাউজার্স আর একটা জ্যাকেট পরে নিল গোয়েন্দা। জ্যাকেটের পকেটে ঢোকাল সরু অথচ মজবুত নাইলনের একটা বান্ডিল, ভাঁজ-করা একটা ছুরি, মাস্টার-কি, টর্চ আর পিস্তল। অন্য পকেটে গাড়ির চাবি।

একতলায় গ্যারাজ। জলপাই রঙের ছোট্ট মারুতিটা নিয়ে কৌশিক যখন পথে বেরুল তখন ঠিক দুটো বাজে। সন্ধের সেই ফুরফুরে হাওয়া এখন বেশ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। ঠাণ্ডা রাতে পথে লোকজন ধরতে গেলে ছিলই না। গাড়িও নামমাত্র। পঁয়ত্রিশ মিনিটের ড্রাইভে ও পৌঁছে গিয়েছিল ট্যাংরার চিনেদের সেই ক্লাবের সামনে। জায়গাটা আগেই ও ঠিক করে রেখেছিল। বন্ধ ক্লাবের সামনে পাঁচ-সাতটা গাড়ি দাঁড় করানো। ক্লাব-ঘরের সদস্যদের অস্থায়ী গ্যারেজ বোধহয়। খুব সাবধানে ওই গাড়িগুলোর পাশে মারুতিকে পার্ক করে গাড়ি থেকে নেমে লম্বা পায়ে হাঁটা দিল সামনের দিকে।

রাস্তায় লোকজন নেই। গোল হয়ে শুয়ে থাকা দু-তিনটে কুকুর ঘাড় তুলে সন্দিগ্ধ চোখে ওকে দেখে নিল। জোর পায়ে হেঁটে অল্প সময়ের মধ্যেই কৌশিক পৌঁছে গিয়েছিল ছোটা জলিলের কারখানার পেছনের সরু গলিপথের মুখে।

চারদিক সতর্ক চোখে একবার দেখে নিয়েই গলির মধ্যে ঢুকে পড়েছিল ও। নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছবার পরে কয়েক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে বোঝার চেষ্টা করল—কেউ কোথাও জেগে আছে কি না। না কোথাও কোনও শব্দ নেই। নিশ্চিন্ত হয়ে দেড় মানুষ উঁচু পাঁচিল টপকে ভেতরে ঢুকে পড়েছিল কৌশিক। কারখানার গেটের আবছা আলো এসে পড়েছে ওখানে। কেউ কোথাও নেই।

নির্দিষ্ট ঘরের তালা খুলে ঘরে ঢুকতেই আবার সেই জড়ানো শব্দটা ভেসে এল। আস্তে আস্তে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে চারদিকের টর্চের আলো ঘোরাল গোয়েন্দা। ঘরের মধ্যে হাত-পা বাঁধা একটা লোক কম্বলের ওপর পড়ে আছে।

পা টিপে টিপে লোকটার কাছে এসে হাঁটু মুড়ে বসে ফিসফিস করে গোয়েন্দা বলল, 'মুখার্জিবাবু, আমি কৌশিক। আমি আপনার মুখের টেপটা খুলে দিচ্ছি। কিন্তু সাবধান, খুব নিচু গলায় কথা বলবেন।'

॥ ২৯ ॥

আজ বোধহয় একটু বেশি ভোরবেলায় ঘুম ভেঙে গিয়েছিল পূর্ণদার। ঘুম ভাঙতেই উঠে পড়েছিলেন। কেবিন থেকে দু পা বাড়াতেই লঞ্চের খোলা ছাত। ছাতে এসে চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে আর একবার মুগ্ধ হলেন তিনি।

সকালটা এখানকার অন্যান্য সকালের মতোই। আকাশ লাল করে সূর্য উঠছে, আকাশে একগাদা পাখি। একদিকে লালচে-সবুজ সুন্দরবনের ঠাসা জঙ্গল, অন্যদিকে জনপদের

চিহ্ন-ধরানো লম্বা তীরভূমি। নদীর এখানে-সেখানে জেলে নৌকো। মাছ ধরার কাজে ব্যস্ত জেলেরা। মৃদু ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। এই সকালটার সঙ্গে কাল-পরশুর সকালের কোনও তফাত নেই এমনিতে, কিন্তু খুঁজলে পরে একটা নতুন-কিছু পাওয়া যাবেই।

মুগ্ধ চোখে চারপাশে তাকতে তাকাতে পূর্ণ চ্যাটার্জির তাই অন্তত মনে হচ্ছিল। প্রকৃতি কখনও বুঝি নিজেকে নিঃশেষ করে হাজির করে না। দ্রুত চোখ ঘোরালে মনে হবে সকালগুলো একই ধরনের। কিন্তু একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, এই সকালটার সঙ্গে কাল-পরশুর সকালের অনেক তফাত। তফাতগুলো ধরার কাজে হঠাৎই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন পূর্ণ চ্যাটার্জি।

সকাল আরও একটু পরিষ্কার হওয়ার পরে পারভেজ এক কাপ চা নিয়ে এসে এক গাল হেসে বলল, 'আপনি আজ দেখছি অনেক ভোরে উঠে পড়েছেন। গোলমালে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল বুঝি?'

'গোলমাল! কিসের গোলমাল?'

'পুলিশের ভুটভুটিয়া ছোটাছুটি করছিল। তারপর ছিল ওদের হাঁকডাক।'

অবাক হলেন পূর্ণদা। 'কাদের হাঁকডাক! কিসের ছোটাছুটি!'

"আপনি তাহলে খেয়াল করেননি। পুলিশের হাঁকডাক শোনার পরে জেলেদের কাছ থেকে খবর নিয়ে আসল বেত্তান্তটা জানতে পারলাম আমরা।'

পারভেজের বাড়ানো হাত থেকে চায়ের কাপটা নিয়ে পূর্ণদা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী বেত্তান্ত?'

'গঞ্জের পুলিশ আর বনের পুলিশ একসঙ্গে কয়েকটা গাঁয়ে তল্লাশি চালিয়েছে।'

'কেন?'

'চোরাই মাল ধরার জন্যে।'

'পেয়েছে কিছু?'

'পাঁচখানা হরিণের চামড়া আর একখানা বাঘের।'

আঁতকে উঠলেন পূর্ণ চ্যাটার্জি। 'অ্যাঁ! বলো কী?'

পারভেজ দাঁত বার করে বলল, 'এই সব কাম আজকাল খুব চলছে। জঙ্গলে চোরাশিকারি এখন আগের তুলনায় বেড়ে গেছে অনেক। বাড়বে নাই বা কেন? এই কারবারে তো এখন দেদার পয়সা।'

'গাঁয়ের লোকেরা চোরাশিকারিদের কথা পুলিশকে জানায় না?'

ঠোঁট উলটে জবাব দিল পারভেজ, 'জানাতে ওদের ভারী বয়ে গেছে, উলটে—।'

'উলটে কী?'

আশেপাশে কেউ নেই, তবু গলার স্বর নীচে নামিয়ে বলল, 'ওরা মুখে অন্য কথা বলে। তার কিছুটা অবিশ্যি সত্যিও। গাঁয়ে কখনও যদি বাঘ ঢোকে, চোরাশিকারিদের খবর দিলে ওরা সঙ্গে সঙ্গে আসে। পারমিট নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে মধু-মোম-কাঠ আনতে গিয়ে কেউ যদি বাঘের হাতে মরে, চটপট সেই লাশ নিয়ে আসার ব্যাপারেও চোরাশিকারিদের সাহায্য পাওয়া যায়।'

একটু বিরক্ত হয়ে পূর্ণদা বললেন, 'আরে, এ সব কাজে সাহায্য করার জন্যে বনরক্ষীরা

আছে, পুলিশরা আছে ; তাদের কাছে খবর পাঠালেই তো হয়। সেটাই তো শুনেছি নিয়ম—।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, সেটাই নিয়ম। তবে তাদের তো সব সময় ধারেকাছে পাওয়া যায় না। তা ছাড়া চোরাশিকারিদের খবর দিলে অনেক পয়সাও পাওয়া যায়।'

'পয়সা! কেন?'

ধারেকাছে কেউ নেই, তবু চারদিক আর একবার দেখে নিল পারভেজ। তারপর গলার স্বর আরও খানিকটা নামিয়ে বলল, 'দু-বছর আগে আমাদের গাঁয়ে ঢুকে একটা গরু ধরেছিল বাঘ। জঙ্গলের ধার পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়ে কিছুটা খেয়েছিল। তার পর গাঁয়ের লোক উঠে পড়ে লাঠিসোটা নিয়ে গিয়ে বাঘ তাড়িয়েছিল। নিয়ম হল এবার বনরক্ষীদেব খবর দেওয়া। তা, আমাদের গাঁ থেকে বনরক্ষীদের আপিস অনেক দূরে। চাষবাসের কাজ ফেলে রেখে কে যাবে বলেন ওদের খবর দিতে! ওদিকে বাঘের হানার রকমসকম সবাই তো জানে। বাঘ রাত্তিরে ওই আধ-খাওয়া গরু খাওয়ার জন্যে আবার আসবে। কত বড় বাঘ কে জানে! একটা গরু নিয়েই যে থামবে—তারও কোনও মানে নেই। খবর পাঠানো হল তখন চোরাশিকারিদের কাছে। ওরা এসে গাঁয়ের মাতব্বরদের অনেক টাকা দিয়ে বলল, 'গরু মারার একটা শোধ তোলা দরকার এবার।'

'শোধ! কী রকম?'

'সে বড় সাঙঘাতিক শোধ। বিষ মাখানো হল মড়িতে। তারপর বন্দুক হাতে গাছের ওপর লুকিয়ে থাকল দুই চোরাশিকারী। বন্দুক আর চালাতে হয়নি ওদের, বিষ মাখানো মড়ি খেয়েই বাঘ মরল।'

'তারপর?'

'তারপর চোরাশিকারিরা বাঘের ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে গাঁয়ের মাতব্বরদের হাতে আরও অনেক টাকাপয়সা গুঁজে দিয়ে পালাল।'

'কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার!'

সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে পারভেজ বলল, 'আমি কিন্তু তখন বাবু গাঁয়ে ছিলাম না। সব শোনা কথা। শোনা কথা কদ্দূর সত্যি কে জানে। মিথ্যেও হতে পরে—।'

মুখ ফসকে বেরিয়ে-পড়া কথাগুলো শেষের দিকে মিথ্যে হিসেবে দাঁড় করাবার জন্যে একটু বুঝি ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল পারভেজ। পূর্ণদা বুঝলেন, পয়সা ছড়িয়ে গাঁয়ের গরিব মানুষদের হাত করার কৌশলটা চোরাশিকারিরা খুব ভালভাবেই রপ্ত করেছে।

গাঁয়ের মানুষরা শুধুই যে গরিব তা নয়, অশিক্ষা আর অসচেতনতাও ওদের অন্ধকারের মধ্যে রেখে দিয়েছে। আচমকা গাঁয়ে ঢুকে বাঘ একটা গরু মারলে গাঁয়ের অনেকেই বিশ্বাস করে ফেলে—শোধ তোলার একটাই পথ ; বাঘটাকে মেরে ফেলো। বাঘ আজ গরু মেরেছে, কাল মানুষ মারবে। আর, মানুষখেকো হলে তো কথাই নেই। গাঁয়ের লোকদের ভুল বোঝানোর কাজ শুরু করে দেয় তখন চোরাশিকারিরা। প্রথমে ভয় পাওয়ানো, তার পর লোভ দেখানো ; সব শেষে পরিত্রাতার ভূমিকায় নামার অভিনয় করে পোচাররা।

বাঘ মারা যে বেআইনি—ব্যাঘ্র প্রকল্পের সুবাদে সে খবর গাঁয়ের সব লোকেরই জেনে যাওয়ার কথা। কিন্তু জানা আর বোঝার মধ্যে অনেক সময় ফাঁক থেকে যায় অনেকখানি।

দারিদ্র্য ওই ফাঁক ভরাট করার ব্যাপারে মস্ত একটা বাধা। চোরাশিকারিরা সে খবর জানে। জানে বলেই কিছু পয়সা ছড়িয়ে দিয়ে স্বার্থসিদ্ধির কাজে নেমে পড়তে পারে অনায়াসে।

সকাল ন'টার সময় লঞ্চের ছাতে ব্রেকফাস্টের টেবিলেও কথা উঠল এই বিষয়ে। ডেভিস একটু বুঝি উত্তেজিত হয়েই বলল, 'দেখুন মিস্টার চ্যাটার্জি, নিজেকে বাঁচাবার অধিকার সবারই আছে। কোর-এরিয়া থেকে বাঘ যদি বেরিয়ে এসে গ্রামের লোকদের ওপর হামলা করে, দে মাস্ট ফাইট ব্যাক।'

পূর্ণদা একটা ঢোক গিলে বললেন, 'কিন্তু বাঘকে আবার তাড়িয়ে গভীর জঙ্গলে ঢোকাবার দায়িত্ব তো বনরক্ষীদের। কয়েকটা রিপোর্টে পড়েছি বাঘকে ঘুমপাড়ানি গুলি মেরে ঘুম পাড়িয়ে খাঁচাবন্দি করে রিজার্ভ ফরেস্টে ছেড়ে এসেছে ফরেস্ট-গার্ডরা।'

তর্ক করার গলায় জবাব দিল ডেভিস, 'ট্রু, কিন্তু গ্রামের লোকদের মুখে শুনেছি ফরেস্ট-গার্ডদের পাওয়া যায় না সব সময়। একটা কারণ, গার্ডদের নাম্বার ইনঅ্যাডিকোয়েট। বিশাল ফরেস্ট, ভালভাবে পাহারা দিতে গেলে যত বড় ফোর্স থাকা দরকার, তত বড় ফোর্স নাকি নেই। কিন্তু ভিলেজারদের কাছে পোচার্স আর অলওয়েজ অ্যাভেলেব্‌ল। ওরা গ্রামের লোকদের প্রোটেকশন দেয়, টাকা দেয়। সেই জন্যেই চোরাশিকারিদের সাপোর্ট করে গ্রামের লোকরা। আমি একটা ঘটনার কথা বলছি আপনাকে। আপনার মনে আছে কি না জানি না। বছর দু-তিন আগে উত্তরপ্রদেশ আর অ্যাডজয়েনিং হিমাচলপ্রদেশের ফুট্‌হিল্‌সে লেপার্ডদের খুব উৎপাত শুরু হয়েছিল। গাঁয়ের লোকদের ছোট ছেলেমেয়েরা উধাও হয়ে যাচ্ছিল প্রায়ই। তার পর তাদের হাফ-ইটেন বড়ি এক-দেড় মাইল দূরের জঙ্গলে পাওয়া যেত। ঘটনাটার কথা মনে পড়ছে আপনার? কাগজে খুব বড়-বড় করে বেরিয়েছিল—।'

সায় দিয়ে বললেন পূর্ণদা, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, মনে পড়েছে এবার।'

'ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে বারবার রিপোর্ট করেও সুফল পায়নি বলে খেপে গিয়েছিল ওই সব গাঁয়ের লোকেরা।'

'রাইট। অ্যাংরি ভিলেজার্স ব্লেম্‌ড অ্যাপেথেটিক ফরেস্ট অফিসিয়াল্‌স। তারপর কী হয়েছিল মনে পড়ছে আপনার?

দুদিকে মাথা নাড়ালেন পূর্ণদা। 'না, তার পরে কী ঘটেছিল মনে করতে পারছি না।'

ধূর্ত একটা হাসি ফুটে উঠেছিল ডেভিসের ঠোঁটে। 'আমার মনে আছে। আমি তখন ওই এলাকাটার কাছাকাছি ছিলাম বলেই বেশি করে মনে পড়ছে। প্রায় প্রতি রাতেই লেপার্ডরা গাঁয়ের বাচ্চাদের টেনে নিয়ে যেত জঙ্গলে। তারপর হঠাৎ দেখা গেল, অত লেপার্ডের একটাও আর গ্রামে ঢুকছে না। কী ভাবে এটা হল বলুন তো?'

'কী ভাবে?'

'ফরেস্ট গার্ডরা কিন্তু এই সব লেপার্ডকে তাড়াতে পারেনি। ওই কাজটা করেছিল পোচাররা।'

অবাক হলেন পূর্ণদা। 'চোরাশিকারিরা লেপার্ডদের তাড়িয়ে দিয়েছিল?'

কথাটা শুনে অদ্ভুত ভাবে হেসে উঠে ডেভিস বলল, 'তাড়ানো মানে দুনিয়া থেকেই তাড়িয়ে দেওয়া। গাঁয়ের লোকেরা কিন্তু খুব খুশি হয়েছিল। ওদের শত্রুদের একেবারে শেষ

করে দিয়েছিল পোচাররা। গাঁয়ের মধ্যে রাতের বেলায় বাচ্চারা আবার আগের মতো ঘোরাফেরা করতে শুরু করল। আর কোনও ভয় ছিল না।'

ডেভিসের কথায় পূর্ণদার কপালে ভাঁজ পড়েছিল কয়েকটা। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে বললেন,—'লেপার্ডগুলো গ্রামে আসা বন্ধ করেছিল—এটা ঠিক আছে। কিন্তু আপনি এটা কী করে ধরে নিলেন যে, ওই লেপার্ডগুলোকে চোরাশিকারিরা মেরে ফেলেছে?'

বাহাদুরি নেওয়ার ভঙ্গিতে হেসে উঠেছিল ডেভিস। 'ওই ঘটনার কয়েক দিন পরে আমি গাজিয়াবাদে গিয়েছিলাম। যাওয়ার পবেই শুনি, ফরেস্ট গার্ডরা পঞ্চাশটা লেপার্ডের স্কিন উদ্ধার করেছে। এই উদ্ধারের ব্যাপাবে গার্ডদের অবশ্য কোনও ক্রেডিট ছিল না, ইট ওয়াজ জাস্ট অ্যান অ্যাকসিডেন্টাল সিজার। দিল্লি আর উত্তরপ্রদেশে ওই বছরেই প্রায় তিনশো লেপার্ড-স্কিন ধরা পড়েছিল।'

'তিনশো!' প্রায় আঁতকে উঠেছিলেন পূর্ণদা।

একটা মোটা স্যান্ডুইচে বেশ বড় একটা কামড় বসিয়ে ডেভিস বলল, 'লোপার্ড মারা পড়েছে শুনে আপনি খুব কষ্ট পাচ্ছেন। কিন্তু মানুষের বাচ্চা মারা পড়া তো আরও দুঃখের। তাই না?'

'নিশ্চয়ই দুঃখের, কিন্তু সেই দুঃখ দূর কবার বাস্তা তো পোচিং নয়। আপনি কি চোরাশিকারিদের সাপোর্ট করেন?'

আবার একটা ধূর্ত হাসি ফুটে উঠেছিল ডেভিসের ঠোঁটে। স্যান্ডুইচে আর একটা কামড় দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, এই ঘটনাটায় আমি ওদের সার্পোটি করি। ঘর থেকে বাচ্চা তুলে নিয়ে যাচ্ছে লেপার্ড। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে জানানো হয়েছে, কিন্তু তারা তো সেফটি মেজার্স নিতে পারেনি। গাঁয়ের মানুষরা ওই অবস্থায় কী করবে বলুন? আমি বলব, তারা চোরাশিকারিদের কাছে গিয়ে ঠিক কাজই করেছে। চোরাশিকারিরা লেপার্ডদের মেরে মানুষের বাচ্চাদের বাঁচিয়েছে। ঠিক কাজ করেনি কি?'

ডেভিসের যুক্তির বহর দেখে একটু অস্থির হয়ে পড়েছিলেন পূর্ণদা। গলা সামান্য তুলে বললেন, 'চোরাশিকারিদের গাঁয়ের লোকদের সেভিয়ার ভাবার কোনও কারণ নেই। গাঁয়ের লোকের ওপর বাঘ-লেপার্ডের হামলা না হলেও পোচাররা ওদের মারে। কারণ ওই সব অ্যানিম্যালের স্কিন ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে চোরাচালান দিতে পারলে বিরাট লাভ। এই সব পোচার্স অ্যানিমাল-ট্র্যাফিকার্স, ক্রিমিনাল ছাড়া আর কিছুই নয়। পারহ্যাপস্ দে আর দ্য ওয়ার্স্ট কাইন্ড অব ক্রিমিনালস। লুপ্তপ্রায় প্রাণী যে ক'টা আছে এখনও, তাদের ওরা মেরে শেষ করবে। এনডেন্‌জারড্ স্পিসিজ আমাদের মস্ত বড় অ্যাসেট। এই সম্পদ যারা ধ্বংস করে, তারা সভ্যতার সবচেয়ে বড় শত্রু, তাদের খুব বড় পানিশমেন্ট হওয়া উচিত।'

পূর্ণদার কথা শেষ হতেই অদ্ভুত ভাবে হেসে উঠেছিল ডেভিস, তারপর সেই হাসিটা কিছুটা টেনে নিয়ে বলেছিল, "দুনিয়ার একটামাত্র ল-ই এফেকটিভ, সেটা হচ্ছে নেচার'স ল। এই আইনই সারভাইভাল অব দি ফিটেস্টের কথা শুনিয়েছে। যার বাঁচার হিম্মত আছে, সেই শুধু বাঁচবে। লেপার্ড, বাঘ—এরা যদি নিজেদের জোরে বেঁচে থাকতে না পারে, সেটা কি আমাদের দোষ? আমরা অবশ্য ওদের কিছুদিন বেশি বেঁচে থাকার ব্যাপারে কিছুটা হেল্প করতে পারি। সেটা কী রকম জানেন?'

একটু অস্থির দেখাচ্ছিল পূর্ণ চ্যাটার্জিকে, কিন্তু উনি ওঁর প্রসন্নতা বজায় রাখার চেষ্টা করে ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কী রকম?'

'ইকনোমিক প্রোডাক্ট হলে সারভাইভ করার চান্স বাড়ে। কয়েকটা দেশে এখন ক্রোকোডাইল, অস্ট্রিচ, ডিয়ার ভ্যালুয়েবল ইকনোমিক প্রোডাক্টস। অনেক দেশের মানুষরাই এখন কুমিরের মাংস খাচ্ছে। অস্ট্রেলিয়া, সাউথ আফ্রিকা আর ইউনাইটেড স্টেটসে ক্রোকোডাইল ফার্মিং এখন বেশ বড় ধরনের ব্যবসা। কিন্তু ভারতের নিয়মকানুন অন্য ধরনের। চেন্নাইয়ের একটা পার্কে ক্রোকোডাইল ব্রিডিংয়ের খুব বড় একটা সেন্টার তৈরি হয়েছে। অসংখ্য কুমির জন্মেছে ওই পার্কে। কিন্তু সরকার ওই সব কুমির বিক্রির রাইট দেয়নি সেন্টারকে। দিলে কুমির বিক্রি করে ওই সেন্টার বিরাট ইনকাম জেনারেট করতে পারত। জিম্বাবোয়েতে বেশ কয়েকটা জায়গায় গ্রামের লোকদের ওয়াইল্ড অ্যানিম্যালের ওনারশিপ রাইট দিয়ে দেওয়া হয়েছে। বুনো জন্তুর মালিকানা পেয়ে লাভ হয়েছে গ্রামের লোকদের। টুরিস্টরা ওখানে বেড়াতে এলে ওরা পর্যটন দফতরের রোজগারের একটা অংশ পায়। অল্প কিছু বুনো জন্তু শিকার করার রাইট দেওয়া হয় হান্টারদের। ওই শিকার থেকেও গ্রামের লোকদের ভাল ইনকাম হয়। টাকাপয়সা রোজগার হয় বলে গ্রামের লোকরা ওই সব এলাকার ওয়াইল্ডলাইফ পপুলেশন মেনটেন করার ব্যাপারে বেশ অ্যাকটিভ ইন্টারেস্ট নিয়ে থাকে।'

দুদিকে মাথা নাড়তে নাড়তে পূর্ণ চ্যাটার্জি বললেন, 'ওয়াইল্ডলাইফ পপুলেশন গ্রামের লোকদের সামনে যদি রোজগারের কোনও পথ খুলে দেয়, ওরা বুনো জন্তু সম্পর্কে বাড়তি ইন্টারেস্ট নেবে—এটা ঠিক। কিন্তু শিকারের অনুমতি দেওয়াটা প্রচণ্ড ভুল হবে। শিকারের অনুমতি দেওয়া মানেই লুপ্তপ্রায় প্রাণীদের লুপ্ত করার রাস্তা পাকা করা।'

উত্তরে ঠাট্টার গলায় ডেভিস বলল, "পুলিশ আজ সকালে এখানে রেড করে পাঁচটা হরিণ আর একটা বাঘের স্কিন পেয়েছে। ইট'স ওনলি এ স্মল পার্ট অব দ্য টোটাল ট্রাফিকিং। পোচিং এ ভাবে আটকানো যাবে না। যাবে কি?"

পূর্ণ চ্যাটার্জি উত্তেজনা গোপন করে সহজ গলায় বলার চেষ্টা করলেন, 'যাবে কি না তার সঠিক উত্তর হয়তো চোরাশিকারিরা জানে।'

অদ্ভুত ধরনের সেই হাসিটা ডেভিসের ঠোঁটে ফিরে এসেছিল আবার। খসখসে গলায় বলল, 'আমিও জানি।'

জোসি পাশের চেয়ারে বসে আছে তখন থেকে, কিন্তু ওর পূর্ণদা আর ডেভিসের কথাবার্তার মধ্যে একবারও ঢোকেনি। সামনের ছোট টেবিলটায় সাজানো ব্রেকফাস্ট। স্যান্ডুইচ, ওমলেট আর আপেল। জোসি এক টুকরো ওমলেট খেয়ে কফি ঢেলে নিয়েছে কাপে। কপির কাপে ছোট-ছোট চুমুক দিতে দিতে ও খুব মনোযোগের সঙ্গে ওই দুজনের কথা শুনে যাচ্ছিল। মাঝেমধ্যে একটু বুঝি উদ্বেগ আর আশঙ্কার ছাপ ফুটে উঠছিল ওর চোখেমুখে। জোসি হঠাৎ সোনালি চুল ঝাঁকিয়ে চোখ বড়-বড় করে বলল, 'টাইগার্স আর রিয়েল বিউটিজ! কী সুন্দর দেখতে! বাট আই হেট ক্রোকোডাইলস।'

পূর্ণদা হেসে বললেন, 'টাইগারকে দেখতে সত্যিই দারুণ। কত পোয়েট টাইগারকে

নিয়ে কত সুন্দর-সুন্দর কবিতা লিখেছে। ওই যে একটা বিখ্যাত কবিতা আছে না—টাইগার টাইগার বার্নিং ব্রাইট—মনে পড়ছে?'

আলতো করে দুদিকে মাথা নাড়ল জোসি।

পূর্ণদা বললেন, 'ইংলিশ পোয়েটদের কবিতা ফ্রান্সে কতটা কী চলে জানি না। তার ওপর এই কবি আবার একটু পুরনো দিনের। পুরোটা মনে নেই। থাকলে তোমাকে শোনাতাম, সত্যিই দারুণ কবিতা।'

কবিতার দিকে কিন্তু গেল না জোসি। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে বসে থাকার পরে জিজ্ঞেস করল, 'পূর্ণদা, সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভে কত টাইগার আছে এখন?'

'সংখ্যা একটু বেড়েছিল, আবার নাকি কমে গেছে।'

'এখন নাম্বার কত?'

'যত দূর মনে পড়ছে, লেটেস্ট টাইগার সেনসাস বলছে—সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা দুশো ষাটের আশেপাশে।'

'আচ্ছা, রিজার্ভে টাইগারদের ফুড কি সাফিসিয়েন্ট আছে?'

পূর্ণদা তারিফ করার গলায় বলে উঠলেন, 'এই প্রশ্নটা তুমি খুব বুদ্ধিমতীর মতো করেছ জোসি। বাঘের প্রধান খাবার হরিণ আর বুনো শুয়োর। ওই খাবার সুন্দরবনে যথেষ্ট পরিমাণে আছে কি না তার একটা সেনসাস রিসেন্টলি চালাবার কথা ছিল ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের—সেটা চালিয়েছে কি না জানি না। তবে সব চাইতে দুঃখের কথা কি জানো? চোরাশিকারিরা হরিণ আর শুয়োরও মারছে মাংস আর চামড়ার জন্যে। এর ফলে বাঘের স্বাভাবিক খাবারে টান পড়ছে। খাবারের খোঁজে সেই জন্যেই বাঘ মাঝেমধ্যে গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। বাঘ হয়তো একটা গরু মারল, অমনি গ্রামের লোকরা ঘাবড়ে গিয়ে খবর দিল চোরাশিকারিদের। ব্যস, মারা পড়ল অমূল্য একটা রয়াল বেঙ্গল টাইগার। টাইগার রিজার্ভের গার্ডদের আরও অ্যাকটিভ হওয়া দরকার। হলে এই ধরনের পোচিং বন্ধ হবে। আমি শুনেছি, কিছুদিন আগে সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দু কোম্পানি পুলিশ ডিপ্লয় করেছে ভিজিলান্স বাড়াবার জন্যে। এ সব অবশ্য শোনা কথা। কদ্দুর সত্যি-মিথ্যে জানি না। তুমি নিশ্চয়ই ওয়ার্ল্ডওয়াইড ফান্ড ফর নেচার-এর নাম শুনেছ?'

লাজুক মুখে দুদিকে মাথা নাড়াল জোসি।

ওর পূর্ণদা সুন্দর করে হেসে বললেন, 'লজ্জা পাওয়ার কোনও কারণ নেই, আমিও সংস্থাটার নাম বেশি দিন শুনিনি। সংক্ষেপে ডবলিউ ডবলিউ এফ। শুনেছি এই সংস্থাটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার মজবুত করার জন্যে গত বছর থেকে একটা টাইগার কনজার্ভেশন প্রোগ্রাম নিয়েছে। এরা সুন্দরবনের ভিজিলান্সের ব্যাপারে খুব ক্রিটিক্যাল। নজরদারি জোরদার না হলে কিন্তু চোরাশিকারিদের হাত থেকে বাঘ বাঁচানো কঠিন হবে। বনরক্ষীদের জন্যে নতুন-নতুন ব্যারাকও নাকি তৈরি হচ্ছে সুন্দরবনে। এ সব নিশ্চয়ই পোচিং আটকাবে অনেকখানি, তবে আমার মতে সবচেয়ে বেশি দরকারি কোন্‌টা জানো জোসি?'

চোখেমুখে প্রশ্ন ফুটিয়ে তুলে লাল-টুকটুকে গাল আর সোনালি চুলের জোসি তাকাল ওর পূর্ণদার দিকে।

পূর্ণদার গলায় হঠাৎই কিছুটা বুঝি বাড়তি আবেগ এসে গিয়েছিল। একটু উঁচু গলায়

বললেন, "গ্রামের সাধারণ লোকদের পাশে আনতে হবে। সচেতন করতে হবে, শিক্ষা দিতে হবে। সবাই যাতে বিশ্বাস করে—বাঘ আমাদের মূল্যবান জাতীয় সম্পদ। রয়াল বেঙ্গল টাইগার সম্পর্কে একটা অহংকার বোধ তৈরি করে দিতে হবে। এই রাজ্যে শহরে যারা থাকে তাদের প্রায় সবার মধ্যেই কিন্তু এই বোধটা আছে। বীরত্বের কোনও কাজ করলে বলা হয়—বাঘের মতো সাহস। গ্রামের লোকের একটা অংশের মধ্যেই এই ধারণাটা আছে। এই যে চারশো বছর আগের সুন্দরবনের রাজা প্রতাপাদিত্যের একটা নাম ছিল 'সুন্দরবনের বাঘ।' খুব সাহসী লোকদের আমরা বাঘের সঙ্গে তুলনা করতে ভালবাসি। ব্রিটিশ পিরিয়ডে আমাদের এখানকার একজন খুব বড় এডুকেশনিস্টকে 'বাংলার বাঘ' বলা হত। তাঁর নাম স্যার আশুতোষ মুখার্জি। সেই ট্রাডিশন কিন্তু সমানে চলেছে। কয়েকদিন আগে নাইবোরি জিমখানায় আই সি সি নকআউট হয়ে গেল। ইন্ডিয়া টিমের ক্যাপ্টেন সৌরভ যখন দারুণ-দারুণ চার-ছয় মারছিল তখন কমেন্টেটর বারবার বলছিল—নাও দ্য টাইগার অব বেঙ্গল ইজ রোরিং। আমাদের কত বড় ইগো-সাটিসফায়িং কথা বলো তো! আমরা কেউ চাই না আমাদের অতি-প্রিয় রয়াল বেঙ্গল টাইগার চোরাশিকারিদের হাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক।"

পূর্ণদার আবেগ ধাপে ধাপে বাড়ছিল, কিন্তু উনি আরও কিছু বলার মুখেই পারভেজ দৌড়ে এসে বলল, 'আমাদের লঞ্চে পুলিশ এসেছে। বলছে, লঞ্চের তল্লাশি নেবে।'

॥ ৩০ ॥

পারভেজ খবর দেওয়ার একটু পরেই পুলিশের বোট লঞ্চের পেছন দিক থেকে সামনে এসে হাজির হল। বোটের ওপর চারজন বন্দুকধারী বনরক্ষী, দু-রকমের উর্দি পরা দুজন অফিসার, আর সাদা পোশাকের একজন যুবক।

ধরতে গেলে জবরদখল করার কায়দায় গোটা দলটা লঞ্চে উঠে পড়েছিল। ওদের দেখে আসন ছেড়ে উঠে পড়েছিল জোসি, ডেভিস আর পূর্ণ চ্যাটার্জি।

সামনের অফিসার ডেভিসের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'উই আর কামিং ফ্রম লোকাল থানা, নো নো, অলসো ফ্রম ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট। আমরা জয়েন্টলি মানে উই আর কনডাকটিং এ রেড—।'

ডেভিস খুব পরিচ্ছন্ন ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা কি আমাদের লঞ্চে তল্লাশি নিতে চান?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, এগজ্যাক্টলি। আরে! আপনি তো দারুণ ভাল বাংলা জানেন!'

পুলিশ অফিসারের তারিফ শুনেও ডেভিসের চোখেমুখে কোনও ভাবান্তর হল না। জোসির দৃষ্টি কিন্তু রীতিমত ধারালো হয়ে উঠেছিল। কঠিন চোখে অফিসারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিন্তু কেন আপনারা আমাদের লঞ্চ রেড করছেন? কী আমাদের দোষ?'

লাল গাল, সোনালি চুল সুন্দরীর মুখে বাংলা শুনে গোটা দলটাই চমৎকৃত। সামনের অফিসার একটু অভিভূত গলায় বললেন, 'না-না ম্যাডাম, আপনাদের কোনও দোষ নেই।

আপনারা হলেন আমাদের অনার্ড গেস্টস। তবে আপনাদের লঞ্চে তো আরও সাত-আটজন আছে, যারা হল গিয়ে মেম্বার্স অব দি ক্রু। এবা সবাই লোকাল লোক, লোকাল লোকদেব অনেকে ট্রাফিকিংয়ের সঙ্গে হাত মেলায়।'

'কী ট্রাফিকিং?'

'ওই যে, যাকে বলে—কনট্রাব্যান্ড আইটেম্‌স।'

জোসির দৃষ্টি আগের মতোই ধাবালো। অফিসারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, আপনারা আপনাদের কাজ করুন।'

অফিসারের ইঙ্গিতে গোটা দলটা দুটো দলে ভাগ হযে কাজে নেমে পড়েছিল। একটা দল গেল লঞ্চের একতলায়, বাকিটা দোতলায়। সাদা পোশাকের যুবকটি রয়ে গেল ডেভিসের সঙ্গেই।

একটু বাদে যুবকটি ডেভিসের দিকে হাত তুলে নমস্কাব কবে বলল, 'অপনিই তো রিচার্ড ডেভিস?'

উত্তরে ডেভিস সামনের দিকে মাথা একটুখানি ঝোঁকাল।

যুবকটি এবার একটু বিহ্বল ভঙ্গিতে বলল, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ পেয়ে খুব ভাল লাগছে আমার। আপনার নাম আমি অনেক শুনেছি।'

কপালে দু-তিনটে ভাঁজ পড়েছিল ডেভিসেব। 'কোথায় শুনেছেন?'

'কয়েকজন এক্সপার্টের কাছে। আপনি তো এই সময়ের একজন নামকরা প্রাচ্যবিদ্যা-বিশারদ। এখন যাঁরা ওরিয়েন্টাল স্টাডিজে আছেন, তাঁবা তো আপনার কাজকে খুব গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।'

সূক্ষ্ম একটা হাসির রেখা ডেভিসের মুখে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গিয়েছিল। গম্ভীব গলায জিজ্ঞেস করল, 'এই সব ব্যাপারে কি আপনার ইন্টারেস্ট আছে?'

'ইন্টারেস্ট তো আছে, কিন্তু বুঝি খুব কম।'

'না বোঝার কিছু নেই, আসলে পুলিশের এই কঠিন চাকরি করার পরে আপনাদেব নিজস্ব সময় তো খুব কম হয়ে যায়—।'

ডেভিসের কথার উত্তরে যুবকটি মুচকি হেসে বলল, 'আমি কিন্তু পুলিশের চাকরি করি না। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টেও নয়। আমি পেশায় সাংবাদিক। বম্বের একটা নিউজপেপারের ক্যালকাটা করেসপনডেন্ট। তবে শুধু কলকাতা নয়, সিটির আশেপাশের অনেকগুলো জায়গাও কভার করি। বনজঙ্গল আর এখানকার জন্তুজানোয়ার নিয়ে আমার একটু বাড়তি আগ্রহ আছে, তাই সুযোগ পেলেই এ সব জায়গায় চলে আসি।'

ডেভিস তীক্ষ্ণ চোখে যুবকটির পা থেকে মাথা পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখে নেওয়ার পরে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার নাম?'

'আমার নাম সমীর পালিত, সবাই এস. পি. বলে ; আপনারাও ওই নামে আমাকে ডাকতে পারেন।'

ঠিক আগের গলাতেই ডেভিস প্রশ্ন করল, 'আপনি পুলিশ-পার্টির সঙ্গে কতক্ষণ আছেন?'

'কাল ছিলাম, আজও আছি। সকাল থেকেই আছি।'

'তাই! পুলিশের সিজার-লিস্টে কী-কী উঠেছে এখন পর্যন্ত?'

একটু উত্তেজিত হয়ে এস. পি. বলল, 'কোয়াইট এ বিগ সিজার! একটা বাঘের আর পাঁচটা হরিণের চামড়া উদ্ধার করা হয়েছে এখন পর্যন্ত।'

'কাদের কাছ থেকে পাওয়া গেল ওগলো?'

'গ্রামের লোকদের বাড়ি থেকে। এরা অ্যাকচুয়ালি পেড্‌লার। চোরাশিকারিরা এদের হাত দিয়ে মাল পাচার করে থাকে।'

'তা পুলিশ এদের ইনটারোগেট করলেই তো পোচারদের নামটাম বেরিয়ে আসবে।'

'এরা মুখ খুলতে চায় না। আসলে এরা তো এক-আধজন নয়, এই রকম অনেক আছে এখানে। গরিব মানুষ, বুঝে গেছে কুইক মানি আর্ন করার এটা একটা সহজ রাস্তা। ওয়াইল্ডলাইফ সম্পর্কে অ্যাওয়ারনেসও তেমন একটা তৈরি হয়নি এদের মধ্যে। আরও একটা ভয়ের কথা এই যে, অ্যানিম্যাল ট্রেড রিসেন্টলি বেস শিফ্‌ট করেছে। আগে সবচেয়ে বেশি চোরাচালান হত দিল্লি আর মুম্বই থেকে। এখন জায়গা পালটে হয়ে গেছে কলকাতা আর শিলিগুড়ি।'

পূর্ণ চ্যাটার্জির চোখেমুখে একটু কষ্ট পাওয়ার ছাপ ফুটে উঠেছিল। 'কী কাণ্ড! আচ্ছা, এটা হল কেন! মানে এই জায়গা বদল—।'

'দুটো কারণে জায়গা বদল হয়েছে। এক নম্বর কারণ—দিল্লি আর মুম্বইতে জোরদার হয়ে উঠেছে পুলিশের ধরপাকড়। এ দিকে আবার মাল পাচারের আদর্শ জায়গা হল কলকাতা আর শিলিগুড়ি। সীমান্ত-এলাকা বিরাট। সব জায়গায় পাহারাদারিও তত মজবুত নয়। চোরাই মাল ঢুকে যাচ্ছে বাংলাদেশ, নেপাল আর ভুটানে। সেখান থেকে দূর-বিদেশে। এ সব নিয়েই সেদিন আমার কথা হচ্ছিল স্টেটের চিফ ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেনের সঙ্গে—।'

পূর্ণ চ্যাটার্জিকে একটু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছিল। 'সত্যি, এটা আমাদের দেশের মস্ত বড় এক সমস্যা। এত অরণ্য, এত অরণ্যসম্পদ—কিন্তু আমরা তার মূল্য বুঝতে না পেরে সব ধ্বংস করে ভয়ংকর এক সর্বনাশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আসলে বন আর বন্যপ্রাণী আমাদের বেঁচে থাকার পক্ষে যে কতখানি জরুরি—সরকারি আর বেসরকারি সংস্থাগুলোর পক্ষে তা নিয়ে রীতিমত প্রচারে নামা উচিত।'

এস. পি. একটু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'নেমেছে তো, অনেকদিন ধরেই নেমেছে। কিন্তু খুব একটা লাভ হয়েছে বলে তো মনে হয় না।'

প্রতিবাদ করার গলায় পূর্ণ চ্যাটার্জি বললেন, 'হয়েছে-হয়েছে, একেবারে যে হয়নি—তা নয়। তবে আরও অনেকখানি হওয়া দরকার। গ্রামের সব লোক যদি বুঝতে পারে—ওদের সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকার সঙ্গে জঙ্গলের গাছপালা আর জঙ্গলের প্রাণীদের গভীর সম্পর্ক আছে—তা হলে গাছপালা কাটা ও বুনো জন্তু মারার ব্যাপারে ওদের মধ্যে একটা প্রতিরোধ গড়ে উঠবে। ওদের পাশে থাকছে আবার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। তার মানে গোটা ব্যাপারটা কত ভাল হবে ভেবে দেখুন তো—।'

এবার আর কাঁধ ঝাঁকাল না এস. পি. তবে ছোট্ট একটা বাঁকা হাসি ফুটে উঠেছিল ওর ঠোঁটে। 'হলে তো খুব ভাল, তবে স্বপ্ন আর সত্যের মধ্যে মস্ত একটা ফারাক দেখা যাচ্ছে মিস্টার, মিস্টার—।'

'চ্যাটার্জি।'

'বেসিক কতগুলো জিনিস কিন্তু আমাদের অনেকের মধ্যে নেই মিস্টার চ্যাটার্জি। সেগুলো জাগাতে হবে প্রথমে। এই যেমন ধরুন, জীবজন্তুর প্রতি গভীর ভালবাসা—।'

এস. পিকে চাপা একটা ধমকই দিয়ে ফেললেন পূর্ণ চ্যাটার্জি। 'কী বলছেন আপনি! এই জিনিসটা সাধারণ মানুষের মধ্যে খুব বেশি পরিমাণে আছে। আপনাকে একটামাত্র উদাহরণ দিই। কিছুদিন আগেই প্রচণ্ড বন্যায় অনেকগুলো জেলা ভেসে গিয়েছিল। বাড়িঘর সব ডুবে গেছে, খাওয়া-দাওয়ার কিছু নেই ; চারদিকে শুধু জল আর জল। এই রকম অবস্থার মধ্যেও কিছু মানুষ বনগাঁর কাছে ডিয়াব পার্কের বেশ কিছু হরিণ বাঁচিয়েছে। এই তো কয়েকদিন আগে একটা খবরের কাগজেব প্রথম পাতায় অসাধারণ একটা রঙিন ছবি বেরিয়েছিল। নৌকোয় অনেকগুলো হরিণ তুলে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। নিজেদের প্রাণ বিপন্ন, কিন্তু ওই অবস্থার মধ্যেও বুনো জন্তু বাঁচাচ্ছে বন্যার্তরা। মনে পড়ছে আপনার?'

একটু থমমত খেয়ে গিয়ে এস. পি. জবাব দিল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, মনে পডছে। ছবিটা দারুণ।'

'ছবিটা দারুণ, ছবির বিষয়টা আরও দারুণ। এর পরেও কি বলা চলে—বুনো জন্তুর ওপরে সাধারণ মানুষের ভালবাসা নেই? আছে, যথেষ্টই আছে। তবে অনেকের মধ্যে যে জিনিসটার অভাব—তা হল সচেতনতা। বনজঙ্গল, বনের প্রাণী প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার ব্যাপারে কতটা জরুরি—নিয়মিত ক্যাম্পেন কবে এই বোধটা জাগিয়ে তুলতে হবে সবার মধ্যে। এটা হলেই চোরাশিকারিদের উৎপাত কমে যেতে বাধ্য।'

এস. পি-র চোখমুখ একটু চকচকে হয়ে উঠেছিল। 'আরে! আপনার এই সব কথার অনেকগুলো তো মিস্টার হার্ডিও বলছিলেন।'

'হার্ডি কে?'

'আলাপ হয়নি আপনাদের সঙ্গে! এই নদীতেই তো আছেন। ওঁদের লঞ্চের নাম এম. ভি. দিনমণি। সাহেবের পুরো নাম গর্ডন এস. হার্ডি। সুন্দরবনের ইকো-সিসটেম নিয়ে গবেষণা করার কাজে এসেছেন। ওঁর সঙ্গে আছেন মহাদেব দাস। উনিও পরিমণ্ডল চর্চার ব্যাপারে একজন এক্সপার্ট।'

অবাক হয়ে সব কিছু শোনার পরে পূর্ণ চ্যাটার্জি বললেন, 'তাই নাকি! এই নদীতেই আছেন? একদিন গিয়ে আলাপ করে আসার খুব লোভ হচ্ছে তো—।'

'যান না, চমৎকার ব্যবহার—।'

'আপনি নিশ্চয়ই কোনও রেফারেন্স নিয়ে গিয়ে আলাপ করেছেন—।'

'না-না, এখানে যে ভাবে এসেছি, ঠিক সেই ভাবেই ওখানে গিয়েছিলাম। ঘণ্টাদুয়েক আগে—।'

আর একবার অবাক হলেন পূর্ণ চ্যাটার্জি। 'ওদের লঞ্চও কি সার্চ করেছে পুলিশ-পার্টি?'

'হ্যাঁ। আমি যা শুনেছি—এটা হচ্ছে পুলিশের কোম্বিং অপারেশন। এখানকার কোনও লঞ্চ, নৌকোই বাদ দেওয়া হবে না। মহাদেব দাস বলছিলেন—এখানে ব্যাঘ্র প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে ১৯৭৩ সালে, কিন্তু তার ঠিক একশো বছর আগে আমেরিকার ইয়ালোস্টোন পার্ক দিয়ে পৃথিবীর জাতীয় উদ্যানের শুরু। হার্ডি এবং দাস—দুজনেই এখানকার জাতীয় উদ্যান ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের গোঁড়া সমর্থক। ওঁদের কয়েকটা ছবি তুলেছি। কিছুতেই

রাজি হচ্ছিলেন না, অনেক কষ্টা করে মত করিয়েছি। ভাল কথা, আপনাদেরও দু-একটা ছবি চাই কিন্তু।'

কাঁধে ঝোলানো ছোট ব্যাগটা থেকে ছোট্ট একটা ক্যামেরা বার করেছিল এস. পি.। কিন্তু ছবি তুলতে দেওয়ার ব্যাপারে ডেভিসের ঘোরতর আপত্তি।

পূর্ণদা মৃদু হেসে বললেন, 'ওরিয়েন্টাল স্টাডিজে আপনি একজন অথরিটি। আর, এস. পি. আপনার একজন গ্রেট অ্যাডমায়ারার। হাতে ক্যামেরা থাকা সত্ত্বেও উনি যদি আপনার ছবি তুলতে না পারেন, ওঁর খুব খারাপ লাগবে।'

কিন্তু এ সব কথা ওকে নরম করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত সাংবাদিকের মুখ চেয়ে সমঝোতার পথে ডেভিসকে নিয়ে এল জোসি। 'ঠিক আছে, তুলুন। কিন্তু একটার বেশি তুলবেন না।'

এস. পি. বাজে ক্যামেরা এবং আরও বাজে ক্যামেরাম্যানের দোহাই পেড়ে একটার বদলে দুটো গ্রুপ ছবি তুলে নিয়েছিল। বেশ খুশি-খুশি দেখাচ্ছিল ওকে। ক্যামেরা ব্যাগে পুরে ডেভিসের দিকে তাকিয়ে এস. পি. বলল, 'ওয়াইল্ড লাইফ সম্পর্কে আপনার কিছু-কিছু ওপিনিয়ন আমি কাগজে পড়েছি, আজ যদি কিছু বলেন—। আপনার জীবনের কোনও একটা আনন্দের কথাও জানাতে পারেন এই প্রসঙ্গে।'

অনেকক্ষণ বাদে বেশ সহজ ভঙ্গিতে হাসল ডেভিস, তারপর বলল, 'সুন্দরবনের সঙ্গে আমার বেশি কিছু দিনের সম্পর্ক। তবে সেইদিন আমি সব চাইতে বেশি খুশি হয়েছিলাম যেদিন আই. ইউ. সি. এন. সুন্দরবনকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ লিস্টের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়েছিল।'

কথাটা বলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দুটো সার্চ পার্টি ফিরে এল ওখানে পাটাতনের ওপর দুপদাপ শব্দ তুলতে তুলতে।

সেই অফিসার ডেভিসের দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বলল, 'আমাদের কাজ শেষ। আপনাদের কিছুটা অসুবিধের মধ্যে ফেলার জন্যে দুঃখিত।'

ডেভিসের ঠোঁটের কোণে ছোট্ট একটা ধারালো হাসি ফুটে উঠেছিল। 'এই লঞ্চে তল্লাশি চালিয়ে আপত্তিকর কিছু পেলেন কি আপনারা?'

'না-না, পাইনি। আসলে এটা আমাদের রুটিন জবের মধ্যে পড়ে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ, বাই।'

গোটা দলটা লঞ্চ থেকে বোটে নেমে গেল। সব শেষে ছিল এস. পি., যাওয়ার আগে বেশ চওড়া করে হেসে বলল, 'আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে খুব ভাল লাগল। আবার দেখা হবে। গুড বাই।'

মৃদু হাত নাড়ানাড়ির মধ্যে দূরে চলে গেল পুলিশের বোট।

সকালের আকাশে মেঘ ও রোদ্দুরের খেলা চলছিল। লঞ্চের ছাতে আলো-ছায়ার বিনুনি। পূর্ণ চ্যাটার্জিকে একটু উত্তেজিত দেখাচ্ছিল, গলা সামান্য তুলে বললেন, 'পুলিশ যদি এই রকম ভিজিল্যান্ট থাকে সব সময়, পোচিং বেশ খানিকটা কমে যাবে। বেঙ্গল টাইগারকে কী দারুণ দেখতে, কী করে যে চোরাশিকারিরা এদের মারে! আগে ছিল আবার শিকারিরা—। তখন বাঘ শিকার করাকে বিরাট এক বাহাদুরি বলে ধরা হত। বুঝলে জোসি, আজ থেকে সত্তর-আশি বছর আগে তোলা একটা ফোটোগ্রাফ সেদিন আমি দেখছিলাম—। দেখলে তোমার মন খারাপ হয়ে যাবে। উত্তরপ্রদেশের একটা জঙ্গলের ছবি। বন্দুকধারী

এক সাহেব, তার পাশে এক নেটিভ রাজা। রাজার কাঁধেও বন্দুক। ওদের সামনে সার দিয়ে শোয়ানো আছে সাত-আটটা বাঘ। তোমার দেখলে মনে হবে—বাঘগুলো ঘুমোচ্ছে। কী গ্রেসফুল চেহারা! ওই বাঘগুলো মেরেছে ওই দুই হান্টার। দুই শিকারির পেছনে বিরাট একটা হাতি আর মাহুত। ওই দুই বীরপুরুষ শিকারি হাতির পিঠে চেপে অতগুলো বাঘ মেরেছে সম্পূর্ণ বিনা কারণে।

জোসি চোখ বড়-বড় করে জিজ্ঞেস করল, 'সুন্দরবনের জঙ্গলে কি হাতি আনা যায় না পূর্ণদা?'

'না-না, এখানে তো অসংখ্য নদী-নালা, খালবিল ভর্তি জঙ্গল। এখানে হাতি আসবে কী করে? তবে বহু বছর আগে এই বন যখন এখানকার চাইতে দশ গুণ বড় ছিল তখন নাকি এখানে বেশ কিছু গণ্ডার আব বুনো মোষ থাকত। তাদের স্কেলিটন পাওয়া গেছে বনের মধ্যে।'

'কিন্তু সুন্দরবনেও তো বাঘ শিকার হত?'

"হত। হাতি ছাড়াই বাঘ শিকার। সুন্দরবনের বাঘ শিকার করার জন্যে সাহেবরা আসত, নেটিভ রাজা-জমিদাররা আসত। অনেকে বলে থাকে, 'রয়াল বেঙ্গল টাইগার' নামটা চালু হয়েছে প্রিন্স অব ওয়েলস-এর বাঘ মারার ঘটনা থেকে। ব্রিটিশ রাজারা কবে চলে গেছে এখান থেকে, কিন্তু সুন্দরবনের বাঘের কথা উঠলে এখনও 'রয়াল' শব্দটা চলে আসে চট করে।"

বাঘের রাজকীয় চেহারাটা জোসির চোখের সামনে মুহূর্তের জন্যে ভেসে উঠেছিল। বেশ তারিফ করার গলায় বলল, "সত্যি, টাইগারকে রয়াল ফ্যামিলির হ্যান্ডসাম মেম্বারদের মতোই দেখতে। মানুষরা বাঘ শিকার করে বলে বাঘরাও মানুষ শিকার করে। ইট'স এ গেম অব রিভেঞ্জ।"

পূর্ণদা দু দিকে মাথা নাড়াতে নাড়াতে বললেন, 'না, বাঘরা মানুষদের মতো ভিন্ডিকটিভ নয়। শোধ তোলার জন্যে বসে থাকে না। একজন জার্মান বিজ্ঞানী ডক্টর হেন্ডরিজ সুন্দরবন নিয়ে গবেষণা করেছিলেন কয়েক বছর আগে। তাঁর ফাইন্ডিংস কী জানো? তিনি বলেছেন, এখানকার বাঘদের মধ্যে শুধুমাত্র থ্রি পারসেন্ট পুরোপুরি মানুষখেকো। আর থার্টি পারসেন্ট বাঘ মানুষ শিকার করে না, তবে কোনও লোক বিরক্ত করলে তাকে আক্রমণ করে। বাঘ মানুষখেকো হওয়ার আরও কয়েকটা ব্যাখ্যা আছে।'

'কী রকম?'

জোসির 'পূর্ণাদা' হেসে বললেন, 'সব তো আমি জানি না। তবে একটা ব্যাখ্যা এই রকম। সুন্দরবনে হেঁতাল গাছের ঝোপের মধ্যে কিছু-কিছু বড় গর্ত থাকে, সুড়ঙ্গের মতো—সেই গর্তগুলো বাঘদের থাকার প্রিয় জায়গা।'

ডেভিস তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'কোন্ গাছের কথা বলছেন মিস্টার চ্যাটার্জি?'

'হেন্টাল ট্রিজ—আমরা বলি, হেঁতাল গাছ। গাছের ঝোপের মধ্যে নাকি বড়-বড় সুড়ঙ্গ থাকে। বাচ্চা হলে বাঘিনীরা ওই সব ঝোপের মধ্যে বাচ্চাদের লুকিয়ে রাখে। ওই সময় বাঘকেও ধারেকাছে ঘেঁষতে দেয় না বাঘিনীরা। এপ্রিল-মে মাসে মৌলিরা মধু আনার জন্যে গভীর জঙ্গলে যায়। মৌচাক তো গাছের মাথায়। মৌলিদের চোখ থাকে তাই ওপর দিকে।

অনেক সময় উড়ন্ত মৌমাছির দিকে চোখ রেখে চাকের খোঁজে ওরা জঙ্গলে ছোটে। ওই ভাবে চোখ ওপরে তুলে ছোটার জন্যে ভুল করে হেঁতাল ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ে এক সময়—।'

আঁতকে উঠে প্রশ্ন করল জোসি, 'তারপর?'

'তারপর যা হওয়ার তাই হয়। বাচ্চাদের ক্ষতি করতে এসেছে ভেবে মানুষ মারে বাঘিনী। বাচ্চাবা দেখে—মা মানুষ মারছে। এই ভাবে মানুষ-মারা দেখতে দেখতে বাচ্চা বাঘগুলোও নাকি পরে মানুষখেকো হয়ে যায়। এই অবশ্য একটা চালু ব্যাখ্যা, কত দূর সত্যি তা জানি না!'

ডেভিস আগের মতোই তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে বলল, 'আপনি হেন্টাল ট্রিজ চেনেন মিস্টার চ্যাটার্জি?'

মৃদু হেসে পূর্ণদা বললেন, 'আমি শহরের লোক, হেঁতাল চিনব কী করে!' তবে ছেলেবেলা থেকেই হেঁতালের নাম শুনে আসছি।'

একটু যেন দাঁতে দাঁত চেপে ডেভিস বলল, 'গাণেশ এখানকার লোক, ও হেন্টাল চেনে। আর হিরু মান্‌ডল্‌ তো চিনবেই।'

আকাশে এখন আর মেঘ-রোদ্দুরের খেলা নেই। মেঘ সরে গেছে অনেক দূরে। সূর্যের ঝলমলে আলো লঞ্চে আর নদীর জলে। দূরে অনেকগুলো জেলে-নৌকো। জালে আজ বোধহয় বিস্তর মাছ উঠেছে। একগাদা পাখি উড়ছে নৌকোগুলোর মাথায়। কয়েকটা শঙ্খচিল চক্কর মারছিল আকাশে।

ডেভিস অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে ওই দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পরে হঠাৎই ব্যস্ত হয়ে সারেংকে লঞ্চ ছেড়ে দেওয়ার হুকুম দিয়ে নীচে নেমে গিয়েছিল। পেছন-পেছন জোসিও।

লঞ্চের নোঙর তোলার দৃশ্যটা দেখতে বেশ লাগে পূর্ণদার। হঠাৎই ব্যস্ত হয়ে পড়ে খালাসিরা। নোঙর ওপরে টেনে তোলার সঙ্গে লঙ্গে লঞ্চের ওপরে ভেজা দড়ির ছোটখাটো একটা পাহাড় গজিয়ে ওঠে। লঞ্চ খোলা হয় জোয়ার এলে। এখন জোয়ার এসেছে। ঘোলা জল ফুলে উঠে লঞ্চের গায়ে আছড়ে পড়ছিল।

লঞ্চের রেলিং ধরে একটুখানি ঝুঁকে পড়ে জোয়ারের জলের বিক্রম দেখছিলেন পূর্ণ চ্যাটার্জি। সুন্দরবনের সব কিছুই বোধহয় আলাদা ধরনের। নদী-নালায় জোয়ার-ভাটা আসে প্রতিদিন দুবার করে। ছোট-বড় বহু নদী আছে এখানে ; আর আছে বিস্তর খাল, নালা ও খাঁড়ি।

চ্যাটার্জি হিসেব কষছিলেন—কোন্ দিকে বঙ্গোপসাগর। সাগরের সঙ্গে মিশে আছে এখানকার বেশ কয়েকটা জোয়ার-ভাটার নদী। এগুলোর মধ্যে মাত্‌লা আছে। মাত্‌লা নদীর নামের মধ্যেই বোধহয় এর স্বভাবের ছাপ পড়েছে খানিকটা। ভয়ঙ্কর নদী। নদীর কয়েকটা জায়গা নাকি দশ কিলোমিটারের ওপর চওড়া।

বরং হিঙ্গলগঞ্জ থানার এই রায়মঙ্গল নদীটা বেশ। বর্ষাকালে অবশ্য এই নদীটারও মস্ত দাপট। তবে শীতের সময় বেশ শান্ত।

লঞ্চ ছেড়ে দিয়েছে সারেং। জলের দিকে তাকিয়ে পূর্ণ চ্যাটার্জি এখানকার জলজঙ্গলের কথা ভেবে যাচ্ছিলেন একমনে। গড় হিসেবে সুন্দরবনে চল্লিশ ভাগ জল, ষাট ভাগ স্থল। বিরাট বান এলে এই হিসেবটা নাকি ঠিক উলটে যায়। বনের মধ্যে জল উঠে আসে তখন।

ভাটার সময় আবার খাঁড়ি, নালা ও খাল দিয়ে বাড়তি জল বেরিয়ে যায়। জল নোনা। এই জল আর পলিতে গড়ে উঠেছে ঘন বাদাবন। বাদাবনের নিয়মকানুনের সঙ্গে অন্য জঙ্গলের নিয়মকানুন একেবারেই মেলে না। সুন্দরবনের বিচিত্র এই জগৎটা পূর্ণ চ্যাটার্জিকে নতুন করে বুঝি আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

আচ্ছন্ন ছিলেন বলেই জানতে পারলেন না যে, ডেভিস নীচের থেকে আবার উঠে এসে ওর পাশ দিয়ে লঞ্চের ওদিকের ছাতে চলে গেছে। চিমনির পাশে দাঁড়িয়ে চোখে দূরবিন এঁটে চারদিকে তাকাচ্ছিল ডেভিস। ওর থমথমে মুখটা ঠিক যেন একটা লালচে পাথরের টুকরো!

॥ ৩১ ॥

সকাল নটা বাজে। নিজের ফ্ল্যাটে একটু অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে ঘোরাফেরা করতে শুরু করে দিয়েছিল কৌশিক। ব্যাচেলার গোয়েন্দার চমৎকার এই ফ্ল্যাটের দ্বিতীয় বাসিন্দার নাম নিমো। তরুণ এই কাজের ছেলেটিকে নেহাতই একটা 'কাজের ছেলে' বললে ভুল হবে। বাজার, রান্না, ঘরদোর ঝাড়পোছ করার সব দায়িত্ব নিমোর। কিন্তু এখানেই ওর কাজ শেষ হয় না, কাজের চাপে গোয়েন্দা খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে অনিয়ম করলে একটু অভিভাবকগিরিও করে থাকে নিমো।

ওর শখ বলতে টিভিতে অ্যাকশন-পিকচার দেখা, আর গোয়েন্দার তদন্তের কাজ শেষ হলে চোখ বড়-বড় করে সেই রহস্যকাহিনী শোনা। কলকাতার বাইরে কয়েক দিনের সফর হলে নিমোকে দেশে যাওয়ার ছুটি দিয়ে দেয় কৌশিক। এখন যেমন দেশে চলে গেছে নিমো। সামনের সপ্তাহে আসবে। ঘটনাপ্রবাহে বড় একটা বাঁক না নিলে কৌশিকের এই সময় কলকাতায় ফেরার কথা ছিল না। আজকেই তো আবার হাসনাবাদে চলে যাওয়ার কথা, কিন্তু হবে না। আরও দু-তিনটে দিন থাকতে হবে এখানে। বিচিত্র ঘটনাগুলো এখন অদৃশ্য এক পিরামিডের ধাঁচে শীর্ষবিন্দুর দিকে এগিয়ে চলেছে।

কমপ্যাক্ট ফ্ল্যাটের তিনটে ঘরের ব্যালকনিতে বারসাতেক পায়চারি করার পরে সিটিং-রুমের সোফায় পা ছড়িয়ে বসে কৌশিক ওর সর্বক্ষণের সঙ্গী নোটবইয়ের পাতা ওলটাতে শুরু করে দিয়েছিল।

তদন্ত এই রকম একটা জায়গায় পৌঁছে গেলে গোয়েন্দা নিজের কাজের রিভিউ শুরু করে দেয় বারবার। এও এক ধরনের মানসিক খেলা। নিজের থেকে নিজেকে একটু সরিয়ে নিয়ে নিজের কাজের পর্যবেক্ষণ করা। এই ভাবে নিজের কাছ থেকে একটু সরে যেতে পারলে খানিকটা মোহমুক্ত হয়ে সব কিছু দেখা সম্ভব। আর ওই সব দেখা থেকে অনেক সময় কিছু সত্য উঠে আসে।

ডায়েরির পাতায় সাঙ্কেতিক ভাষায় সব লিখে ফেলে গোয়েন্দা। শেষের দিকের সব কাজ নিছক আপ-টু-ডেট নয়, আপ-টু-দ্য মিনিট বলাই ভাল। সোফায় হেলান দিয়ে বসে নির্মোহ দৃষ্টিতে নিজের কাজের কঠিন এক পর্যবেক্ষক হয়ে উঠেছিল গোয়েন্দা।

কাল রাত দুটোর সময় ছোটা জলিলের কারখানায় মুখার্জিবাবুর মুখ থেকে ও যা-যা শুনেছিল, তার প্রতিটি কথাই নোট করে রেখেছে ডায়েরির পাতায়। যা শুনেছে তা তো ভয়ংকর, এখন আরও ভয়ংকর কিছু ঘটার অপেক্ষায়। শেষ রাতে বাড়ি ফিরে ডায়েরির পাতায় সব লেখার পরে ঘটনার বিশ্লেষণ এক দফা হয়ে গিয়েছে। তার পরেই ও ফোন করেছিল কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা-প্রধান সন্দীপ দেবকে। সন্দীপদা সব শুনে খুশি হয়ে বলেছিলেন—সব ঠিক আছে, কিন্তু মুখার্জিবাবুকে ওই ভাবে ওখানে রেখে দেওয়াটা একটু ঝুঁকি হয়ে যাবে কি না ভেবে দেখো। তদন্তের কাজ শেষ হওয়ার আগে গোয়েন্দা কখনওই হাতের সব তাস উল্টে দেখায় না। সন্দীপদার কথার উত্তরে বলেছিল—ঝুঁকি একটু আছে ঠিকই, কিন্তু সেটা মনে হয় মারাত্মক নয়। আমাদের যে দুই অতিথি গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে উঠবে তাদের দিকে একটু বেশি মাত্রায় নজর দেওয়ার কথা আপনার সাদা পোশাকের পুলিশকে বলে দেবেন। খুব শিগগির আরও কিছু খবর পেয়ে যাব। তার পরেই মনে হয় বড় ধরনের একটা-দুটো পুলিশি রেডের প্রয়োজন হবে। তখন আপনাকে সব কিছু জানাব। ধারালো বুদ্ধির তরুণ এই প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটরকে ওর সন্দীপদা খুব পছন্দ করেন। বাহবা দিয়ে বলেছিলেন : যেমন ইচ্ছে ঠিক তেমন ভাবে কাজ চালিয়ে যাও। পুলিশি সাহায্যের প্রয়োজন হলেই ফোন করবে।

সন্দীপদার সঙ্গে কথা শেষ হওয়ার পরেই কৌশিক ছুটেছিল ভেটারিনারি সার্জেন প্রতুল মহাপাত্রের চেম্বারে। অল্পবয়সী ওই ডাক্তারের উদ্যোগ আর আগ্রহ—দুটোই বুঝি একটু বেশি। কৌশিককে দেখেই চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে বলেছিলেন—আপনি এসে গেছেন, খুব ভাল হয়েছে। আমিই ভাবছিলাম আপনাকে একটা ফোন করি—। দারুণ খবর। ডাক্তারবাবু ওঁর অ্যান্টি-চেম্বারে কৌশিককে নিয়ে গিয়ে খবরটা শুনিয়েছিলেন।

ঘণ্টাখানেক ধরে সব কিছু শুনেছিল কৌশিক। তার পর নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে আসার পরেই ওর প্রথম কাজ ছিল ইন্সপেক্টর অবনী ঘোষরায়কে ফোন করা। অবনীদার মধ্যে ইদানীং ছেলেমানুষি কিছু মান-অভিমান জমে উঠেছে। সে সব উনি শুরু করার আগেই কৌশিক বলেছিল : ট্র্যাঙ্কের ওই হাড়গুলো ফেলবেন না, ওগুলো পরে প্রমাণ হিসেবে দাখিল করতে হবে।

শুনেই অবনীদা একটু ভারী গলায় বলেছিলেন : শুধু ওই হাড়ে নয়, আমার হাড়েও দুব্বো ঘাস গজিয়ে যাবে, কিন্তু অপরাধীর আর দেখা পাওয়া যাবে না।

কাল রাতে তো ঘুমের প্রশ্নই ছিল না, আজ সকালেও ঘুমোবার সময় পায়নি কৌশিক। এখন চোখের পাতা ভারী হয়ে আসছে, হাই উঠছে বারবার। এই রকম অবস্থায় এক-দু-ঘণ্টার ঘুমই যথেষ্ট। কিন্তু ঘুমোলে চলবে না। সাত-সকালে ইনফর্মার গগন ফোন করে জানিয়েছে, কিন্তু খবর দেওয়ার জন্যে সকাল সাড়ে ন'টা দশটা নাগাদ ও বাড়িতে আসবে।

সময় হয়ে গিয়েছে, যে কোনও মুহূর্তে ও এসে পড়বে ; কিন্তু তার আগে শ্রীকৃষ্ণদাকে একটা ফোন করা দরকার। হাসনাবাদের লাইন চট করে পাওয়া যায় না, কিন্তু এখন একবারেই পাওয়া গেল।

কৌশিব বলল, 'শ্রীকৃষ্ণদা, আমার ফিরতে আরও দু-তিনটে দিন দেরি হতে পারে।'

শ্রীকৃষ্ণ মাইতি অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসার, মৃদু হেসে বললেন, 'তুমি কলকাতায় রওনা হওয়ার সময়েই বুঝতে পেরেছিলাম, তোমার কাজ চট করে মেটার নয়। কিন্তু কাজ নিশ্চয়ই ঠিক ভাবে এগোচ্ছে?'

'তা এগোচ্ছে, কিন্তু আপনাকে যে জন্যে ফোন করেছিলাম—।'

শ্রীকৃষ্ণদা কৌশিককে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'ফোন করার একটাই কারণ—তোমার পূর্ণদার কাছে খবর পাঠাতে হবে—তোমার লঞ্চে ফিরতে দু-তিনটে দিন দেরি হবে—এই তো?'

তারিফ করার গলায় কৌশিক বলল, 'ঠিক তাই, কিন্তু—।'

এ বারও শ্রীকৃষ্ণদা ওকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'তোমার শ্রীকৃষ্ণদা ভাঙা পা নিয়ে খুব ঝঞ্ঝাট-ঝামেলার মধ্যে পড়ে গিয়েছেন, আর তুমি ডাক্তারবদ্যি করে বেড়াচ্ছ। লঞ্চে ফিরতে দেরি হওয়ার কারণ হিসেবে এই কথাগুলোই জানিয়ে দেব তো?'

বিব্রত মানুষের গলায় হেসে উঠে কৌশিক বলল, 'আমার তদন্তের স্বার্থে এই নির্দোষ মিথ্যেটুকু আপনাকে জানাতে হবে শ্রীকৃষ্ণদা। পূর্ণদার সব ভাল, একটাই শুধু গোলমেলে ব্যাপার—খুব তুচ্ছ কারণেও ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। এটা কিন্তু মাথায় রেখেই খবর পাঠাবেন।'

শ্রীকৃষ্ণদা আশ্বস্ত করার পরে টেলিফোন ছেড়েছিল কৌশিক।

গগন বেরা এল সাড়ে দশটা নাগাদ। এসেই খুব লাজুক ভঙ্গিতে বলল, 'দেরি করে ফেললাম, না?'

দেয়াল-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হাসল কৌশিক। 'দেরি কোথায়! তুমি তো এই রকম সময়েই আসবে বলেছিলে—।'

কৌশিকের কথা শুনেও ইনফরমার গগন বেরার লজ্জা-সঙ্কোচ দূর হল না। 'না স্যার, একটু দেরি হয়ে গেছে। আসলে পথে একটা ট্যাক্সি আর অটোয় ঠোকাঠুকির ঝামেলা হয়েছিল, তার থেকেই জ্যাম—।'

গোয়েন্দা বুঝতে পারল, গগন এখন একটা অন্য ধরনের জ্যামে আটকে গেছে। জ্যাম থেকে ওকে বার করার জন্য গোয়েন্দা সরাসরি ওকে প্রশ্ন করল, 'তুমি কি কাল প্রিন্সেপ স্ট্রিটে গিয়েছিলে?'

'গিয়েছিলাম স্যার।'

'কিছু কাজ হয়েছে?'

'হয়েছে স্যার।'

রোগা, কালো, নিরীহ গোবেচারা চেহারার ইনফরমারের চোখমুখ দেখে বোঝার উপায় নেই—যে কাজটা হয়েছে সেটা ভাল না মন্দ। তীক্ষ্ণ চোখে গগনের শরীরের ভাষা পড়তে পড়তে গোয়েন্দা বলল, 'তুমি দাঁড়িয়ে কেন? বসো।'

বলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সামনের চেয়ারটায় বসে পড়েছিল গগন।

'চা-টা কিছু খাবে?'

'খেয়েই বেরিয়েছি স্যার।'

এ দিকের চেয়ারে বসে গোয়েন্দা বলল, 'এ বার শোনা যাক তোমার কাজের কথা। ভোলা আর পচনের দেখা পেয়েছিলে?'

'পেয়েছিলাম স্যার।'

'কোথায়?'

'চাঁদ ট্রাভেলসের সামনে।'

'সেটা আবার কোথায়?'

'আপনি স্যার প্রিন্সেস স্ট্রিটের যে ঠিকানা দিয়েছিলেন—ওখানেই তো চাঁদ ট্রাভেল্‌স। ট্রান্সপোর্ট কোম্পানিটা বেশ বড়। অনেক পার্টি আসছিল ওখানে। চাঁদ ট্রাভেলসের কাছেই একটা চায়ের দোকান আছে, ফুটপাথের দোকান, ভাঁড়ে চা বেচে। ওখানে দাঁড়িয়েই চোখ রেখেছিলাম ওই অফিসটার দিকে। আধঘণ্টাটাক বাদে ওখানেই হাজির হয়েছিল ভোলা আর পচন।'

'ওরা কি তোমাকে চেনে?'

'না স্যার, সেই জন্যেই তো আমার কাজের সুবিধে হয়ে গিয়েছিল অনেকখানি। অনেকগুলো অফিস, দোকানপাট প্রিন্সেপ স্ট্রিটে—রাস্তায় ভিড়ভাট্টা লেগেই থাকে। ভিড়ের মধ্যে একটু একটু করে এগোতে এগোতে আমি তো ওদের অনেক কথা শুনে ফেলেছি—।'

'কী রকম?'

'বলছিল পার্টি আসবে পেমেন্ট নিতে।'

'কোথায় আসবে? কার কাছ থেকে পেমেন্ট নেবে?'

'আমি প্রথমে ভেবেছিলাম স্যার ওদের কাছ থেকেই। কিন্তু পরে দেখি পেমেন্ট করার লোক এসে গেছে।'

'কে? চেনো তাকে?'

নিস্পৃহ ভঙ্গিতে একদিকে মাথা কাত করল গগন। 'চিনি স্যার। এক মারোয়াড়ি কারবারি। একটা বিল্ডিং মেটিরিয়ালের দোকান চালায়। কিন্তু শুনেছি স্যার ওই দোকানটা দেখ্‌নাই শুধু, টাকা খাটায় দু-নম্বরি কারবারে।'

'কীসের দু-নম্বরি কারবার?'

'সেটা স্যার এখনও জানতে পারিনি।'

'লোকটাকে তো চেনো বলছ। কী নাম?'

'রঘু, রঘু জালান।'

একটু চমকে উঠল কৌশিক, তার পর বিড়বিড় করে বলল, 'মুখার্জিবাবুর কাছে এই নামটা তো শুনেছি—।'

'আপনার চেনা স্যার?'

'না। নামটা শুনেছি বলে মনে হচ্ছে। যাকগে, ও কাকে পেমেন্ট করল?'

'দুটো লোক এসেছিল একটু পরে, তাদের।'

'ওদের কি চেনো তুমি?'

'না স্যার। তবে একটা লোককে দেখে গাঁয়ের লোক বলে মনে হয়। বিশাল চেহারা। গায়ের রং কালো কুচকুচে, মাথায় একরাশ কালো কোঁকড়ানো চুল। পাশের লোকটা শহুরে। স্বাস্থ্য ভাল। ঝকঝকে শার্ট-প্যান্ট পরা। হাতে একটা অ্যাটাচি। রঘু বেশ খাতির করে কথা বলল ওদের সঙ্গে—।'

'কোথায় নিয়ে গিয়েছিল ওদের?'

'কোথাও না স্যার, ফুটপাথে দাঁড়িয়েই কথা চালিয়েছিল কিছুক্ষণ। তার পর ওই লোক দুটো চলে গেল।'

'চলে গেল! তুমি যে বললে ওরা পেমেন্ট নিতে এসেছিল। ভোলা আর পচনের কথাবার্তার মধ্যে ওই রকম একটা কথা ছিল নাকি—।'

ইনফরমার গগন বেরার কণ্ঠস্বরের মধ্যে কোনও রকম তাপ-উত্তাপ ছিল না। চোখমুখের চেহারা অসম্ভব নিরীহ। ঠান্ডা গলায় বলল, 'পেমেন্ট তো হয়ে গিয়েছিল স্যার।'

'কোথায়? রাস্তার ওপরেই টাকা-পয়সা দেওয়া-নেওয়া হয়ে গেল?'

'ও ভাবে তো হয়নি স্যার। ওই লোক দুটো আসার একটু পরে ওবা একসঙ্গে সিগারেট ধরিয়েছিল। সিগারেট ধরাবার সময় রঘু আর ওই কাপ্তেন গোছের লোকটা ওদের হাতের দুটো অ্যাটাচি নামিয়ে রেখেছিল পায়ের কাছে। সিগারেট ধরাবার পরে লোকটা নিজের অ্যাটাচির বদলে রঘুর অ্যাটাচিটা তুলে নিয়ে চলে গিয়েছিল। অ্যাটাচি বদল হওয়া দেখেই বুঝলাম—পেমেন্ট হয়ে গেল—।'

গগনের কথা শুনে গোয়েন্দার শরীর কেমন যেন টানটান হয়ে উঠেছিল। অবাক চোখে জিজ্ঞেস করল, 'ওই ভাবে অ্যাটাচি বদলাবদলি করার ব্যাপারটা তুমি কি ভাল ভাবে লক্ষ্য করেছ?'

গগনের চোখমুখ, কণ্ঠস্বর আগের মতোই শান্ত। বলল, 'রঘুর হাতের অ্যাটাচির রং ছিল কালো, আর ওই ক্যাপ্তেন গোছের লোকটার অ্যাটাচি ছিল স্টিল গ্রে রঙের। হ্যান্ডেলে একটা ট্যাগ লাগানো, ভুল হওয়ার কোনও কারণ নেই। ইচ্ছে করেই বদলাবদলি করেছে। রঘুর অ্যাটাচিটা, আমার মনে হয় স্যার কারেন্সি নোটে ভর্তি ছিল।'

কপালে বেশ কয়েকটা ভাঁজ পড়ে গিয়েছিল গোয়েন্দার। 'লোক দুটো গেল কোন দিকে?'

'সেন্ট্রাল এভিনিউয়ের উপরে একটা প্রাইভেট গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। ওটায় ওরা উঠতেই গাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল। পাকা দল স্যার। আসা, কথাবার্তা, অ্যাটাচি বদল করা—এত সব পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে সেরে ফেলেছিল।'

গম্ভীর মুখে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে গোয়েন্দা জিজ্ঞেস করল, 'ওই পেমেন্টের কথা ছাড়া আর কী-কী কথা কানে এসেছে তোমার?'

সিলিংয়ের দিকে একবার তাকিয়ে নেওয়ার পরে গগন বলল, 'খুব শিগগিরি বড় ধরনের একটা চালান যাবে। পেট্রল পাম্পের কথা কানে এল। মাল ওখান থেকে যেতে পারে, আবার চাঁদ ট্রাভেলস থেকেও যেতে পারে। কোত্থেকে যাবে এখনও বোধহয় পাকা হয়নি, দু-তিন দিনের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে। টুকরো-টাকরা কথা শুনে তাই তো মনে হল।'

'ওই লোক দুটো অ্যাটাচি বদল করে চলে যাওয়ার পরে রঘু, ভোলা আর পচন কী করেছিল?'

'রঘু পকেট থেকে দুটো খাম বার করে ভোলা আর পচনকে ধরিয়েছিল স্যার। মনে হয় ওই দুটো খামের মধ্যেও টাকা ছিল। খাম পেয়ে হাসি ফুটে উঠেছিল ওই দু জনের মুখে। ওরা উল্টোমুখো হাঁটা শুরু করার পরে রঘু চাঁদ ট্রাভেলসের অফিসে ঢুকে পড়েছিল।'

'তুমি কী করেছিলে তারপর?'

'আমি স্যার একটু দোনামনা করার পরে ভোলা আর পচনের পিছু নিয়েছিলাম।'

তারিফ করার গলায় গোয়েন্দা বলল, 'ঠিক কাজই করেছ গগন। তা, ওই ক্রিমিনাল দুটো প্রিন্সেপ স্ট্রিট থেকে বেরিয়ে কোথায় গিয়েছিল?'

পকেট থেকে রুমাল বার করে চোখমুখ মুছে নিয়ে গগন বলল, 'কী জোরে হাঁটে লোক দুটো! হাঁটা না বলে দৌড়নো বলাই বুঝি ভাল। অত জোরে হাঁটতে দেখে একবার মনে হয়েছিল—আমি ওদের পিছু নিয়েছি—ওরা বোধহয় টের পেয়ে গেছে।'

'তাই কী?'

'না স্যার, তেমন-কিছু হলে ওরা পেছন ফিরে তাকাত দু-চারবার। ঝপ্ করে আশেপাশের গলির মধ্যেও ঢুকে পড়তে পারত। তেমন কিছু হয়নি। সোজা হেঁটে ওরা লালবাজারের পাশের রাস্তা দিয়ে বাগরি মার্কেটে ঢুকে পড়েছিল।'

'মার্কেটের মধ্যে কোথাও কি ঢুকেছিল?'

'ঢুকেছিল স্যার। ওখানে প্রচুর হোলসেল ওষুধের দোকান আছে। ওই সব দোকানের একটায় ঢুকে পড়েছিল। খুব চেনাশোনা না থাকলে ওই ভাবে দোকানের একেবারে ভেতরে ঢুকে যাওয়া যায় না।'

মুখার্জিবাবু কোনও ঘটনার বিবরণ দিতে গেলে মূল ঘটনা তো বটেই, আশেপাশের বৃত্তান্তও শুনিয়ে দেন নিখুঁত ভাবে। কৌশিকের মনে পড়ে গেল, ওই রকম একটা জায়গায় ভোলা আর পচনের ওষুধের দোকানে ঢোকার কাহিনীও শুনিয়েছিলেন মুখার্জিবাবু। দোকানের ঠিকানাটাও নাকি ওঁর নোটবুকে লেখা আছে। মিলিয়ে দেখার ইচ্ছেতেই গোয়েন্দা গগনকে জিজ্ঞেস করল, 'ওষুধের দোকানের ঠিকানাটা লিখে নিয়েছ তো?'

শান্ত মুখের উত্তর এলে, 'নিয়েছি স্যার।'

'ওষুধের দোকান থেকে ওরা বেরুল কখন?'

'মিনিট-দশেক বাদে।'

'কোনও জিনিসপত্তর সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিল কি?'

'না স্যার। খালি হাতে ঢুকেছিল, আবার খালি হাতেই বেরিয়েছে। তবে পকেটে ছোট মাপের কোনও মাল ঢুকিয়ে নিয়েছিল কি না জানি না—।'

'ওখান থেকে বেরিয়ে কোথায় গেল?'

'ট্রামরাস্তায় ফিরে বাসে চেপে মানিকতলায়। ওখানে এক কালোয়ারের লোহার দোকানে ঢুকেছিল।'

গোয়েন্দার মনে পড়ে গেল মুখার্জিবাবুও কালোয়ারের একটা দোকানের কথা শুনিয়েছিলেন। ভোলা আর পচন ওই দোকান থেকে একটা র‍্যাশনব্যাগ নিয়ে বেরিয়েছিল। র‍্যাশনব্যাগে অত সাবধানে ধরার ভঙ্গি দেখে মুখার্জিবাবুর মনে হয়েছিল—টাকা আছে ব্যাগে। ওরা ওখান থেকে বেরিয়ে শিয়ালদায় গিয়েছিল। পুরো ঘটনাটা মনে পড়ে যেতেই কৌশিক জিজ্ঞেস করল, 'ওই দোকান থেকে বেরিয়ে ওরা কি শিয়ালদার দিকে গিয়েছিল?'

দুদিকে মাথা নাড়তে নাড়তে উত্তর দিল কৌশিক, 'না স্যার। লোহালক্কড়ের ওই দোকানগুলো বেশ লম্বা হয়। ভোলা আর পচন একদম ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল। বেরিয়ে এল মিনিট-পনেরো বাদে। দোকানের সামনে ফুটপাথের ওপর একটা খাটিয়া বেছানো

ছিল। ওই খাটিয়ায় বসে দোকানের দু-তিনজন কর্মচারীর সঙ্গে ওরা খোশগল্প জুড়ে দিয়েছিল। শুনলাম ওরা ওখানে প্রায়ই যায়।'

'শুনলাম! কে আবার শোনাল তোমাকে ওই কথাটা?'

গগন একদম গোড়ায় যে ভাবে কথা শুরু করেছিল, ভঙ্গি এখনও ঠিক সেই রকমই। আবেগ-উত্তেজনার কোনও রকম চিহ্ন ছিল না ওর চোখেমুখে বা কণ্ঠস্বরে। আগের মতোই নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বলল, 'আমাদের লাইনে কাজ করে এমন একজনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ওখানেই। আমি ছিলাম উল্টো দিকের ফুটপাথে একটা গাছের আড়ালে। তা, ওখানেই লক্ষ্মণের সঙ্গে দেখা। লক্ষ্মণ তো ওই দিকটাতেই বেশি কাজ করে। জিজ্ঞেস করল, ওখানে কেন? বললাম—কাজে এসেছি। তার পরেই ভোলা আর পচনকে দেখিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—ওদের ও চেনে কি না। বলল—খুউব চিনি। প্রায় সন্ধেতেই পাঁচুর ঠেকে যায়।'

'পাঁচুর ঠেক!'

আগের মতো তাপ-উত্তাপহীন কণ্ঠে উত্তর দিল গগন, 'পাঁচুর ঠেক মানে ওই এলাকার একটা বাংলা মালের ঠেক। শুধুমাত্র দিশি মদই বিক্রি হয়। তা লক্ষ্মণ একটু খায়টায়, ওই ঠেকে যায় প্রায়ই। বললাম, ঠেকে গিয়ে ওদের ওপর একটু নজর রাখতে হবে, ওদের মধ্যে যা-যা কথা হবে, যদ্দুর সম্ভব শুনে আমাকে সব জানাতে হবে।'

একটু উত্তেজিত হয়ে উঠল গোয়েন্দা। 'তোমার লক্ষ্মণ রাজি হয়েছে?'

'হয়েছে স্যার। মাল খাওয়াব জন্যে ওকে একটা পঞ্চাশ টাকার পাত্তি ধরিয়ে দিয়েছি।'

কথাটা শুনে একটু ব্যস্ত হয়ে কৌশিক বলল, 'তোমাকে তা হলে আরও কিছু টাকা দিই?'

জিভ কেটে লাজুক মুখে গগন বলল, 'এক্ষুনি আর কিছু লাগবে না স্যার। দরকার পড়লে চেয়ে নেব।'

'মনে করে নেবে কিন্তু। আমাকে এখন মনে হয় দু-তিন দিন থাকতে হবে এখানে। তুমি এই ফ্ল্যাটে ফোন করে সব জানাবে। তেমন কিছু খবর থাকলে সকালে বা রাতের যে-কোনও সময় চলে আসবে। কাজটা কিন্তু অসম্ভব জরুরি। একটুও ঢিলেমি দিলে চলবে না।'

বিনীত, বাধ্য মানুষের ভঙ্গিতে গগন বলল, 'সে আমি বুঝতে পেরেছি স্যার। আমি মানিকতলা থেকে চলে আসার সময় লক্ষ্মণকে খুব ভাল করে সব বলে এসেছি। কাল রাতেই ওর পাঁচুর ঠেকে যাওয়ার কথা। আজ যাব একবার ওর কাছে। মনে হয় আজই কিছু খবর পেয়ে যাব। এখন তা হলে চলি স্যার।'

'ঠিক আছে, এসো।'

দরজার দিকে দু পা গিয়ে আবার ফিরে এসে গগন বলল, 'আপনাকে আমার এ সব বলা ঠিক নয়, তবু বলছি স্যার। এদের কাজের ধরনধারণ দেখে মনে হচ্ছে—দলটা খুব জবরদস্ত। একটু বেশি সতর্ক হয়ে আপনাকে এগোতে হবে স্যার।'

মৃদু হেসে জবাব দিল গোয়েন্দা, 'ঠিক আছে।'

॥ ৩২ ॥

সন্ধে হতেই ফুরফুরে হাওয়া ছেড়েছিল। আকাশে খইয়ের মতো তারা ফুটে উঠেছে অসংখ্য। নোঙর-করা এম ভি সদাগরের গায়ে নদীর জল ছলাত্-ছল ছলাত্-ছল করে ভাঙছিল। ওই শব্দটুকু ছাড়া আর কোথাও কোনও শব্দ নেই। লঞ্চের ছাতে জমাটি একটা আড্ডা বসেছিল। চৌকির ওপর হেলান দিয়ে বসে আছেন পূর্ণ চ্যাটার্জি। হাতে কফির কাপ। ওঁর বাঁ দিকের চেয়ারে জোসি। হাতে কোল্ড ড্রিংকসের গ্লাস। ডানদিকের চেয়ারে ডেভিস। ওর হাতে হুইস্কির গ্লাস। আজ সাহেবকে একটু বেশি চঞ্চল দেখাচ্ছিল। অন্যান্য সন্ধ্যায় হুইস্কির প্রথম গ্লাসটা শেষ করতে যে সময় নেয়, আজ সেই সময়ের মধ্যেই প্রায় দুটো গ্লাস শেষ।

আগের কথার জের টেনে জোসির 'পূর্ণদা' বললেন, 'বেশ কিছু বনকর্মী গেছে বাঘের পেটে। কোর-এরিয়ার পাহারার কাজে যারা থাকে, তাদের অনেকেই বাঘের শিকার হয়েছে। বনকর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে অনেক আগে থেকে। এক ধরনের হেলমেট একবার তৈরি করা হয়েছিল ওদের জন্যে। ফাইবার গ্লাসের তৈরি, নাম দেওয়া হয়েছিল 'টাইগার গার্ড'। মৌলি, ফরেস্ট গার্ড—প্রত্যেককে ওই হেলমেট দেওয়া হত বনে ঢোকার আগে। কিন্তু ওটা খুব একটা পপুলার হয়নি, আসলে গরমকালে ওই হেলমেট পরে থাকা বেশ কষ্টের।'

চোখ বড়-বড় করে সায় দিয়ে জোসি বলল, 'সুন্দরবনে শুনেছি হট ডেজই বেশি, ওই সময় ফাইবার গ্লাসের টাইগার গার্ড বেশিক্ষণ পরে থাকা মনে হয় সত্যিই খুব কষ্টের। তা, ওদের বাঁচাবার জন্যে অন্য কোনও ডিভাইস বার করা হয়নি পূর্ণদা?'

কফির কাপে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে পূর্ণদা বললেন, 'বেশ কয়েকটা ব্যবস্থাই নেওয়া হয়েছে শুনেছি, সবগুলোর কথা আমি অবশ্য জানি না। তবে একটা এক্সপেরিমেন্টের রিপোর্ট পড়ে বেশ মজা পেয়েছিলাম একবার।'

মজার কথা শুনে জোসির বড়-বড় চোখ দুটো বুঝি আর একটু বড় হয়ে উঠেছিল। কপালের সোনালি চুলগুলো আঙুল দিয়ে পেছনের দিকে ঠেলে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী এক্সপেরিমেন্ট পূর্ণদা?'

পূর্ণদা হাতের কাপটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে বললেন, 'জেলে, কাঠুরে, মৌলি—এদের কয়েকটা মূর্তি বানানো হয়েছিল। মূর্তিগুলোর গলায় নেকেড অয়্যার। ওই খোলা তারে দেওয়া হল তিনশো ভোল্টের বিদ্যুৎ। আমি টেকনিক্যাল ব্যাপারস্যাপার বুঝি না, তবে যত দূর মনে পড়ছে—রিপোর্টে লেখা ছিল, গাড়ির ব্যাটারি থেকে ছোট ছোট ট্রান্সফর্মারের সাহায্যে ওই বিদ্যুৎ তৈরি করা হত। বিদ্যুৎ সিস্টেমের মধ্যে রাখা হত একটা ফিউজ রেকর্ডার।'

ডেভিস খুব আগ্রহের সঙ্গে সব শুনতে শুনতে জিজ্ঞেস করল, 'ওই স্ট্যাচুগুলো দেখিয়ে টাইগারকে কি বোকা বানানো গিয়েছিল?'

পূর্ণদা হেসে বললেন, 'না সহজে যায়নি। মূর্তি যত নিখুঁতই হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত মূর্তিই তো। বাঘরা ঠিক বুঝে ফেলবে। সুতরাং কিছুটা টাচ অব রিয়ালিটি দেওয়া হয়েছিল।'

'কী রকম?'

'ওই জেলে, কাঠুরে বা মৌলির মূর্তির গায়ে সত্যি-সত্যি ওই সব লোকের-ব্যবহার করা পোশাক চাপানো হল। পোশাক মানুষের গায়ের গন্ধ ধরে রাখে অনেকখানি। গাছের পাশে দাঁড়িয়ে কাঠুরের একটু ঝুঁকে পড়ে গাছ কাটার ভঙ্গি। পরনে ধুতি আর ফতুয়া। আশেপাশে গাছের ডালপালা। এবার ভুল হল বাঘের। পা টিপে টিপে এসে পেছন দিক থেকে লাফিয়ে পড়ল নকল কাঠুরের ঘাড়ে। খোলা তার জড়ানো মূর্তির গলায়, তাতে তিনশো ভোল্টের বিদ্যুৎ। শক্ খেয়ে ছিটকে পড়ল বাঘ। তার পর প্রচণ্ড এক লাফ মেরে পালাল ওখান থেকে।'

অবিকল বাচ্চাদের মতো খুশি হয়ে উঠেছিল জোসি। প্রায় হাততালি দেওয়ার ভঙ্গি করে বলল, 'রাইটলি সার্ভ্ড। আচ্ছা পূর্ণদা, এতে বাঘের কোনও ইনজুরি হয় না?'

'রিপোর্টে লিখেছে—হয় না। একটা শক্ খেলে বাঘের কোনও ক্ষতি হয় না। উদ্দেশ্য হল—বাঘকে একটু ভয় পাইয়ে দেওয়া। একবার শক্ খাওয়ার পরে বাঘের মনে হতে পারে, যে-কোনও মানুষকে আক্রমণ করলেই বুঝি ওই ধরনের ঘটনা ঘটবে। চামটা, নেতি ধোপানি, সুধন্যখালির বেশ কয়েকটা বাঘকে ওই ভাবে বিদ্যুতের শক্ খাওয়ানো হয়েছিল।'

হুইস্কির গ্লাসে দ্রুত একটা চুমুক মেরে ডেভিস ধাবালো চোখে প্রশ্ন করল, 'ওই সব ঘটনার পরে কি বাঘের মানুষ খাওয়া কমে গিয়েছিল?'

'একটা সার্ভে রিপোর্ট বলে—কমেছিল।'

'কবেকার সার্ভে রিপোর্ট?'

'ওই সব ঘটনার ঠিক পরের?'

'তার পরে কি আর কোনও সার্ভে করা হয়েছিল?'

'ঠিক জানি না।'

ডেভিসের ঠোঁটে একটা বাঁকা হাসি ফুটে উঠেছিল। 'খোঁজ নিয়ে দেখবেন—পরে আর কোনও সার্ভে যদি করাও হয়ে থাকে, তার রিপোর্ট ফেভারেবল নয়।'

অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন পূর্ণ চ্যাটার্জি—'কেন? এ কথা আপনি বলছেন কেন?'

ডেভিসকে বেশ আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছিল। গ্লাসে বেশ বড় গোছের একটা চুমুক দেওয়ার পরে বলল, 'ম্যানইটারকে একবার বোকা বানানো যেতে পারে। বারবার নয়। ইমপসিবল।'

আর একবার অবাক হলেন পূর্ণদা। 'কেন? আপনি এ কথা বলছেন কেন?'

জড়ানো গলায় সবজান্তার ভঙ্গিতে হেসে উঠল সাহেব। 'কারণটা আপনি জানেন না? হিরু মানডল বলছিল। ওর কাছ থেকেই শুনুন। গানেশ, গান্-নেশ।'

অসম্ভব নির্জন ওই সন্ধ্যা সাহেবের গাঁক-গাঁক করা গলার ডাকে বোধহয় কেঁপে উঠেছিল।

একটু বাদেই সিঁড়িতে দুপদাপ শব্দ উঠল। পারভেজ এসে বলল, 'স্যার, গণেশ তো ওর দেশের বাড়িতে গেছে, ওর মায়ের অসুখ। বোধহয় কালকেই ফিরবে।'

মাথা নেড়ে ডেভিস বলল, 'রাইট, ও তো আমাকে বলেই গেছে। আই জাস্ট ফরগট। এনিওয়ে, হিরু কোথায় এখন?'

'ও তো স্যার নীচে রান্নাঘরে বসে গল্প করছে।'

'কল হিম হিয়ার রাইট নাউ। জল্‌দি ডাকো।'

পারভেজ ছুট লাগাল আবার।

একটু পরেই এল ব্যাঘ্রবন্ধনের ডাকসাঁইটে গুনিন। পরনে সেই বিচিত্র পোশাক। গায়ে হরেক রকমের রঙিন কাপড়ের টুকরো-জোড়া বিরাট এক আলখাল্লা। গোটা শরীরটাই ঢেকে রেখেছে ওই আলখাল্লা, শেষের দিকে ঢোলা পাজামার একটুখানি। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, মুখে দাড়িগোঁফের জঙ্গল। চোখে বেশ একটা লালচে ভাব ফুটে উঠেছে। পূর্ণদার মনে হল, লোকটা নির্ঘাত নীচে বসে গাঁজা টানছিল।

গুনিনের চলা-ফেরা, বসা আর কথা বলার মধ্যে বেশ একটা নাটকীয়তা আছে। হাতজোড় করে অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরে গিয়ে একসঙ্গে তিনজনকে নমস্কার ঠোকার পরে ডেভিসের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল হিরু, 'ছাহেব, কী জন্যে আমাকে তলব করেছেন?'

সাহেব শূন্য গ্লাসে বেশ কিছুটা হুইস্কি ঢেলে জল মেশাতে মেশাতে জিজ্ঞেস করল, 'হিরু, বাঘের বুদ্ধি কেমন?'

'দারুণ ছাহেব।'

'আর যে বাঘ একবার মানুষ খেয়েছে, তার বুদ্ধি?'

'এমনি বাঘের দশ গুণ বেশি।'

'কেন এটা হয়?'

'হিসেব তো খুব পষ্ট ছাহেব।'

'হ্যাঁ, তুমি একটু-একটু বলছিলে আমাকে—। ভাল করে বলো তো, সবাই শুনুক।'

একজন মাল্লা এগিয়ে এসে একটা টুল পেতে দিল। হিরু ওই টুলে বসে চারদিক একবার দেখে নিয়ে কপালে জোড়া হাত ঠেকিয়ে মাথাটা সামান্য উলটে দিয়ে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'জয় মা বনবিবি, জয় মা বনবিবি, আমরা তোমার অধম সন্তান ; মা, মাগো—।'

হিরু গুনিন অলৌকিক ক্ষমতার জোরে বাঘের মুখ বাঁধতে পারে বলে গাঁ-গঞ্জের লোকরা ওকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করে চলে। আর একটা মস্ত গুণ আছে লোকটার—তা হল, জমিয়ে গল্প বলার। কর্কশ গলা ওপরে তুলে, নীচে নামিয়ে, কাঁপিয়ে, কখনও-কখনও যাত্রাপালার ধাঁচে দু-কলি গান গেয়ে চট করে আসর জমিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে হিরু। গল্পের লোভে লঞ্চের মাঝিমাল্লারা একটু দূরত্ব বজায় রেখে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল চারদিকে। হিরু জোড় হাত দ্রুত তালে কপালে বারতিনেক ঠুকে মাতৃবন্দনা শেষ করে বলল, 'ছাহেব, বাঘের অসম্ভব বুদ্ধি। ওর বুদ্ধির সঙ্গে আর কোনও প্রাণী এঁটে উঠেতে পারে না। এই বুদ্ধিমান বাঘ একবার যদি মানুষ খায়—ব্যস, তা হলে আর দেখতে হবে না।'

জোসির চোখেমুখে ছেলেমানুষি ভাব ফিরে এসেছিল আবার। কপালের ওপর উড়ে-আসা সোনালি চুলের গুচ্ছ এক ঝটকায় পেছন দিকে পাঠিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'মানুষ খেলে কী হয় বাঘের?'

'বুদ্ধি বাড়ে মেমছাহেব, বুদ্ধি। মানুষের রক্ত খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঘের বুদ্ধি দশ গুণ বেড়ে যায়। এ আমার নিজের চোখে দেখা মেমছাহেব, শোনা কথা নয়। দু-একটা দিষ্টান্ত দিচ্ছি আপনাদের। শিকারি গেছে বাঘশিকারে। কোন্ বাঘ? না, মানুষখেকো বাঘ। শিকারি বাঘের পিছু নেয় কী ভাবে জানেন তো?'

'কী ভাবে?'

'বাঘের খোঁচ দেখে দেখে।'

'হোয়াট ইজ দিস খোঁন্চ পূর্ণাদা?'

জোসির প্রশ্নের উত্তর দিলেন পূর্ণদা। 'খোঁচ হচ্ছে পাগমার্ক, বাঘের পায়ের ছাপ।'

প্রশ্নের উত্তর জোসি বুঝে ফেলার পরে আবার আগের কথার খেই ধরল হিরু। 'গাঁয়ের জেলে, মৌলি, কাঠুরে মিলিয়ে দশটা মানুষ খেয়েছিল ওই বাঘটা। খুব অল্প সময়ের মধ্যে। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে গাঁয়ে ঢোকে, আর মানুষ মারে। অনেক দিন আগের কথা। তখন এত নিয়মটিয়ম ছিল না। সরকারি দফতর শিকারি ফিট করল সেই বাঘ মারার জন্যে। ফরেস্ট ডিপার্ট থেকে আমাকে বলল, শিকারির সঙ্গে যেতে হবে। আমি শিকারিকে প্রথমেই জিজ্ঞেস করলাম : আপনি কি আগে বাঘ মেরেছেন? শিকারি হেই লম্বা-চওড়া। গোঁফ মুচড়ে জবাব দিল : মেরেছি, পাঁচ খান। আমি বললাম . তার মধ্যে কি একটাও মানুষখেকো ছিল? বলল : না। আমি তখন বললাম : আপনার ওই পাঁচ খান বাঘ মারার বিদ্যে তা হলে এখানে কাজে আসবে না। সেই কথা শুনে শিকারি আমার ওপর বেজায় চটল। বড় মানুষ, বড় শিকারি, কাঁধে ঝোলানো বন্দুক, গলায় গুলির মালা—চটে গিয়ে আমাকে ছোট-বড় অনেক কিছু বলে গেল। আমি কোনও জবাব না দিয়ে মাথা নিচু করে সব শুনলাম। জঙ্গলের মধ্যে কিছুটা পথ এগোবার পরে পাওয়া গেল বাঘের খোঁচ। বন্দুক বাগিয়ে ওই খোঁচ ধরে ধরে এগোতে লাগল শিকারি। আমি আকাশের দিকটা দেখিয়ে দিয়ে বললাম : 'হুজুর খুব সাবধান।'

পূর্ণদা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওপরে কী ছিল?'

হিরু গম্ভীর গলায় জবাব দিল, 'সুয্যিঠাকুর। তখন ঠিক দুপুর বারোটা, সূর্য মাথার ওপরে।'

গুনিনের কথার মাথামুণ্ডু কেউই বুঝতে পারল না। মাথার ওপর সূর্য থাকার সঙ্গে সাবধান হওয়ার কী সম্পর্ক!

লালচে চোখ দ্রুত একবার চারদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে হিরু বলল, 'আপনাদের চোখমুখ দেখেই ঠাহর হচ্ছে আপনারা কেউ আমার কথার মানে বুঝতে পারেননি। না পারাটাই স্বাভাবিক, আপনারা কেউ তো আর বাঘশিকারি নন। কিন্তু আপনাদের মতো দশা সেদিনের ওই শিকারিরও হয়েছিল। আমার ওই কথাটা বুঝল না, গেরাহ্যও করল না। একটু বাদেই ফেরে পড়ে গিয়েছিল—।'

'কী ফের?'

'বাঘের খোঁচ ধরে শিকারি এগোচ্ছে। পেছনে আমি। খোঁচ ধরে শিকারি এগোচ্ছে তো এগোচ্ছেই। পথ আর ফুরোয় না। ব্যাপারটা আমি ধরে ফেলে শিকারির পিঠে খোঁচা মেরে বললাম : হুজুর সাবধান। খোঁচা খেয়ে ঘাবড়ে গিয়ে শিকারি জিজ্ঞেস করল : সাবধান কেন? আমি তখন আর একবার আঙুল তুলে মাথার ওপরের সুয্যিঠাকুর দেখিয়ে বললাম : এই রকম ভরদুপরে বনের মধ্যে দিক ভুল হয়ে যায়। ঠাহর হয় না কোথায় যাচ্ছি। আপনি কি বুঝতে পারছেন—বাঘ চক্র কাটছে। গোল হয়ে ঘুরতে শুরু করে দিয়েছে বাঘ। আমরা ভাবছি আমরা বাঘের পেছনে, ওদিকে চালাকি করে বাঘ আমাদেরই পিছু নিয়েছে। বলতে না বলতেই দেখি আমাদের ঠিক পেছনে প্রকাণ্ড সেই

মানুষখেকো। চেঁচিয়ে উঠে বললাম : ছোড়েন গুলি। ওই চিৎকারেই কাজ হল। বাগানো ধরা বন্দুকের ঘোড়া টিপল শিকারি। বাঘ কিন্তু মরেনি, জব্বর চোট পেয়ে ধাঁ হয়ে গিয়েছিল। শিকারিকে বললাম : শিগ্‌গির পালান এখান থেকে। আর কিছুক্ষণ এখানে থাকলে ওই মানুষখেকো ঠিক তুলে নিয়ে যাবে আপনাকে।'

'ফিরে এল শিকারি?'

'তা নয় তো কী? ওই মানুষখেকোর বুদ্ধির দৌড়ের সঙ্গে তাল দেওয়ার সাধ্যি ছিল না ওই শিকারির। পরে অন্য এক পাকা শিকারির গুলিতে ওই মানুষখেকো মরে। মানুষ খেলেই বাঘের বুদ্ধি বেড়ে যায় দশ গুণ। কী রকম বুদ্ধি শোনেন। জঙ্গলের মধ্যে কাঠুরে কুড়ুল দিয়ে কাঠ কাটছে। চারদিকে শুকনো পাতা। গভীর জঙ্গল একেবারে শান্ত, কোথাও কোনও শব্দ নেই। ওই শান্ত বনে শুকনো পাতার ওপর দিয়ে একটা পাখি হেঁটে গেলেও শব্দ উঠবে। তা ওই শব্দ এড়াবার জন্যে মানুষখেকো কী করেছিল বলেন তো?'

একই সঙ্গে জনাতিনেক প্রশ্ন করল, 'কী?'

'এ সব আমার নিজের চোখে দেখা। মানুষখেকো কী করল জানেন? ওই যে কাঠুরে কুড়ুলের কোপ মারছিল গাছে, ওই কোপের শব্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মিলিয়ে পা ফেলছিল শুকনো পাতায়। শুকনো পাতা ভাঙার শব্দ ওইভাবে গোপন করে কাছে এসে লাফ মেরেছিল কাঠুরের ওপর।'

বিস্ময় ঠিকরে পড়ছিল জোসির চোখ থেকে। ঢোক গিলে বলল, 'হাউ ডেঞ্জারাস!'

হিরু কথা বলে যাচ্ছিল কেমন যেন নিজের খেয়ালে। বলল, 'সুন্দরবনের কাদা যে কী জিনিস আপনারা তা জানেন না! এই মাঝিমাল্লারা জানে। খালের ধারে কাদায় পা ফেললে হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যায়। ওই কাদাজমিতে হাঁটা ভীষণ কষ্টের! তারপর ওই কাদা ভাঙার কী বিকট আওয়াজ হয়—ভেবে দেখেন একবার। কিন্তু অবাক কাণ্ড, মানুষখেকো যখন ওই কাদা ভেঙে শিকারের পিছু নেয় ; একফোঁটাও শব্দ ওঠে না। অথচ ওই প্রকাণ্ড শরীর, পা ডুবে যায় এতটা কাদার ভেতর। কিন্তু পা টানা আর ফেলার মধ্যে কোনও শব্দ নেই। একবার আমি দেখলাম, এও আমার নিজের চোখে দেখা—শিকারের পিছু নিতে গিয়ে অসাবধানে কাদা ভাঙার শব্দ করে ফেলেছে বাঘ। শিকার তো পালাল, কিন্তু মানুষখেকোটা কী করেছিল বলেন তো?

'কী?'

"দোষ করার জন্যে শাস্তি দিয়েছিল নিজেকে। নিজের চোখে দেখা না হলে হয়তো বিশ্বাস করতাম না। ওই মানুষখেকো কাদা থেকে ড্যাঙায় উঠে প্রাচিত্তির করার জন্যে নিজের পা কামড়ে ছিল তিন-চার বার। মানুষের রক্ত খেয়ে ওই মানুষখেকোটার শুধু মানুষের মতো বুদ্ধিই হয়নি, ভুল করার জন্যে মানুষের মতো নিজেকে শাস্তি দেওয়ার স্বভাবটাও হয়েছিল। 'কলপাতা' শিকার সুন্দরবনে বহু বছর ধরে চলছে, কিন্তু মানুষখেকো হলে ওই কলপাতা দিয়ে ফাঁসানো কঠিন।"

ডেভিস টান হয়ে বসে হিরুর গল্প শুনছিল, হুইস্কির গ্লাসে লম্বা একটা চুমুক মেরে জিজ্ঞেস করল, 'কলপাতা শিকার কেমন শিকার?'

'আজ্ঞে, বাঘ মারার জন্যে কলপাতা হয় বনে। যেখানে-সেখানে নয়, বাঘের টাটকা খোঁচের ওপর। যে পথে গেছে ঠিক সেই পথেই আবার ফিরতে পারে বাঘ। বাঘের খোঁচ দেখে পাকা শিকারিরা বোঝে, কী মাপের বাঘ! সেই মাপ আন্দাজ করে তেকাঠির মাথায় বসানো হয় কল।'

'কী ধরনের কল?'

পূর্ণদার প্রশ্ন শুনে একটু বুঝি অনুকম্পাব হাসি ফুটে উঠেছিল হিরু গুনিনের মুখে। তার পর গলার স্বর একটা উচু করে বলল, 'কল মানে বন্দুক। এদিকে ওই ভাবে বন্দুক পাতাকে বলে কলপাতা।'

'কী ভাবে বন্দুক পাতে?'

'বাঘের পথে তেকাঠির ওপর বন্দুক রাখে। বাঘেব খোঁচ দেখে আন্দাজ করা হয় বাঘ কতটা উঁচু। তেকাঠি পোতা হয় সেই ভাবে। গুলি ছুটলে সেই গুলি লাগবে গিয়ে বাঘের মাথায়।'

'কিন্তু গুলি ছুটবে কেন?'

'ঘোড়ায় টান পড়লেই ছুটবে।'

'হোয়াট ইজ দিস ঘোর্‌য়া পূর্ণাদা?'

জোসির কথার জবাব দিলেন পূর্ণদা। 'বন্দুকের ঘোড়া মানে বন্দুকের ট্রিগার।'

হিরু আলখাল্লার হাতা দিয়ে মুখ মুছে নিয়ে বলল, 'বন্দুকের ঘোড়ার সঙ্গে শক্ত কালো সুতলি বাঁধা থাকে। সেই সুতলি একটু উঁচু করে আড়াআড়ি ভাবে টানা দিয়ে রাখা হয়। বাঘ ওই পথ দিয়ে ফেরার সময় কালো সুতলির ওপর গিয়ে পড়লেই বন্দুকের ঘোড়ায় টান পড়ে গুলি ছুটবে। মাপজোক ঠিক থাকলে গুলি লাগবে বাঘের গায়ে বা মাথায়। কিন্তু ওই বাঘ যদি মানুষখেকো হয, তাকে কলপাতা দিয়ে মারা খুব কঠিন। মানুষের রক্ত খেয়ে দশ গুণ বুদ্ধি বেড়ে গেছে বাঘের। ওই কল দিয়ে তখন সে মানুষের জন্যেই কল পাতে।'

লাল গাল, সোনালি চুল জোসির বিস্ময় যেন ঠিকরে পড়ছিল। 'কী ভাবে সেটা করে ম্যানইটার?'

দাড়িগোঁফের জঙ্গলে একবার আঙুল চালিয়ে নিয়ে হিরু বলল, 'কলপাতা মানুষখেকো ঠিক ধরে ফেলে ব্যাপারটা। শুনলে মনে হবে গপ্পো, কিন্তু এ সব আমার নিজের চোখে দেখা। মুখে করে ডাল ভেঙে একটু তফাতে গিয়ে কালো সুতলিতে টান মারে বাঘ। গুলি ছোটে অমনি। শিকারি ভাবে কলপাতায় বাঘ পড়েছে। কিন্তু কাছে আসতেই বাঘ ওখান থেকে লাফ মেরে ধরে শিকারিকে।'

শুনে একটু বুঝি আঁতকে উঠেছিল জোসি। কিন্তু ডেভিস ভারী গলা'য় হিরুকে একটা ধমক লাগিয়ে বলল, 'তুমি কী করছিলে হিরু? তোমার ব্যাঘ্রবনডনের মন্ত্রা কাজ করছিল না তখন?'

ধমক খেয়ে একটু যেন আহত হয়ে সাহেবের দিকে ফিরল নামজাদা গুনিন হিরু মণ্ডল, তারপর কপালে হাত ঠেকিয়ে 'জয় মা বনবিবি' বলার পরে বলল, 'ছাহেব, আমরা বনবিবির সন্তান, তিনি যেমন চালান তেমনি চলি। তবে তাঁর ভজনার তো একটা দস্তুর আছে। তাঁর কাছে কিছু নিবেদন করতে গেলে তাঁর নামে ফুল দিতে হয়, মানত করতে হয়, সিন্নি চড়াতে

হয়। এ সব ক্রিয়াকর্ম অনেক বড়। আমরা নিষ্ঠা ভরে করে থাকি। তারপর মায়ের ছিচরণে দুটো নিবেদন করলে তিনি সন্তানের কথা শোনেন। তা ওই সব কলপাতা শিকারিরা হল গিয়ে ঠ্যাটা গোছের। ভাবে বন্দুকই সব, মায়ের নামটা কিছু নয়, ওই বড়াই থেকেই মরে। আমরা আমাদের ব্যাঘ্রবন্ধনের মন্ত্র তো এ ভাবে বলি না। যদি বলতাম, তা হলে তার ফল অন্যরকম হত। নিজের মুখে বলা ঠিক নয়, কিন্তু এখানে তো আশেপাশের গাঁয়ের কয়েকজন আছে—এরা সবাই জানে, হিরুর মুখ থেকে মন্তর খসার সঙ্গে সঙ্গে বাঘের মুখে খিল পড়ে যায়।'

গ্লাসের বাকি হুইস্কিটুকু গলার মধ্যে নামিয়ে দিয়ে ডেভিস অদ্ভুত ধরনের একটা হাসি হেসে জড়ানো গলায় বলল, 'তোমার কথা শুনে খুব খুশি হলাম হিরু। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যে বনে যাবে, তাকেই তুমি সাহায্য করবে। রাইট?'

সাহেবের বাহবা পাওয়ার জন্যেই বোধহয় হিরু গুনিন হঠাৎ গলা ছেড়ে গান গেয়ে উঠেছিল—'জয় মা বনবিবি, নাম গাই তোর—ঘুচাইয়া দে মা, আন্ধারের ঘোর।'

শহরের মতো পরিবেশদূষণের পাট নেই এদিকে। নদীর ওপরের ফুরফুরে তাজা বাতাস বুকের মধ্যে টেনে নেওয়াটাও আনন্দের। অসংখ্য ঝকঝকে তারায় ভরে গেছে আকাশ। ধোঁয়াকালিতে ঢাকা কলকাতার আকাশে এমন তারা দেখার সুযোগ নেই। এম ভি সদাগরের ছাতে সন্ধের আড্ডা জমাট হয়ে উঠেছিল।

প্রধান বক্তা ডাকসাঁইটে গুনিন হিরু মণ্ডল। ওকে অবশ্য বক্তা না বলে অভিনেতা বলাই ভাল। একটু ভাঙা, কর্কশ গলার স্বর ওপরে তুলে, নীচে নামিয়ে, হাত নাড়িয়ে, কখনও-কখনও টুল ছেড়ে উঠে পড়ে গভীর জঙ্গলের নানা গা-ছমছমে দৃশ্য শ্রোতাদের চোখের সামনে ফুটিয়ে তুলছিল নিখুঁত ভাবে। বনবিবির প্রিয় সন্তান হিরু কথার ফাঁকে ফাঁকে মাঝেমধ্যে জোড়াহাত কপালে ঠেকাচ্ছিল মায়ের নামে।

এখন আরও একবার ঠেকিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'জয় মা বনবিবি', তার পরেই ডেভিসের দিকে তাকিয়ে গলা সামান্য তুলল। 'হাতে বন্দুক থাকলেই বাঘ শিকার হয় না। কত লোকই তো বন্দুক নিয়ে জঙ্গলে ঢুকেছে, কিন্তু বাঘ শিকারের কথা বলতে গেলে এখনও সবাই একবাক্যিতে পচান্দি গাজির কথা বলে।'

'পচান্দি গাজি কে?'

পূর্ণদার প্রশ্নের জবাবে গলার স্বর আরও এক পর্দা ওপরে তুলে হিরু বলল, 'সুন্দরবনের নামকরা শিকারি। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর আগে ওর নাম এই এলাকার লোকের মুখে মুখে ফিরত। পচান্দি একা নয়, মস্ত বড়-বড় শিকারির বংশ ওরা। ওর বাবা মেহের আর কাকা নিজামদিও ছিল বিরাট শিকারি। অসংখ্য বাঘ মেরেছে ওরা।'

জোসি একটু অবাক চোখে তাকিয়ে বলল, 'কী করে মারল? বাঘ মারার তো নিয়ম নেই।'

দু দিকে মাথা নাড়াতে নাড়াতে জবাব দিল হিরু। 'বাঘ মারা বন্ধ করার নিয়ম তো চালু হয়েছে এই সেদিন। আমি বলছি অনেক দিন আগেকার কথা। পচান্দির বাবা-কাকার শিকার করা মানে পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর আগেকার কথা। অনেক বাঘ ছিল তখন সুন্দরবনে। মানুষখেকোর উৎপাতও ছিল খুব বেশি। আমি যখনকার কথা বলছি তখন

তিনটে মানুষখেকো বাঘ শিকার করে বারোশো টাকা পুরস্কার পেয়েছিল মেহের। সেই আমলে বারোশো টাকা মানে বিরাট টাকা। তা, বাঘ শিকারের নেশা মেহেরের আর কাটেনি। বয়েস সত্তর, একটা চোখ নষ্ট ; আর একটা চোখে দিষ্টি কম, ভাল ভাবে কিছুই ঠাওর করতে পারে না—কিন্তু ওই অবস্থাতেও জঙ্গলে গিয়ে বাঘ শিকারের গোঁ চাপল মেহেরের।'

'সে কী! ওর বাড়ির লোকরা আটকাতে পারল না?'

অদ্ভুত ভাবে হেসে উঠে উত্তর দিল হিরু, 'ওকে আটকানো আর জঙ্গলের বাঘকে আটকানো একই ব্যাপার। বুড়ো খেপে গিয়েছিল ছেলে পচাব্দি বাঘ শিকারে যাচ্ছে শুনে। এসে বলল, তোর শিকারে যাওয়ার দবকার নেই, আমি যাব। দে আমারে পাশ।'

'কিসের পাশ?'

'তখন বাঘ শিকার করতে গেলে পাশের দরকার হত। তা, একটা না—দুটো মানুষখেকো মারার জন্যে পাশ পেয়েছিল পচাব্দি। সে খবর বাপের কানে যেতেই বাপ খাপ্পা। ছেলেকে বলল—তোর যাওয়ার দরকার নেই, যাব আমি, দে পাশ আমারে।'

'সত্তর বছর বয়েস, তার ওপর চোখে দেখতে পায় না—সেই লোক যাবে জঙ্গলে বাঘ মারতে!'

পূর্ণদার কথার জবাবে হিরু বলল, 'মরণ ডাক দিলে যা হয়, তাই হয়েছিল। ছেলে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল কত ভাবে—। বলল—বাপ, তোমার বয়েস হয়েছে। মরণকালে আর বাঘ মারার গোঁ ধোরো না। তুমি এখন শিকার করতে গেলে গাঁয়ের লোক আমার নিন্দে করবে। তোমার পায়ে ধরি বাপ—।'

'ঠিকই তো বলেছিল, তা শুনল না ছেলের কথা?'

'শুনবে কেমন করে! মরণ ডাক দিচ্ছিল বুড়োকে। ছেলের হাত থেকে পাশ কেড়ে নিয়ে বন্দুক তুলল। কিন্তু বাঘ শিকারে ওই প্রায়-অন্ধ বুড়োর সঙ্গী হবে কে? কেউ রাজি হল না সঙ্গী হতে। তাতেও থামানো গেল না বুড়োকে। একাই চলল বাঘ মারতে। ওই যাত্রাই মেহেরের শেষ যাত্রা। মোট ছাপ্পান্নটা বাঘ মেরেছিল মেহের, তারপর ওই বাঘের হাতেই মরল। মেহেরের ভাই নিজামদিও ছিল মস্ত শিকারি। ওর একটা হাত বাঘে খেয়েছে। লোকে ভেবেছিল—শেষ হল তা হলে বুঝি নিজামদির বাঘ শিকার। কিন্তু ভুল ভেবেছিল। এক হাতেই বন্দুক ধরে বাঘ শিকারে যেত ও। মস্ত বড় শিকারি। ওই পরিবারে একটা জিনিসের খুব চল্ ছিল, তা হল—বাঘের ডাক ডেকে বাঘকে ডেকে আনা।'

পূর্ণদা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'সেটা আবার কী?'

দুদিকে হাত ছড়িয়ে দিয়ে হিরু বলল, 'সবই ভগবানের লীলা। ছিষ্টিলীলাও বলতে পারেন। সব প্রাণীই ওই ডাকে সাড়া দেয়। মিলনের ডাক। ছিষ্টি রক্ষা পায় তাইতে। মিলনের ইচ্ছায় বাঘ ডাকে। ডাকে আশ্বিন, কার্তিক আর অঘ্রানে। বসন্তেও ডাকে। তা হাঁড়ির মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে ঠিক বাঘিনীর মতো ডাকতে পারত পচাব্দি। ওই ডাক শুনে তিন মাইল দূর থেকেও ছুটে আসত বাঘ। মিলনের ডাক বলে কথা।'

'হোয়াট ইজ মিলঁন্যার ডাক পূর্ণদা?'

গম্ভীর মুখে জোসির প্রশ্নের উত্তর দিল ডেভিস, 'মেটিং কল।'

বিড়বিড় করে বনদেবীর নাম করতে করতে কপালে হাত ঠেকাবার পরে হিরু বলল, 'সবই ছিষ্টিলীলা। পচাব্দি হাঁড়ির মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে ডাকত বাঘিনীর ডাক। আর সেই ডাক শুনে বহু দূর থেকে ছুটে আসত বাঘ। এ রকম বাঘ আমিও অনেক দেখেছি। বাঘের সে কী চেহারা তখন! কোনও কিছুতেই বাগ মানে না। বাঘিনীর ডাকের কাছাকাছি এসে পাগলের মতো ছুটোছুটি শুরু করে দেয়। পচাব্দি তো গাছের মাথায় মাচা বেঁধে বসে হাঁড়িতে মুখ ঢুকিয়ে বাঘিনীর ডাক ডাকত। আর, কাছে এসে পাগলের মতো ছুটোছুটি শুরু করে দিত বাঘ। সেই সুযোগটা নিয়েছিল পচাব্দি। তবে বাঘ মাথা সোজা করে থাকলে গুলি করা ঠিক নয়, গুলি ফসকাতে পারে। একটু অপেক্ষা করে থাকা ভাল বাঘের ঘাড় ঘোরানোর জন্যে। ঘাড় ঘোরালেই গুলি চালাও।'

'পচাব্দি কি মাচায় বসেই শিকার করত?'

"না-না, মাচায়-বসা শৌখিন শিকারি ছিল না পচাব্দি। বন্দুক হাতে নিয়ে মানুষখেকো মারতে জঙ্গলে ঘুরত পায়ে হেঁটে। কলপাতা শিকারেও ওস্তাদ ছিল। বাঘের ক' হাতের মধ্যে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে বাঘ মেরেছে। মরার সময় ওর বাপও ওর ওপর এক দায়িত্ব চাপিয়ে গিয়েছিল।"

'কী দায়িত্ব?'

'জঙ্গলে বাঘের আক্রমণে শেষ হয়নি পচাব্দির বাপ। সাঙঘাতিক ভাবে জখম হয়ে ফিরে এসেছিল গাঁয়ে। ফেরার পরে দু-চারটে দিন বেঁচেছিল। তা, তখনই ছেলের ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছিল বাবা। বলেছিল : আমারে যে বাঘটা মেরেছে তাকে খতম করার দায়িত্ব তোর। এই প্রতিশোধটা নিতে কিন্তু কখনওই ভুলবি না—।'

'কোন্ বাঘ সেটা—বুঝতে পেরেছিল পচাব্দি?'

'কেন পারবে না? পচাব্দি নিজেও তো মস্ত বড় শিকারি। কোন্ জঙ্গলের বাঘ জানিয়ে দিয়ে বরাবরের জন্যে চোখ বুজেছিল মেহের। ছেলে কিন্তু মান্য করেছিল বাপের কথা। বাপ মরার পরেই জঙ্গলে ঢুকে সেই বাঘ খতম করেছিল পচাব্দি। বিরাট শিকারি তো। সব মিলিয়ে বাঘ মেরেছিল গোটা-পঞ্চাশ। বাপের শিকারের চেয়ে গোটা-ছয়েক কম। পচাব্দি সেই আমলের বন দফতরে চাকরি করে মাসে আশি টাকা বেতন পেত। মানুষটা ছিল এক নম্বরের ভদ্দরলোক। গলা তুলে, চোখ রাঙিয়ে কথা বলত না কারও সঙ্গে। তবে সেই স্বপ্ন দেখার পরে পচাব্দি বাঘ শিকার করা ছেড়ে দিয়েছিল একেবারে।'

'কী স্বপ্ন?'

'পচাব্দি স্বপ্ন দেখেছিল—ফের বাঘ শিকারে বনে গেলে ও বাঘের হাতে মরবে। ওই স্বপ্ন দেখার পরে আর শিকারে যায়নি। ওর বাপ-ঠাকুদ্দা, কাকা—সবাই নাকি একই স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু তাদের কেউই স্বপ্নের কথা বিশ্বাস করেনি। অবিশ্বাস করে বাঘ মারতে গিয়ে বাঘের হাতেই মরেছে। পচাব্দি ওই ভুলটা আর করেনি। স্বপ্ন দেখার পর দিন থেকেই বন্ধ করে দিয়েছিল বাঘ শিকার।'

পূর্ণদা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আশ্চর্য ব্যাপার তো! তিন শিকারিই এক স্বপ্ন দেখেছিল!'

হিরু জোড়াহাত কপালে ঠেকিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'জয় মা বনদেবী', তারপর উত্তর দিল পূর্ণদার কথার। 'আপনারা সব শহুরে লোক। কী কতটা বিশ্বাস করবেন জানি না, তবে এ সবই হল বনবিবির লীলা। সবাই মায়ের সন্তান। মা মানুষরেও ভালবাসেন, আবার বাঘরেও ভালবাসেন। লীলার জন্যেই এদের কাউরে কখনও বাঁচান, কখনও মারেন। জঙ্গলের ভেতরে কোনও-কোনও ভাঙাচোরা মন্দিরে বাঘ আস্তানা গাড়ে কেন বলেন তো?'

'কেন?'

'মায়ের সেবা করার জন্যে।'

পূর্ণদার ঠোঁটের ফাঁকে এক চিলতে বাঁকা হাসি ফুটে উঠেছিল। উনি বললেন, 'আমি তো অন্য কথা শুনেছি হিরু।'

'কী কথা?'

'সুন্দরবনের ঘন জঙ্গলের ভেতরের মন্দিরগুলো সব চাইতে বেশি উঁচু ডাঙার ওপরে বানানো হত। তার কারণ সুন্দরবন বারবার বানের জলে ভেসে যায়। মন্দিরগুলো উঁচু জমির ওপরে থাকে বলে বানের চোট মন্দিরের ওপর একটু কম পড়ে। ওই কষ্ট থেকে বাঁচার জন্যেই নাকি পোড়ো মন্দিরগুলো বাঘের ডেরা হয়। বাঘিনী ওখানে বাচ্চাদের রাখার মতো জায়গাও পেয়ে যায়।'

পূর্ণদার কথা শুনে রহস্যপূর্ণ একটা হাসি ফুটে উঠেছিল হিরুর। দাড়ির জঙ্গলের মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে বলল, 'আজ্ঞে এ সব কথা তো ফরেস্ট ডিপাটের বাবুরা বলেন। ওরা বলেন, আর আমরা হাসি।'

'কেন? হাসো কেন?'

'হাসি এই জন্যে যে, আসল বেত্তান্ত আমরা জানি।'

'কী সেই বৃত্তান্ত?'

'আজ্ঞে জঙ্গলের ওই সব মন্দির তো তিন-চারশো বছর আগে বানানো। এখন ভেঙেচুরে গেছে। কোথাও-কোথাও আবার মন্দিরের জায়গায় শুধুই ইটের পাঁজা। তা এই সব মন্দিরে অনেক দেবদেবীর মূর্তি থাকত। বেশির ভাগই কালীমূর্তি। এখনও কোনও কোনও মন্দিরে আছে। সব দেবদেবীই খুব জাগ্রত। এই মন্দির বানিয়েছিল তখনকার দিনের রাজা-মহারাজারা। রাজাদের ধম্মেকম্মে খুব মতি ছিল। তা, কোনও-কোনও রাজা মন্দিরে মায়ের কাছে সোনাদানা, গয়না গচ্ছিত রাখত। ওদের বিশ্বাস ছিল, মায়ের কাছে থাকলে সব কিছু নিরাপদে থাক'বে।'

'মায়ের কাছে রাখত! খোলা জায়গায়? চুরি-ডাকাতি হত তা হলে খুব মন্দিরে?'

'কী করে হবে? এ কি সাধারণ লোকের মন্দির! রাজারাজড়াদের মন্দির বলে কথা! লোক-লস্কর থাকত। সড়কি, রামদা হাতে পাহারা দিত পাহারাদাররা।'

'তা ঠিক, কিন্তু খোলা জায়গায় এত সোনাদানা, গয়না রাখলে—।'

'খোলা জায়গার কথা ভাবছেন কেন আপনি? দূর দেশ থেকে রাজমিস্ত্রি আনাত রাজারা। তার পর রাতের অন্ধকারে চোখ বেঁধে সেই সব মিস্ত্রিকে আনা হত জঙ্গলের মন্দিরে। পাহারাদাররা তখন একটু দূরে গিয়ে ঘিরে রাখত ওই মন্দির-এলাকা। শুধু রাজার সামনে ওই রাজমিস্ত্রিরা চোরাকুঠুরি বানাত ওই মন্দিরে। সে বড় জব্বর চোরাকুঠুরি।

বাইরে থেকে কিছুই ঠাওর করা যাবে না। চোরাকুঠুরির হদিশ জানত শুধু রাজা। ওই কুঠুরিতে সোনা-দানা-গয়নাগাঁটি ভর্তি বাক্স তালা-মারা অবস্থায় রেখে দিত রাজারা। চোরাকুঠুরি বানাবার পরে রাজমিস্ত্রিদের আবার চোখ বেঁধে রাজবাড়িতে আনা হত। তার পর ওদের খুশি করে রাজ্যের বাইরে ছেড়ে দিয়ে আসা হত।'

গল্প শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন পূর্ণদা, তারপর সায় দেওয়ার মতো একটা ভঙ্গি করে বললেন, 'তিন-চারশো বছর আগে দেশের যা হাল ছিল—। হ্যাঁ, এ গল্পের মধ্যে কিছুটা সত্যি থাকা অসম্ভব নয়।'

পূর্ণদার কথা শুনে একটু বুঝি অসন্তুষ্ট হয়েছিল হিরু। গলার স্বর সামান্য তুলে বলল, 'এটা গল্পকথা নয়, পুরোটাই সত্যি। আমরা এই সুন্দরবনের সাত পুরুষের গুনিন। বাপ-ছেলে-নাতি এই ভাবে ঘুরতে ঘুরতে সব কথা আমাদের গোচরে এসেছে।'

পূর্ণদা এবার রফা করার গলায় বললেন, 'কথাগুলো মিথ্যে—আমি কিন্তু একবারও বলিনি। তা ছাড়া বংশ-পরম্পরায় যখন কানে এসেছে, তখন নিশ্চয়ই সত্যি। তবে আমি যে খবরটা জেনেছি, সেটাও মনে হয় ঠিক।'

'কোন খবরটা?'

'ওই যে জঙ্গলের মধ্যে উঁচু জায়গা দেখে মন্দির বানানো হত। আর উঁচু জায়গা বলেই বাঘদের ওটা পছন্দ। তা ছাড়া ভাঙা মন্দিরে দেয়ালের আড়াল, ঘরটর থাকে বলে বাঘিনীর পক্ষে বাচ্চাদের লুকিয়ে রাখা সহজ হয়। আচ্ছা, বাঘিনী নাকি বাচ্চাদের বাঘের কাছ থেকে তফাতে রাখে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। বাঘ নিজের বাচ্চাকেও খেয়ে ফেলে। বাঘিনী তাই বাচ্চাদের বাঘের চোখের আড়ালে রাখে। বাঘ যদি হঠাৎ এসে পড়ে ডেরায়, বাঘিনী ভুলিয়ে-ভালিয়ে সেই বাঘকে অন্য পথ ধরিয়ে দেয়। তবে আপনারা যা জেনেছেন—মানে, মন্দির উঁচু জায়গায় বানানো বলে, কিংবা ভাঙা ঘরের আড়াল আছে বলে বাঘ মন্দির পছন্দ করে—এটা ঠিক নয়। বাঘকে অনেক সময় মন্দিরে থাকতে হয় পাহারা দেওয়ার জন্যে।'

হিরু গুনিনের কথা শুনে রীতিমত অবাক হয়ে গিয়েছিলেন পূর্ণদা। জোসির চোখেমুখেও বিস্ময়ের ছাপ। ডেভিসের চোখমুখ হুইস্কির প্রভাবে বেশ লালচে হয়ে উঠেছিল। দৃষ্টি স্থির হিরুর মুখের ওপর। কয়েকটা মুহূর্ত থমকে থাকার পরে পূর্ণদা জিজ্ঞেস করলেন, 'বাঘ মন্দিরে থাকে পাহারা দেওয়ার জন্যে! কাকে পাহারা?'

একটু দোনামনা করে হিরু বলল, 'এ সব বলতে আমাদের নিষেধ আছে।'

ডেভিসের গলায় মেঘ ডাকল। 'নিষেধটিষেধ হটাও। বাঘ কাকে পাহারা দেয়, বলো। কুইক।'

সাহেবের ওই গর্জন শুনেই বোধহয় মিইয়ে গিয়েছিল হিরু গুনিন। মিনমিন করে বলল, 'ছাহেব, আপনারা বনবিবিকে মানেন, আমাকে ভালবাসেন, আপনাদের কাছে সবই বলা যায়, কিন্তু—।'

সাহেবের গলায় এবার মেঘ নয়, বাঘ ডাকল। 'বাঘ কাকে পাহারা দেয়? শিগগির বলো।'

হিরু হাত জোড়া করে কপালে ঠেকিয়ে বলল, 'জয় মা বনবিবি, আমরা সবাই তোমার সন্তান। দোষ নিও না মা। তোমার অনুমতি নিয়ে ছাহেবদের দুটো গুপ্ত কথা বলছি।'

একটু ঘুরে বসে আর এক দফা বিড়বিড় করল হিরু। তার পর বলল, 'তিন-চারশো বছর আগে ঘন জঙ্গলের মধ্যে মন্দির পিতিষ্ঠে করত রাজারা। তার পর সেই মন্দিরে চোরাকুঠুরি বানিয়ে ধনরত্ন রাখত। দূরে দূরে থাকত সড়কিধারী পাহারাদাররা। সেই পাহারাদারদের অনেককে আবার বাঘের পেটে যেত। সুন্দরবনে তখন তো বাঘ ছিল অনেক। সাত পুরুষ আগে আমাদের বংশে এক সিদ্ধ গুনিন জন্মান। অনেক আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তাঁর। সুন্দরবনের এই সব নদীতে তখন আজকের চেয়ে পাঁচ গুণ বড় বান আসত। তা, আমাদের বংশের ওই সিদ্ধ পুরুষ বানের মাথায় হেঁটে বেড়াতেন। সে দিশ্য তখন গাঁয়ের বহু লোক দেখেছে। তারা আবার সেই দিশ্যের কথা ছেলে-নাতিদের বলেছে। সেই কথা ঘুরতে ঘুরতে গাঁয়ের সব ঘরে পৌঁছে গেছে এখন। তা, মণিরামকে সবাই তখন সাক্ষাৎ দেব্‌তা বলে মান্য করত।'

'মণিরাম কে?'

'আমাদের বংশের সেই সিদ্ধ পুরুষ। তখনকার সব রাজারই দেবদেবীর ওপর খুব ভক্তি ছিল। সাধু, সিদ্ধ পুরুষ, গুনিনদের খুব মেনে চলত। যে-কোনও বড় কাজেই আশীর্বাদ চাইত ওঁদের। পেসাদি ফুল সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধুটুদ্ধু করতে যেত। তা, একদিন এক রাজা মণিরামের পায়ে এসে আছড়ে পড়েছিল। কী ব্যাপার? না, একটা উপায় বার করে দিতে হবে। কী উপায়? না, গত এক মাসের মধ্যে আমার মন্দিরের পাহারাদার দশজন সড়কিধারীকে বাঘে খেয়েছে। সে এক ভয়ংকর বাঘ। বিশাল চেহারা, চোখ দুটো ভাটার মতো জ্বলে। কোত্থেকে যে লাফ দিয়ে পড়ে কেউ ঠাওর করতে পারে না। এক লাফে আসে, তারপর এক সড়কিধারীকে মুখে তুলে আর এক লাফে জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে যায়। মণিরাম সিদ্ধ পুরুষ, চোখ বুজে ধ্যান করে আসল ব্যাপারটা ধরে ফেললেন সঙ্গে সঙ্গে।'

'কী, আসল ব্যাপারটা কী?'

'ধ্যান করেই মণিরাম বুঝে গিয়েছিলেন যে, ওই বাঘটা দানো বাঘ। দানো বাঘকে মারার সাধ্যি নেই মানুষের। রাজা জিজ্ঞেস করল: তা হলে উপায়? ওই মন্দিরে পাহারা তো বসাতে হবেই। মণিরাম ওই রাজাকে খুব স্নেহ করতেন। বললেন: তুমি যখন নিজে এসেছ, একটা উপায় তো বার করতেই হবে। তারপর এক উপায় বার করলেন।'

'কী উপায়?'

'সে বড় কঠিন উপায়। রাজার সেই মন্দিরে নানা যাগযজ্ঞ করে বললেন: দুটো বাঘ খাঁচাবন্দি করে নিয়ে এসো। তখন সুন্দরবনে বাঘের অভাব ছিল না। রাজা কল পেতে দুটো বাঘ ধরে খাঁচাভর্তি করে মণিরামের কাছে নিয়ে এল। মণিরাম মন্ত্র পড়ে ওই দুটো বাঘকে যক্ষ করে রেখে দিলেন মন্দিরে।'

'যক্‌খো কী পূর্ণাদা?'

জোসির প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে রীতিমত ঘেমে গেলেন ওর পূর্ণাদা। তারপর মাথাটাথা চুলকে বললেন, 'যক্ষ হল, যক্ষ হল—কী বলব—এক ধরনের ভূত, এ কাইন্ড অব গোস্টস। ওই বাঘ দুটো মরার পরে ভূত হয়ে গিয়েছিল।'

জোসি চোখ বড়-বড় করে বলল, "ওহ্ নো। ইট'স ইম্‌পসিবল্।"

ডেভিস প্রায় ধমকে ওঠার গলায় বলল, 'ইন ইন্ডিয়া অল ইজ পসিব্‌ল। এখানে মন্ত্রাতন্ত্রা সব কিছু করতে পারে। বাঘের ভূত দুটো কী করেছিল হিরু?'

'যক্ষ হওয়ার পরেই ওই দানো বাঘটাকে মেরেছিল।'

'তারপর?'

'তারপর ওই মন্দির পাহারা দিত। রাজাকে আর পাহারাদার রাখতে হত না। যক্ষ দুই বাঘ পাহারাদারির কাজ চালাত। যক্ষ বাঘ যে মন্দিরে পাহারা দেয়, সেই মন্দিরে কি আর চোর-ডাকাত আসতে পারে! যক্ষ বাঘদের মৃত্যু নেই। মণিরাম শরীর ছেড়েছেন, সেই রাজাও মারা গেছে কবে ; মন্দির ধসে পড়েছে এখন, কিন্তু ইটের পাঁজার মধ্যে বসে সেই দুই যক্ষ বাঘ আজও মায়ের মন্দির পাহারা দিয়ে যাচ্ছে।'

ডেভিস টান টান হয়ে বসেছে। চোখমুখ লালচে, গলার স্বর আরও ভারী। কেমন যেন কেটে কেটে জিজ্ঞেস করল, 'হিরু, ওই দুই বাঘের ভূতকে মুক্তি দেওয়ার মন্ত্রা তোমার জানা নেই?'

গুনিন হিরু খুব বিচক্ষণ মানুষের হাসি হেসে বলল, 'আছে। ওই দুই যক্ষকে মুক্তি দেওয়ার মন্ত্র লেখা আছে আমাদের পরিবারে। মণিবাম জ্ঞানী মানুষ ছিলেন। তিনি যক্ষদের মুক্তির মন্ত্র লিখে রেখে গেছেন। যক্ষ বাঘ দুটোর সামনে দাঁড়িয়ে ওই মন্ত্র বললেই হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে দুই বাঘ। ওদের মুক্তি হয়ে যাবে।'

ডেভিস তীক্ষ্ণ চোখে হিরুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওই মন্ত্রা কি তোমার মনে আছে?'

দাঁত বার করে হিরু বলল, 'আছে। আমাদের বংশে যে সব ব্যাটাছেলে জন্মায়, একটু বড় হলেই ওই মন্ত্র তাদের শিখিয়ে দেওয়া হয়।'

এক চুমুকে ধরতে গেলে আস্ত গ্লাসটা শেষ করে ডেভিস অদ্ভুত ধরনের হাসি হাসতে হাসতে বলল, 'হিরু মান্‌ডল, আমার মনে হচ্ছে বাঘের ওই দুটো ভূতকে তুমিই মুক্তি দেবে।'

॥ ৩৩ ॥

সকাল সাড়ে-সাতটা। কলকাতার গোয়েন্দাপ্রধান সন্দীপ দেবের বসার ঘরে কৌশিক। শহরের গোটা-ছয়েক দৈনিক পত্রিকা টেবিলের ওপর ভাঁজ করা। কাগজগুলো এ বাড়ির সাহেব এখনও উল্টে দেখার সময় পাননি। এখানকার সিকিউরিটির লোকজন কৌশিককে চেনে, সুতরাং খুব সহজেই ও সাহেবের বসার ঘরে পৌঁছে গিয়েছিল।

কৌশিককে ওর সন্দীপদা খুবই পছন্দ করেন, মিনিট-পাঁচেক বাদে ঘরে ঢুকে হাসতে হাসতে বললেন, 'কী খবর গ্রেট গোয়েন্দা, তোমার কাজের রেট অব প্রোগ্রেস কেমন? সব ঠিক ভাবে চলছে তো?'

একটু লাজুক হাসি হেসে কৌশিক পাল্টা প্রশ্ন করল, 'আপনি কেমন আছেন সন্দীপদা?'

ইঙ্গিতে ওকে বসতে বলে উল্টো দিকের চেয়ারে বসে গোয়েন্দাপ্রধান বললেন, 'আমি তো ভালই, কিন্তু তোমার কাজ এগোচ্ছে কেমন?'

'চলছে।'

উঁচু গলায় হেসে উঠলেন সন্দীপদা। 'তুমি কোনও কাজ হাতে নিলে সেটা তো চলবেই। কোন্ দিকে কতটা চলল—জিজ্ঞেস করব না। কারণ তুমি এখন কথা কম কাজ বেশির স্তরে এসে গিয়েছ। তাই না?'

প্রশ্নের উত্তরে আর একবার লাজুক ভঙ্গিতে হাসল কৌশিক।

দেয়ালঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিয়ে গোয়েন্দাপ্রধান বললেন, 'সৃজন এক্ষুনি এসে যাবে। তোমার সঙ্গে ওর বোধহয় আলাপ হয়নি?'

দুদিকে মাথা নাড়ল কৌশিক।

খবরের কাগজের বান্ডিলের ওপর থেকে প্রথম কাগজটা টেনে নিয়ে প্রথম পাতার খবরের হেডিংগুলোর ওপরে চোখ বোলাতে বোলাতে সন্দীপ দেব বললেন, 'সৃজন, বেশিদিন আমাদের দফতরে আসেনি। তোমারই বয়সী, ইয়ং অ্যান্ড এন্টারপ্রাইজিং। তোমার এই কাজটা ওকে দিয়েই করিয়েছি।'

চা আর বিস্কুট এসে গিয়েছিল। 'নাও, চা খাও'—কৌশিককে বলাব পরে একটা চাযেব কাপ তুলে নিয়েছিলেন ওর সন্দীপদা।

একটু পরেই ঘরের দরজার ওপাশ থেকে একটা কণ্ঠস্বব ভেসে এল—'আসব স্যার?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ এসো, তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি সৃজন। কৌশিকও এসে গেছে।'

গোয়েন্দাপ্রধানের কথার মধ্যেই ঘরে ঢুকে পড়েছিল সুদর্শন এবং বড়সড় চেহারার এক যুবক। উনি পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'কৌশিকের দেওয়া কাজটাই তোমাকে করতে বলেছিলাম। দাঁড়িয়ে কেন, বোসো।'

সৃজন গোয়েন্দা-দফতরে একেবারে নিজের ধাপের তরুণ এক অফিসার। গোয়েন্দাপ্রধান বসতে বলার পরেও জড়সড় হয়ে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকার পরে জড়সড় হয়েই বসল।

সন্দীপ দেব সৃজনের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'তোমার ওই গোয়েন্দাগিরির গল্পটাই তো আমার শোনা হয়নি ভাল ভাবে। সাহেবরা তোমাকে আবার সন্দেহ করে বসেনি তো?'

মৃদু হেসে উত্তর দিল সৃজন, 'না, স্যার।'

'কী নাম যেন সাহেব-দুজনের?'

'এম. ভি. দিনমণি লঞ্চের সাহেবের নাম গর্ডন এস. হার্ডি। আর এম. ভি. সদাগরের সাহেবের নাম রিচার্ড ডেভিস।'

'কেমন লাগল তোমার সাহেবদের?'

'আমার তো স্যার প্রথমে খুব ভয়-ভয় করছিল।'

'ভয়! কেন?'

'দুজনেই মস্ত পণ্ডিত। পণ্ডিতরা দূর থেকেই ভাল। আমি অবশ্য গোড়াতেই বলে নিয়েছিলাম, আমি আপনার মস্ত অ্যাডমায়ারার। বুক ঠুকে বলে দিয়েছি, কিন্তু আমি ওদের সাবজেক্টটাই বুঝি না। পাল্টা কোনও প্রশ্ন করলে একটা শব্দও বেরুত না মুখ দিয়ে। কপাল ভাল, তেমন কিছু জিজ্ঞেস করেননি।'

'কী মনে হল তোমার ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে?'

'আমার তো স্যার খুব ভাল লেগেছে। সবচেয়ে বড় কথা হল—সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে এত দূরে এসে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করে যাচ্ছেন! এটাই তো মস্ত ব্যাপার।'

'কী রকম কাজ করছে সাহেবরা?'

'হার্ডি সুন্দরবনের ইকো-সিসটেম নিয়ে গবেষণা করছেন। ওঁর সঙ্গে আছেন এখানকার আর একজন এক্সপার্ট—মহাদেব দাস। বহুকাল ধরে উনি পরিমণ্ডল-চর্চার কাজ করে যাচ্ছেন। রিচার্ড ডেভিসকে দেখলেই বোঝা যায়, বিরাট পণ্ডিত। তবে ওই পণ্ডিত সাহেব আমাকে প্রথমেই বেশ ঘাবড়ে দিয়েছিলেন।'

'কী রকম?'

'ডেভিসের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পরেই বলেছিলাম—আপনার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার সুযোগ পেয়ে খুব ভাল লাগছে। আসলে আপনার নাম আমি অনেক শুনেছি—। বলতেই চোখ ধারালো করে সাহেব জিজ্ঞেস করেছিলেন—কোথায় শুনেছেন? প্রশ্ন শুনে হয়ে গিয়েছিল আমার! আমি তো স্যার আপনার মুখ থেকে ওঁর সম্পর্কে শুধু একটা কথাই শুনেছি—মস্ত বড় প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ। আর তো কিছুই বলেননি আপনি—।'

'জানলে তো বলব। কৌশিক ওই দুই সাহেব সম্পর্কে দুটো মাত্র ইনফর্মেশন দিয়েছিল আমাকে। ডেভিস ওরিয়েন্টাল স্টাডিজের একজন কেউকেটা আর হার্ডি ইকো-সিস্টেম নিয়ে গবেষণা করছে। এর বেশি কিছু এখনও পর্যন্ত জানি না আমি।'

লাজুক মুখে হেসে উঠে কৌশিক বলল, 'আমার জানার দৌড়ও ওই পর্যন্তই। শ্রীকৃষ্ণদাকে দিয়ে খোঁজখবর নিয়ে ওইটুকুই শুধু জানতে পেরেছি।'

গোয়েন্দাপ্রধান হেসে উঠে বললেন, 'এটুকু জানাও অবশ্য কম নয়। এনিওয়ে, তুমি সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে কী বলে অবস্থা সামাল দিয়েছিল সৃজন?'

সৃজনও হাসল, 'বললাম, বেশ কয়েকজন এক্সপার্টের মুখে আপনার নাম শুনেছি। ওরিয়েণ্টাল স্টাডিজ নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন, তাঁদের অনেকেই আপনার কাজকে খুব গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। সাহেব ভাগ্যিস ওই সব এক্সপার্টের নাম জিজ্ঞেস করেননি!'

'তুমি তোমার পরিচয় দিতে গিয়ে কী বলেছিলে?'

'আপনি যে লাইনে বলতে বলেছিলেন স্যার, সেই লাইনেই বলেছি। বলেছি, আমি বম্বের একটা পত্রিকার ক্যালকাটা করেসপন্ডেন্ট। তবে শুধু কলকাতার নয়, শহরের আশেপাশের অনেক খবরও পাঠিয়ে থাকি। বলেছিলাম, বনজঙ্গল এবং বনের জন্তুজানোয়ার নিয়েও আমার খুব আগ্রহ। তাই সুযোগ-সুবিধে পেলেই চলে আসি।'

'মিডিয়ার লোকজনের ওপর অনেক পণ্ডিতের অ্যালার্জি থাকে, সাহেব-দুজনের তেমন কিছু ছিল না তো?'

'না, সেরকম কিছু মনে হয়নি। তবে দুজনের কেউই ওঁদের ছবি তুলতে দিতে রাজি হচ্ছিলেন না। দুই সাহেবই প্রচণ্ড বেঁকে বসেছিলেন। সত্যিকারের গুণীরা প্রেস-পাবলিসিটিকে পাত্তা দেন না—কথাটা যে কতটা সত্যি—ওঁদের দেখেই বুঝতে পারলাম। শেষে অনেক কষ্ট করে রাজি করাই। আপনি তো স্যার ওঁদের ছবি তোলার জন্যেই পাঠিয়েছিলেন আমাকে—সেই ছবিই তুলতে না পারলে পুরো মিশনটাই বেকার হয়ে যেত। আমার চেহারা দেখে ওঁদের মায়া হয়েছিল বলেই বুঝি ছবি তুলতে পেরেছি।'

গোয়েন্দাপ্রধান হেসে উঠে বললেন, 'যাক, যে ভাবেই হোক না কেন, পারপাজ ইজ

সার্ভড। কৌশিক কিন্তু আজ ছবিগুলো নেওয়ার জন্যেই এসেছে। ওগুলো নিয়ে এসেছ তো?'

মাথা নেড়ে হাতের ফোল্ডার থেকে ছবির একটা প্যাকেট বার করে কৌশিকের দিকে এগিয়ে দিয়েছিল সৃজন।

খাম খুলে বেশ আগ্রহের সঙ্গে ছবিগুলো দেখে নিয়ে কৌশিক বলল, 'আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সৃজনবাবু।'

রীতিমত লজ্জা পেয়ে গিয়েছিল সৃজন। 'আরে! আমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন কেন? ধন্যবাদ দেওয়ার হলে স্যারকে দিন।'

'সন্দীপদাকে তো আগেই দিয়েছি। আপনাকেও দিচ্ছি। আপনি সত্যিই বিরাট একটা সার্ভিস দিয়েছেন আমাকে। এই ছবিগুলো জোগাড় করে না দিলে আমার কাজ কিন্তু মাঝপথে আটকে যেত।'

গোয়েন্দাপ্রধান হেসে উঠে বললেন, 'তুমি তো অ্যাদ্দিন মাঝপথে থেমে থাকার মানুষ নও। তোমার কাজের যা গতি, আমার তো মনে হয় তুমি পথের শেষেই এসে গিয়েছ।'

বিব্রত মুখে হাসল কৌশিক আর ঠিক তক্ষুনি সামনের নিচু টেবিলের ওপরে রাখা লাল রঙের টেলিফোনটা বেজে উঠেছিল। হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলে নিলেন সন্দীপ দেব, তারপর খুব চাপা গলায় কথা বলতে বলতে সামনের রাইটিং প্যাডে কী যেন নোট করে নিয়েছিলেন।

সৃজনের জন্যে চা-বিস্কুট এসে গিয়েছিল। ইঙ্গিতে ওকে চা খাওয়ার কথা জানিয়ে কৌশিকের দিকে তাকিয়ে গোয়েন্দাপ্রধান বললেন, 'এই যে বিখ্যাত প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর, দ্বিতীয় যে কাজটা আমার ওপর চাপিয়েছিলে, সেটাও শেষ। তোমার দুই অতিথি গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে এসে উঠেছে একটু আগে। এই নাও ওদের রুম নাম্বার।' রাইটিং প্যাডের পাতাটা ছিঁড়ে ওর দিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন ওর সন্দীপদা।

কাগজের ওপর চোখ বুলিয়ে ওটা পকেটে রেখে দিয়েছিল কৌশিক। ওকে বেশ চঞ্চল দেখাচ্ছিল। হঠাৎই উঠে পড়ে বলল, 'সন্দীপদা, আমাকে একটা জায়গায় যেতে হবে এক্ষুনি, আজ তা হলে চলি।'

তীক্ষ্ণ চোখে ওকে একবার দেখে নিয়ে সন্দীপদা বললেন, 'খুব একটা কাজের চাপ না থাকলে তুমি কখনোই এ ভাবে উঠে পড়তে না। ঠিক আছে, কাজ সেরে নাও। উইশ ইউ অল সাকসেস।'

উঠে পড়ে সৃজনের কাছ থেকে হাত নেড়ে বিদায় নিল কৌশিক, তারপর গোয়েন্দাপ্রধানের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আরও দু-তিনটে খুব দরকারি কাজে আপনার সাহায্য দরকার হবে সন্দীপদা। আমি ফোনে জানাব।'

'অবশ্যই। এর জন্য আবার আলাদা করে বলাবলির কী আছে।'

'আজ তা হলে চলি।' লম্বা-লম্বা পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল কৌশিক।

রাস্তায় বেরুবার পরে ওর হাঁটার গতি আরও খানিকটা বেড়ে গিয়েছিল। ওই ভাবে কিছুটা যাওয়ার পরে একটা ট্যাক্সিতে উঠে পড়েছিল। রাস্তা মোটামুটি ফাঁকাই ছিল, কুড়ি-পঁচিশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গিয়েছিল ওর ফ্ল্যাটে।

ফ্ল্যাটে পৌঁছবার পরে আর এক দফা ব্যস্ততা শুরু হয়েছিল তরুণ গোয়েন্দার। ড্রয়ার খুলে ব্রাউন রঙের খামে ভর্তি এক তাড়া ছবি ঢোকাল অ্যাটাচি-কেসের ভেতরে। ওই ছবির খামের পাশেই রাখল সৃজনের কাছ থেকে পাওয়া ছবির প্যাকেটটা। আরও কিছু দরকারি জিনিসপত্র ঢোকাবার পরে অ্যাটাচিকেসের ডালা বন্ধ করে টেলিফোন টেনে নিয়েছিল কৌশিক।

গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের টেলিফোন-অপারেটরকে নির্দিষ্ট রুম নাম্বার বলতেই রনিকে পেয়ে গিয়েছিল গোয়েন্দা। উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বরে রনির প্রথম কথা—'কাকা কেমন আছেন?'

ঠাণ্ডা গলায় উত্তর দিয়েছিল কৌশিক, 'ভাল।'

'আর জোসি?'

'জোসিও ভাল।'

এত স্পষ্ট ভাষায় দুজনের কুশল সংবাদ পাওয়ার পরে রনি বোধহয় একটু লজ্জা পেয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার খবর আমার সবার আগেই নেওয়া উচিত ছিল—। বলো, তুমি কেমন আছ কৌশিকদা?'

একটু হেসে কৌশিক বলল, 'এখনও পর্যন্ত আমরা সবাই ভাল আছি। তবে মারাত্মক এক সাইক্লোনের মধ্যে পড়ার আশঙ্কটা থেকেই যাচ্ছে। যদি সত্যি-সত্যি পড়ি, বিপদ থেকে বাঁচার উপায়গুলো এখনই ভেবে রাখতে হবে।'

রনির কণ্ঠস্বর আবার একটু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। 'হেঁয়ালির মধ্যে রেখো না কৌশিকদা। যা বলার এবার একটু পরিষ্কার করে বলো।'

আর একবার হাসল কৌশিক। 'হেঁয়ালিটা কেটে গেলে আমিই খুশি হতাম সবচেয়ে বেশি। দেখা যাক, কী হয় শেষ পর্যন্ত। জোসির বান্ধবী এবং রিচার্ড ডেভিসের প্রাক্তন স্ত্রী লিজিয়াও তো তোমার সঙ্গে এসেছেন। না?'

'হ্যাঁ, আমরা তো একসঙ্গেই এসেছি। লিজিয়া এই হোটেলে পাশের ঘরেই আছেন।'

'কী বলছেন উনি?'

'একসঙ্গে অসংখ্য কথা। বলছেন—অসম্ভব নস্টালজিক হয়ে পড়েছেন। আসলে কলকাতায় তো ওঁর বেশ কয়েকটা বছর কেটেছে। আমাকে পরের পর প্রশ্ন করে যাচ্ছেন। সব প্রশ্নই কলকাতা নিয়ে। এ শহর আমার নিজের শহর, কিন্তু মনে হয়, কলকাতা সম্পর্কে উনি আমার চেয়ে ঢের বেশি জানেন। তুমি এলে তোমাকেও ধরবে—। বাই দি ওয়ে, তুমি কখন আসছ আমাদের হেটেলে?'

টেলিফোনে তোমার সঙ্গে এখন আমার কথা বলা শেষ হলেই রওনা দেব—।'

হেসে উঠে জবাব দিল রনি, 'আমি তা হলে টেলিফোন নামিয়ে রাখছি। তোমাকে কতক্ষণ বাদে হোটেলে এক্সপেক্ট করব বলো?'

'সব ঠিকঠাক থাকলে পৌনে এক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছি।'

পৌনে এক ঘণ্টা নয়, ঠিক এক ঘণ্টা বাদে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে এসে হাজির হল কৌশিক। নির্দিষ্ট ঘরের দরজায় টোকা দিতেই দরজা খুলল রনি। তারপর ঝকঝকে চোখে কৌশিকের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকার পরে ওর হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বলল, 'কদ্দিন বাদে তোমাকে দেখছি কৌশিকদা, কিন্তু তোমার চেহারা মোটামুটি একই রকম রয়ে গেছে।'

হেসে উঠে কৌশিক বলল, 'কিন্তু রনি তোমার চেহারা তো অনেক পাল্টে গেছে। পাল্টে সাহেবদের মতো হয়েছে। সাহেবদের দেশে টানা অ্যাদ্দিন থাকলে বোধহয় চেহারা একটু সাহেব-সাহেব হয়ে যায়। তাই কী?'

কৌশিককে ওদিকের সোফায় বসিয়ে দিয়ে উল্টো দিকের চেয়ারে বসে রনি বলল, 'বাইরের চেহারায় কিছু হেরফের হয় কি না জানি না, তবে বিদেশে গিয়ে আমি আগের চাইতেও ঢের বেশি বাঙালি হয়ে গিয়েছি। আমাদের ওখানে বাঙালির সংখ্যা কম। বাঙালি পেলে তাই ছাড়তে চাই না। বাংলা ভাষায় কথা বলার সুযোগ পেলে বর্তে যাই। লিজিয়ার সঙ্গে আমার এত ভাব হওয়ার একটা বড় কারণ হল, লিজিয়া দারুণ ভাল বাংলা জানে।'

অবাক হল কৌশিক। 'কী করে শিখলেন?'

'ও তো বেশ কয়েক বছর কলকাতায় ছিল—।'

'সে তো অনেকেই থাকে। বেশিদিন থাকলেই যে বাংলা শেখা যাবে, তার কোনও মানে নেই।'

'তা ঠিক, কিন্তু লিজিয়া তো তখন বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ ডেভিসের স্ত্রী ছিল, সেই সুবাদে হয়তো—।'

সায় দিয়ে কৌশিক বলল, 'ঠিক, আমি এই ব্যাপারটাই ভুলে গিয়েছিলাম। স্বামী অত বড় একজন পণ্ডিত হলে স্ত্রীর ওপর তাঁর কিছুটা প্রভাব তো পড়বেই।'

একটু আপত্তির ভঙ্গি করে রনি বলল, 'না, কৌশিকদা, আমিও প্রথমে ওই ভাবে ভেবেছিলাম। পরে দেখলাম তা নয়। বাঙালিদের জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি নিয়ে ওর খুব আগ্রহ। সেই জন্যেই বাংলা ভাষাটা শিখে নিয়েছে চট করে। কথা বলে যা জেনেছি, ডেভিসের কিছু আগেই প্রাচ্যবিদ্যার দিকে ঝোঁক গিয়েছিল ওর। ডেভিস একটু পরে এসেছেন, তবে লিজিয়া বলছিল—ওরিয়েন্টাল স্টাডিজে ডেভিসের আগ্রহ আর শেখার জন্যে সময় দেওয়ার ঘটনা ইদানীংকালে তুলনাহীন। তবে ওর প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা শেষের দিকে নাকি খ্যাপামোর পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশনের চাকরি ছাড়ল ডেভিস। শেষে তন্ত্রমন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল খুব বেশি করে। দুদিন অন্তর আস্তানা গাড়ত কাশী-মথুরা-বৃন্দাবনে। লিজিয়া বুঝিয়েসুঝিয়ে ওকে ফেরাবার বহু চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কাজ হয়নি তাতে। নিরুপায় হয়ে তখন ডিভোর্স নিয়ে দেশে ফিরে গিয়েছিল লিজিয়া।'

খুব মনোযোগের সঙ্গে রনির কথাগুলো শোনার পরে কৌশিক জিজ্ঞেস করল, 'ডেভিস সম্পর্কে প্রাক্তন স্ত্রীর ধারণা এখন কেমন?'

একটু হেসে উত্তর দিল রনি, 'এরা মনের কথা খুব সহজেই মুখে আনতে পারে। কোথাও কোনও রাখঢাক নেই। এই তো পরশু দিনই লিজিয়া বলছিল—ডেভিসের পোটেনসিয়াল ছিল, কিন্তু কিছুই তেমন করতে পারবে না তার কারণ অসম্ভব ইনডিসিপ্লিনড আর হুইমজিক্যাল।'

'এখানে এসেছে, ডেভিসের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে নেই লিজিয়ার?'

'আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। উত্তরে বলেছিল—নো, এ বিগ নো। তার পরেই বলেছিল—তুমি আমাকে দু-তিনটে কারণ দেখিয়ে কলকাতায় নিয়ে আসতে চেয়েছিলে। আমি মতও দিয়েছিলাম। তবে আমার কলকাতায় আসার আসল কারণ হল ব্রিটিশরাজের তৈরি পুরনো বাড়িগুলো খুঁটিয়ে দেখা।'

অবাক হয়ে কৌশিক জিজ্ঞেস করল, 'তাই?'

রনি উত্তর দিল, 'ব্রিটিশ আমলের পুরনো বাড়িগুলো লিজিয়ার প্রাণ বলা যেতে পারে। বলেছে, এবার বাড়িগুলোর একটা রিপোর্ট তৈরি করে নিয়ে ইংলিশ হেরিটেজকে দেবে।'

'ব্রিটিশ আমলের বাড়িগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ যাতে ঠিক ভাবে হয়, সেই ব্যাপারে কিছু সাহায্যটাহায্য করার জন্যে কি?'

'ঠিক তাই। লন্ডনের ইংলিশ হেরিটেজ এই ব্যাপারগুলো দেখে। ওই হেরিটেজের হয়ে লিজিয়া কিছু কাজকর্মও করে থাকে। তোমার সঙ্গে আলাপ হলেও দেখবে ব্রিটিশ রাজের পুরনো বাড়িঘর নিয়ে কথা তুলবে ঠিক।'

রনি পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে লিজিয়ার সঙ্গে কৌশিকের আলাপ করিয়ে দেওয়ার একটু পরেই কৌশিক লক্ষ্য করল—রনি মহিলা সম্পর্কে মোক্ষম দুটি সত্যি কথা আগেভাগেই জানিয়ে দিয়েছে। প্রথমটি হল—বাংলা ভাষার ওপর মহিলার চমৎকার দখল। দ্বিতীয়টি—কলকাতার পুরনো বাড়িঘর নিয়ে অপরিসীম আগ্রহ। দু-চারটে কথার পরে লিজিয়া জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, দমদমে তৈরি লর্ড ক্লাইভের বাড়িটা নাকি ধসে পড়ছে?'

কৌশিক সায় দিয়ে বলল, 'আমিও তাই শুনেছি। বাড়ির অবস্থা খুবই খারাপ, বিস্তর গাছপালাও গজিয়ে গেছে। এ-ব্যাপারে পরে আপনাকে পুরো রিপোর্ট দিতে পারব। তবে তার আগে আপনার একটু সাহায্য চাই আমি।'

'সাহায্য! কী সাহায্য?'

কথা হচ্ছিল লিজিয়ার ঘরে বসে। কৌশিক উঠে গিয়ে দরজার পাল্লা দুটো ভাল ভাবে টেনে দিয়ে এসে চাপা গলায় বলল, 'আমি আপনাকে কয়েকটা ফোটোগ্রাফ দেখাব। দেখুন তো, ছবির কাকে-কাকে আপনি চিনতে পারেন—।'

॥ ৩৪ ॥

গীতায় বলেছে, সেই মানুষই সেরা যিনি সুখে এবং দুঃখে সমান নির্বিকার থাকতে পারেন। এমন বিগতস্পৃহ মানুষ হওয়া কঠিন। তবে একবার হতে পারলে আর কথা নেই। সাতসকালে ফ্ল্যাটের দরজা খুলে গগন বেরাকে দেখে গীতায় বলা সেরা মানুষের সংজ্ঞা মনে পড়ে গিয়েছিল কৌশিকের। একটু আপ্যায়ন করেই নামকরা গুপ্তচর গগনকে ঘরে নিয়ে এসে বসাল গোয়েন্দা।

বড়-বড় জানলা দিয়ে সকালের ঝকঝকে রোদ এসে পড়েছিল ঘরের মধ্যে। উল্টো দিকে চেয়ারে বসে বেশ খুঁটিয়ে গগনকে দেখে নিল কৌশিক। চোখমুখের ভাষা পড়ে মনের ভাব জেনে যাওয়ার ব্যাপারে বেশ একটা দক্ষতা এসে গিয়েছে গোয়েন্দার, কিন্তু গগনের চোখমুখ শুধু নয়—গোটা শরীরের দিকে তাকিয়েও কোনও কিছুরই হদিশ পেল না ও। অদ্ভুত ধরনের শান্ত, নির্মোহ চোখমুখ। ভাল না খারাপ খবর এনেছে ওকে দেখে বোঝা মুশকিল।

মানুষটাকে আর একবার খুঁটিয়ে দেখে নেওয়ার পরে গোয়েন্দা জিজ্ঞেস করল, 'চা খাবে নাকি গগন?'

অতিমাত্রায় বিনীত ও শিষ্ট ভঙ্গিতে উত্তর এল, 'না স্যার, এই তো একটু আগেই খেয়েছি।'

গোয়েন্দা আশা করেছিল—কী খবরাখবর পেল না পেল সে ব্যাপারে মুখ খুলবে গগনই। কিন্তু কিছুই ও বলল না। ওর চোখমুখ দেখে গোয়েন্দার মনে হচ্ছিল—কোনও প্রশ্ন না করলে চোখমুখের ভঙ্গি একই রকম নির্লিপ্ত রেখে বহুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকাও মানুষটার পক্ষে অসম্ভব নয়। সুতরাং চটপট আসল ব্যাপারে চলে আসাই ভাল। গোয়েন্দা জিজ্ঞেস করল, 'গগন, তুমি মানিকতলায় একটা লোককে ফিট করেছিলে না ভোলা আর পচনের খবর নেওয়ার জন্য! কিছু কি জানতে পেরেছে?'

নির্বিকার মুখে উত্তর দিল গগন, 'পেরেছে স্যার। আমাদের লাইনে লক্ষ্মণের কাজ খুব ভাল। ও একটু নেশাভাঙ করে থাকে, তার ফলে কখনও-কখনও একসঙ্গে অনেক খবরও পেয়ে যায়। আপনি তো জানেন স্যার, অপরাধীদের একশো জনের মধ্যে নিরানব্বইজনই কম-বেশি নেশা করে থাকে। পাঁচুর বাংলা মালের ঠেকে দাগি লোকদের অনেকে যায়। ভোলা আর পচনও ওখানকার নিয়মিত খদ্দের। লক্ষ্মণ ওই ঠেকে গিয়ে ওদের পাশে বসেছিল—কান খাড়া করে রেখেছিল, অনেক কথাই ওর কানে এসেছে। আসলে পেটে একটু পড়লে পেটের কথা ঠিক বেরিয়ে আসে। তার ওপর ঠেকটা আবার নিজেদের। সব খদ্দেরই মুখ-চেনা। তাই ভোলা আর পচন বোধহয় লুকনো কথাবার্তা নিজেদের মধ্যে একটু বেশিই চালাচালি করেছিল। লক্ষ্মণ পাকা লোক, কিছু দরকারি কথা ঠিক ও ক্যাচ করে নিয়েছে।'

'কী জেনেছে লক্ষ্মণ?'

'দু-তিন দিনের মধ্যে ভোলাদের খুব বড় এক লট মাল চালান যাবে শিলিগুড়ির দিকে। মাল যাবে ট্রাকে কিংবা বড় কোনও ভ্যানে।'

'কী মাল?'

'সেটা বুঝতে পারেনি লক্ষ্মণ। তবে খুব বড় রকমের চালান। কলকাতা থেকে মাল চালান হয়ে গেলে ওদের হাতে মোটা টাকা আসবে। সেই টাকায়, ওরা বলছিল, দু-তিনটে মাস নাকি দিব্যি ফুর্তি করে কাটানো যাবে।'

'মালভর্তি গাড়ি শিলিগুড়ির পথে রওনা দেবে কোত্থেকে?'

'সেটা বোধহয় পাকা হয়নি এখনও। লক্ষ্মণের কানে এসেছিল—গাড়ি রওনা দেবে হয় চাঁদ ট্রাভেলস্, নয় পেট্রল পাম্প থেকে—।'

'কোন্ পেট্রল পাম্প?'

'সেটা ওরা বলেনি। তবে লক্ষ্মণ বলছিল, যে ভাবে ওরা পাম্পের কথা বলাবলি করছিল—তাতে মনে হয় খুব চেনাশোনা কোনও পাম্প।'

স্থির দৃষ্টিতে গগনকে কয়েক মুহূর্ত দেখার পরে কৌশিক জিজ্ঞেস করল, 'লক্ষ্মণ আর কী-কী জানতে পেরেছে?'

'খুব পরিষ্কার করে এর বেশি আর কিছু নয়। তবে ভোলা আর পচনের মধ্যে ফিরে ফিরে আসছিল কয়েকটা নাম। যেমন চাঁদ ট্রাভেলস, পেট্রল পাম্প, গোডাউন, গণেশ মেডিক্যাল—।'

'গণেশ মেডিক্যাল!'

'গণেশ মেডিক্যাল হল্—ওই দোকানের ঠিকানা তো আপনাকে দিয়েছি স্যার।'

'আমাকে!'

'ওই সে স্যার ভোলা আর পচন লালবাজারের পেছন দিকে যে ওষুধের দোকানটায় ঢুকেছিল, সেটাই তো গণেশ মেডিক্যাল হল্।'

'ও হ্যাঁ-হ্যাঁ, ওই দোকানের ঠিকানাটা তো আমি তোমার কাছ থেকে নিয়েছি। আর কোনও কথা কানে এসেছে ওর?'

'ভোলা আর পচনের আজ বেলা তিনটের সময় চাঁদ ট্রাভেল্সে যাওয়ার কথা।'

'কেন?'

'ওই ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির কাছ থেকে ওরা কিছু টাকাপয়সা বাগাবার ধান্ধা করেছে।'

'বলছিল?'

'পষ্ট করে বলেনি. তবে ভোলা আর পচনের কথাবার্তা থেকে আন্দাজ করেছে লক্ষ্মণ। ওদের বোলচাল আর মাল খাওয়ার ধরন দেখে ওর মনে হচ্ছিল—ব্যাটারা খুব মেজাজে আছে। বড় কোনও কাজ নামিয়ে দিয়েছে হালে। কিছু টাকা হাতে এসেছে। বাকি মোটা টাকাটা এসে যাবে শিগ্গিরই।'

গগনের কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিল গোয়েন্দা। মাঝেমধ্যে ওর কপালে কিছু ভাঁজও ফুটে উঠছিল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে জিজ্ঞেস করল, 'গগন, তুমি কি আজ তিনটের সময় চাঁদ ট্রাভেল্সে যাচ্ছ?'

ঠিক আগেরই মতো ঠাণ্ডা গলায় উত্তর দিল গগন, 'ভোলা আর পচনের পিছু নেওয়ার কথা বলছেন স্যার? কোনও লাভ নেই। ওরা ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির মালিকের কাছ থেকে কিছু টাকা হাতাতে যাবে। গেলেই যে পাবে, তার কোনও মানে নেই। মালিক শুনেছি খুব খলিফা। ওই জুটির এখন মনে হয় তেমন কোনও কাজকম্ম নেই। থাকলে আজ সন্ধেয় আবার পাঁচুর ঠেকে যাওয়ার কথা পাকা করে রাখত না।'

'তাই?'

'হ্যাঁ স্যার, লক্ষ্মণ শুনেছে। আমি ঠিক করেছি লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে আজ সন্ধেয় পাঁচুর ঠেকে যাব একবার।'

একটু অবাক হয়ে গোয়েন্দা জিজ্ঞেস করল, 'পাঁচুর ঠেকে যাবে, তোমার কি ও সব চলেটলে?'

জিব কাটার ভঙ্গি করে জবাব দিল গগন, 'এমনিতে চলে না স্যার, তবে কাজেকর্মে ওসব জায়গায় যাওয়ার দরকার পড়লে একটু তো খেতেই হয়। মালের ঠেকে গিয়ে মাল না খেলে তো ধরা পড়ে যাব স্যার। বাংলাটা মন্দ নয়, তবে বিলিতিতে গন্ধ লাগে।'

হেসে উঠে কৌশিক বলল, 'দিশির কাছে বিলিতি কি দাঁড়াতে পারে!'

গগন কিন্তু হাসল না। গম্ভীর মুখে বলল, 'ব্রিটিশ আমলে আমাদের বাড়িতে জোর রাজনীতি চলত। দাদু, জ্যাঠা আর বাবা স্বদেশি করতেন। সেই আমলটা তো আমার আর দেখার সৌভাগ্য হয়নি। তবে আমার ছেলেবেলায় দেখেছি দাদু-জ্যাঠারা বিলিতি জিনিসপত্তর খুব অপছন্দ করতেন। আমি তো অতি তুচ্ছ মানুষ স্যার, তবে ছেলেবেলায় বাড়িতে বড়দের মুখে শুনে শুনে বিলিতির ওপর বেশ একটা ঘেন্না ধরে গিয়েছিল। সেই ঘেন্নাটা বোধহয় আজও কাটাতে পারিনি পুরোপুরি।'

কৌশিক মুখে রুমাল চেপে দমকা হাসিটা কোনও মতে সামাল দিয়ে গম্ভীর মুখে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার লক্ষ্মণ কি আর কিছু জানতে পেরেছে?'

'না স্যার। তবে ওদের কথা শুনে লক্ষ্মণের মনে হয়েছিল—যতটুকু কাজ ওদের দিয়ে করানো হয়, তার বেশি খুব একটা জানার সুযোগ নেই ওদের।'

বেশ তারিফ করার গলায় কৌশিক বলল, 'আমার মনে হয়, লক্ষ্মণের এই অনুমানটা ঠিকই। তবে ওদের কাজ কতটুকু—সেটাও জানতে হবে।'

গলার স্বর একটু খাদে নামিয়ে গগন বলল, 'আমি তো আজ সন্ধেয় পাঁচুর ঠেকে যাচ্ছি স্যার, দেখি বাড়তি কোনও খবরটবর আপনাকে জানাতে পারি কি না—।'

হাতঘড়ির দিকে কৌশিক একবার তাকাতেই গগন বলল, 'ঠিক আছে স্যার। আমি তা হলে এখন উঠি। কাল সকালে এই সময় আসতে পারি একবার।'

'ঠিক আছে, এসো। আমাকে আবার এক্ষুনি একবার বেরুতে হবে, না হলে তোমার সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ গল্প করা যেত।'

চেয়ার ছেড়ে গগন উঠে দাঁড়াতেই গোয়েন্দা বলল, 'ও, তোমাকে তো ওটা দেখানোই হল না।' উঠে গিয়ে টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা ফোটোগ্রাফ বার করে এনে বলল, 'দেখো তো গগন এই ছবির কোনও লোককে তুমি চেনো কি না—।'

ছবি হাতে নেওয়ার পরেই গুপ্তচরের চোখ দুটো চকচকে হয়ে উঠেছিল। বলল, 'এই লোকটাই তো স্যার সেদিন প্রিন্সেপ স্ট্রিটে অ্যাটাচি বদল করেছিল।'

'শ্যিওর? তোমার আইডেন্টিফিকেশন ঠিক তো?'

গগনের চেহারায় আবার আগের সেই নির্লিপ্তি এসে গিয়েছিল। ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'আমি কাউকে একবারমাত্র দেখলেও বহুকাল মনে রাখতে পারি। এর সঙ্গে ঝাঁকড়াচুলো, লম্বা-চওড়া যে লোকটা ছিল—তার ছবি জোগাড় করতে পারেননি স্যার?'

মৃদু হেসে জবাব দিল গোয়েন্দা, 'একজনকে তুমি যখন যখন শনাক্ত করতে পেরেছ, বাকিজনকে চিনে ফেলতে মনে হয় কোনও অসুবিধে হবে না।'

'ঠিক আছে, আমি তা হলে এখন আসি স্যার।'

গগন বেরা চলে যাওয়ার মিনিট-দশেক বাদে ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল কৌশিক। ট্যাক্সি ধরে আধ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে গিয়েছিল সল্ট লেকের একটা গেস্টহাউসে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। চার নম্বর রুমের বেল টিপতেই দরজা খুলে গিয়েছিল। দরজা খুলেছিলেন বছর-চল্লিশ বয়সের বেশ শক্তসমর্থ চেহারার এক ভদ্রলোক। দু হাত সামান্য ওপরে তুলে নমস্কারের ভঙ্গি করে বললেন, 'আমার নাম শঙ্কর লাহিড়ী। আপনি তো কৌশিকবাবু?'

কৌশিক পাল্টা নমস্কার করে মাথা কাত করতেই লাহিড়ী বললেন, 'আসুন-আসুন, ভেতরে আসুন। আপনার কথা ডাক্তার প্রতুল মহাপাত্রের কাছে অনেক শুনেছি। আপনি ওয়াইল্ডলাইফ সম্পর্কে উৎসাহী। নিজে থেকে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন—। সত্যি কথা বলতে কী, আমি একটু অবাকই হয়েছি।

মৃদু হেসে কৌশিক প্রশ্ন করল, 'কেন? অবাক হয়েছেন কেন?'

শঙ্কর লাহিড়ীও হাসলেন। 'আপনি বসুন, বলছি।'

সাজানো-গোছানো গেস্টহাউসের এই ঘরটার একধারে দুটো চেয়ার, মধ্যিখানে ছোট টেবিল। মুখোমুখি বসল দুজনে।

শঙ্কর বললেন, "কয়েক দিন আগে জব্বলপুরে বন্যপ্রাণী ও পরিবেশ নিয়ে একটা সেমিনার হয়েছিল। বুনো জন্তু ও বনজঙ্গল ভালোবাসেন—এমন কয়েকজন মানুষও এসেছিলেন বিদেশ থেকে। এক বক্তার বক্তব্য নিয়ে বেশ হইচই শুরু হয়ে গিয়েছিল সেমিনারে। তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের দেশে বন্যপ্রাণী বা বনজঙ্গল নিয়ে রাজনীতিকদের কোনও মাথাব্যথা নেই। কেন নেই, সে কারণটা স্পষ্ট। বাঘরা ভোট দেয় না, গাছপালা ভোট দেয় না ; কিন্তু জঙ্গলের চোরাশিকারিরা ভোট দেয়। সুতরাং ভোটের রাজনীতিওয়ালারা চোরাশিকারিদের তোয়াজ করে। বাঘ বা গাছপালা নিয়ে মাথা ঘামায় না।' কথাটা খুব সত্যি। পলিটিশিয়ানদের ওই মনোভাবের সমালোচনা করেন কনজারভেশনিস্টরা। কিন্তু তাতে তো কাজের কাজ কিছুই হয় না। আমরা যেটা সবার আগে চাই—তা হল, এ-ব্যাপারে জনসাধারণের সচেতনতা। একটা জঙ্গল মানে শুধুই পিকনিক করার জায়গা নয়। গাছপালাকে ভালবাসতে হবে, বাঁচিয়ে রাখতে হবে। বন্যপ্রাণী ভালবাসতে হবে। এই ভালবাসা জাগানো কিন্তু কঠিন ব্যাপার নয়। ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে অল্পস্বল্প দায়িত্বও নিতে হবে সবাইকে। সচেতনতা তৈরি হলে ওই দায়িত্ব পালন করা খুব সহজ হয়ে যাবে। একশো কোটির দেশ ভারতবর্ষ। এখানকার বেশির ভাগই গরিব মানুষ। এরা যদি বুঝতে পারে যে, এদের ঠিকভাবে বেঁচে থাকার সঙ্গে বনজঙ্গল আর বন্যপ্রাণীর বেঁচে থাকা জড়িয়ে আছে—তা হলেই এই চোরাশিকারি আর গাছ-চোরদের উৎপাত কমে যাবে অনেকখানি।"

কৌশিক পরিষ্কার বুঝতে পারছিল জব্বলপুরের আস্ত ওই আলোচনা-চক্রটা এখনও পর্যন্ত জাঁকিয়ে বসে আছে শঙ্কর লাহিড়ীর মাথার মধ্যে। তবে ওই কথাগুলো এঁর কাছে নিশ্চয়ই কথার কথা নয়। যিনি বনজঙ্গল ভালবাসেন, বন্যপ্রাণী ভালবাসেন—তাঁর মধ্যে আর যাই থাক, ভেজাল বলে কিছু নেই। জিজ্ঞেস করল, 'সেমিনারে আপনি কিছু বলেননি?'

লাজুক হাসি হেসে শঙ্কর লাহিড়ী বললেন, 'জব্বলপুরের ওই অনুষ্ঠানটিকে ঘরোয়া অনুষ্ঠানই বলা ভাল। বিদেশ থেকে কয়েকজন এসেছিলেন, কিন্তু লোকজন সব মিলিয়ে খুব একটা বেশি ছিল না। সবাই ধরতে গেলে সবাইকে চেনে। কিছু না বলে পার পাওয়া কঠিন। তাই বলতে হয়েছিল দু-চার কথা।'

'কী বলেছিলেন আপনি?'

'যা ভাবি তাই বলেছি। বলেছি, বুনো জন্তুজানোয়ার মারার কোনও অধিকার নেই মানুষের। ঘটনাচক্রে মানুষের মাথায় কিছু বেশি বুদ্ধি আছে। সেটা আছে বলেই কি বুনো জন্তু মারতে হবে? বন্যপ্রাণী বলে যদি কিছুই পৃথিবীতে না থাকে, মানুষেরও এখানে থাকার অধিকার নেই।'

শঙ্কর লাহিড়ীকে চড়া গলায় সমর্থন করে কৌশিক বলল, 'খুব ভাল কথা বলেছেন, আমি আপনার সঙ্গে একমত।'

জোরালো সমর্থন পেয়ে বন্যপ্রাণী প্রেমিকটির উৎসাহ দ্বিগুণ হয়ে উঠেছিল। গলার স্বর একটু উঁচুতে তুলেই বললেন, 'একটা রিপোর্ট বলছে—আজ থেকে শতখানেক বছর আগে

ভারতবর্ষে হাজার-চল্লিশ বাঘ ছিল, ১৯১২ সালে সেই সংখ্যাটা কতয় এসে দাঁড়িয়েছিল বলুন তো?'

'কত?'

'মাত্র চোদ্দোশোতে। ভাবা যায়! চল্লিশ হাজার থেকে নামতে নামতে এক হাজার চারশোতে। ওই সংখ্যা দেখে টনক নড়েছিল ভাবত সবকাবের। লুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণীর তালিকায় ঢোকানো হল বাঘকে। শুধু তাই নয়, বাঘকে ভারতের জাতীয় পশুর মর্যাদাও দেওয়া হল। টাইগার প্রজেক্ট বানানো হল ন'টি অভয়ারণ্যে। এককালে ভারতের সব জঙ্গলেই বাঘ দেখা যেত। এখন বাঘ আছে মাত্র কয়েকটা স্যাংচুয়ারি আর ন্যাশনাল পার্কে। যেমন—করবেট, কান্‌হা, কাজিরাঙ্গা, রনথামবোর, সরিসকা আর সুন্দরবনে। বাঘের সংখ্যা এখন অবশ্য অল্প একটু বেড়েছে। বেড়ে দাঁড়িয়েছে চার থেকে পাঁচ হাজারের মধ্যে। তবে এই হিসেবটা কতটা সঠিক বলা কঠিন। চোরাশিকারিরা নতুন-নতুন কায়দায় বাঘ তো মেরেই যাচ্ছে। চোরাচালান কতটুকুই বা ধরা পডছে! তবে যেটুকু যা পড়ছে তা রীতিমত আতঙ্কজনক। চোরাশিকারিদের উৎপাত এই ভাবে চলতে থাকলে শুধু বাঘ নয়, বাকি লুপ্তপ্রায় প্রাণীরাও পুরো লুপ্ত হয়ে যাবে।'

শঙ্কর লাহিড়ীর কথার মধ্যে নিখাদ আবেগ ও আন্তরিকতা ছিল। সেটা স্পর্শ করেছিল কৌশিককে। ও জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, এই চোরাশিকারিদের আটকাবার জন্যে সরকার কী করছে?'

'বনেজঙ্গলে পাহারাদারি চালাচ্ছে।'

'পাহারাদারের সংখ্যা কি কম?'

'খুবই কম। ফরেস্ট গার্ডের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ানো উচিত। শুধু বনেজঙ্গলে পাহারাদারি বাড়ালেই চলবে না, সীমান্ত-এলাকাগুলিতেও পাহারা জোরদার করতে হবে। বাঘ, হরিণ, লেপার্ডের চামড়া, হাতির দাঁত, গণ্ডারের খড়্গ বিদেশে পাচার হচ্ছে নিয়মিত ভাবে। বিরাট লাভজনক চোরা কারবার। এ সব থামাতে গেলে সরকারের সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকেও এগিয়ে আসতে হবে। কয়েকজন বিদেশি এই ব্যাপারে খুব সাহায্য করছেন আমাদের।'

'কী রকম?'

"একজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল গত বছর। সানফ্রান্সিসকোর কাছে একটা রেস্টুরেন্টে চাকরি করেন, ছোটখাটো চাকরি। কিন্তু বছরে ছ' সপ্তাহ এ দেশে আসেন ওয়াইল্ডলাইফ দেখতে। সঙ্গে মার্কিন ট্যুরিস্টদের দল থাকে। ওই ধরনের কনডাকটেড ট্রিপ থেকে ভদ্রলোকের যা আয় হয়, সেটা চলে যায় 'সেভ দ্য টাইগার' প্রকল্পে। বছর-পাঁচেক আগে একটা 'টাইগার ফান্ড'ও তৈরি করেছেন। ওই ফান্ডের একটা টাকা যায় চোরাশিকারিদের উৎপাত বন্ধ করার কাজে। একটা স্পাই-নেটওয়ার্ক চালানো হয়। লোকজন ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে চোরাশিকারিদের খবরাখবর জোগাড় করে ফরেস্ট গার্ডদের জানাবার জন্যে। ওদের ধরিয়ে দেওয়ার জন্যে পুরস্কারের ব্যবস্থাও হয়েছে। ফরেস্ট-গার্ডদের পেট্রলের জন্যে উত্তরপ্রদেশের করবেট টাইগার রিজার্ভে হাতি কিনে দিয়েছেন সাহেবরা। শুধু ওখানেই নয়, আরও দু-তিনটে জায়গায়। গভীর অরণ্যে বুনো জন্তুজানোয়ার আছে, কিন্তু পথ বলে কিছু নেই। বনরক্ষীরা হাতির পিঠে চেপে পাহারাদারির কাজ সারে। হাতি আছে বলে দুর্গম

জঙ্গলে অনেকখানি টহল দেওয়া যায়। তবে এই চোরাশিকারিদের মতো বদমাইশ আর দুটো নেই। জন্তুজানোয়ার মারার নতুন-নতুন মতলব সব সময় ওদের মাথায় ঘোরে। এই তো কয়েক দিন আগেই পোচিংয়ের নতুন একটা কায়দার কথা শুনলাম। গভীর অরণ্যে বাঘ যাতায়াতের পথে বড়-বড় মাংসের টুকরো ফেলে রাখে ওরা। কোনও বাঘ ওই মাংসের টুকরো মুখে তুললেই বিপদ।'

'কেন? বিষ-মাখানো মাংস?'

'বিষ-মাখানো তো পুরনো টেকনিক। নতুন কায়দা হল ওই মাংসের টুকরোর মধ্যে এক্সপ্লোসিভ ঢুকিয়ে রাখা। বাঘ মাংসের টুকরো মুখে তুলে চাপ দিলেই বিস্ফোরণ।'

আঁতকে উঠল কৌশিক। 'কী সাংঘাতিক!'

'সাংঘাতিক বললেও কম বলা হয়। সুন্দর চেহারার নির্দোষ প্রাণীদের কী নিষ্ঠুরভাবে মারা হয় দেখুন—। ওই বিস্ফোরণে বাঘের মুখ, চোয়াল উড়ে যায়। চোরাশিকারিরা সমাজের ঘৃণ্যতম শত্রুদের মধ্যে পড়ে। এদের শিকারের আর মাল পাচারের বহু কায়দার কথা জানা আছে আমার।'

আগ্রহী গোয়েন্দা মুখ একটু বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'সে সব শুনবার জন্যেই তো আপনার কাছে এসেছি। জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে কিছু করার ক্ষমতা আমার নেই। তবে চোরাচালান আটকাবার ব্যাপারে কিছু হয়তো করতে পারি।'

শঙ্কর লাহিড়ী তীক্ষ্ণ চোখে কৌশিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তা হয়তো পারেন। কিন্তু আপনি এটা করতে চাইছেন কেন?'

'একটাই কারণ—বন্যপ্রাণী ভালবাসি আমি।'

উত্তর শুনে বেশ খুশি হয়ে শঙ্কর লাহিড়ী বললেন, 'বেশ, শুনুন তা হলে।'

॥ ৩৫ ॥

সন্ধেবেলায় এম ভি সদাগর লঞ্চের ছাতে আড্ডা জমে উঠেছিল আবার। শেষ বিকেলেই নোঙর ফেলা হয়েছে লঞ্চের। কাছেই একটা খাঁড়ির মুখ। সন্ধে নামতেই চার দিক আশ্চর্য রকমের শান্ত হয়ে গিয়েছিল। লঞ্চের গায়ে নদীর ছোট-ছোট ঢেউ ভাঙার শব্দ উঠছিল নির্দিষ্ট বিরতিতে। বিরতি ও তাল নির্দিষ্ট হওয়ার জন্যেই বুঝি ওই শব্দগুলোও মিশে গিয়েছিল নির্জনতার সঙ্গে। মাঝেমধ্যে রাতপাখির তীক্ষ্ণ ডাক ছড়িয়ে পড়ছিল আকাশে। আর ওই ডাক কানে এলেই লঞ্চের ছাতে আড্ডা দিতে বসা তিনজন মানুষ হয়তো নতুন করে টের পাচ্ছিল নির্জনতা এখানে কী গভীর।

সন্ধের পানীয় পছন্দের ব্যাপারে তিনজনেই মোটামুটিভাবে একটা নিয়ম মেনে চলে। ডেভিসের হাতে হুইস্কির গ্লাস, জোসির হাতে স্ট্র-লাগানো কোল্ড ড্রিংকসের বোতল, পূর্ণ চ্যাটার্জির হাতে ধোঁয়া-ওঠা কফির কাপ।

কাছেই বাঘদের খাসতালুক, সুতরাং মুখের কথা ঘুরতে ঘুরতে বাঘের দিকেই ঘুরে গিয়েছিল।

পূর্ণ চ্যাটার্জি বললেন, 'কয়েক দিন আগে একটা রিপোর্ট দেখলাম কাগজে, খুবই শকিং।'

বড়-বড় চোখ আরও একটু বড় করে জোসি জিজ্ঞেস করল, 'কী খবর পূর্ণাদা?'

কফির কাপে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে পূর্ণদা বললেন, 'অনেক আগে বনে-জঙ্গলে বাঘ শিকার করত শিকারিরা। তার পর সেই শিকার বন্ধ হয়ে গেলে এল চোরাশিকারির দল। এখন আবার চিড়িয়াখানার মধ্যেও বাঘ মারার ঘটনা ঘটছে।'

ডেভিস দৃষ্টি ধারালো করে জিজ্ঞেস করল, "জু'র মধ্যে বাঘ মারা হচ্ছে! কোথায়?"

"দু-তিনটে চিড়িয়াখানায় হয়েছে। এই যে কিছুদিন আগে হায়দরাবাদের চিড়িয়াখানায় হল। বাঘ নয়, বাঘিনী। বাঘিনীর নামটাও মনে আছে আমার—সখি। বাঘিনীটাকে মেরে ফেলা হয়েছিল চিড়িয়াখানার মধ্যেই। এটা নিয়ে খুব হইচই হয়েছিল সারা দেশে। অন্ধ্রপ্রদেশের চিফ মিনিস্টার চন্দ্রবাবু নাইডু বলেছিলেন, ঘটনাটা 'অমানবিক'। সত্যিই তাই। চিড়িয়াখানায় বন্দি একটা বাঘকে মারার মতো অমানবিক ঘটনা আর কী হতে পারে! আমাদের প্রাইম মিনিস্টার এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ফরেস্টের ইউনিয়ন মিনিস্ট্রির কাছে এই ব্যাপারে একটা স্পেশাল রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছেন।"

জোসির চোখে রাজ্যের বিস্ময় এসে জড়ো হয়েছিল। ও প্রশ্ন করেছিল, 'টাইগ্রেসকে কেন মারা হয়েছিল পূর্ণাদা!'

'সে রিপোর্টও বেরিয়েছিল নিউজপেপারে। সত্যি হলে বিষয়টা কিন্তু ভয়ের।'

'ভয়ের! হোয়াই?'

'বাঘিনীকে মারা হয়েছিল চামড়া নেওয়ার জন্যে। তবে এই চামড়া দেশ-বিদেশের বাজারে মোটা দামে বেচার জন্যে নয়, ঘটনাটার পেছনে নাকি তান্ত্রিকদের হাত ছিল। তন্ত্রসাধনের জন্যে সদ্য-মারা বাঘের চামড়া দরকার। কিন্তু মারতে চাই বললেই তো আর বাঘ মারা যায় না। তবে জঙ্গলে না গিয়ে চিড়িয়াখানায় গেলেও যে প্রয়োজন মেটে—এমন ভাবা তো সাংঘাতিক!'

'কেন? সাংঘাতিক কেন!'

'সাংঘাতিক নয়? তন্ত্রের নামে তো অনেক বুজরুকি চলে। ধর্মের অনেক ভাল দিক আছে। তবে ধর্মের দোহাই পেড়ে কিছু বাজে লোক অনেক স্বার্থসিদ্ধি করে থাকে। লোকগুলো হয়তো চড়া দামে বেচার জন্যে টাইগার-স্কিন চাইছে, কিন্তু তন্ত্রের নামে ভাঁওতা মেরে জোগাড় করতে শুরু করেছে চিড়িয়াখানার থেকে। এই ট্রেন্ডটা চালু হয়ে গেলে তো সর্বনাশ!'

আধ গ্লাস হুইস্কি এক চুমুকে গলার মধ্যে নামিয়ে দিয়ে ডেভিস বললেন, 'আই বিলিভ ইন তন্ত্রা। তান্ত্রিক রিচুয়াল সাধারণ লোকজন বোঝে না, তাই এটা নিয়ে অনেক ভুল বোঝাবুঝি হয়। তন্ত্রসাধনায় টাইগার-স্কিন লেগে থাকে।'

একটু অসহিষ্ণু হয়ে পূর্ণদা বললেন, 'কী আশ্চর্য! লাগে বলে চিড়িয়াখানার বাঘ মারতে হবে!'

অদ্ভুত একটা হাসি ফুটে উঠেছিল ডেভিসের মুখে। 'বাঘ মারার দরকার থাকলে কোথায় যাবে তান্ত্রিকরা? জঙ্গলেও তো বাঘ মারা বন্ধ—।'

'দেশের নিয়ম সবাইকেই মানতে হবে। একটা সময় তো এ সব অনেক হয়েছে।

আপনি ভারত সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন—। সেদিন পর্যন্ত এ দেশে ছোট-বড় অনেব রাজা ছিল—। রাজাদের মধ্যে একটা বিষয় নিয়ে খুব প্রতিযোগিতা হত বলে শুনেছি আপনি তো জপমালার কথা জানেন। জপমালায় একশো আটটা রুদ্রাক্ষ থাকে।'

'রাইট। রুদ্রাক্সো—ওয়ান হাড্রেড অ্যান্ড এইট রোজারি বিড্স।'

'রাজাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ছিল ওই একশো আটটা রুদ্রাক্ষের সঙ্গে হিসেব মিলিয়ে একশো আটটা বাঘ মারা। শুধু বীরত্বের ব্যাপার নয়, তন্ত্রমন্ত্রের ব্যাপারটাও জুড়ে দেওয় হয়েছিল এর সঙ্গে। সিভিলাইজ্ড ওয়ার্ল্ডে তো এগুলো আর চলতে দেওয়া উচিত নয়।

ডেভিস শূন্য গ্লাসে কিছুটা হুইস্কি ঢেলে নেওয়ার পরে বিচিত্র ভঙ্গিতে আর একবার হাসল, তারপর বলল, 'সোসায়েটির নিয়মকানুন মানবে কেন তন্ত্রামন্ত্রা? সমাজের অনেক ওপরে এর জায়গা। শুধু আজ বলে নয়, অনেক দিন আগে থেকেই। একটা সময় তো টেম্পলের সামনে মানুষকে বলি পর্যন্ত দেওয়া হত।'

আঁতকে উঠে পূর্ণদা বললেন, 'একটা সময় তো মানুষ ক্যানিব্‌ল ছিল, কিন্তু নরখাদক মানুষকে কি আপনি সমর্থন করেন?'

গ্লাসে দ্রুত একটা চুমুক দিয়ে মুখ খুলল ডেভিস। 'ক্যানিবলদের কথা আনছেন কেন মিস্টার চ্যাটার্জি? নো সিভিলাইজড ম্যান উইল সাপোর্ট দেম। কিন্তু আমি তো তন্ত্রার কথা বলছি। স্যাক্রিফাইসের কথা ভাবুন—অফারিং টু এ ডিটি। এই পারভেজ, কল হিরু হেয়ার—হিরু মান্ডলকে ডাকো।'

পূর্ণ চ্যাটার্জি ডেভিসের কথার উত্তর দিতি গিয়ে থমকে গিয়েছিলেন। বুঝলেন, সাহেব গুনিন হিরুকে ডাকছে সালিশি মানার জন্যে।

পারভেজ সারেংয়ের ঘরের কাছে ছিল, সাহেবের আদেশ শুনে তরতর করে সিঁড়ি ভেঙে নেমে গিয়েছিল নীচে।

একটু বাদেই ওপরে উঠে এল গুনিন হিরু মণ্ডল। ওর পেছন-পেছন সামান্য দূরত্ব বজায় রেখে লঞ্চের পাঁচ-সাত জন মাঝিমাল্লা। ওপরের সবাই বুঝতে পারল, নীচের রান্নাঘরে গল্পগুজবে আসর মাতিয়ে রেখেছিল হিরু। ওর গল্পের লোভেই নীচের লোকগুলো ওপরে উঠে এসেছে।

হিরুর সব কিছুর মধ্যেই আছে একটু চড়া মাত্রার নাটকীয়তা। পরনে একটিমাত্র পোশাক। নানা রঙের কাপড়ের টুকরো জোড়া মস্ত এক আলখাল্লা। আলখাল্লার একেবারে নীচের দিকে ঢোলা পাজামার দুটো অংশ। ছোট করে ছাঁটা চুল, মুখ ভর্তি দাড়িগোঁফ। দুটো হাত জুড়ে অর্ধবৃত্তাকারে এক দফায় তিনজনকেই নমস্কার ঠুকে হিরু বলল, 'ছায়েব, বলেন কী জন্যে তলব করেছেন?'

ডেভিস সালিশি চাওয়ার গলায় বলল, 'হিরু সেদিন তুমি আমাকে বলেছিলে না—এক সময় মন্দিরের সামনে অলটারে মানুষকে অফারিং দেওয়া হত ডিটির জন্য। তাই না?'

সাহেব-মেমের কথা কখনও-কখনও দুর্বোধ্য ঠেকলে হিরু সাহায্যের জন্যে পূর্ণদার দিকে তাকায়। এবারও তাকাল। আর তাকাতেই পূর্ণদা বললেন, 'সাহেব জানতে চাইছেন, এক সময় দেবদেবীর সামনে নরবলি দেওয়া হত কি না—।'

গুনিন হিরু মণ্ডলের চোখ দুটো আজ ঠিক জবাফুলের মতো লাল। পূর্ণ চ্যাটার্জি পরিষ্কার বুঝতে পারলেন, লোকটা নীচেয় বসে অনেকক্ষণ ধরে গাঁজায় দম দিয়েছে। দমটা

বোধহয় একটু বেশিই হয়ে গিয়েছিল। লাল চোখে পূর্ণদার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকার পরে হিরু বলল, 'ছায়েব ঠিক কী জানতে চাইছেন আর একবার বুঝিয়ে বলেন তো আমারে—।'

পূর্ণদা এবার আরও বেশি স্পষ্ট করে আরও কেটে কেটে বললেন, 'সাহেব পুরনো দিনের কথা জানতে চাইছেন। পুরনো দিনে মন্দিরে বলিটলি হত তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, হত।'

'মানুষকে কি বলি দেওয়া হত মাঝেমধ্যে? নরবলি?'

গুনিন হিরু এ বার কেমন যেন একটা হুঙ্কার দেওয়ার গলায় বলে উঠল, 'হ্যাঁ, হত। দেবদেবী অশান্ত হলে তাঁদের শান্ত করার জন্যে নরবলি দেওয়া হত।'

হুইস্কির গ্লাসে বড় একটা চুমুক দিয়ে সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে ডেভিস বলল, 'দেয়ার ইউ আর।'

পূর্ণদা আফসোস করার গলায় বললেন, 'একটা সময় তো কত কিছুই হত এ দেশে। মৃত বুড়ো স্বামীর সঙ্গে এক চিতায় অল্পবয়সী স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারা হত। গঙ্গাসাগরে কোলের ছেলেকে ভাসিয়ে দেওয়া হত। সবই করা হত পুণ্যের লোভে, ধর্মের নামে।'

হুইস্কি খেলে সহেবের ভারী গলা আরও ভারী হয়ে যায়। ভারী গলায় ডেভিস বলল, 'তন্ত্রামন্ত্রা যদি চায়, তা হলে তো স্যাক্রিফাইস করতেই হবে। তখনও হত, এখনও হয়। তুমি সে দিন বলেছিলে না—ড্যাকশিন রায় আগেও নরবলি চাইত, এখনও চায়। তই না হিরু?'

'হ্যাঁ ছায়েব।'

'স্টোরিটা তুমি মিস্টার চ্যাটার্জিকে বলো, জোসিকে বলো।'

হিরুর ভক্তদের একজন একটা টুল দিয়ে গিয়েছিল, সেই টুলের পর গ্যাঁট হয়ে বসেছিল হিরু। সাহেবের কথাগুলো মন দিয়ে শোনার পরে দু-হাত কপালে ঠেকিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'জয় মা বনবিবি, আমি তোমার অধম সন্তান—মা, মাগো। জয় দক্ষিণ রায়, বিপদে-আপদে রক্ষা করো।' বলার পরেই একদম চুপ করে গিয়েছিল হিরু।

গল্প শোনার জন্যে কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করার পরে ডেভিস ধমক লাগানোর গলায় জিজ্ঞেস করল, 'স্যাপ্টডিঙ্গা সেই নদীতে পৌঁছলে ড্যাকশিন রায় কী চেয়েছিল হিরু?'

গল্পের ধরতাই পেয়েই চনমনে হয়ে হিরু গুনিন বলল, 'আপনার দেখছি ছায়েব সব কথাই মনে আছে। একদিন বরিজহাটির দুই ভাই ধোনাই আর মোনাই সপ্তডিঙ্গে সাজিয়ে সুন্দরবনের পথে রওনা হল। বন থেকে মধু আনবে ওরা। ওদের সঙ্গে ছিল দুখিনী বিধবার একমাত্র ছেলে দুখে। ওদের সপ্তডিঙ্গে গড়খালি নদীতে পৌঁছলে দক্ষিণ রায় আদেশ দিলেন। কী আদেশ দিলেন? না, নরবলি দিতে হবে। দক্ষিণ রায়ের আদেশ অগ্রাহ্যি করার সাহস পৃথিবীতে কারও নেই। কী উপায় তা হলে এখন? অনেক ভাবনাচিন্তা করার পরে ধোনাই আর মোনাই ওদের ডিঙ্গা থেকে ডাঙায় নামিয়ে দিলে দুখেকে। বাঘের মুখে নামিয়ে দেওয়া আর নরবলি দেওয়ার মধ্যে কোনও তফাত নেই। তার পরের কাহিনী তো সবাই জানে। মা বনবিবির কৃপাপ্রার্থী হয়ে দুখে কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছিল। সে কী কান্না! সে কান্না শুনলে পাথর ফেটেও জল বেরিয়ে আসে। কাঁদতে কাঁদতে গান গেয়েছিল দুখে। সে গান বড় করুণ গান—।'

খুক-খুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করে চড়া গলায় গান ধরেছিল গুনিন হিরু মণ্ডল— 'কহ না বনবিবি কোথা রইলে এই সময়/জলদি করে এসে দেখ তোমার দুখে মারা যায়।' দু-কলি মাত্র গান, কিন্তু কথাগুলো নানান ভাবে দুমড়ে-মুচড়ে কিছুক্ষণ ধরে গাইল হিরু। গুনিনের কণ্ঠস্বরে কোনও রকম মিষ্টতা নেই, কিন্তু সুর আছে।

লঞ্চের মাঝিমাল্লারা সাহেব-মেমদের সঙ্গে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে গোল হয়ে বসেছে। পূর্ণদা লক্ষ্য করলেন গানের সঙ্গে তাল দিয়ে মাথা নাড়ছে সবাই। দুখের এই বিপদে পড়ার কাহিনী এই এলাকার সবাই বোধহয় জানে। এও জানে বনবিবির দয়ায় প্রাণে বেঁচেছিল দুখে। শুধু বাঁচাই নয়, বাঁচার মতো বাঁচা। বনবিবির দয়ায় বহু সম্পত্তির মালিক হয়েছিল দুখে। ওর অন্ধ মা চোখে দেখতে পেয়েছিল আবার। ধোনাইয়ের মেয়ে চম্পার সঙ্গে ধুমধামের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল দুখের।

দুখের দুঃখের গান করুণ সুরে কিছুক্ষণ গাইবার পরে কাহিনীর শেষ অংশটা সাদামাটা ভাষায় শুনিয়ে দিয়ে হিরু গুনিন বলল, 'নরবলি দেওয়াটা তখন প্রথা ছিল। দক্ষিণ রায় নরবলি চাইতেন। নরবলি চাইতেন চামুণ্ডা, মহাকালী এবং অন্যান্য দেবদেবীও। তন্ত্রমতে সাধনায় নরবলির প্রয়োজন হত।'

চেয়ারের হাতলে পেল্লায় হাতের একটা চড় কষিয়ে দিয়ে উঁচু গলায় সায় দিল ডেভিস। 'এই কথাটাই আমি আপনাকে বলছিলাম মিস্টার চ্যাটার্জি, তন্ত্রামন্ত্রায় নানা রকমের অফারিং লাগে। ওই যে আপনি হায়দরাবাদের জু-এর কথা বলেছিলেন না—। তন্ত্রমন্ত্রায় কখনও-কখনও টাইগার স্কিনও লাগে। ফ্রেশলি-কিলড টাইগার। পুরনো বাঘের চামড়ায় কাজ হয় না। কিন্তু বাঘ পাওয়া যাবে কোথায়? বাঘ মারা এখনও ব্যান্‌ড। বাঘের নাম্বারও কমে গেছে। কোর-এরিয়ায় অল্প কিছু বাঘ আছে। এখন যদি তান্ত্রিক রিচুয়ালের জন্যে বাঘের চামড়ার খোঁজে কেউ ডেসপারেটলি জু-এর দিকে যায়—। আমি এটাকে সাপোর্ট করি না, কিন্তু ওয়ে আউট কোথায়?'

ডেভিসের কথা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন পূর্ণ চ্যাটার্জি। কী বলতে চায় লোকটা? কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে বললেন, 'ধর্মের নাম করে বিস্তর অধর্মের কাজ গোটা পৃথিবীতেই হয়েছে। এখনও হচ্ছে। একটা মানুষকে দেবদেবীর সামনে বলি দেওয়ার কথা সভ্য সমাজে কেউ কি ভাবতে পারে!'

প্রশ্নের উত্তরে একটু বুঝি তেড়েফুঁড়ে হিরু বলল, 'শুদ্ধ ভাবে দেবদেবীর পুজো করতে গেলে তন্ত্রের বিধান তো মানতে হবেই। সুন্দরবনের কয়েকটা মন্দির বাঘ যক্ষ হয়ে পাহারা দিচ্ছে তিনশো সাড়ে-তিনশো বছর ধরে। এখন ওই বাঘের মুক্তি দিতে গেলে নরবলির দরকার। আজ থেকে চারশো বছর আগে দুখেকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল সুন্দরবনে। কেননা দক্ষিণ রায় নরবলি চেয়েছিলেন। বাঘের দেবতার সামনে নরবলি দেওয়া মানে কোনও মানুষকে গভীর বনে ছেড়ে দেওয়া। ওই মানুষকে বাঘে ধরা মানে বলির পুণ্য অর্জন করা। মন্দিরে নরবলি আবার অন্য নিয়মে হয়। তন্ত্রমন্ত্রে বলির বিধান এক-এক জায়গায় এক-এক রকম।'

হিরু গুনিনের কথা বলার ধরনটা অদ্ভুত। কখনও-কখনও আবার প্রতিটি কথাই বেশ জোর দিয়ে বলে। ডেভিসের কথা শুনে পূর্ণদা বেশ অস্বস্তি বোধ করেছিলেন, কিন্তু গুনিনের কথা শুনলে অস্বস্তি হয় না। টুকরো-টুকরো রঙিন কাপড় জোড়া মস্ত আলখাল্লা

পরা গুনিনের মুখে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল, রোদে-পোড়া চামড়ায় বিচিত্র পালিশ—এ মানুষটা যখন তাল ঠুকে বাঘের মুখ বাঁধার কাহিনী শোনায়, তখন কী ভাবে যেন সম্ভব-অসম্ভবের রেখাটা মুছে যায়। আষাঢ়ে গল্প শোনার অদ্ভুত একটা টান থাকে। সেই টান থাকার জন্যেই বুঝি পূর্ণদা জিজ্ঞেস করলেন, বাঘের মুক্তির ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না। একটু পরিষ্কার করে বলো তো হিরু।'

হিরু দু' হাত কপালে ঠুকে বিড়বিড় করে বলল, 'জয় মা বনবিবি। জয় দক্ষিণ রায়।' তারপর পূর্ণদার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাঘকে যক্ষ করে মন্দির পাহারাদারির কাজে রেখে দেওয়া খুব কঠিন প্রক্রিয়া। সবাই এটা পারে না। কিন্তু আমাদের পরিবারে সাত পুরুষ আগে যিনি জন্মেছিলেন তিনি এটা পারতেন। পারবেন নাই বা কেন? তিনি ছিলেন সিদ্ধ পুরুষ। সিদ্ধ পুরুষের অসাধ্য নয় কিছুই। কয়েকটা বাঘকে মন্দিরে তিনি যক্ষ করে রেখে গেছেন। মন্দির পাহারা দেওয়ার কাজ ওই সব যক্ষ-বাঘেব। মন্দির কোথাও-কোথাও ভেঙে হয়তো ইটের পাঁজা হয়ে গেছে, কিন্তু ওই পাঁজা থেকে একখানা ইটও কেউ সরাতে পারবে না।'

মজা পাওয়ার ভঙ্গি গোপন করে পূর্ণদা জিজ্ঞেস করলেন, 'কেউ যদি সরাতে যায়, কী হবে?'

'যক্ষ-বাঘের হাতে মরবে।'

'কী সাংঘাতিক! তা, এই যক্ষ-বাঘের মুক্তির উপায়টা কী?'

দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলে হাত চালিয়ে দিয়ে হিরু বলল, 'যক্ষ-বাঘের মুক্তির উপায় খুব জটিল। মন্তর আছে, সেই মন্তর বলতে হবে। ক্রিয়াকাণ্ড আছে অনেক, সেগুলো সারতে হবে। কাজ খুব ভাল হবে যদি নরবলি দেওয়া যায়।'

আঁতকে ওঠার ভঙ্গিতে পূর্ণদা বললেন, 'নরবলি!'

'আজ্ঞে তন্ত্রে বিধান সেই রকমই। উচ্চ বর্ণের মানুষকে বলি দিলে ফললাভ অব্যর্থ।'

বিস্ময় দূর করতে পারছিলেন না পূর্ণদা। 'তা বলে নরবলি!'

এক কালে তো খুবই দেওয়া হত। এখনও মাঝেমধ্যে দক্ষিণ রায়কে নিবেদন করে মানুষ ছেড়ে দেওয়া হয় বনে। কাঠুরে-মৌলি-জেলেদের অনেকেই বাঘের পেটে যায়। সব কিন্তু দুর্ঘটনা নয়। কিছু-কিছু মানুষ নিবেদন করা হয় দক্ষিণ রায়কে।'

একটু বুঝি উত্তেজিত হয়েই আপত্তি তুললেন পূর্ণদা। 'না-না, এ সব বলা ঠিক নয়। এমন কথা বলা মানেই কুসংস্কার ছড়ানো।'

ডেভিস ভারী গলায় তর্ক জুড়ল। 'তন্ত্রামন্ত্রা যারা মানে, তারা মানে। তাদের কাছে এটা সাধনা. যারা মানে না তাদের কাছে কুসংস্কার। আমি তন্ত্রামন্ত্রা মানি।'

হিরু গুনিন বলল, 'শিগ্গিরই খুব ভাল একটা যোগ পড়ছে, তিথিও বলতে পারেন। সেদিন দক্ষিণ রায়ের কাছে কোনও উঁচু বর্ণের মানুষকে নিবেদন করে শুদ্ধাচারে যদি ক্রিয়াকাণ্ড করা যায়, এই জন্মেই পৃথিবীর সেরা সম্পদ পাওয়া যাবে, মোক্ষলাভও হবে—।'

হিরুর বেশ আবেগ এসে গিয়েছিল, গড়গড় করে আরও অনেক কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু আচমকা ওকে একটা ধমক লাগিয়ে ডেভিস বলল, 'স্টপ ইট হিরু। এ সব কথা থাক এখন।'

লাল চোখে সাহেবের দিকে তাকাল হিরু। বেশ একটা আবেগ এসে গিয়েছিল গুনিনের। থামিয়ে না দিলে গড়গড় করে অনেক কথাই বলে যেত। কথার স্রোত এ বার গানের দিকে ঘুরিয়ে দিল হিরু। চাপা গলায় গান ধরল—'এক্ষণে দক্ষিণ রায় ভাটির ঈশ্বর / নানা শিষ্য কৈল সেই বনের ভিতর।'

পাঁচালি পড়ার সুরে গান গাইছিল হিরু। ও থামতেই সোনালি চুলের গুচ্ছ কপাল থেকে পেছনের দিকে ঠেলে দিয়ে জোসি বলল, 'পূর্ণাদা, কৌশিককে আমরা খুব মিস করছি। ও কবে আসবে আবার?'

আফসোস করার গলায় জোসির পূর্ণদা বললেন, 'সত্যি আমরা প্রত্যেকেই ওকে মিস করছি। তবে নাথিং ডুয়িং, ও ওর অসুস্থ শ্রীকৃষ্ণদাকে হেল্প করছে। ভদ্রলোক এখন আগের চাইতে ভাল আছেন। সব ঠিকঠাক থাকলে কৌশিক দু এক দিনের মধ্যেই ফিরে আসছে লঞ্চে।'

॥ ৩৬ ॥

চমৎকার ভাবে সাজানো-গোছানো গেস্টহাউস। বাইরের উজ্জ্বল রোদের একটা ফালি এসে পড়েছিল ঘরের মেঝেতে। মাঝেমধ্যে দূরের রাস্তার চলন্ত গাড়ির শব্দ ভেসে আসছিল। এ ছাড়া আর কোথাও কোনও শব্দ ছিল না। হঠাৎই খোলা জানলার পাল্লার মাথায় বসে একটু দোল খেয়ে উড়ে গেল একজোড়া পাখি। কৌশিক জিজ্ঞেস করল, 'কী পাখি?'

মৃদু হেসে উত্তর দিলেন শঙ্কর লাহিড়ী—'দোয়েল।'

'আপনি অনেক পাখিটাখি চেনেন, না?'

'আগে চিনতাম না, এখন কিছু-কিছু চিনি।'

'আমি তো কিছুই চিনি না।'

'কী আর চিনবেন? কলকাতায় আর পাখি কোথায়? এই এলাকাটা নিরিবিল, কিছু গাছপালা আছে, তাই কিছু-কিছু পাখি দেখা যায়। পাখিদেরও মারার জন্যে মানুষ মুখিয়ে আছে। শীতকালে মাইগ্রেটারি বার্ড আসে এ দেশে, সেগুলো মারার জন্যেও কিছু বদলোক একপায়ে খাড়া। নিত্য নতুন মতলব বার করে। আপনার কি মনে আছে—কয়েক বছর আগে কিছু লোক ঘুড়ির সুতোয় বঁড়শি বেঁধে ঘুড়ি ওড়াত। ঝাঁকের কিছু-কিছু পাখি ওই ঘুড়ির পাশ দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় গেঁথে যেত বঁড়শিতে। কী ভয়ংকর ব্যাপার বলুন তো?'

'সত্যিই ভয়ংকর! লোকগুলোর মাথায় আসেও বটে!'

"মাথা নয়, ডেভিল'স ওয়ার্কশপ। এই ধরনের খুনির মাথা থেকেই বেরিয়েছে মাংসের টুকরোর মধ্যে এক্সপ্লোসিভ পুরে দিয়ে বনের বাঘ মারা। এদের মায়াদয়া বলে কিছু নেই। এক্সপ্লোসিভ ভর্তি মাংসের টুকরোয় চাপ দিলেই বিস্ফোরণ। বাঘের জিভ-দাঁত-চোয়াল ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় ওই বিস্ফোরণে। কিন্তু বাঘ তো অত্যন্ত শক্তিশালী প্রাণী। চট করে তাই মরে না ; ক্ষত-বিক্ষত মুখ নিয়ে ছটফট করে বহুক্ষণ। ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ খুন করা আর এ ভাবে বাঘ মারার মধ্যে কোনও তফাত নেই। আছে কি?'

দু দিকে মাথা নাড়াল কৌশিক, তারপর বলল, 'আপনার কথা শুনতে শুনতে বোমায় মুখ-উড়ে-যাওয়া বাঘের ছবি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল।'

চাপা উত্তেজনায় শঙ্কর লাহিড়ীর গলার স্বর ওপরে উঠে গিয়েছিল খানিকটা। 'আমি নিজের চোখে ওই ভাবে মারা একটা বাঘ দেখেছি। সত্যি, তাকিয়ে দেখা যায় না।'

'কী ভাবে দেখেছেন?'

'আপনাকে বলছিলাম না—আমরা একটা স্পাই-নেটওয়ার্ক চালাই জঙ্গলে জঙ্গলে। আমাদের ফান্ড থেকে বেশ কিছু পয়সাকড়ি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে গাঁ-গঞ্জের গরিব মানুষদের মধ্যে। তাদের একমাত্র কাজ হল চোরাশিকারিদের গতিবিধির কথা ফরেস্ট গার্ডদের জানিয়ে দেওয়া। ওই সব খবরের সুবাদে চোরাশিকারিদের কোনও চাল ভেস্তে গেলে বা ধরা পড়লে বিশেষ ব্যবস্থা। খবর দেওয়ার জন্যে গাঁয়ের লোকদের আমরা ভাল পুরস্কারও দিই। ওদেরই একজন সেবার খবর দিয়েছিল—বাঘ মারার জন্যে জঙ্গলে ঢুকেছে দুটো চোরাশিকারি। আমরা তখন ওখানেই ছিলাম, কিন্তু কপাল খারাপ, বনরক্ষী নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে দেখি দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। বিস্ফোরণে চোয়াল উড়ে গিয়েছিল বাঘের। পূর্ণবয়স্ক বিরাট বাঘ। চেহারাটা কী গ্রেসফুল, কিন্তু মুখের দিকে তাকানো যায় না। ফরেস্ট গার্ডদের দেখে বাঘ ফেলে রেখেই পালিয়েছিল চোরাশিকারিরা।'

টান হয়ে বসেছিল কৌশিক। শঙ্কর লাহিড়ী থামতেই জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা পোচারদের ধরেওছেন তো কয়েকবার।'

'আমরা নই, ফরেস্ট-গার্ডরা। গাঁয়ের লোকদের মারফত খবর পেয়ে গিয়েছিল আগে থেকে। খবর ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে আমাদের স্পাই-নেটওয়ার্ক খুব অ্যাকটিভ। গ্রামের সাধারণ লোকরাই গুপ্তচরের কাজ করছে। এদের মধ্যে জেলে আছে, মৌলি আছে, কাঠুরে আছে।'

'গাঁয়ের লোকদের এই ভাবে কাজে লাগানোর আইডিয়াটা কিন্তু দারুণ। কার মাথা থেকে বেরিয়েছে এটা?'

'আমাদের ওয়াইল্ডলাইফ-প্রেমিক এক সাহেবের আইডিয়া। সাহেবের নাম অ্যান্ডি। অ্যান্ডি বলেছিল, চোরাশিকার এত যে বাড়ছে তার কারণ—গাঁয়ের লোকদের সাহায্য পাচ্ছে চোরাশিকারিরা। কেন পাচ্ছে, গাঁয়ের লোকেরা নির্ঘাত কিছু টাকাপয়সা পাচ্ছে ওদের কাছ থেকে। কিন্তু ব্যাপারটা যদি অন্য রকম হয়। গাঁয়ের লোকদের টাকাপয়সা দেব আমরা। ওদের কাজ হবে চোরাশিকারিদের খবর বনরক্ষীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। ব্যস, উল্টো চাল চালতেই উল্টো ফল ফলতে শুরু করল। পোচারদের বেশ কিছু চাল গুবলেট করে দিয়েছি আমরা। এর পর শুরু হল কোথাও-কোথাও পুরস্কার দেওয়া। ওদের দেওয়া খবরে চোরাশিকারি বা চোরাচালান যদি ধরা পড়ে, পুরস্কার পাবে খবরদাতা। আমরা কথাও রেখেছি, তার ফলে আমাদের এই উল্টো চালে কাজ হচ্ছে চমৎকার।'

কৌশিক খুব খুশি হয়ে বলল, 'বাহ্! দারুণ চাল। কিন্তু ফান্ড আরও বাড়িয়ে আরও বেশি লোককে কি কাজে লাগানো যায় না?'

শঙ্কর লাহিড়ী মৃদু হেসে বললেন, 'অনেক লোকই কিন্তু আমাদের হয়ে কাজ করছে। তবে অ্যান্ডি এটা আর বাড়াতে চায় না। এ ব্যাপারে ওর নিজস্ব একটা থিয়োরি আছে। পাঁচটা জায়গায় হাত পাতলে ফান্ড আরও বড় হবে, কিন্তু ফান্ড বিরাট হওয়ার মুশকিলও

আছে অনেক রকম। এখন আমরা যেমন পুরো বিষয়টাকে কন্ট্রোল করছি, বড় হলে তা আর পারব না। আর তেমন হলে টাকা নষ্ট হবে, অথচ কাজ পাব না আমরা। তার চাইতে আমরা যেমন ছোট স্কেলে কাজ করছি, তেমনই করে যাই।'

একটু আপত্তি করার ভঙ্গি করে কৌশিক বলল, 'কিন্তু আমি ডক্টর প্রতুল মহাপাত্রের কাছে যা শুনেছি তাতে তো মনে হয় না আপনাদের স্পাই-নেটওয়ার্ক খুব একটা ছোট।'

কথাটা শুনে কিছুটা বুঝি বিস্মিত হলেন শঙ্কর লাহিড়ী। 'ডক্টর মহাপাত্রের সঙ্গে আপনার এই বিষয়েও কথা হয়েছে!'

বিব্রত হওয়ার ভঙ্গি করল কৌশিক। 'এটা গোপন খবর। গোপন খবর সবাইকে বলা ঠিক নয়। তবে যে কোনও কারণেই হোক আমাকে বোধহয় প্রতুলবাবুর বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়েছে।'

কথাটা শুনে একটু বুঝি লজ্জা পেলেন শঙ্কর লাহিড়ী। 'ডক্টর মহাপাত্রকে ওয়াইল্ডলাইফের একজন চ্যাম্পিয়ন বলা যায়। তবে উনি সবাইকে কনফিডেন্সে নেন না। যাকে নেন তাঁর সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত। আপনি যখন ওঁর রেফারেন্সে এসেছেন, আপনি আমাদেরই একজন। আপনার সম্পর্কে আমাদের কারওরই কোনও প্রশ্ন থাকার কথা নয়। তা ছাড়া আমরা তো কাউকে কোনও ব্যবসা পাইয়ে দিতে পারব না। বরং আমাদের সঙ্গে যারা ভিড়বেন তাঁদের গ্যাঁটের পয়সা খরচ হবে। আমাদের দোষ বলুন গুণ বলুন—তা হল একটাই। সেটা হল আমরা বন্যপ্রাণী ভালবাসি, গাছপালা ভালবাসি—ব্যস।'

সায় দিয়ে কৌশিক বলল, 'ঠিক, ওটাই আমাদের সবচেয়ে বড় মিটিং পয়েন্ট। পাশাপাশি আর একটা ব্যাপারেও মিল আছে। আপনারা চোরাশিকারি, চোরাচালান বন্ধ করতে চান, আমিও চাই। তবে এই ব্যাপারে আপনারা অনেকটা এগিয়ে গেছেন, আমি সদ্য-সদ্য কাজ শুরু করতে যাচ্ছি। কতটা কী পারব জানি না, তবে অনেস্টলি চেষ্টা করব।'

'ব্যস ব্যস, সেটাই যথেষ্ট। আমাদের কাজের সব চাইতে বড় অংশ হল—এই ব্যাপারে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো। চোরাশিকারিদের সংখ্যা কত? কয়েকশো। গাছটাছ যারা চুরি করে কেটে নিয়ে যাচ্ছে তদের সংখ্যা কয়েক হাজার। অথচ লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস করে বনজঙ্গলের আশেপাশে। এদের শুধু বুঝিয়ে দেওয়া দরকার—তোমাদের সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্যে বুনো জন্তুদের বাঁচিয়ে রাখা দরকার। আর বাঁচানো দরকার বনের গাছপালা। আমাদের সুস্থ থাকার জন্যে দরকার সুন্দর পরিবেশ। গাছপালা পাগলের মতো কেটে ফেললে আমরা ভালভাবে বাঁচতে পারব না। ছেলেমেয়েরা ঠিকভাবে বড় হতে পারবে না। বনজঙ্গলের আশেপাশে মানুষজন যারা থাকে তাদের এই সারসত্যটুকু বুঝিয়ে দিতে পারলেই কাজ হবে। ওরা সচেতন হলে বন্ধ হয়ে যাবে চোরাশিকার আর চোরাচালান।'

লম্বা করে সায় দিল কৌশিক। 'আমি আপনার সঙ্গে একমত। শিক্ষা আর সচেতনতা বাড়লে সাধারণ মানুষই প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। তবে তার জন্যে তো বেশ কিছুটা সময় দরকার। অদ্দিন ধরে অপেক্ষা করতে গেলে এনডেনজারড স্পিসিজের কিছু-কিছু একেবারেই লুপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। আমার মনে হয়, বনজঙ্গলে পাহারাদারি এক্ষুনি আরও অনেকখানি বাড়িয়ে দেওয়া দরকার। সরকারের পাশাপাশি আপনারাও থাকছেন। তবে আপনাদের স্পাই-নেটওয়ার্ক আর একটু বাড়লে বোধহয় মন্দ হত না—।'

মৃদু হেসে শঙ্কর লাহিড়ী বললেন, 'আমাদের ওই নেটওয়ার্ক কিন্তু খুব একটা ছোট নয়। সুন্দরবনের বহু গ্রামে আমাদের লোকজন ছড়ানো আছে। ভাল কোনও খবর দিতে পারলেই ওদের হাতে চটপট টাকাপয়সা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। নিয়মিত পে-রোলেও আছে বেশ কিছু লোক। আমরা কিন্তু ওদের কাছ থেকে খুব ভাল কাজ পাচ্ছি।'

'সুন্দরবন মানে তো নদীনালার দেশ। নৌকো ছাড়া তো ওখানে জীবন অচল। মনে হয় মাঝিমাল্লারা আপনাদের খবরের একটা বড় সোর্স।'

বেশ তারিফ করার গলায় শঙ্কর লাহিড়ী বললেন, 'আপনি তো প্রথমেই একটা বড় অঙ্ক মিলিয়ে দিয়েছেন। ঠিকই বলেছেন, আমাদের সবচেয়ে ভাল সোর্স মাঝিমাল্লারা। সুন্দরবনের নদীনালায় শুধু নৌকো নয়, বিস্তর ভুটভুটিয়া চলে। ওই কলে-চলা নৌকোগুলোতেই বেশি পরিমাণ চোরাচালান যায়। স্পিডবোট, লঞ্চকেও কাজ লাগায় চোরাশিকারিরা। সুতরাং আমাদের বেশ কিছু খবর জোগান দেয় মাঝিমাল্লারাই। এই তো আজ সন্ধেয় আমাদের একটা প্রজেক্টের কাজে আমার টাকি যাওয়ার কথা। তা, আমি যাব শুনে আমাদের এক সোর্স, এক খালাসি, খবর পাঠিয়েছে রাত্তিরে কিংবা ভোরে দেখা করতে আসবে আমার সঙ্গে। হয়তো কোনও খবর দিতে আসবে।'

কৌশিক চেয়ারের হাতলে দ্রুত তালে কয়েকটা টোকা মেরে বলল, 'আমি এই রকম এক খালাসির কথা জানি—দারুণ ভাল ইনফর্মার। ওর নাম কি বৃন্দাবন?'

দুদিকে মাথা নাড়াতে নাড়াতে উত্তর দিলেন শঙ্কর লাহিড়ী—'না, এর নাম পারভেজ।'

'ভুটভুটিয়ার খালাসি?'

'উহুঁ, লঞ্চের।'

কৌশিক কথা বলতে বলতে টান হয়ে বসেছিল আবার। 'ডাক্তার প্রতুল মহাপাত্রের সঙ্গে এই সব নিয়েই কাল কথা হয়েছিল আমার। তখনই ঠিক করেছিলাম—আপনার সঙ্গে কথা বলতে হবে একবার। আসলে এই সব ব্যাপারে আমি হালে একটু জড়িয়ে পড়েছি। বনের পশুপাখি আর গাছপালা ভালবাসতে গিয়ে ওদের শত্রুদের কথা জানতে পেরেছি কিছু-কিছু। যেটুকু যা জানতে পারি পুলিশকে জানাই। আসলে সবাই মিলে একসঙ্গে কাজ করলে ফল ভাল হবে। আপনারা, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট, পুলিশ—সবাই একসঙ্গে অপারেশনে গেলে দারুণ ব্যাপার। তার পর আপনাদের সঙ্গে আমাদের মতো কিছু কাঠবেড়ালিও থাকছে।'

আপত্তি তোলার ভঙ্গিতে শঙ্কর লাহিড়ী বললেন, 'না-না, কাঠবেড়ালি নন, আপনারাই হলেন আসল ফোর্স। অ্যান্ডি তো আপনাদের মতো মানুষকে সবার আগে দলে টানার কথা বলে। চোরাশিকারি আর চোরাচালানিদের র‍্যাকেটটা বিশাল। ওই দল ভাঙতে গেলে সবাইকে কাজ করতে হবে একসঙ্গে। আপনি চলে আসুন আমাদের মধ্যে।'

মৃদু হেসে কৌশিক বলল, 'এসেই তো গিয়েছি। এমনও হতে পারে আমরা দু-পক্ষ মিলে এখন একটা কাজে হাত দিয়েছি দু-দিক থেকে। টাকিতে তো যাচ্ছেন—মনে হয়, বৃন্দাবনের কাছ থেকে এবার বড় কোনও খবর পেয়ে যাবেন।'

'বৃন্দাবন নয়, পারভেজ।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, পারভেজ। আচ্ছা, আপনি টাকি থেকে ফিরছেন কখন?'

'কাল সকালেই ফিরে আসব। বেশ কয়েকটা কাজ জমে গেছে একসঙ্গে।'

'আমি কাল সকালেই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব। ফোন করে আসব। আপনি টাকি থেকে ফিরে আসার পরেই মনে হয় মনে হয় আমাদের ফাইনাল অ্যাসল্টের সময় এসে যাবে। এখন তা হলে আসি।'

'আসুন। আপনার সঙ্গে কথা বলে খুব ভাল লাগল।'

'আমারও।'

হাত নেড়ে গেস্টহাউস থেকে বেরিয়ে আসার পরেই শুরু হয়ে গিয়েছিল গোয়েন্দার অতিমাত্রায় ব্যস্ত একটি দিন।

ট্যাক্সি ধরে নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে এসেছিল গোয়েন্দা। মেক-আপ বক্স নিয়ে আয়নার সামনে বসে নিজেকে পাল্টে ফেলেছিল চটপট।

আধ ঘণ্টা বাদে ওই ফ্ল্যাট থেকে যিনি বেরুলেন তাঁকে কৌশিকের অতি-চেনা মানুষজনও চিনতে পারবে না। ভদ্রলোকের চেহারা গুজরাটি ব্যবসায়ীদের মতো। মাথায় টুপি, চোখে সরু ফ্রেমের গোল চশমা, হাতে একটা ফোলিও ব্যাগ। এমন মানুষদের যে-কোনও ব্যবসা কেন্দ্রেই মানিয়ে যায় দিব্যি। ট্যাংরায় গোটা-দুয়েক ট্যানারির পাশে দেখা গিয়েছিল এই মানুষটিকে। তারপর দেখা যায় লালবাজারের পেছন দিকে একটা ওষুধের দোকানে। মানিকতলার কালোয়ার-পট্টিতেও দেখা গিয়েছিল একবার। বেলা তিনটে নাগাদ দেখা গেল প্রিন্সেপ স্ট্রিটের একটা ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির কাছে।

প্রিন্সেপ স্ট্রিটের এই জায়গাটা দোকানপাট আর ছোট-ছোট অফিসে ভর্তি। কাছাকাছি দু-তিনটে পান-সিগারেটের দোকান। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভাঁড়ে চা খাওয়ার দোকানও আছে গোটা-দুয়েক। জমজমাট রাস্তা। গাড়ির ড্রাইভার আর অফিসের পিয়ন-গোছের কিছু লোকজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আড্ডা জমিয়েছে দু-তিনটে জায়গায়। এমন ভিড়ভাট্টার মধ্যে গা-ঢাকা দেওয়া কোনও ব্যাপারই নয়। গুজরাটি ওই ভদ্রলোক চাঁদ ট্রাভেলস-এর সামনে একটা পানের দোকানের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে। ভদ্রলোকের চোখ ঘুরছিল চারদিকে।

একটু বাদেই ওখানে এসে হাজির হল পচন আর ভোলা। চলাফেরায় বেশ একটা নিশ্চিন্ত ভাব। নিজেদের মধ্যে গল্প করতে করতে ওরা এই ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির অফিসে ঢুকে পড়েছিল।

বেরিয়ে এল মিনিট-দুয়েকের মধ্যেই। একজনের হাতে পিজবোর্ডের একটা বাক্স। সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করেছিল ওরা। পিছু নিয়েছিল ছদ্মবেশী কৌশিক।

বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট পেরিয়ে ওরা ওয়াটারলু স্ট্রিটে একট ক্যুরিয়ার সার্ভিসের অফিসে ঢুকল। অফিসে আরও দু-তিনজন খদ্দের। সবার হাতেই চিঠিপত্তর। খরচাপত্তর একটু বেশি, কিন্তু বেসরকারি এই সংস্থাটি চিঠিপত্তর, পার্সেল ইত্যাদি পাঠাবার ব্যাপারে সুনাম পেয়েছে বেশ।

ক্যুরিয়ার সার্ভিসের অফিসে ভোলা আর পচনের পিছু-পিছু ঢুকে পড়েছিল ওই গুজরাটি ভদ্রলোক। পেছনে দাঁড়িয়ে পিজবোর্ডের প্যাকেটে লেখা নাম-ঠিকানা পড়তে একটুও অসুবিধে হল না ছদ্মবেশী গোয়েন্দার।

একদম সামনের খদ্দেরের হাতে একগাদা চিঠি। কাউন্টারের ছিপছিপে মেয়েটি পেছনের খদ্দেরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনারা একটু বসুন কাইন্ডলি।' দেয়ালের দিকে দু-সারি চেয়ার আছে, সেদিকে এগিয়ে গেল সবাই। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে একটু ব্যস্ত-ব্যস্ত ভাব দেখিয়ে গুজরাটি ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন বাইরে।

এমন একটি দৃশ্য সব জায়গাতেই দেখা যায়। যাদের তাড়া থাকে তারা আর লাইনে দাঁড়ায় না। ক্যুরিয়ার সার্ভিসের অফিস থেকে ওই মানুষটির চলে যাওয়া আলাদা করে তাই বুঝি কারও চোখেও পড়েনি। একটু দূরে গিয়ে পকেট থেকে ছোট্ট নোটবুকটা বার কবল গোয়েন্দা, তারপর ওই পিজবোর্ডের বাক্সে লেখা নাম ঠিকানা দ্রুত লিখে নিল। প্যাকেট পাঠানো হচ্ছে শিলিগুড়ির একজন মাস্টার জয় প্রধানের ঠিকানায়। প্যাকেটে বোধহয় মোটাসোটা আর বড় মাপের একটা বই আছে।

একটু পরে গোয়েন্দা ফিরে এসেছিল আবার আগের জায়গায়। দূর থেকে নজর রেখেছিল ক্যুরিয়ার সার্ভিসের অফিসে। কিছুক্ষণ পরে দেখল প্যাকেট জমা দিয়ে রিসিট হাতে বেরিয়ে আসছে ভোলা আর পচন।

ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে কৌশিক ওদিকেব একটা টেলিফোন বুথে ঢুকে পড়ল। তারপর ফোন করল কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দাপ্রধানকে। কপাল ভাল, একবারের ডায়ালেই পেয়ে গিয়েছিল ওর সন্দীপদাকে। একটু তড়িঘড়ি করার গলায় কৌশিক বলল, 'আপনার একটু সাহায্য চাই সন্দীপদা। আমি এখন বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট-ওয়াটারলুর মুখে। মাস্টার জয় প্রধানের নামে শিলিগুড়িতে একটা প্যাকেট পাঠানো হচ্ছে এখানকার একটা ক্যুরিয়ার সার্ভিস থেকে। প্যাকেটটা আপনাকে সিজ করতে হবে। এইমাত্র জমা পড়েছে।'

ওদিক থেকে শান্ত গলায় গোয়েন্দাপ্রধান বললেন, 'ঠিক আছে, ক্যুরিয়ার সার্ভিসের ঠিকানা দাও। আর প্যাকেটের ডেসক্রিপশন ও নাম-ঠিকানা। যতটা যা জেনেছ, সব বলো।

কৌশিক পকেট থেকে নোটবইটা বার করে বলল, 'ঠিক আছে, লিখুন সন্দীপদা—।'

॥ ৩৭ ॥

গুজরাটি ভদ্রলোকের মাথায় টুপি, চোখে সরু ফ্রেমের গোল চশমা। কৌশিকের ফ্ল্যাটের সামনে দু-এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াবার পরে দ্রুত হাতে দরজার চাবি খুলে ভেতরে ঢুকে পড়েছিলেন তিনি। একটু বাদেই ওই ছদ্মবেশের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল কৌশিক। তারপর স্বমূর্তিতে রাস্তায় বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরেছিল। মিনিট-পনেরো বাদে ট্যাক্সি থেমেছিল একটা ট্রাভেল এজেন্সির সামনে।

ট্রাভেল এজেন্সির নাম 'ফ্লাই হাই'। ঝকঝকে-তকতকে সাজানো-গোছানো অফিস। কৌশিক সুইং-ডোর ঠেলে অফিসে ঢুকতেই আপ্যায়নের হাসি হেসেছিল এজেন্ট সোহন সিং। কাউন্টারের কাছে ও এগোতেই সিং বলল, 'আপনার সব ইনফর্মেশন আমি রেডি করে রেখেছি। এই নিন।' ড্রয়ার খুলে একটা ব্রাউন রঙের খাম কৌশিকের দিকে এগিয়ে দিয়েছিল এজেন্ট।

কাউন্টারে জনা-তিনেক বিদেশি ট্যুরিস্ট দাঁড়িয়েছিল, সে দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে কৌশিক বলল, 'আপনি এখন ব্যস্ত, পরে কথা বলব। চলি এখন।'

সিং হাত নেড়ে বলল, 'ও. কে, বাই।'

একটু বাদে সন্ধের মুখে গোয়েন্দাপ্রধান সন্দীপ দেবের দফতরে এসে হাজির হয়েছিল কৌশিক। ওকে দেখে ওর সন্দীপদা হেসে বললেন, 'ভাল সময়ে এসেছ, আমি এক্ষুনি উঠে পড়ছিলাম—চলো।'

বাইরে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে উনি বললেন, ‘ওই ক্যুরিয়ার সার্ভিস থেকে প্যাকেটটা আমি সিজ করিয়েছি। কিন্তু এ তো একেবারেই ইনোসেন্ট প্যাকেট। প্যাকেটের মধ্যে আছে একটা কনসাইজ এনসাইক্লোপিডিয়া অব জিওগ্রাফি। ছোটদের উপহার দেওয়ার জন্য বইটা দারুণ। উপহার হিসেবেই দেওয়া হয়েছে অল্পবয়সী একটি ছেলেকে। এই প্যাকেটটাকে তুমি হঠাৎ সন্দেহ করে বসলে কেন?’

মৃদু গলায় উত্তর দিল কৌশিক—‘না, প্যাকেটটাকে সন্দেহ করিনি। আসলে যে দুজনের কাছে ওটা ছিল, তারাই যথেষ্ট সন্দেহজনক।’

একটু হেসে উঠে গোয়েন্দাপ্রধান বললেন, ‘সন্দেহজনক লোকদেরও মাঝে মধ্যে সাদামাঠা, নির্দোষ কাজ করতে হয়। এই প্যাকেটটাকে ক্যুরিয়ার সার্ভিসের হাতে ওদের তুলে দেওয়া ওই রকম একটা কাজ।’

কৌশিককে এবার বিব্রত দেখাচ্ছিল কিছুটা। চাপা গলায় বলল, ‘প্যাকেটটা কি আপনার সঙ্গেই আছে, নাকি—।’

‘আছে, ওই তো সিটের পেছনে, মাথার দিকে—।’

কৌশিক একটু নড়েচড়ে বসতেই ওর সন্দীপদা আদেশ দেওয়ার গলায় বললেন, ‘এখন আর দেখার দরকার নেই। আমার বাড়িতে গিয়ে চা-টা খাওয়ার পরে দেখো।’

কথাটা কানে যেতেই নড়াচড়া থামিয়ে গুড বয় হয়ে গিয়েছিল কৌশিক। মৃদু হেসে ওর সন্দীপদা বললেন, ‘তোমার কাজ আর কতটা এগোলো বলো?’

লাজুক হেসে গোয়েন্দা বলল, ‘এগোচ্ছে না থমকে গেছে—শিগগিরই জানতে পারব মনে হয়।’

‘পরের কথা পরে হবে। এখন পর্যন্ত রেট অব প্রোগ্রেস কী?’

গোয়েন্দাপ্রধানের মোবাইল ফোন বেজে ওঠায় কৌশিকের আর উত্তর দেওয়ার মধ্যে যেতে হল না। মোবাইলে খুব নিচু গলায় কথা শুরু করেছিলেন ওর সন্দীপদা, সেই কথা বাড়িতে পৌঁছবার আগে আর থামেনি।

বসার ঘরে হাজির হওয়ার একটু বাদেই চা এসে গিয়েছিল। চায়ে চুমুক দিয়ে সন্দীপদা বললেন, ‘নাও, দেখো এবার তোমার কনসাইজ এনসাইক্লোপিডিয়া অব জিওগ্রাফি। নতুন এডিশনের বই। ভূগোল সম্পর্কে কিছু জানার থাকলে জেনে নিতে পারো।’

গাড়ির ড্রাইভার সাহেবের ব্যাগ, ফাইল আর ক্যুরিয়ার সার্ভিসের প্যাকেট সোফায় পাশের টেবিলে রেখে গিয়েছিল। সন্দীপদার মুখ থেকে কথাটা খসামাত্তর ওই প্যাকেটটা টেনে নিয়েছিল কৌশিক। প্যাকেটের ওপরে লেখা ঠিকানাটা খুঁটিয়ে দেখে নেওয়ার পরে ভূগোলের সংক্ষিপ্ত এনসাইক্লোপিডিয়া টেনে বার করেছিল। শক্ত মলাটের মোটাসোটা, ঝকঝকে বই। মলাটের ওপরে বিশাল এক জলপ্রপাতের ছবি। এটাই বোধহয় নায়েগ্রা। মলাটের নীচের দিকে গোল একটা চাকতির মতো জায়গায় লেখা—ফুললি রিভাইজড অ্যান্ড আপডেটেড।

বইয়ের প্রথম পাতায় সবুজ কালি দিয়ে বড়-বড় করে লেখা—‘অল ফর জয়। লাভ, আংকল।’ তার পরেই একটু ছোট হরফে লেখা—‘মুভ অ্যাজ ফাস্ট অ্যাজ অয়েল-ইঞ্জিন টু স্কোর ৯৫০০ ইন এগজ্যাম অন মনডে।’

বইটির আর কোনও পাতায় আর কিছু লেখা নেই। যা আছে তা হল ছাপানো হরফ,

উজ্জ্বল ছবি, মানচিত্র আর ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদির ভৌগোলিক বৃত্তান্ত।

সন্দীপদা বললেন, 'ক্যুরিয়ার সার্ভিসকে বলা হয়েছে প্যাকেটটা ইনোসেন্ট হলে কাল সকালেই ফেরত দিয়ে দেওয়া হবে। বইটা কিন্তু চমৎকার। ওয়েদার, ক্লাইমেট, স্ট্রাকচার অব আর্থ নিয়েও প্রচুর ইনফর্মেশন দেওয়া আছে। এ সব বই ছেলেবেলায় আমাদের হাতে আসেনি। শিলিগুড়ির জয় প্রধান ছোকরা সে দিক থেকে লাকি। সোমবার ছেলেটার কী একটা পরীক্ষা আছে। কাকা চাইছে ও পরীক্ষায় সাড়ে নশো পাক। বোধহয় হাজারের মধ্যে পরীক্ষা। আজকাল নম্বরও ওঠে প্রচুর। আমাদের সময় এটা ছিল না। তখন মাস্টারমশাইদের নম্বর দিতে খুব কষ্ট হত।'

কথাশেষ করে হাসলেন গোয়েন্দাপ্রধান। কৌশিকের মুখেও হাসি ফুটেছিল। বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বলল, 'সন্দীপদা, এ বইটা আজ আমি একটু নিয়ে যাব। কাল সকালে আপনি বেরুবার আগেই বই আপনার কাছে পৌঁছে যাবে।'

'সকালে পেয়ে গেলে কোনও অসুবিধে হবে না। একটা মেল নষ্ট করিয়েছি, পরের মেলে বইটা যাতে ছেলেটার হাতে পৌঁছে যায় সেট দেখা উচিত আমাদের। বইতে কী লেখা আছে যেন, হ্যাঁ-হ্যাঁ, সোমবারে পরীক্ষা। পরীক্ষায় বসার আগে এই ধরনের শুভেচ্ছা কিন্তু মনের জোর বাড়িয়ে দেয় খানিকটা। দেয় না?'

ঘাড় নাড়িয়ে সায় দিল কৌশিক।

মোবাইল ফোন বেজে উঠল আবার। টেলিফোন কানে লাগাবার পরেই গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল গোয়েন্দাপ্রধানের মুখ। উনি টেলিফোন কানে লাগিয়ে প্রকাণ্ড বসার ঘরের জানলার ধারে গিয়ে নিচু গলায় কথা শুরু করলেন।

মহানগরীতে প্রতিদিনই ছোট-বড় এমন কিছু-কিছু ঘটনা ঘটে যাকে বলে অঘটন। শহরে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার ভার যাঁদের উপর, তাঁদের পরিভাষায় এই অঘটনগুলি 'ইনসিডেন্ট'।

টেলিফোনে কথা শেষ হলে গোয়েন্দাপ্রধান পকেট থেকে একটা লম্বাটে অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক বার করে খসখস করে কিছু নোট করে নিলেন। নোট নেওয়ার পরেও ওঁর মুখটা বেশ গম্ভীর দেখাচ্ছিল। কৌশিক বুঝতে পারল কোথাও বেয়াড়াগোছের কোনও ইনসিডেন্ট ঘটেছে। এটা বোঝার পরেই বলল, 'সন্দীপদা আমি এখন উঠি। পরে যোগাযোগ করব আপনার সঙ্গে।'

গোয়েন্দাপ্রধান একটু অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে মাথা নাড়ালেন।

ওখান থেকে সোজা বাড়ি ফিরে এসেছিল কৌশিক। ওর মাথার মধ্যে টুকরো-টুকরো নানা সূত্র, নানা ঘটনা। ঘটনা আর সূত্রগুলো পরম্পরা রেখে জোড়ার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল গোয়েন্দা। কাজটি খুব জটিল এবং জোড়ার কাজ সব সময় হচ্ছিলও না।

বাড়িতে ফেরার একটু পরেই একটা ফোন পেল কৌশিক। ও পাশে রনির গলা। রনি হাসতে হাসতে বলল, 'আমার আর লিজিয়ার অবস্থাটা অনেকটা গৃহবন্দির মতো। এখানে অবশ্য 'গৃহ' কেটে 'হোটেল' বসাতে হবে।"

'কেন, তোমাদের চলাফেরা, বেড়ানোর ওপরে তো কোনও বিধিনিষেধ নেই। আমাদের তরফ থেকে তোমাদের কাছ একটাই অনুরোধ—দু-চারটে দিন তোমরা একটু বেশি সময় হোটেলে থাকো। প্রয়োজনে তোমাদের যাতে কাছাকাছি পাওয়া যায়।'

'লিজিয়া বলছিল, ওর কছে এখানকার ব্রিটিশ ডেপুটি হাই-কমিশনের অফিস থেকে লোক এসেছিল।'

'তাই? কখন?'

'আজ সকালে। আমি তখন একটা বইয়ের দোকানে গিয়েছিলাম।'

'লিজিয়া তো এখানকার ডেপুটি হাই-কমিশনের পুরনো কর্মী। ওঁরা নিশ্চয়ই পুরনো সহকর্মীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম, কিন্তু লিজিয়া তো অন্য রকম বলল।'

'অন্য রকম! কী?'

'খুব একটা ভেঙে বলেনি। তবে ব্যাপারটা মনে হয় একটু গোলমেলে। ওকে খানিকটা থমথমে দেখাচ্ছিল।'

'এখন কোথায় লিজিয়া?'

'ওর শখ মেটাতে বেরিয়েছে।'

'শখ! কী শখ?'

'ওর শখ তো এখন একটাই। কলকাতায় ঘুরে ঘুরে পুরনো দিনের ব্রিটিশ-রাজের বাড়িঘর দেখা। এই গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল আর রাইটার্স বিল্ডিংয়ের ওপর নোট নিয়ে নিয়ে ইতিমধ্যে ও একটা ছোট খাতা ভর্তি করে ফেলেছে।'

'এখন কী দেখতে বেরিয়েছে?'

পুরনো দিনের বিখ্যাত সেই টাউন হল। একজন এক্সপার্টের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্টও আছে ওখানে। বলেছে আজ ফিরতে ওর একটু দেরি হতে পারে। ও না থাকার জন্যে আমি একেবারেই একলা হয়ে পড়েছি। কাঁহাতক আর টিভি দেখা যায় বলো?'

'ঠিক আছে, আমি চলে আসছি। টেলিফোনের বদলে সামনাসামনি বসে গল্প করা যাবে কিছুক্ষণ।'

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে পৌঁছে গিয়েছিল কৌশিক। দেখা হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গল্প জমে উঠেছিল ওদের মধ্যে। মধ্যিখানে একবার রুম সার্ভিসকে ফোন করে কফি পাঠিয়ে দেওয়ার কথা বলেছিল রনি।

গল্প নানা খাতে ঘুরছিল, হঠাৎ রনি অন্য রকম গলায় বলল, 'তোমার এই রহস্য-রহস্য ব্যাপারটা আরও কতটা টানবে বলো তো? কাকা ভাল আছেন? জোসি? সত্যি করে বলবে কিন্তু—।'

হেসে উঠে কৌশিক বলল, 'খুব ভাল আছেন পূর্ণদা। জোসিও চমৎকার। সুন্দরবন ট্রিপটা ওরা দারুণ উপভোগ করছে। প্রথম দিকে আমারও সব কিছু ভাল লাগছিল সমান তালে, কিন্তু পরের দিকে—।'

'পরের দিকে কী?'

'পরের দিকে এমন কিছু ঘটনা ঘটতে লাগল যাতে সফরটা আমি আর আগের মতো এনজয় করতে পারছিলাম না—।'

রনির কপালে দু-তিনটে ভাঁজ, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। 'ঠিক কী ঘটেছে একটু খুলে বলবে?'

'বলার মতো হলে অনেক আগেই বলতাম। ব্যাপারটা এখনও অনেকখানি অস্পষ্ট।

মনে হয়, শিগগিরই স্পষ্ট হবে। হোক না হোক, তোমাদের আর দু-এক দিনের বেশি কষ্ট দেব না না। পরে তোমাদের এই বন্দি থাকার ক্ষতি যতটা পারি পুষিয়ে দেব। আচ্ছা রনি, জোসিকে তোমার ঠিক কেমন মেয়ে বলে মনে হয়?

রনি হেসে উঠে বলল, 'কৌশিকদা, তুমি কিন্তু প্রথমেই দারুণ কঠিন একটা প্রশ্ন করে বসেছ।'

'কেন, কঠিন কেন?'

'ওর সম্পর্কে এক কথায় কিছু বলা অসম্ভব।'

'ঠিক আছে দশ কথায় বলো।'

'সেটা আরও অসম্ভব। ওর সম্পর্কে দশটা কথা বললে তার মধ্যে চারটে হবে পরস্পরবিরোধী।'

'কী রকম?'

হোটেলের ঘরে কফি দিয়ে গিয়েছিল ওয়েটার। একটা কাপ কৌশিকের হাতে তুলে দিয়ে আর একটা নিজে নিয়েছিল রনি। কাপে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে রনি বলল, 'জোসিকে আমি যদি খুব নরম মনের মেয়ে বলি—কথাটা ঠিক বলে মনে হবে। সায় দেবে অনেকেই। কিন্তু আমি জানি, কোথাও-কোথাও ও অসম্ভব রকমের কঠিন। শুধুমাত্র ওই চেহারাটা যারা ওর দেখেছে, তাদের কারও পক্ষে ওকে নরম মনের মেয়ে ভাবা সম্ভব নয়। জোসি চলাফেরা, কাজকর্মে ভীষণ ডিসিপ্লিন্‌ড। কোথাও একটু এদিক-ওদিক হয় না। হার্ড রিয়েলিটি কাকে বলে, খুব ভাল রকম বোঝে। ইমোশনাল বলতে যা বোঝায়, তা আদপেই নয়, কিন্তু—।'

'কিন্তু কী?'

'কখনও-কখনও এমন সব কাণ্ড করে বসবে যেগুলো দেখলে মনে হবে—জোসি বাচ্চাই রয়ে গেছে, ওর বয়েস আর বাড়েনি। ফ্যান্টাসির জগতে বাস করে এখনও।'

কৌশিক খুব মন দিয়ে রনির কথাগুলো শুনছিল, ও থামতেই জিজ্ঞেস করল, 'কী রকম?'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে রনি বলল, 'একটা উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারবে। ভারতবর্ষে ও তো এই প্রথম এল, কিন্তু অল্প বয়স থেকেই সুন্দরবন ওর কাছে খুব চেনা একটা জগৎ। এমন ভাবে সুন্দরবনের কথা বলে যেন ওই জগতেই ও বড় হয়ে উঠেছে।'

কৌশিক আপত্তি করার গলায় বলল, 'না-না, এটা কিন্তু একেবারেই অস্বাভাবিক নয়। অনেক বাচ্চার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে যারা খুব কল্পনাপ্রবণ, এমন তো ঘটতেই পারে। জোসির বেলায় একটা বাড়তি ব্যাপার হল—ওর পূর্বপুরুষ একজন বিশ্ববিখ্যাত মানুষ। ওই পরিবারে ছোটরা নির্ঘাত বড় হয় বার্নিয়েরের কথা শুনতে। অল্প বয়েস থেকেই বার্নিয়েরের ভ্রমণকাহিনীর অসম্ভব ভক্ত জোসি। বার্নিয়ের স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন, যুগে যুগে লেখকরা মিশরকে সোনার দেশ বলে গেছেন। অমন ফুল-ফল-ফসলে ভরা দেশ নাকি পৃথিবীতে আর একটাও নেই। বার্নিয়ের পৃথিবীর নানা দেশ দেখেছেন, সে সবের মধ্যে মিশরও ছিল। মিশর দেখে উনি মুগ্ধও হয়েছিলেন, কিন্তু বাংলাদেশে এসে ওঁর ধারণা পাল্টে যায়। একবার নয়, দু-দুবার বাংলাদেশ ঘোরার পরে পরিষ্কার ভাবে লিখেছেন—গোটা পৃথিবীর মধ্যে

বাংলাদেশই সোনার দেশ, মিশর নয়। বিখ্যাত এক পূর্বপুরুষ গোটা পৃথিবী ঘুরে একটি সোনার দেশ আবিষ্কার করেছেন। সেই দেশ সম্পর্কে উত্তরপুরুষের কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক ব্যাপার। জোসির আগ্রহ খুব বেশি মাত্রায়। বাংলাদেশের মধ্যে সুন্দরবন আবার আলাদা ভাবে মুগ্ধ করেছিল বার্নিয়েরকে। মুগ্ধ হওয়ার কথা উনি লিখে গেছেন। সেই বর্ণনা মুগ্ধ করেছে জোসিকে। বাংলাদেশ এতই ভাল লেগেছে যে দূর দেশে বসে বাংলা ভাষা পর্যন্ত শিখে নিয়েছে। এমন দৃষ্টান্ত কিন্তু খুব বেশি নেই। ম্যাক্সমুলার ভারতে কখনও আসেননি, নিজের দেশে বসেই সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত হয়েছিলেন। তবে ওঁর কথা বাদ দাও। উনি তো স্কলার এক্সট্রাঅর্ডিনারি!'

কফির কাপে আর একটা চুমুক দিয়ে রনি বলল,'বার্নিয়েরের বইটা জোসি কতবার যে পড়েছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। শুধু ছাপা বইটাই নয়, না-ছাপানো পাণ্ডুলিপিও।'

অবাক হয়ে প্রশ্ন করল কৌশিক, 'পাণ্ডুলিপির পুরোটা ছাপা হয়নি?'

'উহুঁ। জোসি বলেছে—পাণ্ডুলিপির সঙ্গে ছাপানো বই ওদের বাড়ির কেউ কখনও মিলিয়ে দেখেনি। এই কাজটা শুধু ও-ই করেছে। করতে গিয়ে দেখে, গোটা-পাঁচেক চ্যাপ্টার ছাপানোই হয়নি।'

'সে কি! কখনও হয়নি?'

'না। জোসি বলেছে—কখনওই হয়নি।'

টেবিলের ওপর ছোট্ট একটা ঘুষি মেরে কৌশিক বলল, 'সাঙঘাতিক ব্যাপার! বার্নিয়েরের ছাপা না-হওয়া পাণ্ডুলিপি পাওয়া আর অমূল্য সম্পদ পাওয়ার মধ্যে তো কোনও তফাত নেই। জোসি কবে ওগুলো ছেপে বার করছে?'

'করবে না। পাণ্ডুলিপির মধ্যে এক জায়গায় নোট আছে—এই কয়টি চ্যাপটারের মধ্যে বাংলাদেশের কিছু অলৌকিক ঘটনা আর তন্ত্রমন্ত্রের কথা লেখা আছে। ফরাসি সম্রাট এগুলো বিশ্বাস নাও করতে পারেন ভেবে তিনি ওগুলো ছাপানোর জন্যে সম্রাটের অনুমতি চাননি।'

আর একবার অবাক হল কৌশিক। 'বার্নিয়েরের আমলে বই ছাপতে গেলে কি ফরাসি সম্রাটের অনুমতি নিতে হত?'

'হত। জোসিই আমাকে বলেছে। বার্নিয়ের ওঁর বই ছেপে বার করার অনুমতি পেয়েছিলেন ফরাসি সম্রাট থার্টিন্থ লুইয়ের কাছ থেকে। সেটা সেভেন্টিনথ সেঞ্চুরির শেষের দিকের ঘটনা।'

"খুব ভাল কথা। কিন্তু সাড়ে-তিনশো বছর আগেকার নিয়মকানুন তো এখন আর খাটে না। 'বার্নিয়েরের অপ্রকাশিত ভ্রমণকাহিনী' নাম দিয়ে এক্ষুনি ওই পাণ্ডুলিপি ছাপা উচিত। ওটা অমূল্য রত্ন বললেও কম বলা হয়। জোসির সঙ্গে দেখা হলেই কথাটা বলতে হবে তো।'

কৌশিকের কথা শুনে আঁতকে উঠে রনি বলল, 'খবর্দার এ কথাটা ওকে বলবে না। আমার কাছ থেকে আর কেউ এটা জেনেছে জানলে জোসি আমার সঙ্গে হয়তো কথা বলাই বন্ধ করে দেবে। আমি ছাড়া ওই পাণ্ডুলিপির কথা জোসি আর একজনকে মাত্র বলেছে। নাম বলেনি, তবে আমার মনে হয়—দ্বিতীয় ব্যক্তিটি জোসির পুরনো বয়ফ্রেন্ড ক্যাম্পবেল। এখন অবশ্য ওর সঙ্গে জোসির আর কোনও সম্পর্ক নেই।'

একটু ছটফটে গলায় কৌশিক বলল, 'অদ্ভুত ব্যাপার তো! জোসি কেন পাণ্ডুলিপি ছাপতে দিতে রাজি হচ্ছে না?

'বংশধরদের উদ্দেশে বার্নিয়েরের একটা নোট আছে।'

'কী নোট?'

'বার্নিয়ের লিখেছেন, পাণ্ডুলিপিতে লেখা অলৌকিক ওই সব ব্যাপার নিয়ে উত্তরপুরুষদের কেউ যদি কোনও অনুসন্ধান চালাতে চায়, চালাতে পারে। কিন্তু এটা যেন কখনওই ছাপানো না হয়। আর একটা সতর্কবাণী আছে—।'

'কী?'

'উত্তরপুরুষদের উদ্দেশে বার্নিয়ের লিখেছেন—অনুসন্ধানের কাজ খুব সাবধানে চালাতে হবে। কেননা ওই কাজে প্রাণহানির আশঙ্কা আছে যথেষ্ট পরিমাণে।'

চমকে উঠে কৌশিক জিজ্ঞেস করল, 'কী নিয়ে অনুসন্ধান? কেনই বা প্রাণহানির আশঙ্কা? এ সব নিয়ে বার্নিয়ের কিছু লেখেননি?'

দুদিকে মাথা নাড়াতে নাড়াতে উত্তর দিল রনি। 'আমি প্রশ্ন করেছিলাম। জোসি বলেছে—না, ওই বিষয়ে আর কিছুই লেখেননি বার্নিয়ের।'

॥ ৩৮ ॥

রাত সওয়া-এগারোটা। চারদিক বেশ শান্ত হয়ে গেছে। খাটের ওপর দুটো বালিশ মাথায় দিয়ে চিৎপাত হয়ে শুয়ে আছে কৌশিক। হাতের কাছে নোটবই আর কলম। নোটবইয়ে সাঙ্কেতিক ভাষায় ওর বেশ কিছু জটিল অঙ্ক কষা হয়ে গিয়েছে। বিচিত্র সব সূত্রের সাহায্যে অঙ্ক। উত্তর শেষ পর্যন্ত মিলবে কি না—সে ব্যাপারে এখনও তেমন নিশ্চিত হতে পারেনি গোয়েন্দা।

গোয়েন্দার চোখ কখনও ঘরের সিলিংয়ের দিকে, কখনও বা জানলার বাইরে। মাঝেমধ্যে চোখ বুজছিল, তবে ওর কপালের ভাঁজগুলোই বলে দিচ্ছিল, ঘুমের থেকে ও অনেক দূরে। হঠাৎই ছোট্ট একটা লাফ মেরে উঠে বসল গোয়েন্দা, তারপর বেডসাইড টেবিলের ওপর থেকে টেনে নিল কনসাইজ এনসাইক্লোপিডিয়া অব জিওগ্রাফি। শিলিগুড়ির একটি ছোট ছেলে জয় প্রধানের কাছে এই বইটি পাঠাচ্ছে তার এক কাকা।

বইয়ের পাতাগুলো ওল্টাচ্ছিল কৌশিক। পাতায় পাতায় রঙিন সব ছবি, মানচিত্র। ঝকঝকে সাদা কাগাজে বড়-বড় হরফে খুব সংক্ষেপে গোটা পৃথিবীর কথা লেখা আছে বইতে। সাতটি কন্টিনেন্টের মধ্যে সব চাইতে বড় এশিয়া। অ্যান্টার্কটিকায় শুধুই বরফ। হিম উপকূল-এলাকায় অল্প কিছু প্রাণী শুধু বেঁচে থাকতে পারে। মজার কাহিনী নর্থ আমেরিকার। সাহেব-লেখক জানিয়েছেন: আজ থেকে মাত্র পাঁচশো বছর আগে ইউরোপীয়রা 'আবিষ্কার' করেছে এই মহাদেশটিকে। সেই দেশটিই এখন পৃথিবীর সব চাইতে ধনী এবং শক্তিশালী দেশ।

নিজের মনে গোয়েন্দা হঠাৎই প্রশ্ন তুলে বসল—সত্যিই কি তাই?

বইয়ের পাতা উল্টে যাচ্ছিল কৌশিক। রাত ইতিমধ্যে আরও কিছুটা বাড়ার ফলে আরও শান্ত হয়ে গিয়েছিল চারদিক। গভীর রাতের নিস্তব্ধতা যে-কোনও ছোট শব্দকেও বুঝি ধরে ফেলতে পারে। হঠাৎই খুব হালকা একটা আওয়াজ ভেসে এল গোয়েন্দার কানে।

কিসের আওয়াজ? প্রতিটি এলাকারই বুঝি রাতের কিছু নিজস্ব শব্দ থাকে। কিন্তু এই ঝিরিঝিরি শব্দটা গোয়েন্দার কানে একেবারেই অচেনা। কান খাড়া রেখেছিল ও ; কিন্তু না, আর শোনা গেল না।

দেওয়ালঘড়ির কাঁটা গভীর রাতের দিকে বেশ কিছুটা ঘুরে গেছে। এবার ঘুমোতে হবে। একটা হাই তুলে হাতের বইটা টেবিলে রাখতে গিয়ে আর একবার শুনতে পেল সেই ঝিরিঝিরি শব্দ।

টান হয়ে বসল গোয়েন্দা, তার পর বইটা কানের কাছে নাড়াতে লাগল আস্তে আস্তে। হ্যাঁ, শব্দ শোনা যাচ্ছে আবার ; এই তো এখান থেকেই।

বিছানা থেকে নেমে পড়ে শেভিং-সেট থেকে একটা ব্লেড বার করে আনল গোয়েন্দা। তারপর কনসাইজ এনসাইক্লোপিডিয়া অব জিওগ্রাফির মোটা মলাটের মধ্যে ব্লেড ঢুকিয়ে খুব আস্তে আস্তে টানতে লাগল। ব্লেড টানবার একটু পরে মোটা মলাটের ভেতর থেকে বিছানার সাদা চাদরের ওপরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল আশ্চর্য সুন্দর সব প্রজাপতি।

সব প্রজাপতিই মৃত, কিন্তু হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে বিছানার ওপর এমন ভাবে ছড়িয়ে পড়ছিল যেন ওরা জ্যান্ত। দুটি মলাটের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল অসংখ্য প্রজাপতি। অসাধারণ সব বর্ণবাহার ডানায়। এত সুন্দর প্রজাপতি তো চোখে পড়ে না চট করে। কৌশিক বুঝতে পারল, প্রতিটি প্রজাপতিই বিরল প্রজাতির।

এনসাইক্লোপিডিয়ার পাতাগুলো দ্রুত উল্টে গেল ফের। এবার আর পড়ার জন্যে নয়। ওর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল। প্রথম মলাট থেকে শেষ মলাট পর্যন্ত বইটিকে আরও একবার পরীক্ষা করল। তার পর খুব খুঁটিয়ে জয় প্রধানকে লেখা আংকলের শুভেচ্ছাবাণী বারকয় পড়ল। বইটির উপহারদাতা কাকা আশা করে, প্রাপক ভাইপো সোমবারের পরীক্ষায় বিরাট একটা নম্বর তুলবে। শুভেচ্ছাবাণীর সহজ-স্বাভাবিক অর্থ পাল্টে গিয়েছিল গোয়েন্দার কাছে।

রাত আরও কিছুটা গভীর হওয়ার পরে একটা বড় ব্রাউন রংয়ের খামে প্রজাপতিগুলো ভরে ফেলল গোয়েন্দা। তারপর বই আর খাম কাবার্ডের ভেতর ঢুকিয়ে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়েছিল।

সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরেই কৌশিকের প্রথম কাজ হয়েছিল আঠা দিয়ে নিখুঁত ভাবে বইয়ের মলাট জোড়া। খুব খুঁটিয়ে না দেখলে বোঝা যাবে না যে, বইটা জোড়া হয়েছে। বই সরিয়ে রেখে নোটবই টেনে নিয়ে জটিল অঙ্কে আর একবার ডুব দিয়েছিল গোয়েন্দা।

সাড়ে-আটটা নাগাদ ইনফর্মার গগন বেরা এসে হাজির হল। মাথায় একটু বেশি পরিমাণে তেল দিয়ে চেপে চুল আঁচড়েছে। ভাবলেশহীন মুখ তুলে নমস্কার করল গগন। কৌশিক একটু হেসে বলল, 'বোসো গগন। তুমি কি বরাবরই সকালে চান করে নাও?' লাজুক হাসি হেসে উত্তর দিল গগন, 'না স্যার। সকালে উঠে শরীরে জুত ছিল না মোটেই তাই, ভাবলাম একটু চান করে নিই। তা, চান করার পরে ভাল ঠেকছে।'

'তোমার কি শরীর খারাপ হয়েছিল?'

'না স্যার, তবে ওটা হলেই দেখেছি রাত্তিরে ভাল ঘুম হয় না, কিংবা খুব ভোরের দিকে ঘুম ভেঙে যায়—।'

'ওটা হলে মানে?'

'ওই যে স্যার, খবর জোগাড় করার জন্যে লক্ষ্মণের সঙ্গে কাল একবার পাঁচুর ঠেকে গিয়েছিলাম না—আপনাকে তো আগেই বলেছিলাম স্যার।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, বলেছিলে।'

'তা, আপনি তো জানেন স্যার—মোদোমাতালদের ঠেকে গেলে ওই সব একটু না গিললে চলে না। শুকনো মুখে বসে থাকলে সন্দ করবে সবাই। বাধ্য হয়ে খাই। কিন্তু আমার শরীর ঠিক নেয় না। একটু খারাপ হয়। তবে পরদিন সকালে মাথায় ভাল করে তেলটেল দিয়ে চান করে নিলে দেখেছি অস্বস্তি কাটে। এখন আমি ঠিক আছি স্যার।'

'বেশ। কাল কি পাঁচুর ঠেকে ভোলা আর পচন গিয়েছিল?'

'গিয়েছিল স্যার। ওরা এখন খুব ফূর্তিতে আছে। পকেটে মালকড়ি ভালই আছে। আরও আসবে শিগ্‌গির।'

'ওদের কথাবার্তা শুনে কি তাই মনে হয়েছে?'

'হ্যাঁ স্যার, যেটুকু যা শুনেছি তাই তো মনে হল।"

'কী খবর জোগাড় করতে পারলে এবার বলো—।'

বুকপকেট থেকে কাগজের একটা টুকরো বার করে গগন বলল, 'গাড়ির একটা নম্বর ওদের মুখে দু-তিনবার শুনেছিলাম। টুক করে লিখে নিয়েছি। এটা আপনার কাজে লাগতে পারে। রেখে দিন স্যার।'

কাগজটা হাতে নিয়ে নম্বরে একবার চোখ বুলিয়ে নোটবইয়ের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখল গোয়েন্দা। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'এই গাড়ি নিয়ে কী করবে ওরা?'

'মনে হয় মাল পাচার করবে।'

'কী মাল জানতে পেরেছ?'

'না স্যার। তবে মাল যে খুব দামি হবে—এটা বুঝতে পেরেছি।'

'কোত্থেকে কোথায় যাবে? কানে এসেছে কোনও জায়গার নাম?'

'না স্যার, সেটা ওরা বলেনি। তবে এটা বুঝতে পেরেছি, গাড়িতে মাল উঠবে কলকাতা থেকেই।'

'কলকাতার কোন্ জায়গা থেকে?'

'সেটাও বলেনি। তবে পেট্রল পাম্পের কথা বলেছে দু-তিনবার। এমনও হতে পারে—কোনও একটা পেট্রল পাম্প থেকে পুরো তেল বোঝাই করার পরে গাড়ি ছুটবে।'

'কী গাড়ি?'

'গাড়ির নাম না বলে ওই নম্বরটাই বলেছে শুধু। এমনি গাড়ি হতে পারে, আবার ট্রাক হওয়াও অসম্ভব নয়। বলছিল, একসঙ্গে অনেক মাল যাবে।'

'কবে যাবে মাল?'

'সেটা বলেনি, তবে কথাবার্তার ধরন দেখে মনে হয়েছে—খুব শিগ্‌গিরই। কাল-পরশুও হতে পারে।'

কপালে বেশ কয়েকটা ভাঁজ পড়েছিল গোয়েন্দার। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে জিজ্ঞেস করল, 'আর কিছু জানতে পারলে?'

'না স্যার, আর কিছু কানে আসেনি। নেশা করলেও পার্টি বেশ সেয়ানা। এটা মনে হচ্ছিল, কিছুদিন ধরে মালপত্র যা জোগাড় হয়েছে—এবার তা পাচার হবে। আজ সন্ধেতেও পাঁচুর ঠেকে যাওয়ার কথা আছে ভোলা আর পচনের। লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে আমিও একবার যাব। দেখি, আর কিছু জানতে পারি কি না—।'

শেষ কথাটা শুনে ব্যস্ত হয়ে কৌশিক বলল, 'তা হলে তোমাকে আরও কিছু টাকা দিয়ে দিই।'

মৃদু হেসে উত্তর দিল গগন, 'পরের দিন নেব স্যার। এখন তা হলে উঠি—।'

একটু ইতস্তত করে কৌশিক বলল, 'তুমি আমার একটা কাজ করে দেবে?'

'নিশ্চয়ই। কী কাজ বলুন না?'

'লালবাজারে ডি সি ডি ডি ওয়ানের কাছে একটা প্যাকেট পৌঁছে দিতে হবে। রিসেপশনে দিলেই হবে।'

'আমাকে এখন একবার ডালহৌসির দিকে যেতে হবে। পথেই তো লালবাজার পড়বে। দিন, কোনও অসুবিধে হবে না আমার।'

দ্রুত হাতে ভূগোলের এনসাইক্লোপিডিয়া ঠিকানা-লেখা পিজবোর্ডের প্যাকেটে পুরে মুখ এঁটে দিল কৌশিক। তারপর বড় একটা ব্রাউন রংয়ের কাগজে প্যাকেটটা মুড়ে সেলোটেপ লাগিয়ে সন্দীপ দেবের নাম-ঠিকানা লিখে গগনের হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'রিসেপশনে দিলেই হবে। আমি সন্দীপদাকে পরে ফোন করে নেব।'

গুপ্তচরের চোখমুখ আবার আগের মতো ভাবলেশহীন হয়ে উঠেছিল। 'এখন আসি স্যার' বলে বেরিয়ে পড়ল কৌশিকের ফ্ল্যাট থেকে।

গগন চলে যাওয়ার একটু বাদেই তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়েছিল কৌশিক। বাস-মিনি বাসে অফিসযাত্রীদের ভিড় শুরু হওয়ার মুখে। সল্ট লেকে শঙ্কর লাহিড়ীর আস্তানায় আধ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে গিয়েছিল কৌশিক। দরজা খুলে আপ্যায়নের গলায় লাহিড়ী বললেন 'আসুন-আসুন, আমি এইমাত্র আপনার কথা ভাবছিলাম। টাকি থেকে ফিরেছি ঘণ্টাখানেক আগে। আমাদের সেই ইনফর্মার পারভেজ দেখা করতে এসেছিল ভোরবেলায়। যা খবরাখবর দিল তা তো বেশ গ্রেভ। তবে আমার মনে হয়—ব্যাপারটা ও একটু বেশি-বেশি করে ভেবেছে। এনিওয়ে, যা জেনেছি আমাদের স্পাই-নেটওয়ার্ককে জানিয়ে দেব। ঘণ্টাদুয়েক বাদে বেরুব যখন তখনই ফোন করব। তবে আজ সকালেই মনটা খারাপ হয়ে গেছে আমার।'

'কেন?'

'খবরের কাগজ পড়ে।'

একটু আমতা-আমতা করে কৌশিক জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কাগজের কোন্ খবরটার কথা বলছেন?'

ইঙ্গিতে কৌশিককে ওদিকের খালি চেয়ারটা দেখিয়ে দিয়ে এ পশের চেয়ারে বসে পড়েছিল লাহিড়ী। কৌশিক বসার পরে বললেন, 'এ সব খবর খবরের কাগজে চার-ছ লাইনের বেশি বার হয় না। তাও আবার ভেতরের পাতায় ছাপে। দুধওয়ার খবরটা পড়েছেন?'

'দুধওয়া।'

'হ্যাঁ, দুধওয়া রিজার্ভ ফরেস্ট। নেপালের সীমান্তে। বনের মধ্যে বাঘটা মরে পড়েছিল। মরে অবশ্য পড়ে থাকার কথা নয়। মারা যাওয়ার ঠিক পরেই ফরেস্ট-গার্ডরা ওখানে গিয়ে পড়েছিল বলে ঘটনাটা জানতে পারে।'

'মারা যাওয়ার কারণটা কী?'

'দিব্যি স্বাস্থ্যবান বাঘ। বাইরে থেকে ওর গায়ে আঘাতের কোনও চিহ্ন নেই। অনুমান করা হচ্ছে, বিষ খাইয়ে মারা হয়েছে বাঘটাকে। বাঘের ভিসেরা পরীক্ষার জন্যে ল্যাবরেটরিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। রিপোর্ট পাওয়া গেলে মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। তবে আমি এখনই শ্যিওর—বিষ খাইয়েই মারা হয়েছে বাঘটাকে। চোরাশিকারিদের এটা একটা অনেক দিনের পুরনো টেকনিক। বিষ-মেশানো মাংস খাইয়ে বাঘ মারতে পারলে আস্ত, অবিকৃত চামড়াটা পাওয়া যায়। গত ছ-বছরে এই ভাবে ভারতে কতগুলো বাঘ মারা হয়েছে জানেন?'

'কতগুলো?'

'এই রিপোর্টটা অবশ্য বন্যপ্রাণী নিরাপত্তা সংস্থার। এদের হিসেবে গত ছ-বছরে ভারতে এই ভাবে চারশো চল্লিশটা বাঘ মারা হয়েছে?'

'চারশো চল্লিশ!'

'এটা তো সংস্থার রিপোর্ট। মনে হয়, এই কায়দায় আরও বেশ কিছু বাঘ মারা হয়েছে। চোরাশিকারিদের সব অপরাধের কথা নিশ্চয়ই জানা যায়নি। এটা তো গেল এক ভাবে বাঘ মারার হিসেব। বাঘ মারার নানান কায়দা আছে। এই ভাবে চলতে থাকলে আর কিছু দিনের মধ্যে বাঘের আর কোনও অস্তিত্বই থাকবে না। থাকবে কি?'

দুদিকে মাথা নাড়াতে নাড়াতে আফসোসের গলায় কৌশিক বলল, 'মানুষের লোভ যে কোথায় এসে পৌঁছেছে!'

কথাটা শুনে শঙ্কর লাহিড়ী কেমন যেন চটে উঠে বললেন, 'মানুষের লোভ নয়, অপরাধীদের লোভ। এই ধরনের ঘৃণ্য অপরাধীদের আমি মানুষ বলেই মনে করি না।'

কৌশিক এবার আর সায় দেওয়ার মধ্যেও গেল না।

একটু বাদে কেমন যেন নিজের মনে কথা বলার ভঙ্গিতে শঙ্কর লাহিড়ী বললেন, 'এদিকে চামড়ার লোভ, ওদিকে পুণ্যের লোভ। লোকটা এসে আমাকে যা শোনাল তা তো গপ্পো-কথা। তবে এ দেশে গপ্পের সত্যি হয়ে ওঠার পথে কোনও বাধা নেই। ও বলছিল—সামনে তিথি-নক্ষত্রের কী একটা মস্ত যোগ আছে ; ওই যোগে তান্ত্রিক-পীর-ফকিররা নিয়মটিয়ম মেনে যা প্রার্থনা করবে তাই নাকি পেয়ে যাবে। এ সব শুনে আমার এত রাগ হয়ে গিয়েছিল যে, ইচ্ছে করছিল ওই লোকটাকেই ধমকে দিই।'

কৌশিক ঠিক করেছিল, কৌতূহল যতই মাথা চাড়া দিয়ে উঠুক না কেন—কিছুতেই প্রকাশ করবে না। তাই একটু বেশি মাত্রায় শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কাকে?'

'যে লোকটা ওই সব খবর নিয়ে এসেছিল। আমাদের লোক, আমাদের পে-রোলে আছে পারভেজ। এর কথাই তো আপনাকে বলেছিলাম। এসে বলছিল, দু-তিন দিন বাদে কী একটা শুভ যোগ আছে—সেই যোগে তন্ত্রমতে একই সঙ্গে বাঘবলি আর নরবলি দেওয়ার তোড়জোড় চলছে গোপনে। শুনেই আমি চটে গিয়েছিলাম—।'

'কেন? চটে গিয়েছিলেন কেন?'

'এই সব কথার মধ্যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সত্যি থাকে না। কিন্তু কথাগুলো লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়লে গাঁ-গঞ্জের লোকরা বেশি করে কুসংস্কারগ্রস্ত হয়ে পড়ে। একেই তো ওদের কুসংস্কারের শেষ নেই। পারভেজের ওই খবরটাও অবিশ্বাস্য ঠেকেছিল আমার।'

'কেন, অবিশ্বাস্য কেন?'

'জিজ্ঞেস করেছিলাম—এতে বলিটলি দেওয়ার মতলব যারা ভাঁজছে তারা কি চোরাশিকারি? তা, আমার প্রশ্নের উত্তরে পারভেজ এক কথায় বলেছিল—না, ওরা চোরাশিকারি নয়।'

'বলল?'

'হ্যাঁ। চোরাশিকারিরা ধর্মের ভয়-ভক্তিকেও কাজে লাগায়। তা, যখন শুনলাম—পেছনে চোরাশিকারি নেই ; বুঝলাম খবরটা পাকা নয়।'

মৃদু তর্ক তোলার ভঙ্গিতে কৌশিক বলল, 'ধর্মের দোহাই দিয়ে কি এ সব হয় না?'

শঙ্কর লাহিড়ী বললেন, 'হ্যাঁ, হয়। তবে তার জায়গাটা আলাদা। এই যেমন ধরুন—অন্ধ্রের ওই ঘটনাটা। হায়দারাবাদের নেহরু জুলজিক্যাল পার্কে জ্যান্ত অবস্থাতেই একটা বাঘিনীর চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। বাঘিনীর বয়েস ছিল দেড় বছর। এর ঘাতক হিসেবে সন্দেহ করা হচ্ছে দেশের বিখ্যাত এক নেত্রীর ছেলেকে। ছেলেটা নাকি এই ধরনের প্রাণী বলি দিয়েছে তামিলনাড়ু আর অন্ধ্রপ্রদেশের কয়েকটা মন্দিরে। এই সব বলিটলি শুনেছি ওই ছেলেটার কাছে বড় আকারের শান্তি-স্বস্ত্যয়নের মতো। ও সব করলে নাকি ঈশ্বরের আশীর্বাদ মা-ছেলের ওপর ঝরে পড়বে, আর ওদের সব বিপদ কেটে যাবে সঙ্গে সঙ্গে।'

অবাক হয়ে কৌশিক জিজ্ঞেস করল, 'এ সব আবার কোত্থেকে জানলেন।'

'নানা সোর্স থেকে। মন্দিরের ওই সব রক্তের নমুনা পরীক্ষার জন্যে ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়েছে। ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ এখনও প্রমাণ করা যায়নি। পুলিশ তদন্ত চালাচ্ছে। তবে এটাও সত্যি—তন্ত্রের নামে এমন অনেক কিছু চলে যা শুনলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।'

'আপনার ওই ইনফর্মার এই ব্যাপারে আর কী বলেছে আপনাকে?'

'বলেছে, গুনিনটুনিন নিয়ে তন্ত্রসাধনা চলবে সুন্দরবনের মন্দিরে। বাঘবলি আর নরবলি দুটোই হবে। পুণ্যতিথিতে এই সব তান্ত্রিক কাজকর্ম ঠিকভাবে চালাতে পারলে সাধকরা যা চায় তাই পায়। কোনও সাধই ওদের আর অপূর্ণ থাকে না তখন।'

'কিন্তু ইনফর্মারের কথা আপনার কাছে আজগুবি ঠেকছে কেন? এই সব তন্ত্রসাধনা-টাধনার নামে তো অনেক কিছু চলে থাকে।'

'তা চলে, তবে খবরটা কেন আমার ঠিক নয় বলে মনে হচ্ছে জানেন? এই সব ক্রিয়াকাণ্ডের পেছনে কোনও চোরাশিকারি নেই শুনে। পারভেজ আরও একটা উদ্ভট কথা শুনিয়েছে।'

'কী সেটা?'

'সুন্দরবনের মন্দিরে দেবতার সামনে বলি দেওয়ার জন্য সুলক্ষণযুক্ত উচ্চ বর্ণের হিন্দু আনা হবে কলক'াতা থেকে।'

'তা, এটাকে আপনি উদ্ভট বলছেন কেন?'

'পারভেজকে জিজ্ঞাসাবাদ করে মনে হয়েছে। ওর কথার মধ্যে বিস্তর অসঙ্গতি। একটাই শুধু আপনাকে বলছি। আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—সুলক্ষণযুক্ত উচ্চ বর্ণের হিন্দু কলকাতার কোন্ এলাকা থেকে আনা হবে? তো, তার উত্তরে ও কী বলল জানেন? বলল, ট্যাংরার চিনেপাড়া থেকে।'

কথাটা কানে যেতেই কৌশিকের বুকের মধ্যে ছোট্ট একটা ধাক্কা লেগেছিল। কিন্তু ও মনোভাব গোপন রেখে চাপা গলায় শুধু বলল, 'অ!'

॥ ৩৯ ॥

যাকে বলে 'রুদ্ধদ্বারকক্ষ বৈঠক', ঠিক তেমনই একটা বৈঠক হয়ে গেল গোয়েন্দপ্রধান সন্দীপ দেব আর তরুণ প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর কৌশিক মিত্রের মধ্যে। বৈঠক চলেছিল ঘণ্টাদুয়েক। সন্দীপ দেবের ফ্ল্যাটের এই বসার ঘরের দুটো দরজা—একটা ভেতর দিকের, আর একটা বাইরের। গোপন কথাবার্তা সারার পরে দুটো দরজাই খুলে দিয়ে গোয়েন্দাপ্রধান হাঁক পাড়লেন, 'চা-টা এবার পাঠিয়ে দাও।'

চা বোধহয় বানানো হচ্ছিল, একটু বাদেই ট্রেতে চাপিয়ে এক পট চা নিয়ে হাজির হয়েছিল আর্দালি। সঙ্গে প্লেটভর্তি স্ন্যাকস। পট থেকে চা ঢেলে দুটো কাপ দুজনের হাতে ধরিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল আর্দালি।

গম্ভীর মুখে চায়ের কাপে দু-তিনটে ছোট চুমুক দেওয়ার পরে কৌশিকের দিকে তাকিয়ে ওর সন্দীপদা তারিফ করার গলায় বললেন, 'তুমি যা করেছ, তা তো সাঙ্ঘাতিক! সব যদি ঠিকঠাক চলে, আর আমরা যদি ঠিক সময়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি—তা হলে তো—।' বাকিটা উনি আর বললেন না।

কৌশিক চায়ে একটা চুমুক দেওয়ার পরে বিস্কুট তুলে নিয়েছিল একটা।

সন্দীপদা বললেন, 'কাল সারাদিন-রাত তোমাকে ট্যাংরা থেকে টালা পর্যন্ত ছুটোছুটি করতে হয়েছে! আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি কী করে তুমি এত অল্প সময়ের মধ্যে এত খবরাখবর জোগাড় করলে!'

বিব্রত মুখে প্রতিবাদ করল কৌশিক, 'আমি সব খবর জোগাড় করলাম কোথায়! অনেক খবর তো আপনিই দিয়েছেন। আমাদের ইনফর্মারের কাছ থেকেও বেশ কিছু ভাল ইনফর্মেশন পেয়েছি। তা ছাড়া অল্প সময় কোথায়? ঘটনাগুলোর ফলো-আপ করে যাচ্ছি—তা, সব মিলিয়ে কম দিন তো হল না!'

হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিয়ে ওর সন্দীপদা বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি কিছুই করোনি। এখন থাক, শেষরক্ষা হওয়ার পরে তোমার সঙ্গে এ সব নিয়ে আমার বোঝাপড়া হবে। ভাল কথা, কাল তুমি ভূগোলের এনসাইক্লোপিডিয়া ক্যুরিয়ার সার্ভিসের কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে আবার নিষেধ করলে কেন?'

'টেলিফোনে আসলে কথাটা বলতে চাইনি। তা ছাড়া তখন আমি ওই ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিতও ছিলাম না। শুধু এটা মনে হয়েছিল, বইটা আরও কিছুটা সময় আমাদের হাতে

থাকা দরকার। তারপর কাল সারাদিন এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করার পরে বিষয়টা এখন আমার কাছে মোটামুটি পরিষ্কার হয়েছে। এদিকের স্ট্র্যাটেজিটা ঠিক।'

'তা তো ঠিক, কিন্তু বইটা কখন শিলিগুড়ির জয় প্রধানের হাতে পৌঁছবে?'

'আমি চাইছিলাম কি সোমবার ভোরবেলাতেই পৌঁছক।'

'কেন?'

'যতটা যা বুঝেছি, সোমবার সকালেই ওই গাড়িটার ওখানে পৌঁছবার কথা। যদি একদিন আগে পৌঁছে যায়, মলাট খুলে প্রজাপতি না পাওয়ার জন্যে সতর্ক হয়ে যাবে। পরীক্ষা করলেই বুঝতে পারবে, মলাট কেটে চোরের ওপর বাটপাড়ি হয়েছে। যদি ওরা ওটাকে নিছক বাটপাড়ি ভাবে, মন্দের ভাল। কিন্তু যদি আঁচ করে এর পেছনে পুলিশ আছে—সব চালচলন পাল্টে ফেলবে ওরা।'

সায় দিয়ে সন্দীপ দেব বললেন, 'রাইট।'

'কিন্তু বইটা পৌঁছনো দরকার। বইয়ের মধ্যে কোড ল্যাঙ্গুয়েজে মেসেজ আছে। যা বুঝেছি সোমবার সকালেই গাড়ি পৌঁছবে ওখানে, ওই ঠিকানার কাছাকাছি কোনও সার্ভিস স্টেশনে। সোমবার ভোরে যদি বই পায়, মেসেজ পেয়েই ছুটবে। সূক্ষ্মভাবে বইয়ের মলাট কাটার সময় পাবে না।'

আরও একবার তারিফ করার চিহ্ন ফুটেছিল গোয়েন্দাপ্রধানের মুখে। মাথা সামান্য ঝাঁকিয়ে বললেন, 'ঠিক বলেছ। কিন্তু ভোরে যদি জয় প্রধানের বাড়িতে বই পৌঁছতে হয়, আমাদের নিজেদের লোককেই ক্যুরিয়ার সার্ভিসের লোক সাজিয়ে পাঠাতে হবে।'

'আমিও আপনাকে সেই কথাই বলব ভাবছিলাম সন্দীপদা।'

চায়ের কাপে একটা বড় চুমুক দিয়ে সন্দীপদা বললেন, 'কিন্তু কৌশিক, আমি চাইছিলাম কি—এই অপারেশনটায় তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো।'

'থাকব তো ঠিকই করেছিলাম, কিন্তু মুখার্জিবাবুর ব্যাপারটা যে এর সঙ্গে জড়িয়ে গেছে আবার। খুব সম্ভবত আজ রাতে কিংবা কাল ভোরে হাসনাবাদে যেতে হবে আমাকে।'

হাতের কাপটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে সন্দীপ দেব বললেন, 'তুমি কিন্তু তোমার ওই মুখার্জিবাবুর ব্যাপারে বড্ড বেশি ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছ।'

লাজুক মুখে উত্তর দিল কৌশিক, 'হ্যাঁ, একটু বেশিই ঝুঁকি নেওয়া যাচ্ছে। আমি সে কথা মুখার্জিবাবুকে বলেওছিলাম—।'

'শুনে কী বললেন উনি?'

'খুব স্পিরিটেড মানুষ। বললেন, 'না-না, আপনি যে ভাবে চলছেন—সেই ভাবেই চলুন। আমি আপনার সঙ্গে পুরোমাত্রায় কোঅপারেট করব।'

একটু আপত্তি করার গলায় সন্দীপদা বললেন, 'উনি বলতে পারেন, কেননা ঘটনাটার ইনটেনসিটি ওঁর পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। ভদ্রলোক গুড-নেচারড, একটু অ্যাডভেনচারাস ধরনের। তার ওপর তুমি আবার ওর এমপ্লয়ার। সুতরাং তুমি যা করতে বলবে সেটা ওঁর ঠিক মনোমতো না হলেও করে যাবেন।'

আর একবার বিব্রত হল কৌশিক। 'না-না সন্দীপদা, তা নয়। একটা লোক কোনটা খুশি মনে করছে, আর করছে বাধ্য হয়ে—বোঝা তো যায়।'

একটু ধমকে ওঠার গলায় গোয়েন্দাপ্রধান বললেন, 'তোমার অ্যাসিস্ট্যান্ট এত বড় ঝুঁকি যদি হাসিমুখে নেয়, আমি বলব লোকটা বিষয়টার গুরুত্বই বুঝতে পারেনি। ও যে কিডন্যাপ্‌ড হবে, সেটা আন্দাজ করে তুমি আমাকে ফোন করেছিলে হাসনাবাদ থেকে। আমি লোক রেখে দিয়েছিলাম তোমার অফিসের কাছে। লোক পিছু নিয়েছিল বলেই সঙ্গে সঙ্গে জানতে পেরেছিলাম ওকে কোথায় তোলা হয়েছে। তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে জানিয়েও দিয়েছি। কিন্তু ও যে এই ধরনের একটা বিপদের মধ্যে পড়বে—সেটা কি ও কল্পনা করতে পেরেছিল? সুতরাং এখন ওর নিরাপত্তার ব্যাপারে ওর কাছ থেকে মতামত নেওয়া না-নেওয়া অর্থহীন। আমার সাজেশন যদি নাও—আমি বলব, ফ্রি হিম অ্যাট ওয়ান্‌স।'

সন্দীপ দেবের কথা শুনে বেশ কিছুটা সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল কৌশিক। চাপা গলায় বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন, আমি একটু বেশিই ঝুঁকি দিয়ে ফেলছি। আর দিন-দুয়েকের মধ্যেই আমি ওঁকে বার করে আনার চেষ্টা করব। সত্যিই এটা প্রাণের ঝুঁকি।'

দেওয়াল-ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে সন্দীপদা জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি এখন কোথায় যাবে?'

'এখন একবার নিজের ডেরায় ফিরব, তার পর দু-তিনটে দরকারি কাজ সারার জন্যে বেরুব। উঠি তা হলে, আপনারও বেরুবার সময় হয়ে গেছে।'

'ঠিক আছে, তোমার সঙ্গে যে সব কথা হল আমি ঠিক সেই ভাবেই মুভ করব। এর মধ্যে বাড়তি কোনও ইনফর্মেশন পেলে তুমি তো জানাচ্ছই—।'

লাজুক হাসি হেসে সায় দিল গোয়েন্দা, 'হ্যাঁ, তা তো বটেই।'

'ও. কে। খুব সাবধানে থাকবে কিন্তু।'

হাত নেড়ে বাড়ির পথে রওনা দিয়েছিল গোয়েন্দা।

এ দিকের রাস্তাঘাট বেশ ফাঁকাই। যেখানে জ্যামের ভয় সেই জায়গাটাও নির্ঝঞ্ঝাটে পেরিয়ে গেল কৌশিক। তার ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই পৌঁছে গিয়েছিল ওর ফ্ল্যাটে।

ফ্ল্যাটের দরজা আর খুলতে হল না। কাছাকাছি যেতেই দরজা খুলে একগাল হাসি হাসল ওর কাজের ছেলে নিমো। অকৃতদার গোয়েন্দার রান্নাঘরের সব দায়িত্ব আঠারো-উনিশ বছরের এই ছেলেটার ওপর। কয়েক বছর ধরে ও এখানেই আছে। তবে গোয়েন্দা কাজেকর্মে বা লম্বা ছুটি কাটাতে বাইরে গেলে নিমোরও ছুটি হয়ে যায়। দেশের বাড়ি থেকে ঘুরে আসে তখন কয়েকদিন। সঙ্গে ডুপ্লিকেট চাবি থাকে, সুতরাং ফ্ল্যাটে ঢুকতে কোনও অসুবিধে নেই। নিমো হাসতে হাসতেই বলল, 'আমি এসে গিয়েছি দাদা।'

কৌশিকও হাসল। 'খুব ভাল করেছিস। কিন্তু আমি এখনও পুরোপুরি ফিরে আসিনি।'

'তাই! কবে যেতে হবে আবার?'

'আজকালের মধ্যেই।'

'ফিরবে কবে?'

'মনে হয় দু-তিন দিনের মধ্যে ফিরে আসতে পারব।'

কথা বলতে বলতে ঘরে ঢুকে পড়েছিল গোয়েন্দা। রহস্যকাহিনীর দারুণ ভক্ত নিমো। গল্প-উপন্যাসের রহস্য নয়, সত্যিকারের রহস্যের দিকেই ওর নজর। এই ব্যাপারে ওর হিরো হচ্ছে দাদা। রহস্যের কিনারা হওয়ার পরে চোখ বড়-বড় করে নিমো গল্প শোনে

রহস্যভেদীর কাছ থেকে। একটু দোনামনা করার পরে ও জিজ্ঞেস করল, 'তোমার এই কেসটা কদ্দুর এগলো দাদা?'

দাদা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে খসখসে গলায় বলল, 'বিশ হাত জলের তলায়।'

নিমো খুব ভাল ভবেই জানে, দাদার মুখে এই ধরনের কথা শোনা গেলে আর কোনও প্রশ্ন না করে কেটে পড়াই ভাল। রান্নাঘরের দিকে এগোবার আগে দরজা বন্ধ করতে গিয়েছিল, কিন্তু আর একজন অতিথিকে দেখে দরজার পুরোটা খুলে দিয়েছিল। বিশাল আকারের দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইন্সপেক্টর অবনী ঘোষরায় গাঁক-গাঁক করা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কী রে তোর দাদা বাড়ি আছে?'

'আছেন। আসুন।'

ইন্সপেক্টরের গলা শুনে ভেতরের ঘর থেকে উঠে এসে কৌশিক বলল, 'আসুন-আসুন অবনীদা।'

হঠাৎই প্রকাণ্ড চেহারার মানুষটি কেমন যেন ছেলেমানুষের মতো হয়ে উঠে বললেন, 'আমার ধারণা ছিল তুমি আবার সেই সুন্দরবন প্রমোদ-ভ্রমণে ফিরে গিয়েছ। কিন্তু কাল রাতেই খবর পেলাম তোমাকে এখানে দেখা যাচ্ছে নিয়মিত ভাবে। কিছু মনে কোরো না কৌশিক, তুমি আমার ছোট ভাইয়ের মতো, বন্ধুর মতো। আজও বাড়িতে ভাল কিছু রান্না করলে তোমার বৌদি আমাকে বলে—কৌশিককে একবার খবর দাও। তোমার সঙ্গে আমাদের অন্য সম্পর্ক। তুমি এখন কলকাতায়, কিন্তু আমার কাছে আসা তো দূরের কথা—একবার ফোন করে খবর পর্যন্ত নিলে না! তুমি তো জানো—আমি কী বিচ্ছিরি একটা বিপদের মধ্যে আছি। নাকি আমার ব্যাপারটা ভুলে মেরে দিয়েছ? তোমার পক্ষে অবশ্য ভুলে যাওয়ারই কথা। ওই ঘটনা ঘটার পরে দেখতে দেখতে বেশ কয়েকটা দিন কেটেও গেল।'

কৌশিক গোড়া থেকে কাঁচুমাচু মুখ করে হাতজোড় করে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু তাতে অভিমানী মানুষটির কথা থামেনি। উনি সেখানেই থামলেন যেখানে থামতে চেয়েছিলেন।

থামবার পরে কৌশিক বলল, 'অবনীদা, আপনি বসুন তো আগে। তার পর নিমোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'অবনীদার জন্যে একটা ডবল ডিমের ওমলেট বানিয়ে নিয়ে আয় তো চট করে। অবনীদা যেমন ভালবাসেন ঠিক তেমনিই বানাবি। নরম, পেঁয়াজ বেশি, নুন-লঙ্কা কম, আর সঙ্গে যেন একটু টম্যাটো-কুচি থাকে। তার পর ফাসক্লাস করে কফি। অবনীদা কেমন কফি পছন্দ করেন জানিস তো?'

তড়বড় করে উত্তর দিল নিমো। 'জানি। নো কফি নো সুগার।'

'কী বললি?'

চটপট নিজেকে সংশোধন করে নিল নিমো। 'কালো কফি, চিনি-দুধ ছাড়া।' বলেই ও রান্নাঘরের দিকে ছুট লাগিয়েছিল।

কৌশিক আর একবার বলতেই সোফার ওপর ধপ করে বসে পড়ে মাথার টুপি সেন্টার-টেবিলের ওপর খুলে রাখলেন ইন্সপেক্টর ঘোষরায়। তারপর পকেট থেকে বড় রুমাল বার করে মুখ-চোখ-কপালের ঘাম মুছে বললেন, 'চাকরিজীবনের শেষের দিকে ছুটোছুটি করে কাজ করতে কার ভাল লাগে বলো? এ আবার শুধু ছুটোছুটি করা নয়,

নাস্তানাবুদ হওয়া। চাকরিজীবনের শেষ মানে হালকা কাজ, ধীরেসুস্থে রয়েবসে অবসরজীবনের পরিকল্পনা নেওয়া—তাই না?'

কৌশিক মৃদু হেসে বলল, 'আপনি এমন ভাবে বলছেন যেন চার-ছ মাসের মধ্যেই রিটায়ার করে যাচ্ছেন। আপনার অবসর নিতে এখনও কয়েক বছর বাকি।'

দুদিকে মাথা নাড়তে নাড়তে ইন্সপেক্টর বললেন, 'আমাদের যদি ভলান্টারি রিটায়ারমেন্ট স্কিম গোছের কিছু থাকত, আমি এক্ষুনি অপ্‌ট্ করতাম। বিচ্ছিরি, বেয়াড়া এই কেসটার চাপ, তুমি বলেই বলছি, আর সহ্য করা যাচ্ছে না। বড় সাহেব, মেজ সাহেব, ছোট সাহেবরা তো ধমক দিয়েই খালাশ। আমরা কী করি বলো তো? তুমি তো জানো—আমি কী রকম ডিউটিফুল। কোনও কাজ পরে করব বলে ফেলে রাখি না। এই তো এই কেসটাতেই খবর পাওয়ামাত্তর ছুটেছি। তার ফলও পেয়েছিলাম। পোড়োবাড়ি থেকে সেই রাত্তিরে ভোলা আর পচন নামের ক্রিমিনাল দুটো বার হচ্ছিল, সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে ধরেছি। আমি কিন্তু তোমাকে এখনও বলছি কৌশিক, দুটো সাহেব আর একটা মেমের খুনি ওই ভোলা আর পচন। আমার কপাল দেখো, স্রেফ প্রমাণ এখনও জোগাড় করতে পারিনি বলে খুনি দুটো বুক ফুলিয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

'আপনার কি মনে হয় ওরাই খুনি?'

'আলবাত। তবে মুশকিল কী জানো—খুন হওয়ার পরে দেখতে দেখতে অনেকগুলো দিন গড়িয়ে গেল। প্রমাণট্রমান নষ্ট করার সব সুযোগই পেয়ে গেছে খুনিরা। আসলে কপাল, কপালই সব। তোমার কপাল যদি খারাপ হয়, হাজার খাটাখাটনি করেও তুমি কাজ উদ্ধার করতে পারবে না। আর কপাল ভাল হলে তুমি খুন করলেও বেকসুর খালাশ হয়ে যাবে।'

'খুন-হওয়া একটা মেম আর একটা সাহেব তো আইডেন্টিফায়েড হয়ে গেছে। না?'

'হ্যাঁ, সে তো অনেক আগেই হয়ে গেছে। গাঁজা-ভাঙ খাওয়া দুই আমেরিকান। বেনারস থেকে মরতে এসেছিল এখানে। পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট বলছে, সাহেব-মেম দুটোই ছিল প্রচণ্ড নেশাখোর। নেশাখোররা নানারকম খপ্পরে পড়ে মরে, কিন্তু দ্বিতীয় সাহেবটা! গায়ে এককুচি সুতো পর্যন্ত ছিল না। মাথাটা পাথর দিয়ে এমন ভাবে থেঁতলে দিয়েছে যে, চেনা শক্ত। পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট বলছে, ওই সাহেবটা একেবারেই নেশাভাঙ করত না। মৃত্যুর কারণ শ্বাসরোধ। মৃত্যুর সময় হল ওই সাহেব-মেম খুন হওয়ার বারো ঘণ্টা আগে। এই সাহেবের আইডেন্টিফিকেশন করতে না পারাটাও দিশি সাহেবদের রাগের কারণ। একটা কথা বলছি, অন্য ভাবে নিও না। আমাদের দেশ যখন পরাধীন ছিল, তখনও এই সাদা চামড়াগুলো জ্বালিয়েছে, এখনও জ্বালাচ্ছে।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে কৌশিক বলল, 'ওই সাহেব কে—তা এখনও শনাক্ত করা যায়নি। তার মানে এই নয় যে, কখনোই আর করা যাবে না।'

কথা শুনে প্রায় ধমকে উঠে ইন্সপেক্টর বললেন, 'তোমার কি মাথা খারাপ! শনাক্ত আর কী ভাবে হবে? বডি কবে চলে গেছে কবরে—এখন তো হাড়গোড় ছাড়া আর কিছুই নেই। ছবি দেখে যে চিনবে, তার উপায়ও নেই। খুনি মুখ-মাথা বিচ্ছিরি ভাবে থেঁতলে দিয়েছি। গা থেকে জামাকাপড় সব খুলে নিয়েছে। এ সব করার পেছনে একটাই উদ্দেশ্য—

কেউ যাতে লোকটাকে চিনতে না পারে। এমনও হতে পারে, লোকটা হয়তো নির্দোষ একটা বিদেশি ট্যুরিস্ট। খুনিরা অন্যদিকে পুলিশের মনোযোগ ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যে এই কাণ্ডটা করে রেখেছে।'

'কেন? পুলিশের মনোযোগ অন্যদিকে ঘোরাবার কারণটা কী?'

চওড়া কাঁধ ঝাঁকিয়ে দুদিকে দু-হাত ছড়িয়ে ইন্সপেক্টর বললেন, 'আরে! সেটাই যদি জানতাম, বাকিটাও তো ধরে ফেলতে পারতাম!'

নিমো ওমলেট নিয়ে এসে ইন্সপেক্টরের সামনে টেবিল রাখল। ওমলেট থেকে পাতলা ধোঁয়া উঠছিল। কৌশিক বলল, 'নিন, খেতে খেতে গল্প করুন অবনীদা।'

ইন্সপেক্টর মস্ত হাতের তালুতে প্লেটটা তুলে নিয়ে আফসোসের গলায় বললেন, 'আর খাওয়া! আমার খাওয়াও গেছে, গল্পও গেছে। কৌশিক এই কেসটা তুমি আমাকে উত্‌রে দাও। ব্যস, তারপর তোমাকে আর বিরক্ত করব না অনেকদিন—।'

বিব্রত মুখে হেসে জবাব দিল গোয়েন্দা, 'কী যে বলেন আপনি অবনীদা! আমি সব দিক থেকে খুবই সামান্য একজন!'

ওমলেটের বড় একটা টুকরো মুখের মধ্যে চালান করে দিয়ে জড়ানো গলায় আপত্তি তুললেন ওর অবনীদা—'কী যা-তা কথা বলছ!'

ইন্সপেক্টর যাতে নিশ্চিন্তে ওমলেটটা শেষ করতে পারেন সেই জন্যে আর তর্কাতর্কির মধ্যে গেল না কৌশিক। ওমলেট শেষ করার পরে তৃপ্তির শব্দ করে ঘোষরায় বললেন, 'বাহ্! ডিমটা খুব ভালই ভেজেছ!'

তারিফ পেয়ে খুশি হয়ে নিমো বলল, 'আর একটা ভেজে দেব স্যার?'

একটু দোনামনা করে ইন্সপেক্টর বললেন, 'না, আর না। আজ সকালেই একটা ডিম ভাজা খেয়েছি বাড়িতে। এখন আমি খাওয়া-দাওয়া কন্ট্রোল করছি।'

দু-কাপ কফি নিয়ে এসেছিল নিমো। একটা ওর দাদার আর একটা ইন্সপেক্টরের। কফিতে একটা চুমুক দিয়ে কৌশিক বলল, 'হাড়গোড়ভর্তি ওই ট্রাঙ্কটা ঠিক ভাবে রেখে দিয়েছেন তো?'

সামান্য বিরক্ত হয়ে ইন্সপেক্টর বললেন, 'ফেলার জায়গা পাইনি বলেই রেখে দিয়েছি।'

'না-না, ফেলবেন না।'

'কেন, তুমি কি ওগুলো দিয়ে সার-কারখানা খুলতে চাও?'

হেসে উঠে কৌশিক বলল, 'মন্দ কি, একটা বাঁধা রোজগারের রাস্তা তো থাকা দরকার।'

ইন্সপেক্টর উত্তর দেওয়ার মুখে টেলিফোন বেজে উঠল। কর্ডলেস টেলিফোনটা তুলে নিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে গিয়েছিল গোয়েন্দা, তারপর ফিরে এসে গম্ভীর মুখে বলল, 'দু-চার দিনের জন্যে আমাকে কলকাতা ছাড়তে হচ্ছে। আজ, একটু বাদেই, বেরিয়ে পড়ব।'

ইন্সপেক্টর ঘোষরায় আর নিমো—দুজনেই গোয়েন্দার স্বভাবের সঙ্গে খুব ভাল ভাবে পরিচিত। দুজনেই বুঝতে পেরেছিল—এখন আর কোনও প্রশ্ন করে উত্তর পাওয়া যাবে না মানুষটার কাছ থেকে।

সেই রাতে ট্যাংরা থেকে বেরিয়ে একটা স্টেশন ওয়াগন ছুটেছিল হাসনাবাদের পথে। একটু পেছনে ছিল একটা টাটা সুমো।

॥ ৪০ ॥

হাসনাবাদের আকাশে এখন ভোরের প্রথম আলো। মৃদু শীতের হাওয়া বইছে। ঘুমিয়ে আছে গঞ্জ-এলাকা, শুধু ফেরিঘাটের কাছে একটু কর্মচঞ্চলতা। ব্যাপারি, কারবারি আর ঝাঁকা মুটেদের ভিড় বাড়ছে একটু-একটু করে। ভিড়টা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বেড়ে যাবে অনেকখানি।

ফেরিঘাটের লাগোয়া দু-তিনটে চায়ের দোকান খুলে গেছে রাত থাকতে থাকতেই। মাটি লেপা মস্ত উনুনে চায়ের জল ফুটছে টগবগ করে। মাথায় মাফলার আর চাদর জড়ানো কারবারি লোকজন কাচের গ্লাসে চা খাচ্ছে। গ্লাসের সশব্দ চুমুকই বলে দিচ্ছিল—চা খাওয়া আর শীত তাড়ানোর কাজ একই সঙ্গে চলছে। চায়ের দোকানগুলোর পাশ দিয়ে লম্বা পায়ে হেঁটে গেল কৌশিক। এখান থেকে মিনিট-তিনেক হাঁটলেই সি. আই সাহেবের অফিস।

সাহেবের অফিস একতলায়, কোয়ার্টাস দোতলায়। একতলার অফিসঘর থেকে শ্রীকৃষ্ণদার গুরুগম্ভীর গলার স্বর ভেসে আসছিল। দিনের আলো ভাল ভাবে না ফুটতেই উনি অফিসে, তার মানে নির্ঘাত বড় কিছু ঘটনা ঘটেছে!

পায়ে পায়ে এগিয়ে অফিস ঘরের পর্দা সরিয়ে কৌশিক উঁকি মারতেই চোখাচোখি হয়ে গেল শ্রীকৃষ্ণদার সঙ্গে। উনি একই সঙ্গে খুশি আর বিস্ময় মেশানো গলায় বললেন, 'আরে তুমি! কবে ফিরলে কলকাতা থেকে? আমি তো এক্ষুনি তোমাকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম—।'

অবাক হয়ে কৌশিক জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

'বোসো, বলছি।'

শ্রীকৃষ্ণদার সামনে একজন পুলিশ অফিসার আর দুজন কনস্টেবল দাঁড়িয়েছিলেন। অফিসার বললেন, 'দিনের আলো ফুটতে শুরু করেছে, আমরা কি এখন গিয়ে স্পটটা আর একবার দেখে আসব স্যার?'

ঘরে বিদ্যুতের আলো। জানলা দিয়ে বাইরের আবছা আলো দেখে নিয়ে সি. আই সাহেব অফিসারের কথায় সায় দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, এবার যেতে পারো। খুব ভাল করে নজর করবে চারদিক।'

'ঠিক আছে স্যার।'

অফিসার আর কনস্টেবল-দুজন বেরিয়ে যেতেই শ্রীকৃষ্ণদা বললেন, 'বোসো কৌশিক।'

বসতে বসতে ও জিজ্ঞেস করল, 'আপনি এত সকালে শ্রীকৃষ্ণদা।'

'সকালে নয়, শেষ রাত থেকে ছুটোছুটি করছি। ডাকাত পড়েছিল।'

'ডাকাত! কোথায়?'

মৃদু হেসে শ্রীকৃষ্ণদা বললেন, 'এখানে ডাকাত পড়াটা কোনও ঘটনা নয়। ডাকাত পড়ে, জলেস্থলে—সব জায়গাতেই পড়ে। চাষ করা, মাছ ধরা যেমন পেশা—তেমনি এদিকে ডাকাতি করাটাও অনেকের পেশা। ডাকাতির খবর পেলে আমরা ছুটি। তবে এবার ডাকাতির চেষ্টা হয়েছিল বিদেশিদের নৌকোয়—।'

'বিদেশিদের নৌকোয়! কারা তারা?'

'যাদের কথা ভাবছ তুমি, তারাই। জোসি আর ডেভিসের লঞ্চটাকে টার্গেট করেছিল

ডাকাতরা। বিদেশিরা ছিল, কোনও একটা অঘটন ঘটলে তোলপাড় পড়ে যেত সারা রাজ্যে। আমাদের কপাল ভাল যে, তেমন কিছু ঘটেনি। একটা ডাকাত আবার ধরা পড়েছে।'

বেশ একটু উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল কৌশিককে।

'নৌকোর কারও কোনও আঘাতটাঘাত লাগেনি তো?'

'না-না, ওরা লঞ্চে ওঠার আগেই অ্যাকশন শুরু করেছিল অতনু।'

'অতনু মানে সেই বনরক্ষী?'

'হ্যাঁ।'

লঞ্চের সবাই অক্ষত এবং নিরাপদে আছে জেনে আশ্বস্ত হল গোয়েন্দা। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'ঠিক কী হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণদা?'

চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছিল সি. আই সাহেব ওঁর ভোররাতের উদ্বেগ ও ব্যস্ততার পর্বটা বেশ ভাল ভাবেই সামলে নিয়েছেন। চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, 'অল ক্রেডিট গোজ টু অতনু। ওর সাহেব পরশু দিনই আমাকে বলেছিল, অতনু হালে বেশ রেস্টলেস হয়ে পড়েছে। জিজ্ঞেস করেছিলাম, রেস্টলেস কেন? জবাবে শুনলাম, কাজকর্ম নেই বলেই অস্থির।'

কপালে দু-তিনটে ভাঁজ পড়েছিল গোয়েন্দার। 'কেন, অতনুদের তো কাজ ছিল, খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ডেভিসদের ওপর নজরদারি করা—।'

একটু হেসে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণদা বললেন, 'অতনু কাজে বিশ্বাসী একজন দক্ষ ফরেস্ট গার্ড। ও দলের নেতা, দলে আরও তিন-চার জন ইয়াং আর্মড ফরেস্ট গার্ড ছিল। পোচারদের চেজ করার একটাই অর্থ জানে অতনু। তাড়া করে ধরার চেষ্টা করো। চোরাশিকারিরা বাধা দিলে গুলি চালাও। কিন্তু সেই সহজ নিয়মটা তো এখানে খাটানো যাচ্ছিল না। না খাটাবার পেছনে তোমার একটা বড় ভূমিকা আছে। বড় সাহেবদের কাছে তুমি যে ব্রিফিংটা দিয়েছ সেটা তাঁদের কাছে বেশ কনভিনসিং ঠেকেছে। সুতরাং তাঁরা অতনুকে বলেছেন—তেমন কিছু না দেখা পর্যন্ত স্রেফ নজরদারির কাজ চালিয়ে যাবে। তাই চালাচ্ছিল অতনু। তুমি কলকাতায় চলে যাওয়ার পরে সাহেব-মেম শেষ রাতের দিকে জঙ্গলের কোর-এরিয়ায় আরও বার তিনেক রহস্যময় সফরে গিয়েছিল। কাল অবশ্য ওরা আর বার হয়নি। আর, ডাকাত পড়েছিল আজ ভোরেই।'

'ডাকাতরা কি নৌকোয় চেপে এসেছিল?'

'হ্যাঁ, নৌকোতেই। তিনটে নৌকো লঞ্চটাকে ঘিরে ফেলেছিল তিন দিক থেকে। অতনুরা তখন রাতের ডিউটি শেষে ফিরে যাওয়ার মুখে। একটু দূরে ওদের বোট রেখে দূরবিন দিয়ে নজর রাখছিল লঞ্চের ওপর। সন্দেহজনক নৌকো-তিনটে লঞ্চ ঘিরতেই সতর্ক হয়ে যায় ওরা। ভোরের দিকে বেশ কুয়াশা পড়তে শুরু করেছিল। অতনু ওদের বোটটাকে তাই কিছুটা এগিয়ে নিয়ে আসে। তখনই লঞ্চে ওঠার চেষ্টা করছিল ডাকাতরা। অতনুরা ওদের মতলব বুঝতে পেরে বোট নিয়ে তাড়া করছিল। ফরেস্ট গার্ডদের পেট্রল বোট দেখে ডাকাতরা পালাতে শুরু করে। পালাবার সময় গুলি ছোড়ে। অতনুরাও গুলি চালায়। তখন কুয়াশা এত বেড়ে গিয়েছিল যে, দূরে নজর চালানো মুশকিল। দুটো নৌকো কুয়াশার আড়াল নিয়ে পালায়। কিন্তু একটা নৌকোর পিছু নিতে পেরেছিল ওরা। তীরে নৌকো ভিড়িয়ে পালাবার তাল করছিল ডাকাতরা। একটাকে অতনুরা ধরে ফেলে।'

বাহবা দেওয়ার গলায় কৌশিক বলল, 'বাহ্! অতনু সত্যিই কাজের লোক। তা, ওরা কি কিছু পেয়েছে ডাকাতটার কাছ থেকে?'

'কোত্থেকে পাবে! ডাকাতি করতে যাওয়ার মুখেই তো ধরা পড়েছে। তবে একেবারে যে কিছু পায়নি, তা নয়। ডাকাতটার কাছ থেকে কিছু মুদ্রা পাওয়া গেছে—রুপোর আর তামার। কয়েকশো বছরের পুরনো মুদ্রা।'

'কোত্থেকে পেয়েছে ওগুলো?'

'যা বলেছে তা বিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই।'

'কিন্তু বলেছেটা কী?'

'সুন্দরবনের কোর-এরিয়ার একটা পোড়ো মন্দির থেকে পেয়েছে।'

'ওখানে গিয়েছিল কেন?'

'ওই প্রশ্নের উত্তরে আর এক মিথ্যে। ডাকাতি করা ও ছেড়ে দিয়েছে। ভুল করে হঠাৎ একটা করতে যাচ্ছিল অনেকদিন পর। ও এখন কাঠুরের কাজ করে। গভীর জঙ্গলে কাঠ কাটতে যায়। তা, জঙ্গলের মধ্যে একটা পোড়ো মন্দির ছিল। ওখানে গিয়ে ভাঙাচোরা ইট সরাতেই একটা পাত্রের মধ্যেই ওই পুরনো মুদ্রাগুলো পেয়ে যায়। তাই শুনে ইনভেস্টিগেটিং অফিসার জিজ্ঞেস করেছিল—পোড়ো মন্দির তো সাপের বাসা। বাঘরাও ওই সব জায়গাগুলো খুব পছন্দ করে। তুমি হঠাৎ ওখানে গিয়ে ভাঙাচোরা ইট সরাচ্ছিলে কেন?'

'কী বলেছিল তার উত্তরে?'

'কী আবার বলবে? এরা দশটা কথা বললে তার মধ্যে মিথ্যে থাকে এগারোটা। প্রশ্নের উত্তরে এক্কেবারে চুপ। ওই প্রাচীন মুদ্রাটুদ্রা যা পাওয়া গেছে ওর কোমরের গেঁজ থেকে, তা হয়তো প্রথম রাতের ডাকাতির মালের একটা অংশ। তবে এই ব্যাপারে আমি আই. ও-কে একটা ইন্সট্রাকশন অলরেডি দিয়ে দিয়েছি।'

'কী বলেছেন?'

'আর একটু পরেই তদন্তের জন্যে অফিসার যাবে তোমার জোসি আর ডেভিসের লঞ্চে। তা, আমি বলেছি গোটা কয়েক মুদ্রা সঙ্গে নিয়ে যেও। ডেভিস ওরিয়েন্টাল স্টাডিজের একজন এক্সপোর্ট, কয়েনগুলো রেয়ার কি না বলতে পারবেন। উনি পজিটিভ কোনও রিপোর্ট দিলে মিউজিয়াম অথরিটির সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করব।'

কথাটায় লম্বা করে সায় দিয়ে কৌশিক বলল, 'ভাল সাজেশন দিয়েছেন আই. ও-কে।'

'তুমিও তো যেতে পারো ওর সঙ্গে।'

দুদিকে মাথা নাড়তে নাড়তে কৌশিক বলল, 'না-না শ্রীকৃষ্ণদা, আমি এখন এখানে নেই।'

'নেই মানে?'

'আমি এখন লঞ্চে ফিরছি না। আরও দু-একটা দিন ফিরব না।'

'কেন?'

'আমি যে আমার শ্রীকৃষ্ণদাকে বড় অর্থোপেডিক সার্জেন দেখাবার কাজে এসেছি, সেই কাজটা শেষ হয়নি এখনও। শ্রীকৃষ্ণদার পা ভাঙার ঘটনা থেকে নানা ধরনের জটিল উপসর্গ দেখা দিয়েছে। তার ফলে আরও কয়েকজন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করার দায়িত্ব নিয়েছি। এই অবস্থায় একা মানুষ অসুস্থ অধ্যাপককে ছেড়ে যাওয়া উচিত নয়। সুতরাং

কৌশিকের লঞ্চে ফিরতে আরও দু-একটা দিন দেরি হবে। এই খবরটা সাদা পোশাকের কাউকে দিয়ে লঞ্চে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন আজ সকালেই। না হলে পূর্ণদার দুর্ভাবনা খুব বেড়ে যাবে।'

গম্ভীর মুখে সি. আই বললেন, 'তা না হয় করা যাবে, কিন্তু তোমার ব্যাপারটা তো আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তুমি যদি আবার কলকাতাতেই ফিরে যাবে, তা হলে এই সাতসকালে এখানে এলে কেন?'

'আমি তো এখন আসিনি, রাত্তিরে এসেছি। আর এখন লঞ্চে না ফেরার অর্থ কিন্তু কলকাতায় ফেরা নয়। আমি দু-একটা দিন এই হাসনাবাদেই থাকব।'

'কোথায়?'

'এদিক-সেদিক। সব আপনাকে পরে বলব। এখন দু-একটা ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাই শ্রীকৃষ্ণদা।'

'কী সাহায্য?'

'এই নদীতে আজ কিংবা কাল একটা সিক্রেট মিশনে যাব। সঙ্গী হিসেবে অতনু ও আর একজন ফরেস্ট-গার্ডকে চাই। আপনি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের আপ্রোপিয়েট অথরিটিকে বলে অনুমতিটা বার করে দিন। এটা কিন্তু আমার ব্যক্তিগত কাজ নয়, ফরেস্ট গার্ডদেরই কাজ।'

'ঠিক কী ধরনের কাজ, সেটা ভাঙার ব্যাপারে গোয়েন্দার এখন নিশ্চয়ই অসুবিধে আছে?'

একটু বিব্রত মুখে হাসল কৌশিক, 'না-না, আপনার কাছে আবার অসুবিধে কী! আসলে পুরো ছবিটা আমার কাছে এখনও ঠিক পরিষ্কার হয়ে ওঠেনি—।'

হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিয়ে স্নিগ্ধ হাসি হেসে শ্রীকৃষ্ণদা বললেন, 'থাক-থাক, তোমাকে আর অত ব্যাখ্যা করতে হবে না। প্রত্যেকেরই কাজের নিজস্ব একটা ধরন থাকে, আগে থেকে তার পুরোটা বলে দেওয়া ঠিক নয়। অতনু এবং আর একজন ফরেস্ট-গার্ডকে পাওয়ার আবেদন মনে হয় মঞ্জুর হয়ে যাবে। তুমি বেলা দশটার পরে রেঞ্জার সাহেবের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে নিও একবার। ওঁর টেলিফোন নাম্বারটা জানো তো?'

'জানি।'

'আর কী হেল্প চাই বলো?'

'ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের পরে পুলিশ ডিপার্টমেন্টের সাহায্যের দরকার হতে পারে। আপনি তো কাছেই আছেন, পরে জানাব।'

'ও. কে স্যার।'

জানলার বাইরে সকালের আলো বেশ স্পষ্ট হয়ে গেছে। ওই আলোর দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকার পরে শ্রীকৃষ্ণদা জিজ্ঞেস করলেন, 'গন্ধ পাচ্ছ?'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল কৌশিক, 'কিসের গন্ধ?'

'দুদিকে মাথা নাড়তে নাড়তে শ্রীকৃষ্ণদা বললেন, 'না, তোমার নাক তৈরি হয়নি এখনও। আমার নাক হচ্ছে পুলিশের নাক, ঠিক গন্ধ পেয়েছি।'

কৌশিকের অবাক ভাব আর একটু বাড়ল। 'কিসের গন্ধ শ্রীকৃষ্ণদা?'

'বলে দেওয়ার পরেও পাচ্ছ না। জিলিপি—আমাদের এখানকার সেই বিখ্যাত জিলিপির গন্ধ। ভাজা হচ্ছে এখন।'

বেল বাজালেন শ্রীকৃষ্ণদা। একজন উঁকি মারতেই বললেন, 'তুমি আমাদের জন্যে গরম জিলিপি নিয়ে এসো তো। তারপরে খুব গরম দুটো চা, একটায় চিনি খুব কম।'

লোকটি চলে যেতেই শ্রীকৃষ্ণদা মৃদু হেসে বললেন, 'আমি মিষ্টি খেতে খুব ভালবাসি। কিন্তু বয়েস হচ্ছে তো এখন, বেশি মিষ্টি খাওয়াটা ঠিক নয়। এদিকের মিষ্টি খাওয়াটা যেমন চলছে, চলতে দিচ্ছি ; কিন্তু চায়ে চিনি খাওয়া বেশ কমিয়ে দিয়েছি। একদিকে অন্তত চিনি খাওয়া কমাই। কী, ঠিক করিনি?'

হেসে উঠে জবাব দিল কৌশিক, 'ঠিক করেছেন, চমৎকার সমাধান।'

সি. আই সাহেবকে বেশ একটু নিশ্চিন্ত দেখাচ্ছিল। বললেন, 'অতনুর জন্যে বড় একটা ঝামেলার হাত থেকে বেঁচে গিয়েছি আমরা। অতনু যদি ঠিক সময় ওদের দেখতে না পেত, ওরা ঠিক চড়াও হত লঞ্চে। একবার চড়াও হলে কে বাঁচত আর কে বাঁচত না—বলা শক্ত। এদিককার বেশির ভাগ ডাকাতই নৃশংস প্রকৃতির। মানুষ খুন করা এদের কাছে জল-ভাত। পিস্তল আছে, বন্দুক আছে, পাইপগান আছে,—লাশ ফেলে দেওয়াটা কিছুই নয়। অনেক সময় এটা ওদের স্ট্র্যাটেজি। প্রথমেই দু-একটা মানুষকে খুন করে ফেলতে পারলে কেউ আর বাধা দেওয়ার সাহস পাবে না। অথচ ধরা পড়ার পরে ডাকাতগুলোর চেহারা দেখলে ওদের কীর্তিকাহিনীর কথা সাধারণ লোকের পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত। অতনু যে ডাকাতটাকে ধরেছে তাকে একবার দেখো তুমি।'

'কী নাম?'

'রফিক। পুরনো পাপী। পুলিশ-রেকর্ড সাঙ্ঘাতিক। দেখলে শিউরে উঠবে তুমি। কিন্তু ওর চেহারা দেখে ওই সব কাণ্ডকারখানা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করবে না তোমার। হাইট বড় জোর পাঁচ ফুট। রোগা-পাতলা গড়ন। চোখমুখের মধ্যে ভয়ংকর কোনও ছাপ নেই। কিন্তু হাতে পিস্তল বা পাইপগান থাকলে এই লোকটাই দানব হয়ে ওঠে। শরীরে মায়া-দয়ার কোনও চিহ্ন থাকে না তখন। কিছু কাল আগের একটা ঘটনার কথা বলছি তোমাকে। সুন্দরবনে মধু আনতে গিয়ে একটা লোক বাঘের মুখে পড়েছিল। লোকটার সঙ্গীসাথিরা লাঠি-কুড়ুল নিয়ে তাড়া করলে লোকটাকে ফেলে দিয়ে বাঘ পালায়। কিন্তু লোকটা ভয়ংকর ভাবে জখম হয়েছিল। বন থেকে ধরাধরি করে নৌকোয় তুলে নদীর এপারে নিয়ে আসা হয়। এদিকে একটি হেল্‌থ সেন্টার আছে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্যে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের গাড়িতে তোলা হয় লোকটাকে। স্যালাইন ড্রিপ চলতে থাকে। কিন্তু গাড়ি একটুখানি এগোবার পরেই পথ আটকে চড়াও হয় ডাকাতরা। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দুই কর্মী হাতজোড় করে বলল—মরণাপন্ন রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি। দয়া করে পথ ছাড়ুন। আর দয়া! টাকাপয়সা না পাওয়ার রাগে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের লোকদের প্রচণ্ড মারধোর করে ডাকাতরা স্যালাইনের বোতল ছুড়ে ফেলে দেয়ে মাঠের মধ্যে। জখম-হওয়া লোকটা ঘণ্টাদুয়েক বাদে ওখানেই মারা যায়। নৃশংস ওই ডাকাত দলের সর্দার কে ছিল জানো? এই রফিক।'

শুনে প্রায় আঁতকে উঠেছিল কৌশিক। 'অ্যাঁ! বলছেন কী? এই লোকটা দলবলসমেত লঞ্চে উঠলে তো ভয়ংকর একটা কাণ্ড ঘটে যেত!'

সায় দিয়ে শ্রীকৃষ্ণদা বললেন, "তুমি যা ভাবছ, তার চেয়েও বেশি হতে পারত। সুন্দরবনে তো বহুকাল ধরে একটা প্রবাদ আছে—'জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ।' ওটাকে এখন স্বচ্ছন্দে পাল্টে দিয়ে বলা যায়—জলে দস্যু, ডাঙায় বাঘ।' জলে কুমির এখন আর তেমন নেই। যা

ছিল তার বেশির ভাগই চোরাশিকারিরা মেরেধরে সাবাড় করেছে। বাঘ মারার চাইতে কুমির মারা অনেক সহজ। কথায় বলে না—বোকা কুমির! ওদিকে যা ভয়ংকর ভাবে বেড়ে গেছে—তা হল ডাকাতদের সংখ্যা। জলেজঙ্গলে শুধু ডাকাত আর ডাকাত।”

শ্রীকৃষ্ণদার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কৌশিক বলল, ‘কাগজে নিয়মিত ভাবে সুন্দরবনের ডাকাতির খবর বার হয়। ক্যানিং ডকঘাট, ভাঙনখালি, ডাবু, কৈখালি এখন নাকি জলদস্যুদের অভয়ারণ্য। কত নাম—কুমিরমারি, গোসাবা, আমলামেথি, সাতজেলিয়া, আমতলি, বড়মোল্লাখালি, ছোটমোল্লাখালি, গোলাবাড়ি ইত্যাদি এলাকায় জলদস্যুদের হাতে পড়ে নাকি সর্বস্ব খোয়ার যাত্রীরা। অসংখ্য নদীনালা, নির্জন সব দ্বীপ—ডাকাতি করার এমন সুযোগ নাকি আর কোথাও নেই।’

একটু বুঝি চটে উঠে শ্রীকৃষ্ণদা বললেন, “পুলিশ-পেট্রল আরও বাড়লেই ডাকাতদের সুযোগসুবিধে কমবে। আজ থেকে শ-পাঁচেক বছর আগে গোটা এলাকাটাই মগ দস্যুদের ভয়ে কাঁপত। তার থেকেই তো ‘মগের মুলুক’ কথাটার সৃষ্টি। মনের সুখে যত খুশি ডাকাতি করো। ধরার বা বলার কেউ নেই। সেই মগের মুলুকের ধারণাটা দূর হয়েছে বহুকাল। নাকি তোমার ধারণা—সেই মুলুক ফিরে আসছে আবার?”

মৃদু হেসে কৌশিক বলল, ‘এর সঠিক উত্তর দিতে পারবে শুধু স্থানীয় লোকরা। তবে সুন্দরবন এলাকায় ডাকাতি আর চোরাশিকারের সংখ্যাটা কমলে আমাদের মতো মানুষজন যে খুব বেশি হবে—সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই।’

‘খুশি আমরাও হব।’

ছোট্ট এক চ্যাঙারি গরম জিলিপি এসে গিয়েছিল। সাইজ বেশ বড়, রসে টইটুম্বুর আর কড়া করে ভাজা।

ফুল হাতা একটুখানি গুটিয়ে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণদা একটা জিলিপি তুলে নিয়ে কৌশিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘নাও, হাত লাগাও।’

দিনের আলো এখন আগের চেয়েও পরিষ্কার। কয়েক ফালি হালকা রোদ জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে এসে পড়েছিল।

চ্যাঙারি ফাঁকা হয়ে আসছিল দ্রুত। জিলিপির রসালো দুটো দাঁড়া মুখের মধ্যে ঠেলে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণদা বললেন, ‘কী, কেমন জিলিপি বলো?’

চোখেমুখে খুশির চিহ্ন ফুটে উঠেছিল তরুণ গোয়েন্দার। ‘দারুণ!’

জিলিপি ফুরোবার মুখে চা এসে গিয়েছিল।

চা-টা দ্রুত শেষ করে উঠে পড়ে কৌশিক বলল, ‘আমি এবার আসি শ্রীকৃষ্ণদা। আমাকে যেতে হবে এক জায়গায়।’

‘কোথায়?’

‘এখানকার এক পুরুতঠাকুরের কাছে যাব।’

‘পুরুতঠাকুর!’

‘হ্যাঁ। আজ না কাল তিথি-নক্ষত্রের খুব ভাল একটা যোগ আছে। সেটা ঠিক কখন—জানার জন্যেই যাব।’

উত্তর শুনে শ্রীকৃষ্ণদা এতই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন যে, শেষ জিলিপিটা ওঁর মুখের কাছে এসে থমকে গিয়েছিল।

সেই ফাঁকে ওখান থেকে লম্বা পায়ে সরে পড়েছিল কৌশিক।

॥ ৪১ ॥

উত্তরবঙ্গের সিংহদ্বার শিলিগুড়ি। শুধু উত্তরবঙ্গ নয়, উত্তর-পূর্ব ভারতের সড়ক-সংযোগও এই শিলিগুড়ি হয়েই। এখান থেকে যাওয়া যায় নেপাল, চিন, ভুটান, মায়ানমার। ব্যস্ত শহর শিলিগুড়ি, মস্ত বড় ব্যবসাকেন্দ্র। শহরটির মধ্যে রীতিমত প্রাণচাঞ্চল্য আছে। ব্যবসাসূবাদে বহু অচেনা মানুষ ঘোরাফেরা করে এখানে। কিন্তু শহরের কাছে কেউই অবাঞ্ছনীয় নয়। মাঝ-রাত পর্যন্ত জেগে থাকে শহর, আবার কাকভোরেই ঘুম ভেঙে যায় শহরটির। কাল একটি শৈত্যপ্রবাহ ছিল। আজ ভোরের হাওয়াও কনকনে। লেপ-কম্বলের মায়া কাটিয়ে শহরবাসীদের বিছানা ছাড়তে আজ বোধহয় একটু দেরিই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সামান্য দেরি হলেও শহর তার নিজস্ব চেহারায় ফিরে এসেছিল আস্তে আস্তে। চারদিকে পাতলা একটা কুয়াশার আবরণ থাকলেও হিল কার্ট রোডে যানবাহনের সংখ্যা বাড়তে শুরু করেছিল।

অনেক দিন ধরেই হংকং মার্কেট শিলিগুড়ির মস্ত এক আকর্ষণ। অসংখ্য ছোট-বড় দোকান এই মার্কেটে। আর সব দোকানই রকমারি বিলিতি জিনিসপত্রে ঠাসা। যাঁরা কেনাকাটা করতে ভালবাসেন তাঁদের কাছে এই বাজারের আলাদা একটা টান আছে। হিল কার্ট ও সেবকের সংযোগে বাজার-এলাকাটি। প্রতিদিনের সকালের সঙ্গে আজকের সকালের কোনও তফাত ছিল না এখানে।

বাজারের কাছের ফিলিং স্টেশনে একটা অয়েল-ট্যাঙ্কার এসে দাঁড়িয়েছিল। দাঁড়াতেই রাস্তার ওপর থেকে লম্বা-চওড়া চেহারার এক যুবক ড্রাইভার-কেবিনের জানলার ধারে এসে হাজির হল। ড্রাইভারের পাশে যে লোকটা মাফলারে মাথা মুড়ে বসেছিল, তার সঙ্গে ওই যুবকের কথা শুরু হল নিচু গলায়।

এই দৃশ্যটির মধ্যে বিন্দুমাত্র অস্বাভাবিকতা ছিল না। প্রতিদিনই এমন দৃশ্য বহুবার দেখা যায়। কিন্তু হঠাৎই দুজন পুলিশ-অফিসার পিস্তল বাগিয়ে ওদের দিকে ছুটে যেতেই গোটা ছবিটাই পাল্টে গিয়েছিল।

অফিসাররা ছুটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের বাঁশিও বেজে উঠেছিল। বাঁশি বাজতেই যেন চারদিকের মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছিল কয়েকজন পুলিশ। তাদের হাতে রাইফেল।

পিস্তল-বাগানো অফিসারের নির্দেশে অয়েল-ট্যাঙ্কারের ড্রাইভার আর তার পাশে বসা লোকটা নেমে এসেছিল রাস্তায়। অফিসারের ইঙ্গিতে দুই পুলিশ ওই দুজন আর ওদের পরিচিত যুবকটির তল্লাশি নিয়ে নিল দ্রুত। না, কারও কাছ থেকে আপত্তিকর কিছুই পাওয়া যায়নি।

যুবকটি হঠাৎ কেমন যেন মারমুখী গোছের হয়ে সামনের অফিসারের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'এ সব কী হচ্ছে! কী ভেবেছেন আপনারা! কোত্থেকে উল্টোপাল্টা সব খবর পেয়ে হ্যারাস করতে এসেছেন আমাদের! এর ফল কিন্তু আপনাদের পেতে হবে।'

এমন একটা জোরালো প্রতিবাদের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না অফিসার। নিজেকে সামলে নিতে কয়েকটা মুহূর্ত সময় লেগেছিল ওঁর, তার পরেই গম্ভীর গলায় যুবকটিকে বলেছিলেন, 'আপনাদের যা বলার সব থানায় গিয়ে বলবেন।'

এত স্পষ্ট কথায় যুবকটি বোধহয় একটা ধাক্কা খেয়েছিল। মূর্তি আগের মতো অত উগ্র নয়, কিন্তু গলার স্বর একটু উপরে তুলেই বলল, 'আপনারা কি আমাদের থানায় নিয়ে যাবেন?'

'হ্যাঁ, এ ছাড়া তো আপনাদের কথা শোনার আর কোনও জায়গা নেই।'

'আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ কী জানতে পারি?'

'অনেক অভিযোগ, থানায় গিয়েই শুনবেন।'

'আমরা এখন থানায় গেলে অয়েল-ট্যাঙ্কার থেকে তেল সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যাবে। আপনি কি জানেন অয়েল ডিসট্রিবিউশন একটা ইমার্জেন্সি সার্ভিস। আমরা এখন থানায় গেলে ট্যাঙ্কারটা বেকার হয়ে পড়ে থাকবে। আপনারা আমাদের সমস্ত পার্টিকুলারস রেখে দিন, আমরা তেল ডিসট্রিবিউট করার পরেই থানায় পৌঁছে যাচ্ছি।'

গম্ভীর ভাবে অফিসার বললেন, 'আপনাদের ট্যাঙ্কারটাকেও সিজ করছি আমরা।'

শুনে যুবকটি বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিল, তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলেছিল, 'স্যার, আপনাদের মনে হয় কোনও কমিউনিকেশন গ্যাপ হয়ে গিয়েছে। না হলে অয়েল-ট্যাঙ্কার সিজ করতে যাবেন কেন? আপনারা আমাদের কাগজপত্তর দেখে নিন। তেল ডিসট্রিবিউট করার পরেই আমরা থানায় পৌঁছে যাচ্ছি।'

অফিসারের গলার স্বরে কিন্তু কোনও পরিবর্তন নেই। একই রকমের গলায় আদেশ দিলেন, 'আপনারা দুজন আমাদের ভ্যানে গিয়ে বসুন। আমি ট্যাঙ্কার নিয়ে থানায় যাচ্ছি, ভ্যান ফলো করবে আমাকে। এই ড্রাইভার, চলো—উঠে পড়ো গাড়িতে।'

ড্রাইভারকে সঙ্গে নিয়ে অয়েল-ট্যাঙ্কারে উঠে পড়লেন পুলিশ অফিসার। ট্যাঙ্কার রওনা দিল থানার দিকে। ট্যাঙ্কারের পিছু পিছু পুলিশের ভ্যান আর জিপ।

পেট্রল পাম্পের কাছে ছোটখাটো একটা ভিড় জমে উঠেছিল পথচারীদের। কিন্তু কিছুই না ঘটার জন্যে ভিড়টা হালকা হয়ে গেল আবার।

এ তো গেল শিলিগুড়ির খবর। ওই একই সময়ে কলকাতার চার জায়গায় চারটে পুলিশ রেড হয়েছিল। এই চারটে জায়গা হল: ট্যাংরার ছোটা জলিলের ট্যানারি, প্রিন্সেপ স্ট্রিটের ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি—চাঁদ ট্রাভেলস, এজরা স্ট্রিটের একটা মেডিক্যাল হল আর মানিকতলার এক লোহালক্কড়ের দোকান। কলকাতার চারটে আর শিলিগুড়ির একটা জায়গায় একই সঙ্গে পুলিশি হানা চালানো হয়েছিল একটা মস্ত বড় চক্রকে ধরার জন্যে। এই পাঁচটা অপারেশনের পেছনে একজন প্রত্যক্ষ ভাবে সক্রিয় ছিলেন—তিনি কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দপ্রধান সন্দীপ দেব।

প্রধান ঘটনা বলা যেতে পারে একটাই। সেই ঘটনার নানা মুখ। একটা মুখ শিলিগুড়িতে, চারটে মুখ কলকাতার চারটে জায়গায়। আরও একটা মুখ সম্ভবত হাসনাবাদে। ঘটনাস্রোত খুব দ্রুত এগিয়ে চলেছিল। কী শেষ পর্যন্ত হবে তা নিয়ে তরুণ প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর কৌশিক মিত্রের কিছু সংশয় রয়েই গেছে। তাই ও ঘটনার শেষ দেখার জন্যে অপেক্ষা করছিল ঠাণ্ডা মাথায়।

বিকেল ঠিক সাড়ে-চারটের সময় সর্কেল ইন্সপেক্টর শ্রীকৃষ্ণ মাইতির অফিসে এসে হাজির হয়েছিল কৌশিক। জনাদুয়েক বাইরের লোক ছিল অফিসে। সি. আই সাহেব তাদের সঙ্গে শেষ কয়েকটা কথা দ্রুত ভঙ্গিতে সেরে নেওয়ার পরে বললেন, 'ঠিক আছে, দিন-তিনেক বাদে একবার খবর নেবেন।'

লোক দুটো চলে যাওয়ার পর মৃদু হেসে শ্রীকৃষ্ণদা বললেন, 'যে দুটো দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে গিয়েছিলে আমার ওপর, সে দুটো পালন করেছি। তোমার পূর্ণদার কাছে আমার

ড্রাইভারকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। তোমার শেখানো মিথ্যেগুলো ওকে দিয়ে বলিয়েছি। গিয়ে থমথমে মুখ করে বলেছিল—কৌশিকবাবুর ফিরতে আরও দু-একটা দিন দেরি হবে। কেননা অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণ মাইতির পা-ভাঙা থেকে নানা রকম উপসর্গ দেখা দিয়েছে। ব্লাডপ্রেসার ওঠানামা করছে খালি। আগামীকাল আর একজন বড় ডাক্তারকে দেখানো হবে, তার পরেই লঞ্চে ফিরবেন কৌশিকবাবু। কিন্তু মুখস্থ ওই মিথ্যেটুকু বলেই পার পায়নি ড্রাইভার।'

'কেন?'

'তোমার পূর্ণদা মানুষটি খুব ভাল মানুষ। তোমার শেখানো মিথ্যে গল্প শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন—না-না, এটা ভাল নয়। পা তো অনেকেরই ভাঙে। বুড়ো বয়েসে হাড় ভাঙলে জুড়তে না হয় একটু বেশি সময় লাগে, কিন্তু এত উপসর্গ জুটছে কেন? আমি আপনার সঙ্গে গিয়ে একবার শ্রীকৃষ্ণদাকে দেখে আসব। অনেক আগেই আমার যাওয়া উচিত ছিল। ব্যস্, আমার ড্রাইভারের তো আক্কেল গুড়ুম। এই রকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হতে পারে—আগে ভাবেনি। ইন ফ্যাক্ট, ও কেন—আমিও ভাবিনি।'

'কী বলল তখন আপনার ড্রাইভার?'

'ওহ্! জব্বর একটা উত্তর দিয়েছে। বলেছে, আপনি গেলে তো ওর কাছে যেতে পারবেন না। তাই শুনে অবাক হয়ে তোমার পূর্ণদা জিজ্ঞেস করলেন—কেন? জবাবে ড্রাইভার বলেছিল, এখন যে অসুখটা হয়েছে সেটা বড্ড ছোঁয়াচে। ডাক্তার কাউকেই রুগির কাছে যেতে দিচ্ছেন না। কৌশিকবাবুকেও না। ওষুধটষুধ, খাবার-দাবার—সব দিচ্ছে নার্স। ওই সব শোনার পরে শান্ত হয়েছিলেন তোমার পূর্ণদা।'

তারিফ করার গলায় কৌশিক বলল, 'আপনার ড্রাইভারের তো দারুণ উপস্থিত বুদ্ধি।'

শ্রীকৃষ্ণদা একটু হেসে বললেন, 'অন্য কাজটাও হয়ে গিয়েছে। তুমি কি এর মধ্যে রেঞ্জার সাহেবকে ফোন করেছিলে?'

'না, সময় করে উঠতে পারিনি। এখন আপনাকে না পেলে করতাম।'

'করার আর দরকার নেই। অতনু, আর একজন বনরক্ষী ও একটা নৌকো রেডি থাকবে সন্ধে থেকেই। অতনুর ফোন নাম্বার তো তুমি জানো। ঠিক কোন্ পয়েন্টে ওকে আসতে হবে—জানিয়ে দিলেই চলে আসবে ও।'

কথাগুলো খুব মনোযোগের সঙ্গে শোনার পরে কৌশিক বলল, 'আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ শ্রীকৃষ্ণদা। অতনুদের হেল্প আজ রাতে আমার খুব দরকার।'

কপালে কয়েকটা ভাঁজ পড়েছিল অভিজ্ঞ সার্কেল ইন্সপেক্টরের। 'কেন?'

কৌশিককেও বেশ গম্ভীর দেখাচ্ছিল। 'আজ মাঝ রাতেই তিথিনক্ষত্রের শুভযোগ শুরু হচ্ছে। যোগের প্রথম প্রহরটি অতিমাত্রায় শুভ।'

'মানে?'

'মানেটানে জানি না। পুরুতঠাকুর বললেন, আমিও শুনে গেলাম। আপনাকে তখন বলেছিলাম না—শুভযোগ কখন জানার জন্যে একবার ঠাকুরমশাইয়ের কাছে যেতে হবে আমাকে।'

কৌশিককে সার্কেল ইন্সপেক্টর অনেক দিন ধরেই চেনেন। বুঝলেন গোয়েন্দা এখন কিছুতেই আর ওর হেঁয়ালির জট খুলবে না। হাত তুলে বললেন, 'যাকগে, তোমার শুভ

যোগটোগ নিয়ে তুমি থাকো। যদি সুফল ফলে তা হলে তো সবই জানা যাবে। ও হ্যাঁ, তোমার ওই ডেভিস মানুষটি সত্যিই পণ্ডিত। তোমাদের ভাষায় যাকে বলে—প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ। প্রাচীন ওই মুদ্রাগুলো পেয়ে অবিকল বাচ্চাদের মতো খুশি হয়ে উঠেছিলেন।'

শ্রীকৃষ্ণদার কথা শুনে টান-টান হয়ে বসেছিল কৌশিক। 'কোন্ প্রাচীন মুদ্রার কথা বলছেন?'

'তোমাকে বলছিলাম না ওই ডাকাত রফিকের কোমরের গেঁজ থেকে কিছু ওল্ড কয়েন্স পাওয়া গেছে। তা, আই. ও-র হাত দিয়ে কয়েকটা পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। ওগুলো দেখেই ডেভিস প্রায় লাফিয়ে উঠে বলেছিলেন, চারশো বছর আগেকার রেয়ার কয়েন বলে মনে হচ্ছে। একটু ভাল করে পরীক্ষার জন্যে ওগুলো উনি ওঁর কাছে রেখে দিতে চাইছিলেন। অন্য সময় হলে দেওয়া যেতে পারত, কিন্তু এখন মুশকিল। ডাকাতের কাছ থেকে উদ্ধার-করা মুদ্রা, যথাসময়ে কোর্টে এক্সিবিট হিসেবে প্রডিউস করতে হবে। সাহেব পণ্ডিতরা কী রকম সিরিয়াস টাইপের হয় দেখো—। আমাদের আই. ও-কে বারবার জিজ্ঞেস করছিলেন—যে ভাঙা মন্দিরটা থেকে ওই কয়েনগুলো পাওয়া গিয়েছে, সেই মন্দিরটা সুন্দরবনের ঠিক কোন্ জায়গায়? জবাবে আই. ও বলেছিল—ডাকাতের ওই গল্পটা বোধহয় বানানো। ওগুলো নির্ঘাত কোনও বাড়ি থেকে ডাকাতি করে এনেছে। সাহেব তার জবাবে অদ্ভুত একটা কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন—না, স্টেটমেন্টটা সত্যিও হতে পারে।'

গম্ভীর মুখে কৌশিক বলল, 'আমার মনে হয় সাহেবের অনুমান ঠিকই।'

শ্রীকৃষ্ণদা হেসে উঠে বললেন, 'শোনা কথার ওপর নির্ভর করে তুমি বলে দিচ্ছ—অনুমানটা ঠিক। স্ট্রেঞ্জ!'

কৌশিকের চৌকো মুখ একটু বুঝি গম্ভীর হল। চাপা গলায় বলল, 'শোনা কথার ওপর নির্ভর করে বলছি না শ্রীকৃষ্ণদা। আমি লক-আপে গিয়ে ওই রফিকের সঙ্গে ঘণ্টা-দেড়েক কথা বলে এসেছি।'

চোখ কপালে তুলে সি. আই বললেন, 'তুমি কখন আবার ওই ডাকাতটার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে? আমাকে কিছু বলোনি তো।'

'বলতাম। আপনার এখান থেকে বেরুবার পরেই মনে হয়েছিল—ডাকাতদের সঙ্গে একবার দেখা করলে মন্দ হয় না। আপনার রেফারেন্স দিতেই ও. সি আমাকে এনটারটেন করলেন। লক-আপে বসে রফিকের সঙ্গে ঘণ্টা-দেড়েক কথা বললাম একা-একা। আপনি ঠিকই বলেছেন, লোকটা যে ভয়ংকর এক ডাকাত—সেটা ওর চেহারা দেখে একেবারেই বোঝা যায় না। বেঁটেখাটো, পাতলা চেহারা, চোখের চাউনি আর পাঁচটা সাধারণ গাঁয়ের লোকের মতো। এই লোকটা ডাকাতি করতে গিয়ে কী পরিমাণ নৃশংস হতে পারে—কল্পনা করা যায় না। পুলিশ রেকর্ডে ওর যে-সব ভয়ংকর কাণ্ডকারখানার কথা আছে, সে-সবের সঙ্গে রফিককে এখন মেলানো মুশকিল।'

শ্রীকৃষ্ণদা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, 'তাও তো এদের কুকীর্তির সব হদিশ পুলিশ পায় না। হাসতে হাসতে এরা মানুষ খুন করে। দয়া-মায়া-মমতা বলে কিছুই নেই এদের।

রফিকের এক ভাগ্‌নে ওর ডাকাত-দলের সঙ্গী ছিল। কথার একবার অবাধ্যতা করেছিল বলে মামা নাকি ভাগ্‌নেকে গুলি করে উড়িয়ে দিয়েছে।'

কৌশিক কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে বলল, 'আমাকে রফিক মনে হয় একটু খোলা মনে নিয়েছে। আগাগোড়া খুব নরম গলায় কথা বলেছি তো—। বহুদিন ধরে পুলিশ ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। বুঝতে পেরেছে—এবার আর চট করে বেরুতে পারবে না। ডুবন্ত মানুষ খড়কুটো পেলেও চেপে ধরে তো—। আমি ছিলাম বোধহয় ওর খড়কুটো। আমাকে বলছিল—আজকাল ও আর ডাকাতি করে না।'

'ডাকাতি করে না তো—ওর চলছিল কী ভাবে? জিজ্ঞেস করোনি?'

'করেছিলাম। বলেছে, ইদানীং ওর পেশা ছিল চোরের ওপর বাটপাড়ি।'

'মানে?'

'বাংলাদেশ আর সুন্দরবন চোরাচালানকারীদের একটা স্বর্গ বলা যেতে পারে। স্মাগলারদের আর পোচারদের কাছ থেকে তোলা আদায় করত রফিকের দল। বিনিময়ে প্রোটেকশন দিত ওদের। তা, এত বড় একটা দল রাখা, তাদের হাতে অস্ত্রশস্ত্রের জোগান দেওয়া, নিজের হেফাজতে কয়েকটা নৌকো রাখা—সব মিলিয়ে খরচ তো কম নয়। ওই খরচটা ওর তোলা আদায় থেকে উঠে যেত বলে ডাকাতির দিকে আর নাকি যেত না।'

'তাই যদি হবে তা হলে ওই সাহেব-মেমের লঞ্চে ডাকাতি করতে গিয়েছিল কেন? জিজ্ঞেস করোনি?'

'করেছিলাম। জবাবে বলেছিল, ডাকাতি করতে নয়—বদ্‌লা নিতে গিয়েছিল।'

'বদলা! কার ওপর বদ্‌লা?'

'ওই লঞ্চের কয়েকটা মাঝিমাল্লা নাকি অন্য দলের সঙ্গে রফিকের কাজে বাগড়া দিচ্ছিল। তাই ও গিয়েছিল ওদের শায়েস্তা করতে। মাঝখানে অতনুরা এসে পড়ায় ব্যাপারটা অন্য দিকে ঘুরে যায়।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে সি. আই সাহেব বললেন, 'এরা হচ্ছে হার্ডকোর ক্রিমিনাল। দিনকে রাত করতে পারে। মিথ্যে কথা বলায় এদের জুড়ি নেই।'

দুদিকে আলতো করে মাথা নাড়িয়ে কৌশিক বলল, 'ওই লঞ্চের মাঝিমাল্লাদের সবাইকে তো আমি চিনি। রফিক দু-একটা এমন রেফারেন্স দিল—মনে হয়, পুরোপুরি মিথ্যে কথা বলেনি।'

শ্রীকৃষ্ণদা হাসলেন। 'আধাআধি মিথ্যে বলেছে? ওর ওই পুরনো মুদ্রা পাওয়ার গল্পটাও কি তুমি আধাআধি বিশ্বাস করেছ?'

কৌশিক হাসল না। কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে গম্ভীর মুখে বলল, 'না, ওই গল্পটা আধাআধি নয়, পুরোটাই বিশ্বাস করেছি আমি।'

'তাই! কেন?'

'যে মন্দির থেকে ও মুদ্রাগুলো পেয়েছে সেই মন্দিরের একটা নিখুঁত ডেসক্রিপশন দিল। আমি পকেট থেকে কাগজ-কলম বার করে দিয়ে বলল—মন্দির ঠিক কোন্ জায়গায়, এঁকে দেখাতে পারবে? ও আঁকল। আঁকার হাত স্বাভাবিক কারণেই ভাল নয়। কিন্তু ভাঙা মন্দিরটা ঠিক কোথায়—ও পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছিল। ওই নক্‌শা দেখে আমার মনে হল, সত্যি কথাই বলেছে রফিক।'

কৌশিকের কথা শুনে গলা ছেড়ে হেসে উঠেছিলেন ওর শ্রীকৃষ্ণদা। তার পর হাসতে হাসতেই বললেন, 'ঠিক কি বেঠিক তুমি কী করে বুঝবে? যে ভাঙা মন্দিরের গপ্পো ওই ডাকাতটা ফেঁদেছে, সেটা হল সুন্দরবন টাইগার প্রজেক্টের কোর-এরিয়ায়। আর তোমার কোর-এরিয়ার দৌড় বলতে লোহার জালে ঘেরা সজনেখালি আর সুধন্যখালি। নক্‌শা দেখেই তুমি বুঝে গেলে ডাকাতটা সত্যি কথা বলেছে!'

শ্রীকৃষ্ণদার ঠাট্টা গায়ে মাখল না কৌশিক। নিচু গলায় বলল, 'আমি অন্য জায়গায় আর একটা নক্‌শা দেখেছি, এই নক্‌শাটা ঠিক সেই রকমই।'

দুটো ভুরু একটুখানি উঁচুতে তুলে শ্রীকৃষ্ণদা বললেন, 'তুমি আবার অন্য একটা ভাঙা মন্দিরের নক্‌শা দেখলে কোথায়! ও বুঝতে পেরেছি, কোনও সার্ভেওয়ালার ম্যাপে। ওই ম্যাপের চিহ্ন দেখে স্পষ্টভাবে কিছুই কিন্তু ধরা যায় না।'

আরও অনেক কিছু বলতে যাচ্ছিলেন সি. আই সাহেব, কিন্তু হঠাৎ ফোন বেজে ওঠায় উনি কথা থামিয়ে ফোন ধরলেন। তারপর কৌশিকের দিকে রিসিভার এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'তোমার।'

কৌশিক 'হু, হ্যাঁ' বলতে বলতে টেলিফোনের ও পাশের কথা শুনছিল মনোযোগ দিয়ে। একটু বাদে ঝলমলে মুখে বলল, 'পাঁচটা জায়গায় সাইমালটানিয়াস রেড। অপারেশন যে এতখানি সাকসেসফুল হবে—আমি নিজেও ভাবতে পারিনি। না-না, এ কী বলছেন! আমি কী-ই বা এমন করেছি, সব ক্রেডিট তো আপনাদেরই। একটাই অনুরোধ, প্রেসকে এখন কিছু জানাবেন না। আমাদের শেষ বড় অপারেশনটা শেষ হোক আগে। মনে হয়, কাল সকালের পরে নিউজ মিডিয়ার সামনে আপনাদের মুখ খোলার ব্যাপারে আর কোনও অসুবিধে থাকবে না। ছাড়ছি এখন। আমাকে এক্ষুনি একবার একটা জায়গায় ছুটতে হবে।'

চোখ নাচিয়ে শ্রীকৃষ্ণদা জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় ছুটতে হবে এখন?'

টেলিফোনে ডায়াল করতে করতে জবাব দিল কৌশিক, 'অতনুর কাছে। ওকেই এখন ফোন করছি।'

অতনুকে পাওয়া গেল ফোনে। কৌশিক নিজের পরিচয় দেওয়ার পরে বলল, 'খুব দরকার আপনার সঙ্গে। কয়েকটা কথা এখনই বলে নেওয়া প্রয়োজন। হ্যাঁ, আপনার অফিসেই আসছি। মনে হয়, আধ ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাব।'

টেলিফোন নামিয়ে রেখেই উঠে পড়েছিল কৌশিক।

একটু অবাক হয়ে শ্রীকৃষ্ণদা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার! হঠাৎ এমন ব্যস্ত হয়ে পড়লে কেন?'

'খুব চটপট কতগুলো কাজকর্ম সেরে নিতে হবে। হাতে আর বেশি সময় নেই।'

'সময়ের হঠাৎ এত টান পড়ল কেন তোমার?'

'বেশ কয়েকটা কাজ। সময় সেই তুলনায় খুবই কম। সব কাজ শেষ করতে হবে শুভযোগ আরম্ভ হওয়ার আগে। শুভযোগ শুরু হচ্ছে আজ রাত দুটো গতে—।'

রহস্যপূর্ণ ভঙ্গিতে শেষ কথাটা বলেই সি. আই সাহেবের অফিস থেকে বেরিয়ে পড়েছিল তরুণ গোয়েন্দা।

॥ ৪২ ॥

প্রতি রাতে খাওয়ার টেবিলে বেশ গল্প জমে। আজ আর তেমন জমল না। ডেভিস থেকে থেকেই অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। শুধু এখন বলে নয়, সন্ধে থেকেই ওর মধ্যে কেমন যেন একটা আনমনা ভাব। কথা বলতে বলতে চুপ করে যাচ্ছিল হঠাৎ। সব প্রশ্ন বোধহয় ওর কানেও যাচ্ছিল না। অন্যান্য দিনের তুলনায় সন্ধের আসরে হুইস্কি একটু বেশিই খেয়ে ফেলেছিল।

ডেভিসের অন্যমনস্ক থাকার কারণটা নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করে নিয়েছিলেন পূর্ণ চ্যাটার্জি। হ্যাঁ, এ ছাড়া হাসিখুশি মানুষটার আচমকা গম্ভীর হয়ে যাওয়ার আর কোনও কারণ নেই। অল্পের জন্য ভয়ংকর এক বিপদের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছে সবাই। বনরক্ষীদের পেট্রল ঠিক সময়ে এসে না পৌঁছলে এখন কে কী অবস্থায় থাকত কে জানে!

ইনভেস্টিগেটিং পুলিশ অফিসার সামন্ত মানুষটি খুব ভাল। লঞ্চে এসে ইনকুয়ারি শেষ করার পরে ডেভিসকে বলেছিলেন—আপনারা যদি পুলিশ এসকর্ট চান, আমরা দিতে পারি।

ডেভিসের বেশ সাহস আছে, ধন্যবাদের সঙ্গে সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে বলেছিল: ডাকাতদের একটা অ্যাটেম্প্‌ট্‌ অ্যাবরটিভ হয়েছে। শুধু তই নয়, একটা ডাকাত ধরাও পড়েছে—মনে হয়, এখন আমাদের ওপর আর কোনও অ্যাটাক হবে না। তা ছাড়া আমাদের কাজ শেষও হয়ে এসেছে, আমরা আর-দু-একটা দিন পরেই চলে যাব।

ডেভিসের এই কথাটা বেশ ভাল লেগেছিল পূর্ণ চ্যাটার্জির। মানুষটার কথার মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি আছে। বিদেশ-বিভুঁইয়ে এসে এই ধরনের একটা গোলমেলে পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে মাথা ঠাণ্ডা করে এমন কথা বলতে পারা কম নয়। তবে ডাকাতদের কাছ থেকে উদ্ধার-করা বাদশাহি আমলের ওই মুদ্রাগুলো দেখে ডেভিসের অমন হই-হই করার কোনও মানে হয় না। কোন্ ভাঙা মন্দির থেকে ডাকাতটা ওগুলো পেয়েছে জানার জন্যে পুলিশ অফিসারকেই জেরা শুরু করে দিয়েছিল। অফিসার স্পষ্ট ভাষায় বলেছিল: ডাকাতের কথা বিশ্বাস করার কোনও মানে হয় না। এটা নির্ঘাত অন্য কোনও এলাকার ডাকাতি-করা মাল। ভাঙা মন্দির থেকে পাওয়া-টাওয়া—এ সব বানানো গপ্পো।

চোর-ডাকাত নিয়ে যারা দিনরাত্তির ঘাঁটাঘাঁটি করে, তারা খুব সহজেই ওদের সত্যিমিথ্যেগুলো ধরতে পারে। পূর্ণ চ্যাটার্জির সন্দেহ নেই যে, পুলিশের অনুমানটাই নির্ভুল। কিন্তু ডেভিসের ধারণা ডাকাতের গপ্পোটা ঠিক। পূর্ণ চ্যাটার্জি লক্ষ্য করে দেখেছেন—এই মানুষটা অনেক কিছু জানে, কিন্তু কিছু ব্যাপারে বড্ড কুসংস্কারাচ্ছন্ন। ওর ধারণা তন্ত্রমন্ত্র সব ধরনের ভেলকি দেখাতে পারে। তান্ত্রিক আর ফকিরের ওপর খুব আস্থা। বিশ্বাস করে এদের সব তুকতাকই অব্যর্থ। হিরু গুনিনের মতো লোকেরা এদের মাথা আরও বেশি করে খারাপ করে দিয়েছে। উদ্ভট যে-কোনও জিনিসই বিশ্বাস করিয়ে ছাড়ে। ব্যাঘ্রবন্ধন নিয়ে কম গল্প শুনিয়েছে হিরু! আজগুবি সব গল্প। কিন্তু বলার ভঙ্গি এমনই যে, সবাই হাঁ করে শোনে। তবে হ্যাঁ, লোকটা বিচিত্র সব গল্প শুনিয়ে আসর মাত করে দিতে পারে বটে। কিন্তু এই লোকটাকেই আবার সঙ্গে নিয়ে যায় বনরক্ষীরা টাইগার প্রজেক্টের কোর-এরিয়ায়

বাঘের পায়ের ছাপ গোনার সময়। কেন? না, এই গুনিন মন্ত্র পড়ে বাঘের মুখ বেঁধে দিলে কেউ আর বাঘের পেটে যাবে না। হঠাৎই একটু খটকা লাগল পূর্ণ চ্যাটার্জির। বনরক্ষীরা যখন লোকটাকে এত তোয়াজ করে সঙ্গে নিয়ে যায়, ব্যাপারটার মধ্যে কি কিছুটা সত্যি আছে!

একটু আগে রাতের খাওয়া শেষ করে ওপরে নিজের ঘরে চলে এসেছেন পূর্ণ চ্যাটার্জি। কৌশিক থাকলে ওর সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্পগুজব চলত এখন। অসুস্থ অধ্যাপকের সেবার জন্যে ক'টা দিন ও লঞ্চ-ছাড়া। কাল-পরশু ফিরবে। জোসি-ডেভিসেরও এই সুন্দরবন সফর শেষ হচ্ছে কাল-পরশুর মধ্যেই। দেখতে দেখতে বেশ ক'টা দিন কেটে গেল নদীর ওপরে। কী অসাধারণ বনভূমি, নদীনালার কত রকম চেহারা! চোখ ফেরানো মুশকিল।

শেষকালে একটা শুধু ঝঞ্ঝাটের মধ্যে পড়তে হয়েছিল। তবে গুলি বেরিয়ে গেছে কানের পাশ দিয়ে। বনরক্ষীদের পেট্রলের চোখে না পড়ে গেলে ডাকাতরা কী কাণ্ড করতে কে জানে! যা হতে পারত তা ভাবতে গিয়ে মেরুদণ্ডে ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গিয়েছিল চ্যাটার্জির। তার পরেই মনে হয়েছিল, পুলিশ-পাহারা না নিয়ে ডেভিস বোধহয় ভুলই করেছে।

পুলিশ অফিসার নিজে থেকেই এসকর্টের কথা বলেছিলেন। প্রয়োজন না থাকলে নিশ্চয়ই বলতেন না। পুলিশ-পাহারা না নেওয়ার ব্যাপারে ডেভিসের কথা তখন বেশ যুক্তিপূর্ণ মনে হয়েছিল পূর্ণ চ্যাটার্জির। কিন্তু এখন আর তা মনে হচ্ছে না। নির্জনতা কাল পর্যন্ত কী আশ্চর্য রকমের উপভোগ্য ছিল, কিন্তু মানুষটি হঠাৎই বুঝি লোকালয়ের পরিচিত কিছু শব্দ শোনার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

আর একটা খাঁড়ির কাছে নোঙর ফেলেছে এম ভি সদাগর। এ এক আশ্চর্য জগৎ। সন্ধের ঠিক পরেই ঝুপ করে নিশুতি রাত নেমে পড়ে। আড্ডার মধ্যে সময় গড়ায়। কিন্তু একা থাকলে এখানে সময় থেমে যায়, কিংবা খুব ধীরে চলে।

একা বিছানায় একটুখানি এপাশ-ওপাশ করলেন পূর্ণ চ্যাটার্জি। নদীতে জল বোধহয় বাড়ছে। ছোট-ছোট ঢেউ লঞ্চের গায়ে ভাঙছে। দরজা-জানলা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও সেই শব্দ কানে ভেসে আসছিল চ্যাটার্জির। বোধহয় একটু জোর হাওয়া ছেড়েছে। লঞ্চ অল্প-অল্প দুলছে। সেই দুলুনি উনি অনুভব করতে করতে লেপটাকে পায়ের ওপর থেকে তুলে গলা পর্যন্ত টেনে দিলেন। নির্জনতা আবার একটু-একটু করে উপভোগ্য হয়ে উঠছিল ওঁর কাছে।

ভোরবেলায় উঠেছেন, আজ দুপুরে আবার বিছানায় একেবারেই গড়ানো হয়নি ; সারা শরীর কাঁপিয়ে লম্বা একটা হাই উঠল। ঘুমের দিকে এগোবার আগে ওঁর মনে হয়েছিল— এমন রাতে এ এলাকার অনেকেই এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। যারা জেগে আছে তারাও ঘুমোবে শিগ্‌গির।

কিন্তু পূর্ণ চ্যাটার্জি জানতেন না যে, এই এলাকার কেউ-কেউ সারারাত জেগে থাকার জন্যে তৈরি। এই লঞ্চের নীচের তলাতেই তেমন কয়েকজন আছে। ডেভিস নিজের ঘরে। টেবিলের ওপর একটা নক্‌শা বেছানো। ঝুঁকে পড়ে নক্‌শাটা দেখছিল ডেভিস। নিছক চোখের দেখা নয়, যাকে বলে স্টাডি—। বহুক্ষণ ধরে নক্‌শা দেখার পরে একটা ছোট নোটবুকে কী সব যেন ও নোট করে নিয়েছিল।

একটু পরেই দরজায় মৃদু দুটো টোকা পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে নক্‌শাটা ভাঁজ করে ছোট চৌকো-গোছের বাক্সে ঢুকিয়ে ফেলে ডেভিস বলল, 'কাম ইন।'

বলার একটু পরে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল গণেশ। সাহেব ওর দিকে তাকাতেই গণেশ বলল, 'হিরু এখন আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়।'

অবাক হয়ে ডেভিস জিজ্ঞেস করল, 'এখন। হোয়াই?'

মাথা চুলকে উত্তর দিল গণেশ, "আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। আমারে কিছু বলতে চায় না। খালি বলে—যা কওয়ার সাহেবরে ক'ব। তুমি এখন একবার খবর দাও। খুব জরুরি। সাহেবের দু' মিনিটের বেশি সময় নেব না।"

ডেভিসের কপালে কয়েকটা ভাঁজ পড়েছিল। ভুরু নাচিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, ডাকো। কল হিরু হিয়ার।'

সঙ্গে সঙ্গে গণেশ বেরিয়ে গেল ঘর থেকে, একটু বাদে ফিরে এল গুনিন হিরু মণ্ডলকে সঙ্গে নিয়ে। হিরুর পরনে চেককাটা লুঙ্গি, গায়ে ফতুয়া। গলায় জড়ানো একটা কালো চাদর। এসেই শরীর ঝুঁকিয়ে সাহেবকে একটা নমস্কাব কবে নিয়েছিল। হিরুর দুটো চোখই টকটকে লাল, গায়ে গাঁজার কটু গন্ধ।

ডেভিস তীক্ষ্ণ চোখে হিরুকে দেখে নেওয়ার পবে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কেন এখন আমার সঙ্গে দেখা করতে চাও?'

হিরু হাত জোড় করে বলল, 'ছাহেব, আপনাকে তো ফর্দটা দেখানো হয়নি। এই দেখেন ফর্দ।'

ফতুয়ার পকেট থেকে দেড় হাত লম্বা একটা ফর্দ বার করে হিরু বলল, 'ওহ্! কত যে জিনিস জোগাড় করতে হয়েছে! আর এগুলো পাওয়া কি চাট্টিখানি কথা! এই যেমন ধরেন কালো বেড়ালের পায়ের নখ আর লেজের লোম। তার পরে চাই একেরে নতুন পঞ্চমুখী শাঁখ—।'

সাহেবের কপালে বেশ কয়েকটা ভাঁজ ফুটে উঠেছিল। গম্ভীর গলায় বলল, 'তোমার যা রিকয়ারমেন্ট, মানে তুমি যা চাও—তুমি তো বিকেলে বলছিলে—সব পেয়ে গিয়েছ। পাওনি?'

হিরু দাঁত বার করে বলল, 'হিরু মণ্ডল যে কাজে হাত দেয়, সে কাজ শেষ না করে থামে না। ফর্দটা একবার দেখেন, তা হলেই বুঝতে পারবেন কত রকমের অদ্ভুত-অদ্ভুত জিনিসের দরকার হয় এই কাজে।'

হিরু হাতের দেড় হাত লম্বা ফর্দ বাড়িয়ে দিয়েছিল সাহেবের দিকে, কিন্তু সাহেব ফর্দ নেওয়ার কোনও রকম আগ্রহ না দেখিয়ে বলল, 'তুমি তো বিকেলেই আমাকে বলেছিল—সব জোগাড় হয়ে গিয়েছে। কথাটা কি ভুলে গিয়েছ এখন?'

আবার দাঁত বার করল হিরু। 'হিরু মণ্ডল কখনও কিছু ভোলে না ছাহেব।'

সাহেবের গলায় এবার বাঘ ডাকল, 'তুমি এখন এখানে তা হলে কেন এসেছ? হোয়াই?'

সাহেবের ওই চাপা গর্জনে বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিল হিরু, কিন্তু চটপট নিজেকে সামনে নিয়ে বলল, 'আমি এখন এই জন্যে এসেছি—শুভ কাজে যাতে কোনও ত্রুটি না থাকে তার কথা বলতে—।'

উত্তরে সাহেব কিছুই বলল না, কিন্তু চোখে প্রশ্ন।

হিরু কেশে গলা পরিষ্কার করে বলল, "ছাহেব, শুভ কাজে ধারকর্জ রাখলে ফল ফলে না। তাই বলছিলাম কি, ফর্দের টাকা ক'টা এখন মিটিয়ে দেন।"

ডেভিস দু' দিকে মাথা নেড়ে বলল, 'এখন কিছু হবে না। কাল সকালে পেয়ে যাবে।'

হায়-হায় করার গলায় হিরু বলল, 'এইটা কখনোই করবেন না ছাহেব। নিয়ম নাই। শুভ যোগ শুরু হওয়ার আগে পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে না নিলে ফল পাওয়ার ব্যাপারে ব্যাঘাত দেখা দেয়। এ আমার মুখের কথা নয়। পুঁথিতে সব লেখা আছে। আপনি যদি চান আমি এখনই আপনাকে পুঁথি দেখিয়ে দিতে পারি—।'

সাহেব গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল, এই সব পাওনা মেটাতে কত টাকা লাগবে তোমার?'

হাতের দেড়হাতি ফর্দর শেষের দিকে দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে হিরু বলল, "এই তো সব লেখা আছে এখানে। ফর্দর সব জিনিসপত্র জোগাড় করতে মোট খরচ পড়েছে ন' হাজার ছশো টাকা সত্তর পয়সা। এই তো আপনি নিজের চোখেই একবার দেখে নেন না—।"

ফর্দ দেখার বাপারে ডেভিস কোনওরকম আগ্রহ না দেখিয়ে কাবার্ড থেকে অ্যাটাচি বার করল। তার পর অ্যাটাচি খুলে পিন-করা কারেন্সি নোটের একটা বান্ডিল হিরুর দিকে ছুড়ে দিয়ে বলল, 'দশ হাজার টাকা আছে এখানে। তোমার আর কোনও দরকার আছে এখন?'

নোটের বান্ডিলটা ফতুয়ার পকেটে ডোকাতে ঢোকাতে হিরু বলল, 'না ছাহেব। এখন চলি। ঠিক সময়ে ডাকলেই হাজির হয়ে যাব।'

হিরু পেছন ফেরার মুখেই ডেভিস বলল, 'আর একটা কথা। আজ রাতে তুমি আর গানজা, চরস খাবে না।'

জিব কেটে হিরু বলল, 'কী যে বলেন ছাহেব! আমি সন্ধেবেলায় এট্টুসখানি সেবা করেছি শুধু।'

হিরু চলে যাওয়ার পরে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে চৌকো বাক্স থেকে বিচিত্র সেই নক্‌শা টেবিলে বিছিয়ে আবার ঝুঁকে পড়েছিল ডেভিস। কী তীক্ষ্ণ চাউনি! একেই বলে বোধহয় অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। নক্‌শায় যা আছে, তার চাইতেও বুঝি অনেক বেশি কিছু দেখে নিচ্ছিল সাহেব। ছোট্ট সেই নোটবুক আবার বার হল। নোটবুকে খুব মনোযোগের সঙ্গে আরও কিছু নোট নেওয়ার পরে নক্‌শা আবার বাক্সে ঢুকিয়ে রাখল ডেভিস। তারপর নোটবুক পকেটে ঢুকিয়ে ছোট্ট ওই ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে শুরু করে দিয়েছিল।

গায়ের জ্যাকেটটা খুলে ফেলেছে সাহেব। গায়ে এখন হাতকাটা, গোল গলা একটা গেঞ্জি। চওড়া কাঁধ, গাঁথা বুক, পেশী-ওপছানো দুখানা লম্বা হাত। প্রকাণ্ড আকারের বলশালী এই মানুষটি খাঁচার বাঘের মতো পায়চারি করছিল ছোট্ট জায়গায়। কপালে মাঝেমধ্যেই ভাঁজ ফুটে উঠছিল ওর, আবার তা মিলিয়েও যাচ্ছিল। খোলা হাত মুঠো হচ্ছিল কখনও-সখনও। আর মুঠো হলেই পেশীর তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ছিল মজবুত দুই হাতে। এক হাতে কালনাগিনীর উল্কি। পেশীর ঢেউয়ে নেচে উঠছিল সাপের পাঁচটা ফণাও।

আশ্চর্য রকমের শান্ত সুন্দরের এই এলাকায় সময় বুঝি খুব আস্তে আস্তে এগোয়। কিন্তু এগোয়। আর যত আস্তেই এগোক না কেন, সময় ইতিমধ্যেই মাঝ রাত্তিরের দিকে এগিয়ে গেছে অনেকখানি।

রাত পৌনে দুটো নাগাদ শব্দহীন কিছু তৎপরতা দেখা গেল এই লঞ্চে এবং নদীতে। লঞ্চের গায়ে যে বোটটা ঝুলছিল সেটা কখন যেন নামানো হয়ে গেছে নদীতে। আকাশে বেশ চাঁদের আলো, তবে মেঘও আছে। সেই মেঘে মাঝেমধ্যেই চাপা পড়ে যাচ্ছিল চাঁদ। তার ফলে নদীর জলে আলো-আঁধারের খেলা চলছিলই।

আলো-ছায়ার মধ্যে খুব আস্তে আস্তে লঞ্চের মাঝামাঝি জায়গায় নৌকো ভেড়াল গণেশ। আর সঙ্গে সঙ্গে লঞ্চের ইমার্জেন্সি এগজিটের পাশের জানলা দিয়ে দড়ির একটা সিঁড়ি পড়ল নৌকোর ওপর। গণেশ দড়ির একটা প্রান্ত শক্ত করে বেঁধে দিল নৌকোর সঙ্গে।

এই দড়ির সিঁড়ি বেয়ে শিকারির পোশাকে নৌকোয় নেমে এল ডেভিস। কাঁধে বন্দুক, হাতে পাঁচ সেলের লম্বা টর্চ। ডেভিসের পরে নামল জোসি। পরনে জিন্‌সের ট্রাউজার্স আর জ্যাকেট। কাঁধে বন্দুক, মাথায় টুপি, ওর হাতেও লম্বা একটা টর্চ। সবশেষে নামল হিরু। গায়ে নানা রংয়ের টুকরো কাপড়-জোড়া মস্ত সেই আলখাল্লা, আলখাল্লার নীচে ঢোলা পাজামা। গামছাটা মাথায় পাগড়ির মতো জড়ানো। হতে টাঙ্গি।

নৌকোর সঙ্গে বাঁধা দড়ির সিঁড়ি খুলে দিয়ে হাতে বৈঠা তুলে নিয়েছিল গণেশ, ওপাশে দাঁড় হাতে হিরু। নৌকোর ঠিক মধ্যিখানে জোসি আর ডেভিস। নৌকো এগোতে লাগল সামনের খাঁড়ির দিকে। হিরু 'বদর বদর' বলার পরে বিড়বিড় করে বেশ কিছুটা মন্ত্র পড়ে নিয়েছিল। মন্ত্রের কিছুই বোঝা যায়নি, কিন্তু গাদা-গাদা বিসর্গ আর অনুস্বার অদ্ভুত একটা আবহ তৈরি করেছিল নিস্তব্ধ নদীতে।

পাকা হাতে দাঁড় টানছিল ওপাশে গণেশ, এপাশে হিরু। নৌকো ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছিল খাঁড়ির দিকে। খুব সাবধানে দাঁড় টানার জন্যে হালকা ছপছপে গোছের একটা শব্দ উঠছিল। আর কোথাও কোনও শব্দ নেই। খাঁড়ির পাশেই ঘন, ঠাসা সুন্দরবন। ব্যাঘ্র প্রকল্পের খাস এলাকা। কেমন যেন থমথমে হয়ে ছিল ভয়াল-সুন্দর সুন্দরবন। খাঁড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে নৌকো এবার এগোতে লাগল বনের দিকেই।

নৌকো বনের দিকে আরও কিছুটা এগোবার পরে খাঁড়ির মুখে আর একটা নৌকো দেখা গেল। ওদিকে তাকিয়ে চাপা গলায় গণেশ বলল, 'এসেছে।' বলেই পকেট থেকে ছোট একটা টর্চ বার করে আকাশের দিকে তুলে দুবার জ্বালাল, নেবাল। জবাবে খাঁড়ির মুখের নৌকো থেকেও শূন্যের দিকে সরু আলোর রেখা উঠল দুবার। গণেশ চাপা গলায় বলে উঠল, 'হ্যাঁ, ওরাই।'

ডেভিস পকেট থেকে ছোট নোটবুকটা বার করেছিল। তার পর চাঁদের আলোয় নোটবইয়ের পাতা উল্টে বাঁ হাত দিয়ে নিচু করে ধরে টর্চের আলো ফেলল। আলোর নীচে নোটবইয়ের নক্‌শা-আঁকা পাতা। খুব খুঁটিয়ে ওটা দেখে নেওয়ার পরে ডেভিস গণেশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'পরের ওই বাঁকের মুখে জঙ্গলে নৌকো ভেড়াও।'

আকাশে চাঁদের আলো আর মেঘ দুটোই আছে যথেষ্ট পরিমাণে। কেমন যেন পালা করে আলো-আঁধারের খেলা চলছিল নদীতে আর বনে। মাঝমধ্যে রাত-জাগা পাখির ডাক জমাট নির্জনতায় ফাটল ধরিয়ে দিচ্ছিল।

পরের বাঁকের মুখে নৌকো এসে দাঁড়াল। সাত হাত দূরে ব্যাঘ্র প্রকল্পের খাস তালুক। মাঝ রাত তো পরের কথা, দিনের যে কোনও সময়েই এখানে এলে অতি বড় সাহসীরও

বুক উড়ে যায়। নৌকোর কারও মুখে কোনও কথা নেই, শুধু বিকৃত গলায় বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে যাচ্ছিল হিরু মণ্ডল। হাতের টাঙ্গি কাঁধের ওপর। ডেভিস আর জোসির বন্দুক জঙ্গলের দিকে তাক করা।

হিরুর বিকৃত গলার মন্ত্র থামতেই ডেভিস বলল, 'গাণেশ, আমরা এখানে নামব—।'

গণেশ নৌকোটাকে ডাঙার দিকে যতটা সম্ভব এগিয়ে নিয়ে গিয়ে কাদার মধ্যে একটা লগি পুঁতে দিল। তারপর নৌকো থেকে খুব লম্বা একটা তক্তা নামিয়ে দিল ডাঙার ওপর। ওই তক্তার ওপর দিয়ে বনে গিয়ে নামল প্রথমে হিরু। তারপর ডেভিস, জোসি আর গণেশ। ওরা হাঁটা দিয়েছিল জঙ্গলের দিকে।

মিনিট-পাঁচেক বাদেই গণেশ ফিরে এসে নৌকোর ওপর উঠে হাতের টর্চ জ্বালাল-নেবাল তিনবার। খাঁড়ির প্রান্তের নৌকোতেও টর্চের আলো তিনবার জ্বলল আর নিবল। সঙ্কেতের নিঃশব্দ আদান-প্রদান। তারপর উল্টো দিকের নৌকোটা ধীরে ধীরে এগিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল গণেশের নৌকোর দিকে।

আকাশে আলো-আঁধারি আগের মতোই খেলা করছিল। নৌকো আরও কিছুটা এগিয়ে আসতেই গণেশ দ্বিতীয় নৌকোর যাত্রীদের মোটামুটি দেখতে পেল।

মুখে-মাথায় গামছা জড়ানো দুজন নৌকো বাইছে। মধ্যিখানে পাটাতনের ওপরে পড়ে আছে একজন। গায়ের ওপর একটা কম্বল চাপানো। দ্বিতীয় নৌকোটা প্রথম নৌকোর লাগোয়া হতেই গণেশ হিসহিসে গলায় বলল, 'লোকটাকে শিগ্‌গির এই নৌকোয় চালান করে দাও, দক্ষিণ রায়কে উৎসুগ্যু করার ভাল সময় নাকি বয়ে যাচ্ছে। হিরু খুব তাড়া লাগাচ্ছে।'

তাই শুনে ওই প্রান্তের নৌকো-বাওয়া লোকটা উঠে এসে পাটাতনের ওপরে পড়ে থাকা লোকটাকে টানাটানি শুরু করে দিল। কিন্তু খুব একটা সুবিধে করতে পারল না। আবার হিসহিস করে উঠল গণেশ, 'কী হল তোমার? মুখুজ্যে তো হলকাপলকা লোক, ওকে তুলতে পারছ না! ও বুঝতে পেরেছি, ভাল রকমেরই নেশা চড়িয়ে এসেছে! শালা, সব দায় আমার! পুজোটুজোর ব্যাপার না থাকলে একটা লাশ এক্ষুনি খাঁড়ির জলে ভাসিয়ে দিতাম।'

কথাগুলো বলতে বলতে ওই নৌকো থেকে এই নৌকোয় লাফ মেরে চলে এল প্রকাণ্ড আকারের ঝাঁকড়াচুলো গণেশ। তার পর নৌকোর পাটাতনে পড়ে-থাকা লোকটাকে একটানে তুলে নেওয়ার জন্যে ঝুঁকে পড়েছিল।

ঝুঁকেছিল কিন্তু সোজা হতে পারল না। কম্বলের ভেতর থেকে দুটো সবল হাত বেরিয়ে এসে ঝাঁকড়াচুলো মাথাটাকে ওই কম্বলের ওপরেই ঠেসে ধরেছিল। যে লোকটা পাশে দাঁড়িয়েছিল সে মুহূর্তের মধ্যে পিস্তলের বাঁট দিয়ে বেশ জোরে আঘাত করেছিল গণেশের মাথায়। ওই একটি আঘাতেই অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল বিশাল চেহারার লোকটা।

॥ ৪৩ ॥

গ্রহ-নক্ষত্রের শুভ যোগ শুরু হচ্ছে রাত দুটোর পরে। রাত দুটোর পরেই সুন্দরবনের বাঘদের খাস তালুকে পা দিয়েছিল ডেভিস-জোসি সমেত গুনিন হিরু। ওর কোমরে বাঁধা একটা থলিতে গোপন তন্ত্রসাধনার নানা উপচার। কালো বেড়ালের নখের টুকরো, লেজের লোম, একেবারে নতুন পঞ্চমুখী শাঁখ ইত্যাদি নানা দুর্লভ উপকরণ ওই থলির মধ্যেই আছে।

উচ্চবর্ণের একটি মানুষকে পুজোর শুরুতেই বাঘের দেবতা দক্ষিণ রায়ের নামে উৎসর্গ করতে হবে। পুজোর অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে শেষ করতে পারলে যারা পুজো দিচ্ছে তাদের মনস্কামনা পূর্ণ হবেই। আজকের এই পুজোর আয়োজক ডেভিস। গুনিন হিরু পুজো চড়াবে ডেভিস আর জোসির নামে। তন্ত্রমন্ত্রে ডেভিসের অগাধ আস্থা। জোসি পুজো-আচ্চায় বিশ্বাসী নয়, কিন্তু সুন্দরবনের মায়ায় অলৌকিকের দিকে কিছুটা ঝুঁকে পড়েছে এখন।

এই মুহূর্তে অবশ্য বিশ্বাস-অবিশ্বাসের চাইতে ঢের বেশি বড় হয়ে উঠেছে প্রাণের মায়া। টাইগার প্রজেক্টের কোর-এরিয়ায় মাঝরাতে পা দিয়েই বুক কেঁপে উঠেছিল জোসির। ডেভিসের মধ্যেও বেশ একটা সন্ত্রস্ত ভাব ফুটে উঠেছিল। জোসিকে একবার সতর্ক করে দিয়েই বন্দুক বাগিয়ে ধরেছিল সামনের দিকে।

আকাশে আলো-আঁধারি আগের মতোই। চাঁদের আলো জঙ্গলের ফাঁকফোকর দিয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল চারপাশে। তখন সব কিছুই পরিষ্কার, কিন্তু আবছা আঁধার নামলেই প্রত্যেকের বুকের ধুকপুকুনি এক ধাক্কায় বেড়ে যাচ্ছিল অনেকখানি।

জঙ্গলে পা দেওয়ার পরে গুনিন হিরুর গলার স্বর আরও বিকৃত আর কেমন যেন অপার্থিব হয়ে উঠেছিল। একটা মুহূর্তও নষ্ট করতে চাইছিল না। সামনের দিকে পা বাড়িয়েই হাতের টাঙ্গি ঝাঁকিয়ে গণেশকে নির্দেশ দিয়েছিল—এক্ষুনি গিয়ে ওই নৌকো থেকে দক্ষিণ রায়কে উৎসুগ্যু করার জন্যে বামুনটাকে নিয়ে এসো।

উচ্চবর্ণের মানুষ বাঘের দেবতার নামে নিবেদন করে জঙ্গলে ছেড়ে দিলে নরবলি দেওয়ার পুণ্য লাভ করা যায়। আর, এমন পুণ্যের অধিকারী যে হবে তার মনোবাসনা পূর্ণ হবেই। কর্মে সিদ্ধি কেউ আটকাতে পারবে না।

কৌশিকের সহকারী মুখার্জিবাবু উচ্চবর্ণের এবং তন্ত্রমতে সুলক্ষণযুক্ত। কলকাতার ট্যাংরা-এলাকা থেকে কাল রাতের অন্ধকারে ওঁকে হাসনাবাদে নিয়ে এসেছে ভোলা আর পচন। তারপর আজ এখানে এনেছে মাঝরাতের এই শুভক্ষণে। যথাসময়ে ভোলাদের সঙ্গে গণেশের আলোর ইশারা বিনিময়ও হয়ে গিয়েছিল।

সব কিছুই চলছে অঙ্কের নিয়মে। গভীর বনের দিকে পা বাড়াবার মুখেই হিরু হুকুম দিয়েছিল গণেশকে—বামুনটাকে নিয়ে এসো এবার। গণেশ পিছু ফিরতেই এগিয়ে গিয়েছিল হিরু। ওর দুপাশে বন্দুক হাতে ডেভিস আর জোসি। গণেশ যখন নৌকোয় উঠেছিল তখন বনের মধ্যে কিছুটা ঢুকে গিয়েছে হিরু আর ডেভিসরা। দ্বিতীয় নৌকোয় গণেশের জ্ঞান হারাবার ঘটনাটা তাই ওরা আর টের পায়নি।

নৌকোর পাটাতনের ওপরে যে লোকটা হাত-মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে ছিল, গণেশ

ঝুঁকে পড়তেই তাঁর হাতের বাঁধন খুলে গিয়েছিল আপনা-আপনিই, তার পর গণেশকে ঘায়েল করার জন্যে চোখের পলকে জব্বর দুটো ঘটনা ঘটে গিয়েছিল।

গণেশ বেহুঁশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোটা ছবিটাই উল্টে গিয়েছিল একদম। ওর হাতে-পায়ে বাঁধন পড়েছিল, তারপর গায়ে কম্বল চাপা। নৌকো ভাসতে শুরু করে দিয়েছিল খাঁড়ির উল্টো দিকে।

নৌকো নিঃশব্দে কিছুটা ভাসার পরে গণেশের পাশে দাঁড়ানো লোকটি মুখের বাঁধন খুলে ফেলে খুব চাপা গলায় বলল, 'আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ অতনু। আপনার জন্যেই অপারেশনটা সাকসেসফুল হল।'

একই রকমের চাপা গলায় বনরক্ষী অতনু বললেন, 'সব কৃতিত্ব কৌশিক মিত্রের। ভোলা আর পচন নামের দুটো ক্রিমিনালকে ঘায়েল করতে দেখলাম। এখন যেটাকে করলেন—সেটা তো নির্ঘাত ডাকাত।'

নৌকোর ওই প্রান্তের চাদর জড়ানো দাঁড়-ধরা লোকটা অস্ফুট একটা আর্তনাদ করতেই কৌশিক লম্বা পায়ে এগিয়ে গিয়ে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী হল আপনার মুখার্জিবাবু?'

বিড়বিড় করে মানুষটি বললেন, 'আমার শীত লাগছে, শরীর খারাপ করছে।'

মুখার্জিবাবুকে নৌকোর মাঝখানে নিয়ে এসে চাপা গলায় কৌশিক বলল, 'এই কম্বলটা বেশ পুরু, আপনি কম্বলের তলায় ঢুকে পড়ুন।'

আঁতকে উঠলেন মুখার্জিবাবু। 'আমি ভয়ংকর ওই ডাকাতের সঙ্গে শোব না।'

অভয় দেওয়ার ভঙ্গিতে নিচু স্বরে কেটে কেটে কৌশিক বলল, 'গণেশের হাত-পা বাঁধা। তার ওপর বেহুঁশ। ঘণ্টাতিনেকের আগে ওর জ্ঞান ফিরবে বলে মনে হয় না। আপনি নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়ুন এখন।'

জোর করেই মুখার্জিবাবুকে গণেশের পাশে শুইয়ে দিয়ে গায়ে কম্বল টেনে দিয়েছিল কৌশিক।

আকাশে আগের মতোই আলো-আঁধার। তবে আঁধার কম, আলোই বেশি। মেঘের ঝাঁক ভেসে গেছে ওদিকে। চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছিল খাঁড়ির জলে আর দু-পাশের ঠাসা বনভূমিতে। কিন্তু এই সৌন্দর্য উপভোগ করার মতো মানসিকতা ছিল না এই নৌকোর কারওরই।

খাঁড়ির এ পাশের তীরভূমির কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল নৌকোটা। গাছের ছায়া লম্বা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল খাঁড়ির জলে। নৌকোসমেত নিজেদের একটু আড়ালে রাখার জন্যে এই ছায়াটা বেশ ভাল। কৌশিক দাঁড় টানতেই অতনু চাপা গলায় বলে উঠল, 'না-না, তীরের দিকে আর এগোবেন না। এখানেই থাকুন।'

এই সতর্কবাণীর অর্থ এখানে সবার কাছেই জলের মতো সোজা। তীর থেকে এই নৌকো পর্যন্ত লাফ মারা সুন্দরবনের বাঘের কাছে কিছুই নয়। চোখের পলকে শিকার তুলে নিয়ে যাবে মুখে করে। হাতের বন্দুক জঙ্গলের দিকে তাক করে রেখে অতনু ফিসফিস করে বলল, 'এই মুহূর্তে আমাদের বিপদ বোধহয় একটু কম, হাওয়া এই দিকে বইছে।'

'তাতে কী লাভ?'

'বাঘ অত্যন্ত বুদ্ধিমান প্রাণী। বাঘ জানে হাওয়ায় ওর গায়ের গন্ধ শিকারের নাকে পৌঁছে যাচ্ছে। পৌঁছলেই সতর্ক হয়ে যাবে শিকার। সুতরাং হাওয়া ঘোরার জন্যে চুপ করে অপেক্ষা করবে বাঘ।'

জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে নিজের মনে কথা বলার ভঙ্গিতে কৌশিক বলল, 'বাঘ কি সব সময়ই এই নিয়মটা মানে!'

জলজঙ্গলের এই অলৌকিক পরিবেশে সময় খুব ধীরে গড়াচ্ছিল। চারদিক আশ্চর্য রকমের থমথমে। খাঁড়ির জলে মাছের ঘাই কিংবা রাত-জাগা পাখির ডাক মাঝেমধ্যে নির্জনতাকে কেমন যেন ঝাঁকিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল। তার পরেই সব কিছু আবার আশ্চর্য রকমের শান্ত।

কৌশিক জ্যাকেটের ভেতর-পকেট থেকে পিস্তলটা বার করে জঙ্গলের দিকে ঘুরে বসল। সময় এখানে খুবই আস্তে এগোয়। এখন, এই মুহূর্তে, বোধহয় থেমেই গিয়েছিল। নৌকোর ওপরে বসে-থাকা এই দুটি মানুষের বুকের মধ্যে অদ্ভুত একটা চাপ তৈরি হচ্ছিল মাঝেমধ্যে।

চাপ থেকেই বুঝি কিছুটা অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছিল অতনু। খসখসে গলায় বলল, 'আপনাদের অদ্ভুত এই খেলাটা আমি কিন্তু একেবারেই বুঝতে পারছি না!'

পেছন দিকে মুখ না ফিরিয়েই কৌশিক জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কীসের কথা জিজ্ঞেস করছেন?'

'আমার তো গোড়া থেকেই একটাই প্রশ্ন। চোরাশিকারিদের আপনারা এ ভাবে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকতে দিচ্ছেন কেন বারবার? যে কোনও মুহূর্তে আর একটা বাঘ ওদের শিকার হতে পারে।'

অতি মাত্রায় শান্ত গলায় কৌশিক বলল, 'ওরাও তে যে কোনও মুহূর্তে বাঘের শিকার হতে পারে।'

চাপা একটা জান্তব উল্লাস খেলে গিয়েছিল অতনুর গলায়। 'হলে আমি খুবই খুশি হব। চোরাশিকারিরা শুধু সমাজের নয়, জঙ্গলেরও সব চেয়ে বড় শত্রু। বাঘের হাতেই এদের মরা উচিত।'

'আপনি এদের চোরাশিকারিই ভেবে নিয়েছেন?'

'তা নয়তো কী?'

অতনুর পাল্টা প্রশ্নের কোনও উত্তর দিল না কৌশিক। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি তো টাইগার প্রজেক্টের কোর-এরিয়ার বহুবার গেছেন, আপনি বোধহয় বলতে পারবেন—।'

'কী?'

'ডেভিসরা যেখানে নেমেছে—ওই জঙ্গলের মধ্যে একটুখানি গেলেই কি তিন-চারশো বছরের পুরনো একটা মন্দির আছে?'

'আছে, কিন্তু আপনি কী করে জানলেন?'

'শুনেছি। একজন মৌলি বলছিল আজ সকালেই।'

'ভাঙা মন্দিরগুলো বাঘেদের প্রিয়, বিশেষ করে বাঘিনীদের। বাচ্চা হওয়ার পরে ওই সব জায়গায় চলে আসে। ভাঙাচোরা মন্দিরের দেয়ালের আড়ালে বাচ্চাদের সামলে রাখে। বিশ্রামের সময়েও বাঘ-বাঘিনী এই সব জায়গা পছন্দ করে। পোচাররা এই ব্যাপারটা জানে—।'

অতনুর ইঙ্গিত খুব স্পষ্ট। কিন্তু কৌশিক ওদিকে একেবারেই না গিয়ে জিজ্ঞেস করল,

'শোনা যায়, তিন-চারশো বছর আগে এখানকার রাজারাজড়ারা নাকি এই সব মন্দিরের মধ্যে তাদের টাকা-পয়সা সোনাদানা লুকিয়ে রাখত?'

হাসি লুকোবার চেষ্টা করে অতনু নিচু গলায় বলল, 'সোনাদানা খোঁজার জন্যে ওখানে যাবেন নাকি একদিন আমার সঙ্গে?'

কৌশিক হাসল না। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পরে প্রশ্ন করল, 'ডেভিসরা যে মন্দিরটার দিকে গেছে, সেই মন্দিরটাই নাকি এই অঞ্চলের সব চেয়ে পুরনো মন্দির?'

এবারও অতনু হাসল। 'সব পোড়ো মন্দিরের চেহারাই আমার কাছে একরকম ঠেকে। কোন্‌টার বয়েস দুশো, আর কোন্‌টার বয়েস চারশো—তফাত করতে পারি না।'

আরও কিছুক্ষণ পাথরের মতো বসে থাকার পরে কৌশিক দ্রুত গতিতে উল্টো দিকে ঘুরে জ্যাকেটের পকেট থেকে দূরবিন বার করে চোখে আঁটল। তার পর দূরের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকার পরে বলল, 'আরও একটা নৌকো আসছে।'

অতনুও তাকিয়েছিল পেছন দিকে। বহু দূরে ঝাপসা একটা নৌকোর মতো। এই চাঁদের আলোয় দূরের দৃশ্য এর বেশি দেখা সম্ভব নয়, কিন্তু জলের কাছাকাছি কান নিয়ে গেলে জলের তরঙ্গে দাঁড় টানার খুব সূক্ষ্ম একটা শব্দ শোনা যায়।

অতনু জিজ্ঞেস করল, 'নৌকোর যাত্রীদের দেখা যাচ্ছে?'

চোখে দূরবিন-আঁটা কৌশিক বলল, 'না, এখনও ঠিক দেখা যাচ্ছে না। তবে মনে হচ্ছে নৌকোয় দুজন আছে। আচ্ছা, আমাদের নৌকোটা গাছের এই ছায়ায়-ছায়ায় ওদিকে আরও কিছুটা এগিয়ে নিয়ে গেলে হয় না?'

কথার কোনও উত্তর না দিয়ে অতনু নৌকো এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল ওই দিকে। একাই দাঁড় টানছিল। ওদিকে দূরবিনে চোখে এঁটে বসেছিল কৌশিক।

দূরের নৌকো আস্তে আস্তে কাছে এল।

কৌশিকের কাছ থেকে দূরবিন চেয়ে নিয়ে সেটা চোখে লাগাল বনরক্ষী অতনু, তার পর একটু চমকে উঠে ফিসফিস করে বলল, 'এ তো দেখছি এম ভি দিনমণি লঞ্চের সেই সাহেব আর তার সঙ্গী। এরাও কি চোরাশিকারিদের দলে আছে?'

প্রশ্নের কোনও উত্তর দিল না গোয়েন্দা।

খাঁড়ির ওদিক দিয়ে নৌকোটা এবার একটু দ্রুতই এগোচ্ছিল। নৌকোর মুখ তীরে-বাঁধা ডেভিসদের নৌকোর দিকে। ওই নৌকোটা খাঁড়ির জলে অল্প-অল্প দুলছিল। তীরে ডেভিসদের কাউকেই দেখা যাচ্ছিল না।

খালি চোখে মোটামুটি ভাবে সব কিছুই দেখতে পাচ্ছিল কৌশিক, তবু ও অতনুর কাছ থেকে দূরবিনটা চেয়ে নিয়ে চোখে আঁটল।

ডেভিসদের নৌকোর কাছে পৌঁছবার পরেই তৎপরতা বেড়ে গিয়েছিল ওই দুজনের। হার্ডির সঙ্গী দ্রুত হাতে দড়ি দিয়ে দুটো নৌকোকে বেঁধে ফেলেছিল। তার পরেই এ নৌকো থেকে ওই নৌকোয়। ডেভিসদের নৌকো থেকে সরু লম্বা একটা তক্তা নামিয়ে দেওয়া হয়েছে তীরে। ওই তক্তা দিয়ে আস্তে আস্তে বাঘদের খাস তালুকে নেমে পড়ল দুজনেই। হার্ডির হাতে বন্দুক, সঙ্গীর এক হাতে পিস্তল, অন্য হাতে লম্বা একটা টর্চ। নামবার পরেই ওরা থমকে দাঁড়িয়েছিল কয়েক মুহূর্ত, তার পর চারদিক দেখে নিয়ে জঙ্গলের দিকে পা বাড়িয়েছিল।

অতনু বন্দুকটা তুলে নিয়েছিল হাতে, তারপর একটু বুঝি বিরক্তির সঙ্গেই জিজ্ঞেস করল, 'এবার আপনার নির্দেশ কী?'

অসম্ভব ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল গোয়েন্দা, 'আমাদের নৌকো এবার ওই নৌকো-দুটোর দিকে নিয়ে চলুন আস্তে আস্তে।'

আস্তে আস্তেই নৌকো এগোতে লাগল ওই দিকে। আকাশে মেঘ কেটে গিয়েছে। চারদিকের জলেজঙ্গলে হলুদ চাঁদের আলো। আশ্চর্য রকমের নিঝুম চারদিকের প্রকৃতি। কিন্তু আচমকা এই নির্জনতাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে গুলির শব্দ উঠল কাছের ওই জঙ্গল থেকে।

বনরক্ষী অতনু একটু চমকে উঠে বনের দিকে তাকিয়েছিল তীক্ষ্ণ চোখে। কৌশিক ঠাণ্ডা ভঙ্গিতে জ্যাকেটের পকেট থেকে পিস্তল বার করে শূন্যে দু-রাউণ্ড গুলি ছুড়ল। সঙ্গে সঙ্গে খাঁড়ির ওদিকের নদী থেকে জোরালো একটা শব্দ ভেসে আসতে লাগল এদিকে।

শব্দটা বাড়তে বাড়তে আরও কিছুটা বাড়ার পরে খাঁড়ির মুখে স্পিডবোট দেখা গেল। একটা নয়, দু-দুটো। একটা পুলিশের, অন্যটা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের।

জ্যাকেটের পকেটে পিস্তল চালান করে দিয়ে কৌশিক দাঁড় নিয়েছিল হাতে। তারপর বলল, 'জোরে টানুন, ওই নৌকো-দুটোর কাছে পৌঁছতে হবে তাড়াতাড়ি।'

এবার আর শব্দ গোপন করে দাঁড় টানা নয়, শক্তিশালী দু-জোড়া হাত নৌকো বাইছিল। ওই জোড়া নৌকোর কাছে এদের নৌকো পৌঁছবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই স্পিড বোট দুটো পৌঁছে গিয়েছিল ওখানে।

তারপর যা ঘটল তার সঙ্গে বোধহয় যুদ্ধকালীন তৎপরতার বেশ মিল আছে। স্পিডবোট থেকে জোরালো দুটো সার্চলাইটের আলো পড়ল জঙ্গলের ওপর। একটা বোটে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দাপ্রধান সন্দীপ দেব, এখানকার এস. পি ; সি. আই আর স্থানীয় থানার ও সি। অন্য বোটে ছোটখাটো একটা বাহিনীসমেত রেঞ্জার সাহেব। কৌশিক লাফ দিয়ে উঠেছিল ওদের বোটে। ওর সঙ্গে ওদের প্রয়োজনীয় কথাবার্তা এক মিনিটেই সারা হয়ে গিয়েছিল।

তার পরেই শুরু হয়েছিল অপারেশন। শূন্যে তিন রাউন্ড গুলি ছোড়ার পরেই বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দশজন বনরক্ষী নেমে পড়েছিল জঙ্গলে। শূন্যে ওই যে তিন রাউন্ড গুলি ছোড়া হয়েছিল—তা বাঘ তাড়াবার জন্যে। গুলির শব্দে বাঘ যে পালাবেই, তার কোনও মানে নেই। তবে এ এক ধরনের সতর্কতা। পরের বিপদের আশঙ্কা চোরাশিকারিদের কাছ থেকে। চোরাশিকারিরা বাঘের চাইতেও ঢের বেশি হিংস্র প্রকৃতির।

দুটো স্পিডবোট থেকে দুটো সার্চলাইট বনরক্ষীদের পথে এবং আশেপাশে ঘুরছিল। খাঁড়ির ধার থেকে বনের মধ্যে একটুখানি এগোলেই আদ্যিকালের একটা ভাঙা মন্দির।

মন্দিরের কাছাকাছি পাওয়া গেল সবাইকে। ডেভিসের অবস্থাই সব চাইতে খারাপ। কাঁধে বাঘের কামড়, সারা গা রক্তে ভেসে যাচ্ছিল। তবে জ্ঞান টনটনে। দুই বনরক্ষী ওকে ধরাধরি করে নিয়ে এল বোটে। হার্ডির ডান হাতে গুলি লেগেছিল, যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে উঠেছিল গোটা মুখ। দুই বনরক্ষী ওকেও নিয়ে গেল বোটে। হিরু গুনিন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল মাটিতে, মুখে গ্যাঁজলা। ওকে এক বনরক্ষী ঘাড়ে করে নিয়ে গেল। জোসির মুখের রং সাদা কাগজের চেয়েও সাদা। অক্ষত ছিল হার্ডির বাঙালি সঙ্গীটিও, কিন্তু একটু বুঝি অসাড় গোছের হয়ে গিয়েছিল।

কৌশিক প্রথমেই জানিয়ে দিয়েছিল—সংখ্যায় ওরা পাঁচজন। সেই পাঁচজনকেই পাওয়া গেছে। বনরক্ষীরা হাতের টর্চ ঘুরিয়ে মন্দিরের চারপাশ দেখে নিয়েছে। না, কোথাও কোনও মৃত বাঘ নেই। বাঘ অবশ্য মারা যাওয়ার কোনও কারণও নেই। একটু আগে এই জঙ্গল থেকে একটা মাত্র গুলির শব্দ শোনা গিয়েছিল। গুলি বাঘের গায়ে লাগেনি, ফসকে গিয়ে লেগেছে আর এক সাহেবের হাতে।

এস. পি ব্যস্ত হয়ে বললেন, "জখম-হওয়া লোকদুটোকে এক্ষুনি হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। লেট'স মুভ।"

গণেশ এখনও অজ্ঞান, ওকে আর মুখার্জিবাবুকে তুলে নেওয়া হয়েছিল স্পিডবোটে। ছ'জন বনরক্ষীর ওপর দায়িত্ব দেওয়া হল নৌকো-তিনটেকে নিয়ে আসার জন্যে। ওই দুটো স্পিডবোটই বেশ ভাল রকমের স্পিড তুলে ছুট লাগিয়েছিল হাসনাবাদের দিকে।

চাঁদ আকাশের এক ধারে ঢলে পড়েছে। আকাশে মেঘ নেই, কিন্তু চাঁদের আলো আগের মতো ছড়িয়ে পড়তে পারছিল না চারদিকে। অল্প-অল্প করে কুয়াশা জমতে শুরু করে দিয়েছে।

স্পিডবোট আর কিছুটা এগোবার পরে কৌশিক গোয়েন্দাপ্রধানের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'সন্দীপদা, ওদের দুজনকে নিয়ে এসেছেন তো?'

'ওরা মানে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের রনি আর লিজিয়া?'

'হ্যাঁ, ওদের তো সঙ্গে করে আনার কথা বলেছিলাম—।'

মুচকি হেসে ওর সন্দীপদা বললেন, 'তুমি আদেশ দিয়েছ, অথচ আমি পালন করিনি—এমন কখনও হয়েছে নাকি? শুধু ওদেরই আনিনি, এখানে আসার আগে একবার হো চি মিন সরণিতে ঢুঁ মেরেছিলাম। হাসনাবাদের এই অপারেশনে আমার তো নর্মাল কোর্সে আসার কথা নয়—। কিন্তু ভাবলাম, আসছিই যখন তোমার পয়েন্টটাকে আর একটু জোরদার করার চেষ্টা করা যাক। তাই তো—।'

'কিন্তু হো চি মিন সরণিতে গিয়েছিলেন কেন?'

'বাহ্! ওখানেই তো ব্রিটিশ ডেপুটি হাইকমিশনের অফিস। আমি ওঁদের প্রেস অ্যান্ড পাবলিক অ্যাফেয়ার্সের চিফকেও হাসনাবাদে নিয়ে এসেছি। রনিদের সঙ্গে একটা গেস্টহাউসে আছেন। এই ভদ্রলোক ওখানকার পুরনো এমপ্লয়ি, আইডেন্টিফিকেশনের ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করতে পারেন।'

মুখে তারিফ করার শব্দ তুলে কৌশিক বলল, 'খুব ভাল করেছেন সন্দীপদা।'

ভোররাতে হাসনাবাদের ঘাটে এসে ভিড়ল স্পিডবোট-দুটো।

॥ ৪৪ ॥

প্রশাসন ঝাঁপিয়ে পড়লে অনেক কাজই অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে হয়ে যায়। এখানেও তাই হয়েছিল। দিনের আলো ভাল ভাবে ফোটার আগেই অনেকগুলো ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে গিয়েছে। সুচিকিৎসার জন্যে স্থানীয় একটা নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে ডেভিস আর

হার্ডিকে। হার্ডির হাত থেকে গুলি বার করে দিয়েছে সার্জেন। বাঘের কামড়ে জখম ডেভিসের চিকিৎসা শুরু হয়ে গিয়েছে নার্সিংহোমে পৌঁছবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

নার্সিংহোমে এই দুই সাহেব ছাড়া জায়গা পেয়েছে গুনিন হিরু মণ্ডল। লোকটার জ্ঞান ফিরছে মাঝেমধ্যে, কিন্তু অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে ঠিক পরের মুহূর্তেই। একটা রুমে আছে গণেশ, ওর জ্ঞান ফেরেনি এখনও। আর একটা রুমে আছেন কৌশিকের সহকারী মুখার্জিবাবু। মানুষটির শরীর-স্বাস্থ্যে বড় রকমের কোনও গোলমাল দেখা দেয়নি, কিন্তু কয়েক দিনের দুর্ভোগ আর দুর্ভাবনায় অসম্ভব দুর্বল হয়ে পড়েছেন।

প্রত্যেকেরই চিকিৎসা চলছে পুরোদমে। মুখার্জিবাবুর ঘরটা বাদ দিয়ে বাকি চারটে ঘরেই পুলিশ পোস্টিং। নার্সিংহোমের সদর-দরজাতেও পুলিশ-পাহারা। হার্ডির সঙ্গী মহাদেব দাসকে থানার লক-আপে রাখা হয়েছে।

অল্প সময়ের মধ্যে ভয়ংকর যে-সব ঘটনা ঘটে গিয়েছে, তার ধাক্কায় রীতিমত বিহ্বল হয়ে পড়েছিল জোসি। মুখে কোনও কথা নেই, চলাফেরাতেও আড়ষ্ট ভাব।

কৌশিক পুলিশের দুই বড় কর্তার অনুমতি নিয়ে জোসিকে সঙ্গে করে কাছের একটা গেস্টহাউসের দিকে রওনা দিল। সঙ্গে আর্মড গার্ড। পথে কিছু দরকারি কথাবার্তা সেরে নিয়েছিল কৌশিক।

গেস্টহাউসের সিটিংরুমে লিজিয়া, রনি আর ব্রিটিশ ডেপুটি হাইকমিশনের প্রেস অ্যান্ড পাবলিক অ্যাফেয়ার্সের চিফ অমিতাভ পাল গল্প করছিলেন। জোসি ওখানে পৌঁছতেই উঠে দাঁড়িয়েছিল লিজিয়া আর রনি।

জোসির বিহ্বলতা এখনও বুঝি পুরোপুরি কাটেনি। লিজিয়া আর রনিকে হঠাৎ এখানে দেখে ও চমকে উঠেছিল, খুশিও হয়েছিল খুব। কিন্তু চমক বা আনন্দ—দুটোর কোনওটারই স্বাভাবিক প্রকাশ দেখা যাচ্ছিল না ওর মধ্যে। একটু আগে সুন্দরবনের মধ্যে ভয়ংকর যে ঘটনা ঘটে গিয়েছে, তার ধাক্কায় বুঝি এখনও কিছুটা অসাড়। লিজিয়া ছুটে গিয়ে বন্ধুকে জড়িয়ে ধরতেই রীতিমত কেঁপে উঠেছিল জোসি। চোখ ফেটে ওর জল পড়েছিল কয়েক ফোঁটা।

লিজিয়া বন্ধুকে ধরে ধরে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়েছিল। রনি এসে জোসির হাত ঝাঁকিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'সুন্দরবন তোমার কেমন লাগছে বলো?'

হাতের রুমাল দিয়ে চোখের জল চট করে মুছে নিয়ে মৃদু হেসে উত্তর দিল জোসি, 'গ্রেট! তোমরা হঠাৎ এখন এখানে?'

'তোমাকে একটা সারপ্রাইজ দিতে এলাম।'

রনির কথায় ম্লান হাসি হেসে জোসি বলল, "হ্যাঁ, ইট'স আ প্লেজান্ট সারপ্রাইজ। আমি খুব খুশি হয়েছি।"

জোসিকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। লিজিয়া সহানুভূতির গলায় বলল, 'শি নিড্‌স সাম রেস্ট।'

ওর কথায় সায় দিল রনি। 'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ। জোসির একটু বিশ্রাম দরকার। এই গেস্টহাউসের তো কয়েকটা রুম আছে, জোসি তো এখানেই বিশ্রাম নিতে পারে।'

রনির কথায় এবার সায় দিল কৌশিক। 'বিশ্রাম নেওয়ার জন্যেই তো গেস্টহাউসটা নেওয়া হয়েছে। জোসির শুধু বিশ্রাম নেওয়া নয়, তোমাদের সঙ্গে আলাদা করে একটু গল্প

করারও দরকার। ট্রমা কাটাবার জন্যে এই দুটোই খুব জরুরি। তার আগে তোমাদের তিনজনের কাছে পুলিশ একটু সাহায্য চাইছে।' ব্রিটিশ ডেপুটি হাইকমিশনের প্রেস অ্যান্ড পাবলিক অ্যাফেয়ার্সের চিফ অমিতাভ পালের দিকে তাকিয়ে কৌশিক বলল, 'মিস্টার পাল, পুলিশ আপনার কাছ থেকেও কিছুটা সাহায্য চায়।'

সাহায্য করার প্রস্তাব পুলিশেব পক্ষ থেকে যত বিনীত এবং শিষ্ট ভঙ্গিতেই আসুক না কেন, প্রত্যেকেই জানে—ওই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। ওই ধরনের অনুরোধকে গোড়াতেই আদেশ ভেবে নেওয়া ভাল। এমন একটা ব্যাখ্যা এই চারজনের মাথাতেই বুঝি খেলে গিয়েছিল। সুতরাং অতিমাত্রায় বাধ্য মানুষের ভঙ্গিতে পুলিশের নির্দেশ পালন করল চারজ'নই। উপস্থিত কাজ বলতে পুলিশের জেরার মুখে দাঁড়ানো এবং বিবৃতি দেওয়া। আইডেন্টিফিকেশনের কাজটা পরে হবে।

প্রথম দফাব কাজ মেটার পরে জেলাব এস. পি. চৌধুরী চারজনকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, 'আপনারা এখন বিশ্রাম নিন, পরে আর একটু ট্রাবল দেব।'

গেস্টহাইসে চারজনকে বেখে বেরিযে এল এস. পি. চৌধুরী, স্থানীয় থানার ও সি. গুরুচরণ দে আর তরুণ গোয়েন্দা কৌশিক মিত্র। অতিথিনিবাসের গেটে পুলিশ বসে গিয়েছিল।

সি. আই.-এর অফিস গেস্টহাইস থেকে জিপে মাত্র তিন মিনিটের পথ। এস. পি. সাহেব সঙ্গীদের নিয়ে ওখানে এসে হাজির হলেন। সি. আই. শ্রীকৃষ্ণ মাইতির চেয়ারে বসেছিলেন কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দাপ্রধান সন্দীপ দেব। উলটো দিকের চেয়ারে শ্রীকৃষ্ণ।

এস. পি. আসতেই থানার সবাই নড়েচড়ে উঠলেন। সন্দীপ দেব বেশ আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওদিককার খবর কী?'

একগাল হেসে এস. পি. উত্তর দিলেন, 'আমাদের গ্রেট প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর আগে যা-যা বলেছিলেন, সব তো দেখছি সেই দিকেই এগোচ্ছে।'

'কী রকম, শুনি।'

এস. পি. চৌধরী মৃদু হেসে বললেন, 'আমরা সবাই কৌশিকের কাছ থেকে অল্প-অল্প শুনেছি। এবার পুরোটা শুনতে হবে। কিন্তু এ ভাবে খালি পেটে শোনা যাবে না। মাইতি, আপনার সেই বিখ্যাত আড়াই প্যাঁচ কোথায়?'

ঝলমলে মুখে সি. আই. মাইতি বললেন, 'আমি স্যার দোকানদারকে অনেক আগেই বলে রেখেছি। বলেছি, বেশ বড় করে আর কড়া করে ভাজবে। হয়ে এল বোধহয়। এই দেখ তো—।

মাইতির কথা শেষ হওয়ার আগেই সাদা পোশাকের একজন কনস্টেবল ছুটল জিলিপির দোকানে। ফিরে এল একটু বাদেই মস্ত দুই চ্যাঙারি জিলিপি নিয়ে।

অফিসের ওপরেই সি. আই সাহেবের কোয়ার্টার্স, ওখান থেকে কয়েকটা প্লেট নিয়ে আসার পরে প্লেট ভর্তি জিলিপি ধরানো হল সবার হাতে।

লালচে, রসে টইটম্বুর গরম-গরম জিলিপির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন সবাই। কৌশিকের সন্দীপদা বললেন, 'জিলিপি মুখে দেওয়ার পরেই বুঝতে পারলাম, সত্যিই বেশ খিদে পেয়ে গিয়েছিল। খিদের অবশ্য দোষ কী, কাল মাঝরাত্তির থেকেই তো ধকল চলছে

আমাদের সবার। সব চেয়ে আনন্দের খবর, অপারেশনটা সাকসেসফুল। নাও কৌশিক, শুরু করো তোমার কাহিনী। আমরা তোমার নির্দেশে কম-বেশি হাত লাগিয়েছি কাজে, কিন্তু পুরো ঘটনাটা কেউই আমরা জানি না। তদন্ত শেষ, তোমার তো মুখ খোলার ব্যাপারে এখন আর কোনও আপত্তি থাকার কথা নয়। নাও, শুরু করো। আচ্ছা, দিব্যি তো সুন্দরবনে বেড়াতে এসেছিলে। চমৎকার ট্রিপ। সঙ্গীসাথিরাও বেশ কালারফুল। হঠাৎ কেন তোমার মনে হল যে, এর মধ্যে কিছু গোলমেলে ব্যাপার আছে?'

কৌশিক ইতিমধ্যে একটা জিলিপি খেয়ে ফেলেছে। আঙুলের মাথার রসটুকু চুষে নিয়ে লাজুক মুখে বলল, 'বড়-বড় কাজগুলো আপনারাই করেছেন, আমাকে অকারণে অত বাহবা দেবেন না—।'

গোয়েন্দার কথার জোরালো প্রতিবাদ উঠল তিন দিক থেকে। এস. পি. চৌধুরী মৃদু হেসে বললেন, 'ঠিক আছে, আমরা আপনাকে কোনও ক্রেডিট দেব না, আপনি গোটা ব্যাপারটা আমাদেব চটপট শুনিয়ে দিন।'

বেলা মাত্র সাড়ে-আটটা। সকালেব নবম হলুদ রোদ ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে একবার তাকিয়ে নেওয়ার পরে কৌশিক বলল, 'সত্যিই, দারুণ শুরু হয়েছিল আমাদের সফর। ভেবেছিলাম—শুয়ে-বসে, গল্প করে আর অসাধারণ প্রকৃতি দেখে চমৎকার কেটে যাবে দিনগুলো। শুরুটা দিব্যি ছিল, কিন্তু প্রথম খটকা লাগে গণেশ ঢালির রহস্যজনক চালচলন দেখে। নজর রেখেছিলাম ওর ওপর। বুঝতে পেরেছিলাম, ও একা নয়—ওর পেছনে আরও কয়েকজন আছে। এই সময় রনির চিঠিটা হাতে আসে, আর ওটা পডতেই রহস্যের চেহারা বেশ কিছুটা স্পষ্ট হয়ে যায়।'

'রনি কি চিঠি দিয়েছিল তোমাকে?'

'না, আমাকে নয়, ওর কাকা মানে আমাদের পূর্ণদাকে। কলকাতা ছাড়ার আগেই চিঠিটা ওঁর হাতে এসেছিল, কিন্তু ঘটনাচক্রে ওটা তখন আর ওঁর পড়া হয়ে ওঠেনি। সুন্দরবনের নদীতে লঞ্চে চেপে দু-তিনটে দিন কাটাবার পরে চিঠিটা উনি পড়ে আমাকে শুনিয়েছিলেন। জোসিকে হাসনাবাদের ফেরিঘাটে আমাদের চেনা যাতে সহজ হয় তার জন্যে জোসির একটা ফোটোগ্রাফ পাঠিয়েছিল রনি। তিনজনের ছবি—মধ্যিখানে জোসি, একদিকে ওর একদা বয়ফ্রেন্ড ক্রিস্টি ক্যাম্পবেল অন্যদিকে রনি। রনি জানিয়েছে, এই ক্যাম্পবেলের সঙ্গে জোসির সম্পর্ক ইদানীং একেবারেই চটে গেছে। কারণ ছেলেটা ভিড়ে গেছে মাফিয়াদের সঙ্গে। এখন তো গ্যাং-লিডার। একটা সময় জোসি ওকে সঙ্গে নিয়েই সুন্দরবনে আসার কথা ভেবেছিল। ক্যাম্পবেলের থুতনিতে ছাগলদাড়ি, কার সঙ্গে ওর চেহারার খুব যেন মিল। বেশ চেনা-চেনা লাগছিল। শেষকালে মনে মনে ওই ছাগলদাড়িটা মুছে দিতেই চিনে ফেলেছিলাম ওকে।'

'কে ও?'

'ভারতে ও নাম-পরিচয় ভাঁড়িয়ে এসেছে। এখানে ওর নাম গর্ডন এস হার্ডি। কী জন্যে এসেছে? না, সুন্দরবনের ইকো-সিস্টেম নিয়ে গবেষণা করতে—।'

বেশ তারিফ করার গলায় সন্দীপ দেব বললেন, 'তোমার চোখ তো দারুণ! ছবি দেখেই চিনে ফেললে লোকটাকে। ছবিতে আবার দাড়ি আছে, এখানে তা নেই।'

একটু বিব্রত মুখে কৌশিক বলল, 'না-না, আমাকে খুব ভাল একজন অবজারভ্যান্ট

হিসেবে ধরে নেবেন না। আসলে হাসনাবাদে আসার পথে এই লোকটা আর ওর সঙ্গীকে পেয়েছিলাম আমরা। লোকটার কপালে খুব পরিষ্কার একটা আইডেন্টিফিকেশন মার্ক আছে—চুলের গোড়া থেকে ভুরু পর্যন্ত লম্বা একটা কাটমার্ক। থুতনিতেও সদ্য-শুকনো মস্ত একটা কাটা দাগ। ফোটোগ্রাফ দেখে বুঝলাম, থুতনির চোট সারাবার জন্যে সাধের দাড়ি ফেলে দিতে হয়েছে সাহেবকে। রনির চিঠিতে আরও একটা খবর জানতে পেরে রীতিমত চমকে উঠেছিলাম আমি—।'

'কী খবর?'

'রনি লিখেছে, ডেভিসের ডান হাতে কালনাগিনীর উল্‌কি আছে, কিন্তু আমরা তো উল্টো দেখছি। সাহেবে বাঁ হাতে উল্‌কি।'

চোখ একটু ধারালো করে এস. পি চৌধুরী বললেন, 'ডান হাত বাঁ হাত লিখতে গিয়ে অনেক সময় একটু উল্টোপাল্টা হয়ে যায় কিন্তু—।'

সায় দিয়ে কৌশিক বলল, 'ঠিক। প্রথমে আমারও তাই মনে হয়েছিল। ডেভিস ন্যাটা, কাজের হাতকে আমরা অনেক সময় ডান হাত ভেবে নিই।'

চৌধুরী বললেন, 'ডেভিসকে দেখে তেমন কিছু হয়তো মনে হয়েছিল রনির।'

একটা ঢোক গিলে কৌশিক বলল, 'কিন্তু এক্ষেত্রে তেমন ভাবার সম্ভাবনা ছিল না। ডেভিসকে রনি আগে দেখেনি। শুধু রনি নয়, জোসিও আগে কখনও ডেভিসকে দেখেনি।'

অবাক হলেন সন্দীপদা। 'আগে দেখেনি মানে!'

একটু হেসে কৌশিক বলল, 'ভারতে আসার আগে পর্যন্ত জোসির সঙ্গে ডেভিসের পরিচয় ছিল শুধুমাত্র চিঠিপত্রের মাধ্যমে।'

'অ্যাঁ! কী বলছ!'

'পূর্ণদা ভাল বলেছেন। বলেছেন, এই সব ঘটনার দিকে তাকালেই জিনে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে। অ্যাডভেঞ্চারের দিকে বিরাট ঝোঁক না থাকলে সাড়ে-তিনশো চারশো বছর আগে কারও পক্ষে ভূপর্যটক হওয়া সম্ভব ছিল না। উত্তরাধিকার সূত্রে বার্নিয়েরের অ্যাডভেঞ্চারের নেশা জোসিও পেয়েছে।'

চৌধুরীর দৃষ্টি আবার ধারালো হয়ে উঠেছিল। 'জোসির সঙ্গে ডেভিসের যোগাযোগটা ঠিক কী ভাবে হয়েছিল?'

'এই যে লিজিয়া—ডেভিসের প্রাক্তন বউ, এর সঙ্গে জোসি জুরিখের একটা অফিসে কিছুদিন একসঙ্গে কাজ করেছিল। সুন্দরবন বলতে জোসি অজ্ঞান। তাই শুনে লিজিয়া বলেছিল, ওর আগের বর আবার ভারতবর্ষ বলতে অজ্ঞান। ভারতের তন্ত্রমন্ত্রের ওপর দারুণ আস্থা। তান্ত্রিক-ফকিরের কেরামতিতে অসম্ভব বিশ্বাসী। জোসিও তাই, ব্যস ওটা ওদের একটা স্ট্রং মিটিং পয়েন্ট হয়ে গিয়েছিল। কলকাতার ব্রিটিশ ডেপুটি হাইকমিশনের ঠিকানায় ডেভিসকে চিঠি দিয়েছিল জোসি। ডেভিস কাশী-মথুরা-বৃন্দাবন-আজমিরে ঘোরাঘুরি করলেও কলকাতায় আসত প্রায়ই। পুরনো অফিসে চিঠিপত্রের খোঁজে যেত। ব্যস, এখানেই জোসির চিঠি ওর হাতে আসে। তার পরেই চিঠির লেনদেন, একসঙ্গে সুন্দরবন ঘোরার পরিকল্পনা। লিজিয়া অবশ্য জোসিকে নানা ভাবে আটকাবার চেষ্টা করেছিল। বলেছিল, ডেভিস পুরো খ্যাপা। তুমি ওর খপ্পরে পোড়ো না। কিন্তু বোঝানোয় কোনও ফল হয়নি। সুন্দরবন অল্প বয়স থেকে জোসির কাছে মস্ত এক অবসেশন।'

'কেন, পৃথিবীর সব জায়গা ছেড়ে সুন্দরবনের ওপর ওর এত আগ্রহ কেন?'

চৌধুরীর প্রশ্নের জবাবে কৌশিক বলল, 'ও, আপনি এই দিকের ব্যাপারটা পুরো জানেন না। মুঘল যুগে ভারতে এসেছিলেন ফরাসি পর্যটক বার্নিয়ের। ফিরে গিয়ে দুর্ধর্ষ এক ভ্রমণকাহিনী লেখেন। ওই ভ্রমণকাহিনীতে বাংলাদেশ সম্পর্কে বার্নিয়ের উচ্ছ্বসিত। লিখেছেন, পৃথিবীতে সোনার দেশ যদি কোথাও থাকে, তা হল এই বাংলাদেশ। তা, পূর্বপুরুষের ওই ভ্রমণকাহিনীতে সোনার বাংলার হদিশ পেয়ে অল্প বয়স থেকেই জোসি উত্তেজিত। কষ্ট করে বাংলা শিখেছিল। ওর আগের স্বামী ছিল বাঙালি। বাংলা ভাষায় সড়গড় হয় তখন থেকেই। তবে শুধু সোনার দেশ বাংলাদেশ দেখতে আসা নয়, পরের উদ্দেশ্যটাই বড় হয়ে উঠেছিল জোসিদের কাছে।'

'পরের উদ্দেশ্য! কী সেটা?'

'গুপ্তধন উদ্ধার করা।'

কথাটা শুনে চমকে উঠেছিল ঘরের সবাই। 'গুপ্তধন!'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে কৌশিক স্পষ্ট ভাষায় বলল, 'হ্যাঁ, গুপ্তধন। লঞ্চে জোসিদের চালচলন, মাঝরাত্তিরে সুন্দরবনের কোর-এরিয়ায় ঢোকা দেখে আমার এই রকম একটা সন্দেহ তৈরি হয়েছিল। একদিন লুকিয়ে ডেভিসের ঘরে ঢুকে জঙ্গলের মধ্যে তৈরি মন্দিবের একটা নক্‌শা দেখেছিলাম। পুরো ব্যাপারটা পরে জানতে পারি রনির সঙ্গে কথা বলার পরে। একটু আগে জোসিকে নিয়ে লিজিয়াদেব ওখানে যাওয়ার পথে জোসিও কনফার্ম করেছে ব্যাপারটা।'

সবার মুখেই কৌতূহলের ছাপ পড়েছিল। চৌধুরী বললেন, 'বিষয়টা একটু খুলে বলুন তো?'

কেশে গলা পরিষ্কার করে কৌশিক বলল, "আজ থেকে সাড়ে তিনশো-চারশো বছর আগে ফরাসি দেশে একটা নিয়ম ছিল—কেউ বই ছেপে বার করতে চাইলে দেশের সম্রাটের অনুমতি নিতে হবে। পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করে দেখার জন্যে সম্রাটের নাকি একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি ছিল। সেই কমিটির কাছে বার্নিয়ের পাণ্ডুলিপি জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু সবটা দেননি, কয়েকটা পরিচ্ছেদ সরিয়ে রেখেছিলেন। সেগুলো শেষ পর্যন্ত আর ছাপেনইনি। অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির ওই পাতাগুলো পুরনো দিনের কিছু দলিল-দস্তাবেজের সঙ্গে বার্নিয়েরের পরিবারে রয়ে গিয়েছিল। কেউ বোধহয় ওগুলো সে ভাবে খুঁটিয়ে পড়েনি। এতকাল বাদে জোসি পড়ে। একবার নয়, বহুবার। মুঘল যুগের হিন্দুস্থানের নানারকম প্রথা, আচার, সংস্কারের কথা লেখা আছে ওই সব পরিচ্ছেদে। লেখা আছে তন্ত্রমন্ত্রের কথা, সাধু-সন্ন্যাসী-পির-ফকিরের কথা। সেই আমলে ভারতে তুকতাক আর তন্ত্রমন্ত্রের ওপর আস্থা ছিল অসংখ্য লোকের। বিশ্বাস করত তাগা-তাবিজ, পাথরটাথর মানুষের ভাগ্য ফিরিয়ে দিতে পারে।'

কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দাপ্রধান একটু বাঁকা হাসি হেসে বললেন, 'এদিক থেকে সাড়ে-তিনশো চারশো বছর আগের ভারতের সঙ্গে আজকের ভারতের খুব মিল। জ্যোতিষী, ত্যাগা-তাবিজ, আর পাথরটাথরের ওপর যত দিন যাচ্ছে মানুষের বিশ্বাস তত বাড়ছে।'

কৌশিক হেসে বলল, 'ঠিক। পূর্ণদা এই বিষয়ে বার্নিয়েরের চমৎকার একটি ব্যাখ্যার

কথা বলেছিলেন সেদিন। বার্নিয়ের নাকি লিখেছেন, মানুষের অভাব-অভিযোগ, নিরাপত্তাহীনতা যত বাড়ে, মানুষ তত বেশি করে এই সব অলৌকিক ব্যাপারস্যাপারের দিকে ঝুঁকে পড়ে।'

বেশ তারিফ করার গলায় সন্দীপ দেব বললেন, 'বাহ্! চমৎকার ব্যাখ্যা। মুঘল পিরিয়ডের শেষের দিকে তো ভারতের অবস্থা যাচ্ছেতাই হয়ে গিয়েছিল। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তাবোধ বলে কিছুই ছিল না। এখনও তো তাই। প্রতিদিন ডাকাতি, খুনখারাপি। দিনের বেলায় শহরের মিনিবাসে পর্যন্ত ছুরি, পিস্তল দেখিয়ে ডাকাতি। তাগা-তাবিজ, পাথরওয়ালাদের রমরমাও বাড়ছে এই সব ঘটনার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে।'

শ্রোতাদের কেউই কিন্তু মূল প্রসঙ্গ থেকে সরতে চাইছিলেন না। এস. পি. চৌধুরী গলা একটু ওপরে তুলেই প্রশ্ন করে বসলেন, 'গুপ্তধন উদ্ধারের ব্যাপারটা কী যেন বলছিলেন—?'

জবাব দেওয়াব জন্যে তৈরিই ছিল কৌশিক। প্রশ্ন শোনার সঙ্গে সঙ্গে মুখ খুলল ওর। 'মুঘল আমলের শেষের দিকে ভারতের শুধুমাত্র সাধারণ মানুষরাই নয়, রাজারাজড়ারাও নিজেদের যথেষ্ট পরিমাণে নিরাপদ মনে করতেন না। দেশে ব্যক্তিগত মালিকানা বলে কিছু ছিল না, দেশের সব কিছুই সারা হিন্দুস্থানের একচ্ছত্র অধিপতি সম্রাটের। দেশে গাদা-গাদা রাজারাজড়া ছিল। কিন্তু সম্রাটের ইচ্ছেটাই সব। আজ যে রাজা, কাল সে ফকির। সুতরাং সোনাদানা, হিরে, জহরত, টাকাপয়সা লুকিয়ে ফেলার একটা ঝোঁক ছিল ধনী মানুষদের মধ্যে। রাজারাও এই নিয়মের বাইরে যায়নি। সুন্দরবন এলাকায় গভীর জঙ্গলের মধ্যে রাজারাজড়ারাও মন্দির বানাত। অনেকে সেই সব মন্দিরে নিজেদের ধনসম্পদ লুকিয়ে রাখত। কোথাও-কোথাও আবার মন্ত্রতন্ত্র পড়ে মানুষ বা প্রাণীকে যক্ষ বানিয়ে পাহারা দেওয়ার কাজ চালানো হত। বার্নিয়েরের ভ্রমণকাহিনীর অপ্রকাশিত অংশে এই সব বৃত্তান্ত লেখা আছে।'

'ওহ্! জোসি তা হলে ওই সব কাহিনী পড়ে গুপ্তধন উদ্ধার করতে এসেছিল!'

'না, শুধু ওই সব কাহিনী নয়। বার্নিয়ের একবার প্রচণ্ড এক সাইক্লোনের মধ্যে পড়েছিলেন। মারাত্মক সেই ঝড়ের বর্ণনা আছে ওঁর ভ্রমণকাহিনীতে, তবে ওই প্রসঙ্গে আরও অনেক কিছু আছে—সাইক্লোনের ভয়ে কয়েক দিন সুন্দরবন এলাকায় থেকে গিয়েছিলেন উনি। তখনকার পণ্ডিতরা জানিয়েছিলেন, শিগ্‌গিরই আবার ভয়ংকর এক সাইক্লোন দেখা দিতে পারে। কিন্তু ওই সময় জরুরি ব্যবসার কাজে বার্নিয়েরকে উত্তর ভারতের পথে রওনা হতে হয়েছিল। রওনা হওয়ার আগে ঝড়ের ভয়ে সুন্দরবনের একটা মন্দিরের মধ্যে নিজের অনেক ধনসম্পদ লুকিয়ে রেখেছিলেন। পাহারার কাজ যাতে পাকা হয় তার জন্যে স্থানীয় সাধু-সন্ন্যাসী পির-ফকির ধরে লুকনো সম্পদের ওপরে তন্ত্রমন্ত্রের বন্ধন দিয়েছিলেন।'

অবাক চোখে সন্দীপ দেব বললেন, 'বলো কী হে!'

'তন্ত্রেমন্ত্রে বিশ্বাসী হলে কী হবে, সাহেবের তো পশ্চিমী শিক্ষা ছিল, সুতরাং ওই মন্দির চেনার সুবিধের জন্য উনি মন্দিরের উনি লাগোয়া-এলাকার নিখুঁত একটা নক্‌শা বানিয়েছিলেন। উত্তর ভারত থেকে ফ্রান্সে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন বার্নিয়ের। হয়তো ওঁর আশঙ্কা হয়েছিল, আর কখনও ভারতে আসতে পারবেন না। তাই অপ্রকাশিত ভ্রমণবৃত্তান্তের সঙ্গে

মন্দিরের ওই নক্‌শাটাও রেখে দিয়েছিলেন। জোসি ওটা জানার পর থেকেই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল।'

গুপ্তধনের ওই বৃত্তান্ত শোনার পরে শ্রোতাদের সবার চোখই জ্বলজ্বল করে উঠেছিল। এস. পি চৌধুরী ঢোক গিলে বললেন, 'উত্তেজিত হওয়াটা স্বাভাবিক। শুধু জোসি কেন, ওই অবস্থায় যে-কেউ থাকলেই উত্তেজিত হত।'

॥ ৪৫ ॥

গরম গরম দু' চাঙারি জিলিপি শেষ হওয়ার পরে আরও দু' চাঙারি এসে গিয়েছিল। সকালের রোদ আগেরই মতো গাঢ় হলুদ, তবে আর একটু ঝকঝকে। সি. আই-এর অফিসঘরে বেশ কয়েকজন উৎসুক শ্রোতা, বক্তা তরুণ প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর কৌশিক মিত্র।

কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দাপ্রধান সন্দীপ দেব বললেন, 'ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ের তো শুনেছি মস্ত বড় পণ্ডিত, দার্শনিক, ফ্রান্সের পাশ-করা ডাক্তার। তিনি কী করে ভারতবর্ষের তুকতাক, মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাসী হলেন?'

উত্তরে কৌশিক বলল, 'ঠিক এই প্রশ্নটাই আমি পূর্ণদাকে করেছিলাম। পূর্ণদা তার জবাবে বলেছিলেন—বার্নিয়ের যে সময়ে ভারতে এসেছিলেন সেই সময়টাকে ভারতীয় ইতিহাসের সংকটকাল বলা হয়। মুঘল সাম্রাজ্যের তখন পতন শুরু হয়ে গিয়েছে। ওই যুগের সমাজ-সংস্কৃতির চূড়ান্ত বিকাশ যা হওয়ার তা হয়ে গিয়েছিল অনেক আগেই। ভারতে তখন যা চলছিল তার নাম অবক্ষয়। বার্নিয়ের তার বোধহয় শিকার হয়েছিলেন কিছুটা। আসলে উনি একবার মরতে মরতে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন—।'

'কী রকম?'

'এটাও শুনেছি পূর্ণদার কাছ থেকে। তখন সেভেনটিন্‌থ সেঞ্চুরির শেষ দিক। আজমিরের কাছে দারার সৈন্যদের সঙ্গে ঔরঙ্গজিবের সৈন্যদের যুদ্ধ হচ্ছিল। বার্নিয়ের সুরাট থেকে আগ্রার দিকে যাচ্ছিলেন। ওই সময় পথে দারার সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। যুদ্ধে হেরে গিয়ে সিন্ধুপ্রদেশের দিকে পালাচ্ছিলেন তিনি। দারা বার্নিয়েরকে সঙ্গে নিয়ে যান। কিন্তু পথে বার্নিয়েরের গরুর গাড়ি খারাপ হয়ে যায়। তখন আর গাড়ি বদল করার সময় ছিল না। দারা বার্নিয়েরকে ফেলে রেখেই পালায়। তার পরেই বার্নিয়ের দস্যুদের খপ্পরে পড়েন। দস্যুরা ওঁর জিনিসপত্র কেড়ে নিয়ে মারধর করে ছেড়ে দেয়। কপাল ভাল যে, প্রাণে মারেনি। কোনও মতে তিনি দিল্লি পালান। তারপর ঔরঙ্গজিবের গৃহচিকিৎসকের চাকরি নিয়েছিলেন। কিছুকাল চাকরি-বাকরি করার পর রওনা দিয়েছিলেন বাংলাদেশের পথে। পূর্ণদা বলেছেন—একদিকে নিরাপত্তাহীনতার বোধ, অন্যদিকে নতুন-কিছু জানার আগ্রহ বোধহয় বার্নিয়েরকে তন্ত্রমন্ত্র ও তুকতাকে খানিকটা বিশ্বাসী করে তুলেছিল।'

'কদ্দিন ছিলেন উনি ভারতে?'

'অনেক দিন। বছর-দশেক—১৬৫৮ থেকে ১৬৬৭। দেশে ফেরার বছর-তিনেক বাদে ফরাসি সম্রাট থার্টিনথ লুইয়ের কাছ থেকে ওঁর ভ্রমণকাহিনী ছেপে বার করার অনুমতি-পত্র পান।'

এস পি চৌধুরী বললেন, 'পাণ্ডুলিপির কয়েকটা পরিচ্ছেদ ছাপতে না দেওয়ার পেছনের

কারণটা তো স্পষ্ট। উনি আবার হয়তো ভারতে আসতে চেয়েছিলেন। বার্নিয়ের মারা যান কত বছর বয়েসে?'

'৬৮ বছর বয়েসে, প্যারিসে।'

'সাহেবদের কাছে, বিশেষ করে ওঁর মতো একজন মানুষের কাছে, ওই বয়েসটা কিছুই নয়। তা, ওই গুপ্তধনের কী হল? জোসি-ডেভিসরা কি কিছু উদ্ধার করতে পেরেছে?'

'উদ্ধার করার আর সময় পেল কোথায়? তার আগেই তো বাঘের আক্রমণ। ওই মন্দিরটাই নক্‌শার সেই মন্দির কি না কে জানে! তবে ডেভিসের চেষ্টার মধ্যে কোনও ফাঁক ছিল না। ডাকাত রফিক পুরনো দিনের ভাঙা মন্দির থেকে বাদশাহি আমলের মুদ্রা পেয়েছে শুনে তো ডেভিস খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। ওর ধারণা—ওই মন্দিরটাতেই গুপ্তধন আছে। ইনভেস্টিগেটিং অফিসার যখন ডাকাতির ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়েছিল তখন ঘুরেফিরে ডেভিসের একটাই প্রশ্ন—ওই ভাঙা মন্দিরটা ঠিক কোথায়, সে ব্যাপারে ডাকাত কি বলেছে?'

সি. আই শ্রীকৃষ্ণ মাইতি কৌশিকের কথায় সায় দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমিই তো তোমাকে বলছিলাম—। তবে ভেতরের ব্যাপারটা আমি জানতাম না। আমার ধারণা হয়েছিল—সাহেব মস্ত বড় স্কলার, তাই পুরনো মুদ্রা নিয়ে অত আগ্রহ দেখাচ্ছেন!'

'গুপ্তধন আর ওই ভাঙা মন্দিরের নকশার কথা জোসি ছাড়া আর দুজন মাত্র জানে। একজন এই ডেভিস আর একজন ওই ক্যাম্পবেল, নাম ভাঁড়িয়ে এখন যে হার্ডি। পরে অবশ্য রনি কিছুটা জানতে পেরেছিল। বয়ফ্রেন্ড ক্যাম্পবেলকে সঙ্গে নিয়ে জোসির সুন্দরবন সফরে আসার প্ল্যান ছিল। কিন্তু পরিকল্পনা পাল্টায় ক্যাম্পবেলের আসল পরিচয়টা জেনে ফেলার পরে। ক্যাম্পবেল মাফিয়া দলের মেম্বার। প্রথম দিকে ছিল শুধুই সদস্য, দল ভাঙাব পরে নেতা হয়ে যায়। ইদানীং দলের প্রধান ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছিল অ্যানিম্যাল-ট্রাফিকিং।'

অবাক হয়ে সন্দীপ দেব বললেন, 'অ্যানিম্যাল-ট্রাফিকিং! কলকাতার এই দলটার সঙ্গে কি ওদের দলের কোনও সম্পর্ক আছে?'

'আছে। একই দলের ওরা। আন্তর্জাতিক চোরাচালানকারীদের দল। ক্যাম্পবেল এখন ইউরোপে ওদের দলের মাথা। ইউরোপের বাজারটা ও দেখে। দলের আর এক মাথা দেখে আমেরিকার বাজার। ভারতেও দল ভেঙেছে। তবে দলের কয়েকজন এখনও দ্বিধা কাটাতে পারেনি, শেষ পর্যন্ত কোন্ দলে যাবে। এই যেমন মহাদেব আর গণেশ। এরা এখনও পর্যন্ত অবশ্য ঝুঁকে আছে হার্ডি মানে ক্যাম্পবেলের দিকে। এদিকে বিরোধী পক্ষ জানে—সহকারী সেজে মহাদেব আর গণেশ নজর রাখছে ক্যাম্পবেলের ওপর। আমি এক ট্রাভেল এজেন্টের কাছ থেকে জানতে পেরেছি, প্যারিসে যাওয়ার জন্যে হার্ডি আর মহাদেবের টিকিট কাটা হয়ে গিয়েছে। গুপ্তধন বাগিয়েই ওরা পালাবার তাল করছিল—।'

আর একবার অবাক হলেন গোয়েন্দাপ্রধান। জিজ্ঞেস করলেন, 'ট্রাভেল এজেন্টের কাছে তুমি কেন গিয়েছিলে? কোনও টিপ্‌স পেয়েছিলে কি?'

'পেয়েছিলাম, মুখার্জিবাবুর কাছ থেকে। নকল দাড়ির কিছুটা খুলে যাওয়ায় মুখার্জিবাবুকে চিনে ফেলেছিল ভোলা আর পচন। এটা অনুমান করেই ইন্সপেক্টর অবনী ঘোষরায়কে বলেছিলাম, মুখার্জিবাবুকে এখন আর গোয়েন্দাগিরির কাজে লাগাবেন না। সন্দীপদা

আপনাকে বলেছিলাম, মুখার্জিবাবুর ওপর গোপনে নজর রাখতে। আপনার সাদা পোশাকের পুলিশরা নজর রেখেছিল বলেই ছোটা জলিলের ট্যানারির খোঁজ পেয়ে গিয়েছিলাম। এটা আমাদের খুব কাজে এসেছে। এক রাত্তিরে লুকিয়ে ওই ট্যানারিতে গিয়ে মুখার্জিবাবুর সঙ্গে দেখা করে দুটো খবর জানতে পেরেছিলাম।'

'দুটো খবর! কী-কী?'

'একটা হল—মুখার্জিবাবু সুলক্ষণযুক্ত বামুন বলে গ্রহ-নক্ষত্রের বিচারে শুভক্ষণে ওরা ওঁকে কাজে লাগাবে। তখন অবশ্য আসল ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারিনি। পারলাম পারভেজের কাছ থেকে খবর পাওয়ার পরে। বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতিপ্রেমিক শঙ্কর লাহিড়ীদের স্পাই নেটওয়ার্কে আছে এম. ভি সদাগর লঞ্চের খালাশি পারভেজ। ও খবরাখবর পৌঁছে দেয় শঙ্কর লাহিড়ীর কাছে। ওখান থেকেই জানতে পারি—শুভক্ষণে বাঘের দেবতা দক্ষিণ রায়ের নামে সুলক্ষণযুক্ত যে বামুনটিকে উৎসর্গ করা হবে তিনি আমাদের মুখার্জিবাবু। ভোলা আর পচন ওঁকে ট্যাংরা থেকে এনে মাঝরাতে পৌঁছে দেবে টাইগার প্রজেক্টের কোর-এরিয়ায়। আলোর ইশারা কী ভাবে দেখাবে, কোন্ ইশারার কী মানে—সে সবও জেনেছি পারভেজের কাছ থেকে। স্থানীয় এক পুরুতঠাকুরের কাছে গিয়ে শুভ যোগের সময় জেনে এসেছিলাম। কাল মাঝরাতের পরেই সেই সময় শুরু হয়েছে। ধরে নিয়েছিলাম, ওই সময়টাই ওরা কাজে লাগাবে। অতনুর কাছ থেকে প্রচুর সাহায্য পেয়েছি। ভোলা আর পচনকে ঘায়েল করে থানায় ঢুকিয়ে দিয়ে আমি আর অতনু ভোলা আর পচন সেজে গণেশকে ধরেছি। তার পরেরটা তো আপনারা জানেন। জঙ্গলে গুলির শব্দ শুনে আপনাদের কথামতো শূন্যে দু' রাউন্ড গুলি ছুড়ে আপনাদের ডেকে এনেছি। আপনাদের অপারেশনটাও দারুণ হয়েছে।'

শ্রোতাদের মধ্যে একটু আগেই রেঞ্জারসাহেব আর বনরক্ষী অতনু এসে বসেছেন। এস. পি. চৌধুরী বললেন, 'মুখার্জিবাবুর কাছ থেকে আপনি দুটো খবর পেয়েছেন। একটা তো শুনলাম, আর একটা কী?'

'আর একটা হচ্ছে ওঁর পাশপোর্ট ছিনতাই। মুখার্জিবাবু আদতে ওপার বাংলার মানুষ। বাংলাদেশে যাবেন বলে সবে একটা ইন্টারন্যাশনাল পাশপোর্ট বানিয়েছিলেন। ওটা ওঁর সঙ্গেই ছিল। ভোলা আর পচন ওকে কিডন্যাপ করে জালিলের ট্যানারিতে তোলে। তখন ওখানে যে ছিল সে পাশপোর্ট পেয়ে খুব খুশি হয়ে মুখার্জিবাবুকে বলেছিল—বাঘের দেব্‌তার কাছে যেতে তোমার পাশপোর্ট লাগবে না, এটা নিয়ে আমি বিদেশে যাব। কথাটা মুখার্জিবাবুর কাছ থেকে শুনে আমার একটা খটকা লেগেছিল। তারপর একটু ঘোরাঘুরি করতেই এক ট্রাভেল এজেন্টের কাছে প্যারিসের এয়ারটিকিট বুকিং লিস্টে এস. মুখার্জির নাম দেখলাম। মুখার্জিবাবুর কাছ থেকে ওই লোকটার চেহারার যে বর্ণনা শুনেছিলাম, তাতে বুঝলাম এ মহাদেব দাস হতে পারে। আমার অনুমান বোধহয় নির্ভুল। পরে নজরে পড়েছিল—এস. মুখার্জির সহযাত্রীর নাম গর্ডন এস. হার্ডি। মুখার্জির পাশপোর্ট জালিয়াতি করে আর একজনের ছবি বসিয়ে দেওয়া এদের কাছে কোনও ব্যাপারই নয়। এটাও বুঝলাম, গুপ্তধনের লোভে মহাদেব হার্ডি অর্থাৎ ক্যাম্পবেলের দলে ভেড়ার তাল করেছে।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে গোয়েন্দাপ্রধান বললেন, 'গুপ্তধনের ব্যাপারটা

জোসির বিশ্বাস করার কারণ আছে। ওর কাছ থেকে শুনে শুনে ডেভিসও বিশ্বাস করতে পারে। কিন্তু জোসির একদা বয়ফ্রেন্ড ক্যাম্পবেলও কি বিশ্বাস করেছিল?'

'ষোলো আনা বিশ্বাস করেছিল। জোসি তো এক সময় ওকে নিয়েই সুন্দরবনে আসার কথা ভেবেছিল। কিন্তু ক্যাম্পবেলের কাণ্ডকারখানা জানার পরে ওর সঙ্গে মেলামেশাই ছেড়ে দেয়। জোসির বন্ধুত্ব হারাবার ফলে মাফিয়া লিডার ক্যাম্পবেলের কোনও ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হয় না। কিন্তু সুন্দরবনের মন্দিরে লুকিয়ে রাখা মস্ত গুপ্তধন হাতাবার মতলবটা বোধহয় কখনওই দূর হয়নি। জোসি ভারতের পথে রওনা হওয়ার পরেই ক্যাম্পবেল রনির কাছে হাজির হয়েছিল জোসির খোঁজ নিতে। রনির সঙ্গে এই নিয়ে আমার কথা হয়েছে। রনি বলেছিল, ও ক্যাম্পবেলের জ্বালাটা বাড়াবার জন্যে বলেছিল—জোসি ওর নতুন বয়ফ্রেন্ড ডেভিসের সঙ্গে বেড়াতে গেছে সুন্দরবনে। রাতে জোসির বন্ধ-করা অ্যাপার্টমেন্টে বার্গলারি হয়। চোর আলমারি থেকে কাগজপত্র নামিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে পালিয়েছে। রনিদের ধারণা—চোর আনাড়ি। কিন্তু আমি তা ভাবি না। মনে হয়, গুপ্তধনের নকশা হাতাবার জন্যে ক্যাম্পবেল হানা দিয়েছিল রাতের বেলায়। তবে পায়নি। না পেয়েও দমেনি অবশ্য। ক্যাম্পবেল জনৈক গর্ডন এস. হার্ডি সেজে চলে আসে এখানে। ওকে মদত দেয় মহাদেব। আর একটা লঞ্চ ভাড়া নিয়ে ওরা নজর রেখেছিল এম. ভি. সদাগরের ওপর। গণেশকে দিয়ে নক্শা চুরি করাবার চেষ্টাও করেছিল একবার। কিন্তু নকশার বদলে সুন্দরবনের একটা ম্যাপ চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল গণেশ। হার্ডি-সাজা ক্যাম্পবেল চটে গিয়ে সেই ম্যাপ দলা পাকিয়ে নদীতে ছুড়ে ফেলে দেয়। সে দৃশ্য অতনুর বোটে বসে দেখেছি। অতনুরাও দেখেছেন।'

বনরক্ষী অতনু একটু নড়েচড়ে বসে বললেন, 'হ্যাঁ, দেখেছি। কিন্তু সাহেব কী ফেলল, কেন ফেলল—কিছুই তো তখন আপনি ভেঙে বলেননি।'

মৃদু হেসে কৌশিক বলল, 'কী করে বলব! তখন পর্যন্ত আমি নিজেই তো ধাঁধার জট ছাড়াতে পারিনি।

এস. পি. চৌধুরী জিজ্ঞেস করলেন, 'এবার তো ধাঁধার সব জট ছাড়ানো হয়ে গেছে। তাই তো?'

লাজুক হেসে কৌশিক বলল, 'না, একটা বড় কাজ বাকি আছে এখনও—আইডেন্টিফিকেশন। সাহেব-দুজনের অবস্থা একটু স্টেবল হলে গেস্টহাউসের লোকজনরা ওদের আইডেন্টিফাই করবে।'

গোয়েন্দাপ্রধান বললেন, 'ওদিকের একটা বড় জট তুমি কিন্তু এখনও খোলোনি। খোলোনি মানে আমার কাছে খোলোনি। অনেকটাই বলেছ, তবে বেশ কিছুটা ফাঁক রেখে দিয়েছ। তোমার কাজের ধরন আমি জানি, তাই আর খুঁটিয়ে প্রশ্ন করিনি। তা ছাড়া তখন হাতে সময়ও তো খুব কম ছিল। চোরাচালানের গাড়িটা যে একটা অয়েল-ট্যাঙ্কার—সেটা কী করে জানলে? শুধু তাই নয়, ট্যাঙ্কারের নম্বর পর্যন্ত মিলিয়ে দিয়েছে। এই অসম্ভব কাণ্ডটা সম্ভব করলে কী ভাবে?'

তরুণ প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর নিজের কাজের জায়গায় দুর্ধর্ষ, কিন্তু সেই কাজ নিয়ে কেউ প্রশংসা জুড়লে ছেলেমানুষের মতো লজ্জা পেয়ে যায়। থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে নিচু গলায় বলেছিল, 'এটা আপনি ধরতে পারেননি—তাই কখনও হয়!'

'বিশ্বাস করো, আমি পারিনি। তুমি একটু ভেঙে বলো, প্লিজ।'

খুকখুক করে কেশে নিয়ে কৌশিক বলল, 'বুঝতে পারছি আপনি আমাকে দিয়েই শোনাতে চান সবাইকে। বেশ বলছি। ভোলা আর পচন চাঁদ ট্রাভেলস থেকে বেরিয়ে এসে একটা মোটাসোটা প্যাকেট নিয়ে ওয়াটারলু স্ট্রিটে কুরিয়ার সার্ভিসে গিয়েছিল। আমি ছদ্মবেশে ছিলাম বলে ওদের পেছন-পেছন কুরিয়ার সার্ভিসের অফিসে ঢুকে প্যাকেটের ঠিকানাটা দেখে নিয়েছিলাম। শিলিগুড়ির ঠিকানায় পাঠানো ওই প্যাকেটটা নির্দোষ মনে হয়নি বলেই আপনাকে ফোন করে সিজ করিয়েছিলাম। বইটার নাম মনে আছে আপনার?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, কনসাইজ এনসাইক্লোপিডিয়া অব জিওগ্রাফি। বইটা কিন্তু দারুণ!'

'বইটার প্রথম পাতায় কালি দিয়ে বড়-বড় করে কী লেখা ছিল—মনে আছে?'

'মাস্টার জয় প্রধানের নাম আর শুভেচ্ছা—কথাগুলো মনে নেই।'

''স্বাভাবিক ভাবে মনে থাকার কথাও নয়। বেশ কয়েক বার পড়ার পরে বুঝলাম—একটা সাঙ্কেতিক বার্তা আছে সাদামাটা কথাগুলোর মধ্যে। বইয়ের প্রথম পাতায় লেখা ছিল: 'অল ফর জয়, লাভ আংকল। মুভ অ্যাজ ফাস্ট অ্যাজ অয়েল-ইঞ্জিন টু স্কোর ৯৫০০ ইন এগজ্যাম অন মন্‌ডে।' পড়লে যে কারও মনে হবে স্নেহপ্রবণ এক কাকা চান তাঁর ভাইপো সোমবারের পরীক্ষায় সাড়ে ন' হাজার পাক। বাহবা দেওয়ার ভঙ্গিতে লিখেছেন, ভাল নম্বর তোলার জন্যে অয়েল-ইঞ্জিনের মতো ছুট লাগাও।'

মৃদু গলায় গোয়েন্দাপ্রধান বললেন, 'আমার তো এখনও তাই মনে হচ্ছে।'

সায় দিল কৌশিক। 'আমারও তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু আমাদের ইনফর্মার গগনের কাছ থেকে খবর পেয়ে আমি আসল ব্যাপারটা ধরতে পারি। ভোলা আর পচনের পিছু নিতে গিয়ে পাঁচুর বাংলা মদের ঠেকে গিয়েছিল গগন। সঙ্গে আর একজন ইনফর্মার লক্ষ্মণও ছিল। নেশাগ্রস্ত ভোলা আর পচনের মুখে গগন শোনে—শিগ্‌গিরিই খুব বড় এক গাড়ি মাল যাবে। মাল নিয়ে গাড়ি রওনা দেবে রাতের বেলায়। পেট্রল পাম্পের কথাও শোনে। আর শোনে একটা গাড়ির নম্বর। নম্বরটা ও কাগজে টুকে নিয়েছিল এক ফাঁকে। ওটা আমায় দেয়। ওটাই গোপন সংকেত বুঝতে সাহায্য করে আমাকে।'

'কী নম্বর?'

'নাইন ফাইভ জিরো জিরো। নম্বরটা পেয়েই মনে হয়েছিল—কোথায় যেন দেখেছি! তার পরেই মনে পড়েছিল এনসাইক্লোপিডিয়ার ওই শুভেচ্ছাবাণীর কথা। সঙ্গে সঙ্গে কোডের ভেতরের খবরটা বেরিয়ে এসেছিল। অয়েল-ইঞ্জিন সোমবার কোথাও পৌঁছচ্ছে। কিন্তু কোথায়? জয় প্রধানের শিলিগুড়ির ঠিকানায় কি? শিলিগুড়ির নামও গগনের কানে এসেছিল একবার। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিলাম রাস্তায়। জলিলদের পেট্রল পাম্প আছে। সেখানে গিয়ে দেখি একটা অয়েল-ট্যাঙ্কার দাঁড়িয়ে আছে। নাম্বার—নাইন ফাইভ জিরো জিরো। বুঝলাম, অয়েল-ইঞ্জিন মানে এখানে অয়েল-ট্যাঙ্কার। এটা হয়তো সোমবার পৌঁছচ্ছে শিলিগুড়িতে জয় প্রধানের বাড়ির কাছাকাছি কোনও পেট্রল পাম্পে। সাধারণত রাত্তিরে এখান থেকে শিলিগুড়ির গাড়ি ছাড়ে, ভোরে পৌঁছে যায়। সোমবার সকালে জয় প্রধানের ঠিকানায় এনসাইক্লোপিডিয়া পৌঁছেছিল, একটু বাদে ওই ঠিকানার কাছে পেট্রল পাম্পে হাজির হয় আপনাদের পুলিশ টিম।'

গোয়েন্দাপ্রধান উঁচু গলায় বাহবা দিতেই কৌশিক দ্রুত প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে বলল,

'অয়েল ট্যাঙ্কারে কী-কী পেয়েছেন—টেলিফোনে শুনেছি। এবার একটু ভেঙে বলুন তো?'

রেঞ্জারসাহেব কৌশিকের কথায় সায় দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, আপনাদের সিজার লিস্টে কী কতটা আছে—একটু পরিষ্কার ভাবে জানতে চাই মিস্টার দেব।'

গোয়েন্দাপ্রধান দু' দিকে হাত ছড়িয়ে চোখ বড়-বড় করে বললেন, 'অ্যানিম্যাল-ট্রফিকিংয়ের এত বড় একটা সিজার এদিকে আর কখনও হয়েছে বলে মনে হয় না। শিলিগুড়ির ওই প্রধানের বাড়ির তিন কিলোমিটার রেডিয়াসের মধ্যে চারটে পেট্রল পাম্প আছে। ভোর থেকে চারটের ওপরেই নজর রেখেছিলাম আমরা। একটায় পাওয়া গেল অয়েল-ট্যাঙ্কারটাকে। কৌশিকের পরিকল্পনায় আমরা শিলিগুড়িতে একটা আর কলকাতায় চারটে জায়গায় একই সঙ্গে হানা দিয়েছি। আন্তর্জাতিক চোরাচালানকারীদের দল। দলের বেশ কয়েকটা চাঁইকে ধরা হয়েছে। আর সিজার? না, এত বড় চোরাচালান দেশের এই অংশে আর কখনও বোধহয় ধরা পড়েনি। আমরা চটপট একটা হিসেব কষে দেখেছি—বাজেয়াপ্ত চোরাই মালের আনুমানিক দাম হবে চল্লিশ কোটি টাকা।'

'চল্লিশ কোটি!'

'হ্যাঁ, এখনও পর্যন্ত যা পাওয়া গিয়েছে, তার দাম ওই রকমই হবে। শুধুমাত্র অয়েল-ট্যাঙ্কারেই তো পঁচিশ কোটি টাকার মাল ছিল।'

'একটা ট্যাঙ্কারে অত মাল?'

প্রশ্নটা কৌশিকের। ওর দিকে তাকিয়েই গোয়েন্দাপ্রধান বললেন, 'একটা অয়েল-ট্যাঙ্কার মানে বিশাল কন্টেনার। আর ভেতরটা তো একেবারে ফাঁকা করে দেওয়া হয়েছে। মস্ত বড় খোলটা ভরা হয়েছে আমাদের বহুমূল্য প্রাণিসম্পদের নানা অংশ দিয়ে। মস্ত বড়-বড় বাঘের চামড়াই আছে আঠারোটা।'

'আঠারোটা! কী বলছেন আপনি!'

'যা নিজের চোখে দেখেছি, তাই বলছি। শুধু বাঘের চামড়াই নয়, ওই বাঘগুলোর হাড়গোড়ও আছে।'

'হাড়গোড়!'

সি আই-এর বিস্ময়ের উত্তরে গোয়েন্দাপ্রধান বললেন, 'আন্তর্জাতিক বাজারে বাঘের হাড়ের কেজি কত জানেন? পঞ্চাশ হাজার থেকে সত্তর হাজার টাকার মধ্যে। চোরাই মালের মধ্যে এলিফ্যান্ট আর রাইনো প্রোডাক্টও আছে। ওগুলোর সোর্স নর্থ বেঙ্গল। পূর্ব এশিয়াতেই হাতির দাঁতের কেজি বিশ থেকে তিরিশ হাজার টাকার মধ্যে। গণ্ডারের খড়্গ তাইওয়ান, থাইল্যান্ডে নিয়ে গিয়ে ফেলতে পারলেই চড়া দাম। পাঁচ-ছ' লাখ টাকা কেজি। তাই তো রেঞ্জারসাহেব?'

সায় দিয়ে রেঞ্জারসাহেব প্রশ্ন করলেন, 'রেড করে আর কী-কী পেয়েছেন?'

'সাপ, কুমির আর হরিণের চামড়া। ওহ্! দেখে মনে হচ্ছিল চোরাশিকারিরা জলজঙ্গল পুরো সাফ করে দিয়েছে। শুধু শিলিগুড়ির ওই অয়েল-ট্যাঙ্কারই নয়, কলকাতায় চারটে জায়গায় হানা দিয়েও এই সব মাল পাওয়া গিয়েছে কম-বেশি।'

এস. পি চৌধুরী জিজ্ঞেস করলেন, 'কলকাতার কোথায়-কোথায় রেড করেছেন?'

কৌশিকের দিকে আঙুল তুলে গোয়েন্দাপ্রধান বললেন, "সব ঠিকানা এরই দেওয়া।

জায়গাগুলোর মধ্যে আছে প্রিন্সেপ স্ট্রিটের একটা ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি, বাগরি মার্কেটের একটা ওষুধের দোকান, মানিকতলার লোহাপট্টির একটা দোকান আর ট্যাংরার একটা ট্যানারি। ট্যানারিতে চোরাশিকারিদের মারা দুর্লভ বন্যপ্রাণীর চামড়া 'প্রসেস' করা হয়। ট্যানারের গোডাউন থেকে প্রসেসড কিছু মালও আমরা কনফিসকেট করেছি। ট্যানারের নাম ছোটা জলিল। অ্যানিম্যাল-ট্রাফিকিংয়ে গিয়ে লোকটা অল্প কিছুদিনের মধ্যে কোটি-কোটি টাকার মালিক হয়ে গেছে।"

বনরক্ষী অতনু ধারালো চোখে গোয়েন্দাপ্রধানের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এই লোকটার ট্যানারি থেকেই কি মুখার্জিবাবুকে সুন্দরবনে নিয়ে আসা হয়েছিল বাঘের দেবতার ভোগ হিসেবে চড়াবার জন্যে?'

বাঁকা হাসি হেসে জবাব দিল কৌশিক, 'হ্যাঁ, আপনি বাধা দিয়েছেন বলেই বাঘের দেবতার পেটে গিয়ে অক্ষয় পুণ্যের অধিকারী হতে পারলেন না মুখার্জিবাবু।'

॥ ৪৬ ॥

কথার ফাঁকে ফাঁকে পরে-আনা গরম-গরম দু চ্যাঙারি জিলিপিও উড়ে গিয়েছিল। জিলিপি শেষ হওয়ার পরে চা এল। গরম জিলিপির পরে গরম চা পেয়ে সবার চোখেমুখেই বেশ একটা তৃপ্তির ছাপ ফুটে উঠেছিল। জানলা দিয়ে আসা রোদের রং আর একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। হাতঘড়ির দিকে তকিয়ে গোয়েন্দাপ্রধান সন্দীপ দেব বললেন, 'আইডেন্টিফিকেশনের কাজটা মিটে গেলেই চলে যাব আমরা। ডাক্তার কী বলছে?'

'ডেভিস আর হার্ডির অবস্থা আগের তুলনায় একটু ভাল। আর একটু স্টেবল হলেই আইডেন্টিফিকেশনের কাজটা সারা যাবে।'

কৌশিকের জবাব শুনে ওর সন্দীপদা বললেন, 'হার্ডি-সাজা ক্যাম্পবেলকে আইডেন্টিফাই করবে জোসি আর রনি। ও দিকে ডেভিসকে আইডেন্টিফাই করবে ওর প্রাক্তন বউ লিজিয়া আর ব্রিটিশ ডেপুটি হাইকমিশনের প্রেস অ্যান্ড পাবলিক অ্যাফেয়ার্সের ওই ভদ্রলোক—। তাই তো?'

এক দিকে ঘাড় কাত করল কৌশিক।

গোয়েন্দাপ্রধান চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে বললেন, 'লিজিয়ার পক্ষে ব্যাপারটা খুব শকিং হবে। আফটার অল, একসঙ্গে তো সংসার করেছিল অনেক দিন। এক সময়ের ভদ্রলোক এখন একজন দাগি অপরাধী—।'

সবাইকে অবাক করে দিয়ে কৌশিক উত্তর দিল, 'না, লিজিয়া তা মনে করে না।'

'অ্যাঁ। বলছ কী তুমি! এখন তো আর মনে করাকরির কিছু নেই। ডেভিস মাফিয়া লিডার, হার্ডকোর ক্রিমিনাল, অ্যানিম্যাল-ট্রাফিকিংয়ের সঙ্গে কানেকটেড, আনলাইসেন্সড গানসমেত টাইগার প্রজেক্টের কোর-এরিয়ায় ধরা পড়েছে। ওর বিরুদ্ধে অ্যাটেম্পট টু মার্ডারের চার্জও আনা হচ্ছে। ওই হার্ডি-সাজা রাইভ্যাল গ্রুপের লিডারটাকে গুলি করে খতম করার চেষ্টা করেছিল ডেভিস। লিজিয়া কি এ সব জানে না?'

'জানে।'

'জানার পরেও ডেভিসকে নির্দোষ বলছে!'

'শুধু বলা নয়, এ ব্যাপারে বোধহয় কোনও মতেই লিজিয়ার ধারণা পাল্টানো যাবে না। ও বিশ্বাস করে ডেভিস অতিমাত্রায় সৎ, কোনও রকম নোংরা কাজ ওর পক্ষে করাই সম্ভব নয়। বড় মাপের একজন স্কলারও। লিজিয়ার মতে ওর একটাই দোষ। তা হল—লোকটা প্রচণ্ড পরিমাণে খ্যাপাটে স্বভাবের। তন্ত্রমন্ত্র, তুকতাকে অসম্ভব বিশ্বাসী। ওই বিশ্বাস ইদানীং এত বেড়ে গিয়েছিল যে, ডেপুটি হাইকমিশনের অফিসে চাকরি করাও ওর পক্ষে আর সম্ভব হয়নি। পির-ফকির-তান্ত্রিকটান্ত্রিক নিয়ে পড়ে থাকত সব সময়। এই মানুষের সঙ্গে ঘর-সংসার করা যায় না। তবে লিজিয়া নানা ভাবে ওকে শোধরাবার চেষ্টা করেছিল। না পেরে শেষে ডিভোর্স নিয়ে ইংল্যান্ডে ফিরে যায়।'

সন্দীপ দেব একটু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, 'বুঝতে পারছি, প্রাক্তন স্বামীর ওপর লিজিয়ার কিছুটা টান এখনও রয়ে গেছে, কিন্তু যা সত্যি তাকে তো মানতেই হবে। রিয়েলিটিকে অস্বীকার করা যায় না। ডেভিস যে জায়গায় এখন এসেছে সেখানে তো আর রাতারাতি আসা যায় না। আন্ডারওয়ার্ল্ড অ্যাকটিভিটিজ নিশ্চয়ই ও অনেক দিন ধরে চালাচ্ছে। কলকাতায় সংসার করার সময় লিজিয়া কি ওর কাণ্ডকারখানা একেবারেই টের পায়নি?'

'না, ডেভিসকে লিজিয়া কখনও কোনও অপরাধ করতে দেখেনি। তবে লিজিয়াই বলেছে, শেষের দিকে নাকি কিছু অপরাধী ডেভিসের সঙ্গে ভিড়তে শুরু করেছিল।'

'জিজ্ঞেস করোনি—কেন?'

'করেছি। লিজিয়া বলেছিল কয়েকটা লোক যে শেডি টাইপের ও প্রথমে বুঝতে পারেনি। ভেবেছিল, ওরা বুঝি ডেভিসেরই মতো খ্যাপাটে স্বভাবের। তন্ত্রমন্ত্র, তুকতাক, ফকিরের কেরামতিতে বিশ্বাস করে। অনেক পরে টের পেয়েছিল, ওরা অন্ধকার জগতের লোক। ডেভিসকে ও সতর্ক করে দিয়েছিল। কিন্তু ডেভিস বিষয়টাকে পাত্তাই দেয়নি তখন—।'

'কেন? নেশার মাত্রা কি বাড়িয়ে দিয়েছিল?'

'না, ডেভিস তখন নেশাভাঙ করত না।'

'পরে শুরু করেছিল?'

'পরের খবর লিজিয়া জানে না। তবে বলছিল, যদ্দিন ও ওর সঙ্গে ঘর-সংসার করেছে, তদ্দিন টিটোটেলার বলতে যা বোঝায়—ঠিক তাই ছিল ডেভিস। কোনওরকম নেশাভাঙ করত না। তবে তুকতাক, বুজরুকিতে এত মেতে গিয়েছিল যে বলার নয়। ওকে ফেরাবার জন্যে বিস্তর চেষ্টা করেছিল লিজিয়া। কোনও কাজ হয়নি তাতে। উল্টে দুম করে একদিন চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল ডেভিস। চাকরি ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে ওকে উসকানি দিয়েছিল জোন্স নামের একজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান। লিজিয়া বলেছে, এই জোন্সকে প্রথমে ও একজন পারিবারিক বন্ধু হিসেবে নিয়েছিল। পরে টের পায়, লোকটা হাড়-বজ্জাত। নানা ধরনের আন্ডারওয়ার্ল্ড কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত। উত্তেজিত হয়ে লিজিয়া ওকে একদিন বাড়ি থেকে বার পর্যন্ত করে দিয়েছিল। কিন্তু তাতে লাভ হয়েছিল এই যে, জোন্সের পিছু-পিছু বাড়ি ছেড়েছিল ডেভিসও।'

একটু বাঁকা হাসি হেসে গোয়েন্দাপ্রধান বললেন, 'এই একটা ব্যাপারে পৃথিবীর সব মা আর স্ত্রী বোধহয় একই স্বভাবের। এদিকে, নিজের ছেলের দোষ দেখতে চায় না কিছুতেই। ওদিকে, স্বামীকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করে তুলোধনা করলেও বাইরের সমাজে তার ন্যালাখ্যাপা, ভোলেভালা একটা ইমেজও তৈরি করার চেষ্টা করে। তাই না?'

মৃদু হাসি ফুটে উঠেছিল ঘরের সবার মুখে। এস. পি. চৌধুরী কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই একজন কনস্টেবল প্রায় ছুটে এসে বড় সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'স্যার, ডাক্তারবাবু বলেছেন, এবার আপনারা আইডেন্টিফিকেশনের জন্যে সাহেব দুজনের কাছে যেতে পারেন। ওদের অবস্থা আগের চাইতে এখন একটু ভাল।'

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে বেশ একটু ব্যস্ততা ছড়িয়ে পড়েছিল। একসঙ্গে উঠে পড়েছিল জনা-চারেক।

একটু বাদেই দুটো জিপ ছাড়ল সি. আই-এর অফিসের সামনে থেকে। গেস্টহাউস কাছেই। ওখান থেকে জিপে তুলে নেওয়া হল জোসি, রনি আর ব্রিটিশ ডেপুটি হাইকমিশনের প্রেস অ্যান্ড পাবলিক অ্যাফেয়ার্সের চিফ অমিতাভ পালকে। তার পর জিপ দুটো গিয়ে দাঁড়াল নার্সিংহোমের সামনে।

নার্সিংহোমের দোতলার পাঁচটা ঘরে পাঁচজন রুগি। প্রথম ঘরে মুখার্জিবাবু, ওঁর পাশের দুটো ঘরে গণেশ ঢালি আর হিরু গুনিন। ভেতরের দিকের দুটো মুখোমুখি ঘরের একটায় হার্ডি, অন্যটায় ডেভিস। মুখার্জিবাবুর ঘরটা ছাড়া বাকি চারটে ঘরের দরজায় সশস্ত্র পুলিশ পাহারা। পাহারাদাররা বড় সাহেবদের দেখে সেলাম ঠুকেছিল।

ডাক্তারবাবু এগিয়ে এসে বললেন, 'আপনারা এই দুজন পেশেন্টের সঙ্গে কথা বলতে পারেন, তবে এখন খুব বেশি কথা না বলাই ভাল।'

প্রথমে হার্ডির ঘরে ঢুকল জোসি আর রনি। পেছনে পুলিশ পার্টি আর কৌশিক। বেডে চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে হার্ডি। ডান হাতে মস্ত বড় ব্যান্ডেজ। ওই হাত থেকে গুলি বার করা হয়েছে। বাঁ হাতে ড্রিপ চলছে। রুগির দিকে তীব্র চোখে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকার পরে হিসহিসে গলায় জোসি বলল, "ইট'স হি, ক্যাম্পবেল।"

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুলে গিয়েছিল হার্ডি-সাজা ক্যাম্পবেলের। তার পরেই ও চমকে উঠেছিল ভীষণ ভাবে। কিন্তু পাকা লোক, চমকটা সামলে নেওয়ার পরে দাঁত বার করে বলল, 'হাই জোসি, হাই রনি।'

জোসি আগেরই মতো হিসহিসে গলায় বলল, 'ইউ আর স্টিল চেজিং মি! চেজিং মি ফর ট্রেজার?'

উত্তরে আমতা-আমতা করে ক্যাম্পবেল বলল, "নো ডিয়ার, ডোন্ট টেক মি আমিস।"

উঠে বসতে যাচ্ছিল ক্যাম্পবেল। ডাক্তারবাবু ওকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "বি কোয়াটেজ প্লিজ, ডোন্ট মুভ।"

গোয়েন্দাপ্রধান চাপা গলায় বললেন, 'চলুন আমরা বেরিয়ে যাই। এখনকার মতো এ ঘরের কাজ মিটে গেছে আমাদের।'

ক্যাম্পবেলের ঘর থেকে বেরুবার পরে সন্দীপ দেব লিজিয়া আর অমিতাভ পালের দিকে হাত তুলে বললেন, 'ডেভিসের ঘরে আপনারা আগে ঢুকুন।'

শান্ত হয়ে ঘরে ঢুকেছিল লিজিয়া, কিন্তু তার পরেই রুদ্র মূর্তি ধরে চেঁচিয়ে বলল, 'ইউ জোন্‌স, ইমপোস্টার, ইউ কিল্‌ড ডেভিস।'

কাঁধে-বুকে মস্ত বড় ব্যান্ডেজ বাঁধা ডেভিস-সাজা জোন্‌সের। আতঙ্কগ্রস্ত মানুষের ভঙ্গিতে উঠে বসে বলল, "নো লিজিয়া, ইট'স নট ট্রু, লিসেন টু মি—।"

আর কিছু বলার আগেই জোন্‌সের কাঁধ-বুকের ব্যান্ডেজ ভিজে গিয়েছিল রক্তে।

ডাক্তারবাবু ছুটে গিয়ে জোন্‌সকে শুইয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—'সিস্টার, সিস্টার।' ডাক্তারের চোখের ইঙ্গিতে ঘর থেকে এক-এক করে বেরিয়ে গিয়েছিল পুলিশ-পার্টির সবাই।

ঘর থেকে বেরুবার পরেও লিজিয়ার রাগ পড়েনি একটুও। ঝাঁজালো গলায় জোন্‌সের বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলে যাচ্ছিল একনাগাড়ে। একটা কথা ফিরে-ফিরে আসছিল: লোকটা পাজি, বদমাইশ ; ডেভিসকে ওই খুন করেছে।

লিজিয়ার কথা শুনে পুলিশ-পার্টি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। জোসি আর রনি শান্ত করার চেষ্টা করছিল লিজিয়াকে। গোয়েন্দাপ্রধান লিজিয়ার কথাগুলো দ্রুত হাতে ডায়েরিতে নোট করে নিয়ে রনির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনারা এবার গেস্টহাউসে চলে যেতে পারেন, পরে আর একবার কথা বলব আপনাদের সঙ্গে।'

গেস্টহাউসে চলে গেল রনিরা। সি. আই-এর অফিসে ফিরে এল পুলিশের দলবল এবং কৌশিক।

সি. আই মাইতির চেয়ারে ধপ্ করে বসে পড়ে গোয়েন্দাপ্রধান সন্দীপ দেব বললেন, 'কী হল ব্যাপারটা কৌশিক? ওই লোকটা ডেভিস নয়! ডেভিস-সাজা জোন্‌স নামের লোকটা কে তা হলে? লিজিয়াই বা ওকে চিনল কী করে?

উল্টো দিকের একটা চেয়ারে বসে পড়ে কৌশিক জবাব দিল, 'এই জোন্‌সের কথাই তখন বলছিলাম আপনাদের। ডেভিসের আজেবাজে পুরনো সঙ্গীদের একজন হল জোন্‌স। লিজিয়ার সঙ্গে ডেভিসের যখন ডিভোর্স হয়নি, সেই আমলের লোক। লিজিয়া প্রথমে ওকে ভদ্রলোক ভেবে আপ্যায়ন করত, পরে ওর আসল পরিচয়টা পাওয়ার পরে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছিল একদিন। কিন্তু তাতে লাভের বদলে ক্ষতিই হয়েছিল। ডেভিস বন্ধুকে ফিরিয়ে আনার জন্যে নিজেই বেরিয়ে গিয়েছিল বাড়ি ছেড়ে।'

গোয়েন্দাপ্রধান স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন কৌশিকের দিকে। ও থামতেই জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি এত সব জানলে কোত্থেকে?'

'লিজিয়া বলেছে।'

'লিজিয়া তোমাকে খামোখা এ সব বলতে গেল কেন?'

'খামোখা তো বলেনি। জোন্‌সের ছবি ওকে দেখাবার পরেই বলেছে।'

'জোন্‌সের ছবি! ওর ছবি তুমি পেলে কোত্থেকে? আর পাওয়ার পরে লিজিয়াকে দেখাতেই বা গিয়েছিলে কেন?'

মৃদু হেসে কৌশিক বলল, 'ছবি তো আপনার জন্যেই জোগাড় করতে পেরেছি সন্দীপদা। আপনার দফতরের একজন তরুণ অফিসারকে সাংবাদিক সাজিয়ে ওই দুই সাহেবের লঞ্চে পাঠাতে বলেছিলাম না—। আপনি সৃজনকে পাঠিয়েছিলেন। ওর কাছ থেকেই তো ছবিগুলো পাই—।'

'ও হ্যাঁ-হ্যাঁ, মনে পড়েছে এবার। কিন্তু এই ডেভিস যে নকল ডেভিস—সেই সন্দেহটা তোমার মধ্যে এল কেন?'

'প্রথম সন্দেহ তৈরি হয়—পূর্ণদাকে লেখা রনির চিঠিটা পড়াব পরে। ডেভিস আর জোসি—কেউ কাউকে আগে দেখেনি। শুধু চোখের দেখা নয়, কেউ কারও ফোটোগ্রাফও দেখেনি। একজন খ্যাপা, আর একজন স্বপ্নের জগতে বাস করে ; কিন্তু চোখে না দেখার অভাবটা এদের কাছে অভাব বলেই মনে হয়নি। সুন্দরবনে আসার আসল উদ্দেশ্য কী? এটা জোসি ডেভিসকে জানিয়েছিল। অবশ্য গোড়াব দিকে এটা আমাব অনুমান ছিল। এটাও অনুমান করেছিলাম—আসল ডেভিস যেহেতু খ্যাপা প্রকৃতির, কোনও ওয়াকিবহাল বাজে লোক নকল ডেভিস সেজে বসতে পারে। প্রথমে গণেশের চালচলন সন্দেহজনক ঠেকেছিল আমার কছে। ডেভিস সম্পর্কে প্রথম বড় ধরনেব খটকা লাগে রনির চিঠিতে উল্‌কির খবর পেয়ে। রনি লিখেছিল, ডেভিসের ডান হাতে পঞ্চমুখী সাপের উল্‌কি আছে। কিন্তু এখানে তো দেখছি উল্টো ব্যাপার। উল্‌কি বাঁ হাতে। ভেবেছিলাম, রনি হয়তো ডান-বাঁ গুলিয়ে ফেলেছে। কিন্তু পরে একদিন উল্‌কির দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠেছিলাম।'

'চমকে উঠেছিলে! কেন?'

পকেট থেকে রুমাল বার কবে চোখমুখ মুছে নিয়ে কৌশিক বলল, 'লঞ্চে চারজন আমরা খেতে বসতাম একসঙ্গে। সেদিনও বসেছিলাম। ডেভিস-সাজা জোন্‌সের গায়ে সেদিন স্যান্ডো গেঞ্জি ছিল। এই লোকটা ন্যাটা। বাঁ হাতে কাঁটা নিয়ে খাচ্ছিল। ওর বাঁ হাতের বাইসেপের পাশে পাঁচমুখো সাপের মস্ত উল্‌কি। হঠাৎ দেখি—।'

'কী?'

'সাপের পাঁচটা ফণার একটা কিছুটা মুছে গেছে।'

'মুছে গেছে' উল্‌কি আবার মুছে যাবে কী করে?'

'সেটাই তো প্রশ্ন, বুঝলাম এটা উল্‌কি নয়। কালি দিয়ে আঁকা। যে সে কালি নয়, ভোটের চিহ্ন আঙুলে যে ধরনের কালি দিয়ে দেওয়া হয়—সেই ধরনের কোনও পাকা কালি। কিন্তু পাকা কালির দাগও ফিকে হতে শুরু করে একদিন—।'

তারিফ করার চিহ্ন ফুটে উঠেছিল গোয়েন্দাপ্রধানের চোখেমুখে। জিজ্ঞেস করলেন, 'তারপর?'

'তারপর কলকাতায় এসে রনিকে ই-মেল পাঠাই। রনি যোগাযোগ করেছিল লিজিয়ার সঙ্গে। ওদের কাছ থেকে পুরো ব্যাপারটা জেনে যাই। রনি লিজিয়ার কাছ থেকে আর একবার জেনে নিয়ে জানাল—উল্‌কি ডেভিসের বাঁ হাতে নয়, ডান হাতে। ডেভিস সম্পর্কে সব তথ্যই পাঠিয়েছিল। কলকাতায় ব্রিটিশ ডেপুটি হাইকমিশনের অফিস থেকে ডেভিসের বায়োডাটাও পেয়ে যাই। জোসির সম্পর্কেও প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো জেনে নিই রনির কাছ থেকে। আর কোনও সন্দেহ রইল না যে, গুপ্তধন বাগাবার জন্যেই জোন্‌স ডেভিস সেজে জোসির সঙ্গে ভিড়ে গেছে।'

ঘরের সবাই গভীর মনোযোগের সঙ্গে কৌশিকের কথা শুনছিল। এস. পি. চৌধুরী জিজ্ঞেস করলেন, 'এই জোন্‌স লোকটার পরিচয় কি জানতে পেরেছেন আপনি?'

'পেরেছি। গোয়েন্দা-দফতরের সাংবাদিক-সাজা অফিসারের কাছ থেকে জোন্‌সের ছবি পেয়ে আমি একদিন লালবাজারে যাই। জোন্‌স পুরনো পাপী, নানা ধরনের অপরাধে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে বেশ কয়েকবার। রেকর্ড্‌স আছে।'

গোয়েন্দাপ্রধানের দৃষ্টি ধারালো হয়ে উঠেছিল। প্রশ্ন করলেন, 'আসল ডেভিস লোকটা তা হলে কোথায় গেল?'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে উত্তর দিল কৌশিক, 'আসল ডেভিস খুন হয়ে গেছে।'

'খুন! কোথায়? কী ভাবে? কে খুন করল?'

'খুনি এই জোন্‌স। কিছুদিন আগে একটা পোড়োবাড়িতে দুই সাহেব আর এক মেম খুন হয়েছিল—। মনে পড়ছে?'

'কেন মনে পড়বে না? ওই তো ও. সি অবনী ঘোষরায়ের এরিয়ায়—।'

'ঠিক বলেছেন। এক সাহেব এক মেম আইডেন্টিফায়েড। আমেরিকান ট্যুরিস্ট। বেনারস থেকে কলকাতায় এসেছিল। দুজনেই ছিল ড্রাগ-অ্যাডিক্ট। কিন্তু তৃতীয়জনকে শনাক্ত করা যায়নি। ওই সাহেবের গায়ে কোনও জামাকাপড় ছিল না। মুখমাথা এমন ভাবে থেঁতলে দেওয়া হয়েছিল যে চেনারও কোনও উপায় ছিল না। ওই আনআইডেন্টিফায়েড বডিটাই ছিল ডেভিসের।'

কৌশিকের কথা শুনে গোটা ঘরটাই চমকে উঠেছিল। এস. পি. চৌধুরী জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু আপনি কী ভাবে এত শ্যিওর হচ্ছেন যে, ওই বডিটা ডেভিসের?'

'প্রমাণ হচ্ছে পঞ্চমুখী সাপের উল্‌কি। ডেভিসের হাতে উল্‌কি ছিল। অবনীদা নানা অ্যাঙ্গেল থেকে ডেভিসের ছবি তুলিয়েছেন। দুটো ছবিতেই ওই উল্‌কি দেখা যাচ্ছে।'

কৌশিকের কথা শুনে গোটা ঘরটাই আর একবার বুঝি চমকে উঠেছিল। গোয়েন্দাপ্রধান ছোট্ট একটা ঢোক দিয়ে বললেন, 'ওই বডিটাই ডেভিসের কি না—লিজিয়াকে ছবি দেখিয়ে কনফার্ম করিয়ে নিতে হবে—।'

নিচু গলায় কৌশিক বলল, 'ছবিটা আমি লিজিয়াকে দেখিয়েছি। ও কনফার্ম করেছে।'

আর একবার অবাক হলেন পুলিশের দুই বড় কর্তা। গোয়েন্দাপ্রধান প্রশ্ন করলেন, 'কখন তুমি ছবিটা দেখালে ওকে?'

'কলকাতায়, গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে। লিজিয়া খুব শক্‌ড হয়েছিল, কিন্তু খুঁটিয়ে দেখে কনফার্ম করেছে।'

এস. পি. চৌধুরী ঝলমলে মুখে কৌশিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার কাজের সত্যিই কোনও তুলনা নেই। কিন্তু এই জোন্‌সই যে ডেভিসের খুনি, সেটা প্রমাণ করবেন কী ভাবে?'

'জোসিদের লঞ্চে ডাকাতি করতে গিয়ে ডাকাত দলের যে সর্দারটা ধরা পড়েছে সে অনেক কথা বলেছে আমাকে। সর্দারটার নাম রফিক। ওর সঙ্গে লক-আপে বসে এক-দেড় ঘণ্টা গল্প করেছি আমি। ডাকাতটা বুঝতে পেরেছে, এবার ওর ছাড়া পাওয়া শক্ত। তা ছাড়া, আমি খুব সহানুভূতিশীল মানুষের ভঙ্গিতে কথা বলেছিলাম—। তাতেও কাজ হয়েছে অনেকটা। রফিক শেষে স্বীকার করেছে, এম. ভি. সদাগরের সাহেব-মেমের মালপত্র লুট করার জন্যে ওকে কাজে লাগিয়েছিল এম. ভি. দিনমণির সাহেব আর মহাদেব দাস। মহাদেবকে ও অনেকদিন ধরে চেনে, চোরাশিকারি আর চোরাচালানকারীদের দলে আছে। চেনে গণেশকেও। বলেছে গণেশ আর এম. ভি সদাগরের সাহেব কিছুদিন আগে দুই সাহেব আর এক মেমকে খুন করে ফেলে এসেছিল কলকাতার এক পোড়োবাড়িতে। জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেন? তার উত্তরে বলেছিল, হালে ওদের দল ভাঙাভাঙি হয়ে

গিয়েছিল—সেই জন্যে এক দল আর এক দলকে ফাঁসাবার তাল করেছিল। আমার মনে হয়, রফিকের কথার মধ্যে অনেকটা সত্যি আছে।'

গোয়েন্দাপ্রধান সায় দিয়ে বললেন, 'আমারও তাই মনে হয়।'

দু-এক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে কৌশিক বলল, 'দল ভাঙাভাঙির ব্যাপারটা ঠিক। অ্যানিমাল-ট্রাফিকিংয়ের এই দলটা আর্ন্তজাতিক। ভাঙাভাঙি যখন গোটা পৃথিবীতে হয়েছে, এখানেও হবে। কিন্তু এখন বার্নিয়েরের গুপ্তধন বাগাবার লোভটাই বড় হয়ে উঠেছিল জোন্‌সের কাছে। জোসির সঙ্গে ডেভিসের চিঠি চালাচালির মধ্যে পঞ্চমুখী সাপের উল্‌কির কথা আছে। সুতরাং নিখুঁত হওয়ার জন্যে হাতে উল্‌কির ধাঁচে ছবি আঁকিয়েছে জোন্‌স। একদিন লঞ্চে ওর ঘরে হানা দিয়েছিলাম আমি। মন্দিরের কোথায় কী ভাবে গুপ্তধন লুকনো আছে সেই নক্‌শা চোখে পড়েছিল আমার। বুঝতে পেরেছিলাম নক্‌শা জোসির কাছ থেকে ডেভিস-সাজা জোন্‌সের হাতে এসেছে। ডেভিস সাজার ব্যাপারে জোন্‌সেব চেষ্টার কোনও ত্রুটি ছিল না। বাক্সের মধ্যে বাখা ডেভিসের পাসপোর্টটাও আমার চোখে পড়েছিল। তখন অবশ্য বুঝতে পারিনি—পাসপোর্ট থেকে আসল ডেভিসের ছবি তুলে ফেলে নকল ডেভিসের ছবি বসানো হয়ে গেছে। ওই জাল-করা পাসপোর্টটা জোন্‌সের অপরাধের আর একটা প্রমাণ।'

হাততালি দিয়ে কলকাতা গোয়েন্দা পুলিশের প্রধান বললেন, 'চমৎকার। তুমি যে কী বিরাট একটা কাজ করেছ—কী বলব! আন্তর্জাতিক চক্রের এতগুলো চাঁইকে একসঙ্গে ধরা কতখানি কঠিন আমরা জানি। রঘু জালান, ছোটা জলিল, ওষুধ কোম্পানি আর লোহাপট্টির ব্যবসায়ীদেরও গুণের ঘাটতি নেই। তার ওপর আছে এই জোন্‌স আর ক্যাম্পবেল। আমাদের জলজঙ্গলের সব সম্পদই লোপাট করে দিত এরা। ভাল কথা, ডেভিসের ডেডবডির ছবিগুলো দেখাও তো একবার।'

একটু বিব্রত মুখে কৌশিক বলল, 'এক্ষুনি এসে যাবে। আসলে তাড়াহুড়ো করার জন্যে ছবিগুলো আমি আমার কলকাতার ফ্ল্যাটে ফেলে এসেছি। ওগুলোর প্রয়োজন হবে ভেবে আমি আজ ভোরেই অবনীদাকে ফোন করেছি। ওঁর কাছে আর একটা সেট আছে, উনি বলেছেন পাঠিয়ে দিচ্ছেন এক্ষুনি। যে কোনও মুহূর্তেই ওগুলো এসে যাবে।'

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে সন্দীপ দেব বললেন, 'একটু পরে পেলেও কোনও ক্ষতি নেই। আমাদের তো আরও কিছুক্ষণ থাকতে হবে এখানে। এখন আমাদের প্রথম কাজ হল—লঞ্চে গিয়ে জোন্‌সের মালপত্রের তল্লাশি নেওয়া। তা ছাড়া তোমাদের পূর্ণদাকেও এখানে নিয়ে আসা দরকার। বেচারা নিশ্চয়ই বহুক্ষণ ধরে একা-একা লঞ্চে বসে উদ্বিগ্ন হচ্ছেন।'

একগাল হেসে কৌশিক বলল, 'আপনার দেখছি সন্দীপদা সব দিকেই খেয়াল থাকে!'

॥ ৪৭ ॥

ঘণ্টা-আড়াইয়ের মধ্যে গোয়েন্দাপ্রধান সন্দীপ দেবের নেতৃত্বে পুলিশের দলটি সব কাজ সেরে ফেলেছিল। লঞ্চে গিয়ে ডেভিস-সাজা জোন্‌সের ব্যাগ আর স্যুটকেসের তল্লাশি নিয়ে আপত্তিকর অনেক কিছু পেয়েছে। পাওয়া গিয়েছে আসল ডেভিসের পাশপোর্ট। পাশপোর্টে ডেভিসের ছবি ফেলে দিয়ে বসানো হয়েছে জোন্‌সের

ছবি। গোয়েন্দাপ্রধানের পাকা চোখে সূক্ষ্ম জালিয়াতির আরও কিছু-কিছু চিহ্ন ধরা পড়েছে।

গণেশ ঢালির জ্ঞান ফিরেছে। জ্ঞান ফেরার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সন্দীপ দেবের জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়েছিল গণেশ। আচমকা ঘরভর্তি পুলিশ দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিল ও। ওর ওই অবস্থাটা দারুণ ভাবে কাজে লাগিয়েছেন গোয়েন্দাপ্রধান। বাঘ-ডাকা গলায় বলেছিলেন, 'জোনস সব বলে দিয়েছে আমাকে।'

বিহ্বল গণেশ নিজেকে বাঁচাবার একটাই চেষ্টা করেছিল শুধু। একটু থমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'জোন্‌স কে?'

প্রশ্নটা শুনেই একসঙ্গে দশটা বাঘ ডেকে উঠেছিল গোয়েন্দাপ্রধানের গলায়। 'চালাকি করার চেষ্টা করলে মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব। ডেভিস-সাজা দাগি অপরাধী জোন্‌স সব স্বীকার করেছে। ওই বলে দিয়েছে, কলকাতার পোড়োবাড়িতে দুটো সাহেব আর একটা মেমকে তুই খুন করেছিস।'

আঁতকে উঠে জবাব দিয়েছিল গণেশ, 'না স্যার, আমি না। আমি জোন্‌সের কথা মতো একটা লাশ বাইরে থেকে ওই পোড়োবাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলাম। পোড়োবাড়িতে থাকা নেশাখোর ওই সাহেব-মেমকে জোন্‌স খুন করেছে নিজের হাতে।'

গণেশের সব কথা উঠে গিয়েছিল পুলিশের খাতায়। গোয়েন্দাপ্রধান চাপা গলায় কৌশিককে বললেন, 'পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট বলেছে, আমেরিকান সাহেব-মেম মারা যাওয়ার ঘণ্টা-বারো আগে বাকি সাহেবটাকে মারা হয়েছে। রিপোর্টটা কি মনে পড়ছে তোমার?'

একদিকে মাথা কাত করে সায় দিয়েছিল কৌশিক।

আর এক দফা বিবৃতি নেওয়া হয়ে গিয়েছে লিজিয়া, জোসি আর রনির কাছ থেকে। ব্রিটিশ ডেপুটি হাইকমিশনের প্রেস অ্যান্ড পাবলিক অ্যাফেয়ার্সের চিফ অমিতাভ পাল জানালেন—না, ওই লোকটা ওদের প্রাক্তন সহকর্মী রিচার্ড ডেভিস নয়।

একটু তাড়াহুড়ো পড়ে গিয়েছিল এবার, পুলিশ পার্টি রওনা দেবে কলকাতার দিকে। অ্যাম্বুলেন্সে চেপে যাবে ডেভিস-সাজা জোন্‌স আর হার্ডি-সাজা ক্যাম্পবেল। প্রিজন ভ্যানে যাবে গণেশ ঢালি, মহাদেব দাশ, ডাকাত রফিক, ভোলা আর পচন।

জোসিদের জন্যে দুটো অ্যাম্বাসাডর এসে গেছে, কিন্তু ওরা আজ আর কলকাতায় ফিরতে চায় না। আর একটা দিন লঞ্চে থেকে কাল ফিরবে। কী কারণ? না, জোসি আর লিজিয়া দুজনেই অসুস্থ বোধ করছে।

গোয়েন্দাপ্রধান সন্দীপ দেব কৌশিককে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'পর-পর যা সব ঘটনা ঘটে গেছে, অসুস্থ না হওয়াটাই অস্বাভাবিক। মানবিকতার দিকটাও তো দেখা উচিত আমাদের। ঠিক আছে, ওরা থাকুক। তোমার ওপর ভরসা করে ওদের রেখে যাচ্ছি। তবে তোমার ওপর পুরো চাপটা দেব না। লঞ্চে পুলিশ গার্ড থাকবে। আর পুলিশের একটা পেট্রল বোট তোমাদের লঞ্চের সঙ্গে থাকবে। রাইট?'

বাধ্য ছেলের মতো আর একবার এক পাশে ঘাড় কাত করল কৌশিক।

এমন সময় সাদা পোশাকের এক পুলিশ কনস্টেবল ছুটে এসে বলল, 'হিরু গুনিনের জ্ঞান ফিরেছে। জ্ঞান ফেরার পরেই পালাবার তাল করেছিল, পুলিশ আটকেছে। এখন ডাক্তারের ওপর হম্বিতম্বি করছে। বলছে, বেরুতেই যদি না দেবেন তা হলে গাঁজা আর

দুধ আনিয়ে দেন। কাল পুজোর নানা ধরনের ক্রিয়াকাণ্ড করতে গিয়ে শরীরের ওপর খুব ধকল গিয়েছে।'

দুটো ভুরু কপালের দিকে ঠেলে দিয়ে গোয়েন্দাপ্রধান বললেন, 'তাই! তা, তুমি ডাক্তারকে গিয়ে বলো—ওকে যদি এখন নার্সিংহোম থেকে ছেড়ে দেওয়া সম্ভব হয় তো, ছেড়ে দিক। তারপর ওকে নিয়ে সোজা চলে এসো এখানে। এত কথা শুনেছি ওর সম্পর্কে, একবার না হয় দেখেই যাই—।'

একটু বাদেই পুলিশের সঙ্গে ওখানে এসে হাজির হল গুনিন হিরু মণ্ডল। দলবলসমেত পুলিশের দুই বড় সাহেবকে দেখে হকচকিয়ে গিয়েছিল হিরু। কিন্তু চটপট নিজেকে সামলে নিয়ে ঝুঁকে পড়ে হাতজোড় করে অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরে গিয়ে বলল, 'পেন্নাম হই, মা বনবিবির কৃপায় আপনারা সবাই সুখে-শান্তিতে থাকুন।'

হিরুর পরনে রঙিন কাপড়ের একগাদা টুকরো জোড়া মস্ত এক আলখাল্লা আর ঢোলা পাজামা। চেক-কাটা গামছা মাথায় পাগড়ির ধাঁচে বাঁধা। মুখে গোঁফদাড়ির জঙ্গল। বেলা সাড়ে-এগারোটার ঝকঝকে রোদ হিরুর কালচে কপাল আর লালচে চোখের ওপর দিয়ে যেন পিছলে-পিছলে যাচ্ছিল।

যে আগে কখনও হিরুকে দেখেনি, তার পক্ষে ওর ওপর থেকে চট করে নজর ফেরানো কঠিন। বেশ খুঁটিয়ে হিরুকে দেখে নেওয়ার পরে হুংকার ছাড়ার গলায় গোয়েন্দাপ্রধান বললেন, 'তুমি নাকি গাঁজা খাওয়ার জন্যে চোটপাট করছিলে ডাক্তারের ওপর—।'

জিভ কেটে কানে হাত ঠেকিয়ে হিরু বলল, 'আমি গাঁজা খাই না ছাহেব, বাবার পেসাদ খাই। কখন খাই? না, মায়ের ভজনা করার আগে। আমরা বনবিবির সন্তান। পুজো-আচ্চা, ক্রিয়াকর্মে কখনও ফাঁকি দিইনি বলেই কাল রাতের বেলায় যক্ষ-বাঘের হাত থেকে ছাহেবদের বাঁচাতে পেরেছি—।'

'যক্ষ-বাঘ! সে আবার কী?

অর্বাচীনের কথায় পণ্ডিতরা যে ভাবে হাসে, ঠিক সেই ভাবে হেসে নিয়ে হিরু বলল "সুন্দরবনের কিছু-কিছু পুরনো মন্দিরে যক্ষ-বাঘ আছে। বাঘ মেরে সেই বাঘ তন্ত্রমন্ত্রের সাহায্যে মন্দিরের পাহারায় রেখে দেওয়া হত একসময়। এই বাঘ হল গিয়ে যক্ষ বাঘ। এই বাঘের মৃত্যু নেই। কিন্তু বাঘের হাতে সবাই মরে। যক্ষ-বাঘ কালকেই সব ক'টাকে সাবাড় করত। পারল না শুধু আমার জন্যে।"

'কী রকম?'

'কাল রাতের বেলায় পোড়োমন্দিরের কাছাকাছি যেতেই দেখি প্রকাণ্ড এক বাঘ। দু-চোখ যেন মস্ত দু-টুকরো জ্বলন্ত কয়লা। বাঘ লাফ দিল ছাহেবের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছুড়ল ছাহেব। চোখের সামনে দেখলাম গুলি বেরিয়ে গেল বাঘের শরীরের ভেতর দিয়ে। বুঝলাম, এ বাঘ জ্যান্ত বাঘ নয়, যক্ষ-বাঘ। আমি সঙ্গে না থাকলে কাউকে আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে হত না কাল রাতে। হাতের ফুল-বেলপাতা-সর্ষে ছুড়ে আউড়ে গেলাম যক্ষ-বাঘ মারণ মন্তর। ব্যস, ওই মন্তরেই মুক্তি পেয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল যক্ষ-বাঘ। তবে এট্টুসখানি চোট পেলাম আমি।'

'চোট! কী চোট?'

'মন্তরের চোট। বড্ড কড়া মন্তর কি না! এই যে এতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিলাম—। কী

জন্যে? মন্তরের চোটেই তো। তবে তাতে আমার কোনও দুঃখ্যু নেই। এতগুলো প্রাণ তো বাঁচাতে পারলাম!'

'তোমার কি গাঁজা খাওয়া হয়ে গেছে?'

'আজ্ঞে, গাঁজা নয়—পেসাদ। আমার কাছে এট্টুসখানি ছিল। এখানে আসার পথে একটু দম দিয়ে নিয়েছি। জয় মা বনবিবি, আমরা তোমারই সন্তান, মা, মাগো—।'

গোয়েন্দাপ্রধান চোখের ইঙ্গিত করতেই একজন পুলিশ গার্ড সরিয়ে নিয়ে গেল হিরু গুনিনকে।

গুনিন ওখান থেকে সরে যাওয়ার পরেই আর এক দফা ব্যস্ততা শুরু হয়ে গিয়েছিল পুলিশ-পার্টির মধ্যে। কোমরে দড়ি বেঁধে কালো ভ্যানে তোলা হল গণেশ ঢালি, মহাদেব দাস, রফিক ডাকাত, ভোলা আর পচনকে।

অ্যাম্বুলেন্সে ওঠানো হল জোন্‌স আর ক্যাম্পবেলকে। এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে ওদের কলকাতার পি জি হাসপাতালে ভর্তি করানো হবে। কিন্তু গোয়েন্দাপ্রধান জিপে ওঠার আগেই আর একটা জিপ এসে থামল ওখানে।

জিপ থেকে প্রায় লাফ দিয়ে নামলেন পুলিশ ইন্সপেক্টর অবনী ঘোষরায়। উর্দি ভিজে গেছে ঘামে। একটু নার্ভাস ভঙ্গিতে এগিয়ে গিয়ে গোয়েন্দাপ্রধানকে একটা স্যালুট ঠুকে মুখস্থ পড়া বলার ভঙ্গিতে বললেন, 'রাস্তায় আমার জিপের অ্যাক্সেল ভেঙে গিয়েছিল স্যার। অন্য গাড়ি নিয়ে তিন মাইল দূরে গিয়ে মেকানিক ধরে এনে গাড়ি সারাই। এই সব করতে গিয়েই তিন ঘণ্টা নষ্ট স্যার। ভেরি স্যরি স্যার।'

উত্তরে গম্ভীর মুখে সন্দীপ দেব বললেন, 'গাড়ি খারাপ হলে আপনি আর কী করবেন? ছবিগুলো এনেছেন?'

ছবির খাম হাতেই ধরা ছিল ঘোষরায়ের, এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'কাছাকাছি একটা জায়গায় আমার আসার কথা ছিল। তা ভাবলাম, যাচ্ছি যখন নিজের হাতেই ছবিগুলো স্যারকে দেওয়া ভাল। তাই—।'

কথার কোনও উত্তর না দিয়ে গম্ভীর মুখে ছবিগুলো দেখে গোয়েন্দাপ্রধান বললেন 'ঠিক আছে, আমরা কলকাতায় ফিরছি। আপনি কিন্তু বেশি দেরি করবেন না—।'

'না স্যার, এক্ষুনি ফিরব। এই এক গ্লাস জল খেয়েই—।'

একটা কনভয় যাওয়ার কায়দায় কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দাপ্রধান, এখানকার এস. পি.-র জিপ, প্রিজন ভ্যান, অ্যাম্বুলেন্স আর পুলিশ গার্ড ভর্তি একটা অ্যামবাসাডর রওনা হয়ে গেল কলকাতার পথে। শেষ জিপটার দিকে তাকিয়ে লম্বা একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ইন্সপেক্টর কৌশিককে বললেন, 'আমার গাড়ি খারাপ হওয়ার পর থেকে কী যে দুশ্চিন্তার মধ্যে ছিলাম—কী বলব! যাক, শেষ রক্ষা হয়েছে—এই বাঁচোয়া। সত্যি কথা বলতে কি, এই কেসটা বড্ড অপয়া। এটা হাতে আসার পর থেকে একটার পর একটা ঝামেলায় পড়ছি। এ তো মেটার কেস নয়—।'

'কোন্ কেসটার কথা বলেছেন আপনি?'

গাবদা হাতের ছোট্ট একটা চড় নিজের কপালে মেরে ইন্সপেক্টর বললেন, 'আমার হাতে বেয়াড়া কেস বলতে এখন তো একটাই। ওই দুটো সাহেব আর একটা মেম খুন—।'

মুচকি হেসে কৌশিক বলল, 'ওই রহস্যটার সমাধান হয়েছে শেষ পর্যন্ত। তবে এ-ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব আপনার।'

বিস্ময়ে চোখমুখ যেন ফেটে পড়ছিল ইন্সপেক্টরের। 'অ্যাঁ! কী বলছ! সমাধান হয়েছে! খুনির কোনও হদিশ পেলে কি?'

'পেয়েছি। খুনি ধরাও পড়েছে। চলুন, একটু চা খেতে খেতে সব শুনবেন। আধ ঘণ্টা বাদেই আমরা লঞ্চে উঠে পড়ছি। কলকাতায় ফিরে কাল-পরশু দেখা করব আপনার সঙ্গে। ভাল কথা, ট্রাঙ্ক-ভর্তি ওই হাড়গুলো আছে তো?'

এখনও আছে, তবে এবার ফেলে দিতে হবে। গোরু-মোষের হাড়। নাইট-গার্ড ভয় পেয়েছে কাল। কনস্টেবলরা ওগুলো আর থানায় রাখতে চাইছে না।'

'না-না, ওগুলো গরু-মোষের হাড় নয়। বাঘের হাড়। কুড়ি কেজি মতো আছে, বাজারে ওই হাড়ের দাম হবে প্রায় চোদ্দো লাখ।'

'অ্যাঁ! কী বলছ! আচ্ছা, ওগুলো যে বাঘের হাড়, কী করে বুঝলে?'

'বাহ্! ভেটারিনারি সার্জেন প্রতুল মহাপাত্রকে দিয়ে পরীক্ষা করালাম না? উনিই বলেছেন। চলুন খুনের রহস্য সমাধানের কাহিনীটা আপনাকে চটপট শুনিয়ে দিই। এটা নিছক খুন নয়, এর সঙ্গে মস্ত বড় এটা চোরাচালান চক্রেরও সম্পর্ক আছে। আন্তর্জাতিক দল, দলের অনেকেই ধরা পড়েছে। চলুন, চা খেতে খেতে আপনাকে সব শোনাই।'

আধ ঘণ্টা নয়, প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে তদন্ত ও ধরপাকড়ের কাহিনী শোনাবার পরে কৌশিক বলল, 'অবনীদা, এই হল ব্যাপার, খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো আমি কলকাতায় ফিরে বলব। আর একটা কথা, একটু আগেই খবরের কাগজ আর টিভির লোকজন কী ভাবে যেন ঘটনাটার কথা জানতে পেরে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। আমি বলে দিয়েছি সব কৃতিত্ব আপনার আর সন্দীপদার। আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করলে আপনি কিন্তু প্রতিবাদ করবেন না।'

উত্তেজিত হয়ে ইন্সপেক্টর ঘোষরায় বললেন, 'আলবাত করব। কথাটা তো ঠিক নয়।'

'ঠিক। আর প্রতিবাদ যদি করতেই হয়, করবেন। তবে এখন নয়, এক দেড় মাস বাদে। কেন অদ্দিন অপেক্ষা করতে বলছি, সেটাও তখন বলব।'

নিমরাজি গোছের মুখ করে ইন্সপেক্টর উত্তর দিলেন, 'দেড় মাস তো তোমার মুখের বুলি। ওই সব বলে ব্যাপারটা ধামাচাপা দাও। পরে আর মুখ খোলো না। ঠিক আছে, তুমি যখন বলছ—তাই হবে।'

এম. ভি. সদাগরে তল্লাশি নেওয়ার পরে লঞ্চটা নিয়ে আসা হয়েছিল হাসনাবাদের ঘাটে। পারভেজ পূর্ণ চ্যাটার্জিকে সঙ্গে নিয়ে চলে গিয়েছিল গেস্টহাউসে। ওখানে ভাইপো রনিকে পেয়ে কাকার আর আনন্দ ধরে না।

অনর্গল কথা বলতে পারে রনি। কাকাকে পুরো ঘটনাটা ও শোনাবার পরেও কাকার বিস্ময় যেন কাটতে চাইছিল না। শেষে উনি হাতজোড় করে ওপর দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বললেন: এই জন্যেই মানতে হয়—মাথার ওপরে একজন আছেন। তাঁর দয়া না থাকলে আমাদের সবার পক্ষে বেঁচে ফেরা কঠিন হত।

পরে এক দফা সবার কুশল-সংবাদ নেওয়ার পরে পুরনো সেই খোস মেজাজে ফিরে এসেছিলেন কাকা। অল্প সময়ের মধ্যে লিজিয়ার সঙ্গেও বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল ওঁর। কিছুক্ষণ বাদে শ্রীকৃষ্ণ মাইতির সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পরে হাসতে হাসতে ওঁকে বলেছিলেন, 'আপনার পা ভাঙার গল্প কৌশিক কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করিয়ে ছেড়েছিল—। যাই হোক, আপনি কিন্তু কিছুকাল সাবধানে চলাফেরা করবেন।'

গলা ছেড়ে হেসে উঠে সি. আই সাহেব জবাব দিয়েছিলেন, 'পা ভেঙেছিল অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণ মাইতির, আমি তো পুলিশের চাকরি করি।'

ইন্সপেক্টর অবনী ঘোষরায় কলকাতার পথে রওনা হয়ে যাওয়ার পরে কৌশিক ফিরে এসেছিল গেস্টহাউসে। তার পর দ্রুত লাঞ্চ সারার পরে সবাই গিয়ে উঠে পড়েছিল এম. ভি. সদাগরে। কাল সকালে ফিরে এসে রওনা দেবে কলকাতার দিকে।

গোয়েন্দাপ্রধানের নির্দেশে চারজন পুলিশ গার্ড উঠেছিল লঞ্চে। তবে উঠেই ওরা চলে গিয়েছিল যাত্রীদের চোখের আড়ালে, লঞ্চের পেছন দিকে। লঞ্চের সঙ্গে একটু দূরত্ব বজায় রেখে পিছু-পিছু আসছিল একটা পুলিশের বোট, তাতেও কয়েকজন সশস্ত্র পাহারাদার।

আকাশ মেঘলা। ফুরফুরে হাওয়া বইছিল। লিজিয়া আর রনি চোখের পলক প্রায় না ফেলে চারদিক দেখছিল। মুগ্ধ হওয়ার নানান অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছিল ওদের চোখেমুখে।

পূর্ণ চ্যাটার্জি মজা পাচ্ছিলেন ওদের মুগ্ধতা দেখে। হাসতে হাসতে বললেন, 'এই তো সবে শুরু। লঞ্চ আর একটু এগোক, তার পরেই দেখতে পাবে সুন্দরবনের আসল সৌন্দর্য!'

জোসি একটু থম্ মেরে বসেছিল। তবে এম. ভি. সদাগর আরও কিছুটা এগোবার পরে ওর বিষণ্ণতা কেটে গিয়েছিল একদম। ছেলোমানুষের মতো খুশি-খুশি গলায় রনির দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'ওই যে দূরে সবুজ বন দেখছ, ওটাই হচ্ছে সুন্দরবন।'

ঝলমলে মুখে রনি প্রশ্ন করেছিল, 'ওখানেই কি টাইগার প্রজেক্টের কোর-এরিয়া?'

'না-না, ওখানে নয়। আরও কিছুটা এগোবার পরে দেখা যাবে। তাই না পূর্ণদা?'

উত্তরে একটু নকল বিস্ময় মুখে ফুটিয়ে জোসির পূর্ণদা বললেন, 'কোর-এরিয়া কোথায়, সেটা তো আমার চাইতে তুমি ভাল করে জানো। মাঝরাত্তিরে বন্দুক-টন্দুক নিয়ে অ্যাডভেঞ্চারে গিয়েছিলে—।'

ওঁর ঠাট্টায় অসম্ভব ব্যথিত হয়ে উঠেছিল জোসির মুখ। ফর্সা মুখ লাল টুকটুকে হয়ে গিয়েছিল। কয়েক মুহূর্ত মুখ নিচু করে রাখার পরে ধরা গলায় বলল, 'আমি ভীষণ অন্যায় করেছি পূর্ণদা। দিস ইজ আনপার্ডনেবল। আমাদের গুলিতে যদি একটা বাঘ মারা যেত!'

জোসির কথাটা শুনে একই সঙ্গে চমকে উঠেছিল কৌশিক আর পূর্ণ চ্যাটার্জি।

রনি বলল, 'জোসি আর লিজিয়া দুজনেই এখন ভীষণ ভাবে বণ্যপ্রাণীকে ভালবেসে ফেলেছে। শুধু বনের প্রাণীই নয়, বনজঙ্গলের প্রতিও ওদের টান বেড়ে গেছে দারুণ। আমি অ্যান্ডি আর শঙ্কর লাহিড়ীর কথা শুনিয়েছি ওদের।'

অবাক হয়ে পূর্ণ চ্যাটার্জি প্রশ্ন করলেন, 'অ্যান্ডি আর শঙ্কর লাহিড়ী কারা?'

কাকার দিকে তাকিয়ে উত্তর দিল রনি, 'ওয়াইল্ড লাইফের দুই চ্যাম্পিয়ন। বনের জন্তুজানোয়ার আর বনজঙ্গল বাঁচিয়ে রাখার জন্যে বলা যেতে পারে—এঁরা এঁদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। আমি কৌশিকদার কাছ থেকে এঁদের কাজকর্মের কথা শুনেছি। গেস্টহাউসে বসে ওই দুজনের কথা জোসি আর লিজিয়াকে বলতেই ওরা তো চার্মড। বলেছে: এক্ষুনি ওঁদের ঠিকানা জোগাড় করে দাও। আমরা দুজনেই ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ডে আমাদের টাকা দান করব।'

অভিভূত মানুষের ভঙ্গিতে পূর্ণ চ্যাটার্জি বললেন, "খুব ভাল। তবে সেই সঙ্গে সঙ্গে চোরাশিকারিদের শায়েস্তা করার ব্যবস্থাও জোরদার করতে হবে। এদের জঘন্য কাণ্ডকারখানার কোনও ক্ষমা নেই। কিছুদিন আগে একটা রিপোর্টে দুজন অ্যানিম্যাল রাইট্স অ্যাকটিভিস্টের

কথা পড়ছিলাম। একটা রিসার্চ ট্রিপে ওঁরা এশিয়ার অনেকগুলো দেশ ঘুরেছেন। কলকাতাতেও এসেছিলেন। নাম ভুলে গিয়েছি। ভদ্রলোক 'অ্যানিম্যাল পিপল' বলে নামকরা একটা মাসিক পত্রিকার সম্পাদক। স্বামী-স্ত্রী বনের জন্তুজানোয়ার বাঁচিয়ে রাখার কজে উঠেপড়ে লেগেছেন। সঙ্গে ওঁদের কিশোর পুত্রও আছে। স্বামী-স্ত্রী প্রশ্ন তুলেছেন—এই যে কুখ্যাত চন্দন দস্যু বীরাপ্পান বনের হাতি মেরেছে দু' হাজারেরও বেশি, অথচ অনেকের কাছে এই লোকটা হিরো। কেন? কলকাতা বিমানবন্দরের ওপরেও ওঁদের খুব রাগ। কলকাতা সুন্দরবন, ডুয়ার্স আর নর্থ-ইস্টের কাছাকাছি বলে কলকাতার পথ দিয়ে প্রতি মাসে কম পক্ষে গোটা-পনেরো বাঘের চামড়া পাচার হয়। শুধু টাইগার স্কিন নয়—নিয়মিত পাচারের তালিকায় আছে লেপার্ড আর ভাল্লুকের চামড়াও। আছে গণ্ডারের খড়্গ। কী ভয়ংকর ব্যাপার বলো তো?"

জোসি বলল, 'আমি দেশে ফিরে গিয়েই ওই পত্রিকার সম্পাদককে চিঠি লিখব—।'

সার দিয়ে লিজিয়া জানাল, 'আমরাও অ্যানিম্যাল রাইট্স অ্যাকটিভিস্ট হতে চাই। মানুষের মতো বনের পশুপাখিরও বাঁচার অধিকার আছে।'

কৌশিক বলল, 'পরিবেশবিদ্‌রা বলেন, পশুপাখি আর গাছপালা এ ভাবে ধ্বংস হতে থাকলে মানুষ আর সুস্থ হয়ে বাঁচতে পারবে না।'

কৌশিকের কথা প্রায় একসঙ্গেই সমর্থন করেছিল সবাই।

গল্পে গল্পে বেলা বাড়ল, তারপর বিকেল-সন্ধে। রাত হতেই সোনার থালার মতো চাঁদ উঠেছিল আকাশে, এখন আর এককুচিও মেঘ নেই।

জোসি বলল, 'পূর্ণাদা, আমরা কিন্তু লঞ্চ এখনই অ্যাংকর করব না। আরও কিছুক্ষণ ঘুরে ঘুরে রাতের সুন্দরবন দেখব।'

'দেখো না, আমরা সবাই তো দেখতে চাই—সত্যি কী অপূর্ব লাগছে! এই সৌন্দর্যের কোনও তুলনা নেই। তোমার পূর্বপুরুষ বর্নিয়ের কেন বাংলাদেশকে সোনার দেশ বলেছিলেন—এখানে এলে বোঝা যায়। সুন্দরবনের ওপর তো ওঁর আবার বাড়তি টান ছিল। ওঁর রাত কাটানোর অভিজ্ঞতাও চমকপ্রদ। একটা লম্বা দড়ি দিয়ে ওঁর নৌকো বাঁধা হত গাছের ডালে, তারপর নৌকো রাখা হত খালের মাঝামাঝি জায়গায়। খালের ধারে থাকলে বাঘ এসে তুলে নিয়ে যাবে। অবশ্য মাঝামাঝি থাকলেও বাঘের হাত থেকে বাঁচা যেত না সব সময়। আজ রাত্তিরে যদি আমাদের লঞ্চে বাঘ আসে!'

কাঁধে মৃদু ঝাঁকুনি তুলে জোসি বলল, "আই ডো'ন্ট মাইন্ড। এলে আসবে। এটা তো বাঘেদেরই জায়গা।"

বলার একটু বাদেই হ্যান্ডব্যাগ খুলে একতাড়া কাগজ বার করেছিল জোসি। ঝকঝকে চাঁদের আলোয় চারপাশের সব কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। কাগজের তাড়া একটু উঁচু করে ধরে আস্তে আস্তে ও চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিল পূর্ণদা, কৌশিক, লিজিয়া আর রনিকে। তার পরে কেমন যেন অচেনা মানুষের গলায় বলল, 'আজ থেকে প্রায় সাড়ে-তিনশো বছর আগে আমার পূর্বপুরুষ ফাঁসোয়া বার্নিয়ের এই বাংলাদেশে, সুন্দরবনে এসেছিলেন। সোনার বাংলা দেখে লিখেছিলেন—এমন দেশ পৃথিবীতে আর একটাও নেই। ওঁর ভাল লাগার কথা ওঁর ভ্রমণকাহিনীতে লেখা আছে। এই যে পাতাগুলো দেখছেন—এর মধ্যেও সুন্দরবনের কথা কিছু-কিছু আছে। তবে সব চেয়ে বেশি করে আছে ট্রেজারের কথা, গুপ্তধনের কথা—।'

কথাগুলো শুনে চমকে উঠেছিল চারপাশের সবাই। পূর্ণদা বললেন, 'এগুলোই কি বার্নিয়েরের অপ্রকাশিত সেই পাণ্ডুলিপির পাতা?'

একপাশে মাথা কাত করল জোসি। 'কী অদ্ভুত ব্যাপার দেখুন। প্যারিস থেকে এই জায়গাটা কত দূরে। কিন্তু সাড়ে-তিনশো বছর আগে লেখা পাতাগুলো প্যারিস থেকে সুন্দরবনে ফিরে এসেছে আবার। কেন বলুন তো?'

'কেন?'

'হয়তো ম্যানাস্‌ক্রিপ্‌টের এই পার্টের এটাই ডেসটিনি। যেখানকার জিনিস সেখানেই থাকতে চায়।' বলার পরে জোসি হঠাৎই পাণ্ডুলিপির পাতাগুলো টান মেরে ছুড়ে ফেলে দিল নদীর ওপরে। বেশ একটু জোরেই হাওয়া বইছিল, পাণ্ডুলিপির পাতাগুলো হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে নদীর জলে গিয়ে পড়তে লাগল।

হাঁ-হাঁ করে উঠেছিল চারপাশের সবাই। পূর্ণদা বেশ একটু জোরেই বলে উঠলেন, 'ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ পাণ্ডুলিপির ওই পাতাগুলো। আর, তুমি ওগুলো জলে ফেলে দিলে!'

চাঁদনি রাতে লঞ্চ ছুটে চলেছিল সামনের দিকে। মৃদু ঢেউ-ওঠা জলের মধ্যে হারিয়ে গেল বিশ্ববিখ্যাত পর্যটক বার্নিয়েরের নিজের হাতে লেখা সাড়ে-তিনশো বছর আগেকার অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির বেশ কয়েকটি পাতা।

জোসির আশেপাশে-বসা মানুষগুলো ঘটনার আকস্মিকতায় রীতিমত বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে জোসি কেমন যেন কেটে কেটে বলল, 'এই পাণ্ডুলিপির একটা জেরক্স কপি এই লঞ্চেই ছিল, আমি আগেই সেটা নষ্ট করে ফেলেছি। এখন করলাম আসলটা।'

ছোট্ট একটা ঢোক গিলে কৌশিক প্রশ্ন করল, 'কিন্তু, কেন?'

জোসি একটু থেমে থেমে বলল, 'এই পাণ্ডুলিপির কথা জানাজানি হয়ে গেছে। এবার এটা ছাপা হত। আর ছাপা হলেই ক্যাম্পবেল আর জোন্‌সের মতো কত লোক গুপ্তধনের লোভে হানা দিত এই সুন্দরবনে। গুপ্তধন খোঁজার সময় সুন্দরবনের অনেক বাঘ মারা পড়ত ওদের বন্দুকের গুলিতে। আমি সেটা হতে দিতে চাই না—।'

জোসির এই কথাটার পিঠে আর কোনও কথা বলতে পারল না কেউ।

এম. ভি সদাগর ছুটে চলেছিল সামনের দিকে। জল কেটে লঞ্চ এগোবার শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই কোথাও। হঠাৎ কাছের শান্ত, সুন্দর, নিবিড় এক বনভূমির দিকে আঙুল তুলে লিজিয়া আর রনির দিকে তাকিয়ে পূর্ণ চ্যাটার্জি বললেন, 'এইটাই হচ্ছে টাইগার প্রজেক্টের কোর-এরিয়া। যাকে বলে, বাঘদের খাশ তালুক।'

লঞ্চ আরও কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিল নিবিড় বনভূমির দিকে। কিন্তু বাঘের ডেরার কাছাকাছি পৌঁছবার পরেও কারও বুকের ভেতরে একটাও অচেনা শব্দ ওঠেনি। বরং ভয়াল-সুন্দর কাউকে দেখার জন্যে সম্ভ্রম ও ভালবাসা মেশানো অদ্ভুত একটা আগ্রহ তৈরি হয়েছিল সবার মধ্যে।